

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।

(ইংরেজপ্রভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত ।)

“নানান্ দেশের নানান্ ভাষা ।

বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ॥”

নিখুঁয়াবু ।

ত্ৰীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা

প্রকাশক—সান্তাল এণ্ড কোম্পানি ।

মূল্য—চারি টাকা ।

କଳିକାତା

୨୫୧ନଂ ଡକ୍ଟର ମେନ, ଭାନୁବିହାରୀ ଯାଦବ

ସାହାଯ୍ୟ ଏଓ ବୋମ୍ବେ ଦ୍ଵାରା

ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

উৎসর্গ-পত্র ।

অশেষ-গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংশ প্রজারঞ্জক
স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্মহারাজ
বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্মাণ বাহাদুরের.
শ্রীকর কমলে,—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।

প্রথম অধ্যায় ।

—:—

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি ।

বঙ্গভাষা : কোন সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে
নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে । ইতিহাসেব
বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি ১০০০ পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্ম্মবীর কি কন্মবীরেব
বৎসবেরও অনেক পুন্সবস্ত্রা ; আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হন, পাঠক-
গণেব মনে হয ত কেহ কেহ এই অধ্যায়-ভাগে সেইরূপ একটা খুষ্টাঙ্ক

শ্রীযুক্ত গীয়াবসন নাহেব ভাবতবর্ষেব প্রচলিত ভাষাসমূহেব (নোকসংখ্যা সমেত)
নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

(ক) উত্তর পশ্চিম ভাবতায় শ্রেণী ।	(অ) উত্তরাংশ
সিকা (২,৫২০,০০০)	মবাবগী (পাছাডা ১,১৫০,০০০)
কান্মীবী (৪,০২০,০০০)	নেপালী (৩,০২০,০০০)
পশ্চিম পঞ্জাবী (২,০০০,০০০)	(গ) পূবভারতীয় শ্রেণী ।
(খ) মবাবভাবতীয় শ্রেণী ।	(ঙ) পূব মধ্য
(জ) পশ্চিমাংশ ।	বৈশাবাবী (২০,০০০,০০০)
পূব পঞ্জাবী (১৪,৭২০,০০০)	বিহাবী (৩০,০০০,০০০)
গুজবানী (১১,০৬৭,০০০)	(আ) দক্ষিণাংশ
বাজপুতী (১২,১৫০,৭০০)	মহাবাঙ্গী (১৮,২৩০,০০০)
হিন্দী (৩৫,৮২০,০০০)	(ই) পূর্বাংশ
	বান্গাল (৪২,৩৪৭,০০০)
	আসামী (১,৪৪০,০০০)
	উড়িষা (২,০১০,০০০)

ভারতবর্ষীয় আযাভাষাকথনশীল লোকেব সংখ্যা সর্বসমেত ২৯৯,৩২০,০০০ ।

—এসিযাটিক সোসাইটিব জারন্সাল নং ৪; ১৮৯১ ।

কি শতাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন ; কিন্তু ভাষার উৎপত্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের তদ্রূপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না । কোন কোন লেখক, এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্ত বলিয়াছেন, ‘.১০০০ বৎসর হইল বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে ।’ ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন । ইহা ত খৃষ্ট জন্মবার পূর্বের কথা । বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ৯৩০ শকের হাতের লেখা একখানি কাশীখণ্ড আমরা দেখিয়াছি । উহার অক্ষর ‘কুটিল’ অক্ষরের একগাফ্রাস্ত প্রাচীন বঙ্গলিপি । সেন-রাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে ঐরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; উহা নূনাধিক ৮০০ বৎসরের পূর্ববর্তী । এই সকল লিপিগুলার পূর্ণাবয়ব দোঁখিয়া তাহা যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির অব্যবহিত পবেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সম্ভব হইবে না । আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে আলোচনা করিব । পাঠক দেখিবেন, উহার সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের বঙ্গভাষার নিদর্শন । এতদ্দেশপ্রচলিত ডাকের বচন অপেক্ষাও প্রাচীনতর বঙ্গভাষায় বিরচিত উক্তরূপ বচনের নমুনা নেপালে পাওয়া গিয়াছে । এইরূপ বিবিধ প্রমাণেব পর্যালোচনা করিলে বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি যে কেবল ১০০০ বৎসর হইল সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না ।

ভারতবর্ষীয় অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে । প্রিন্সেপ ভারতীয় অক্ষর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত । প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয়

অক্ষর গ্রীকদিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত । সময়ের পৌরুষাপর্য্য ও শাস্ত্রিক সূত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে সমর্থিত হইতে পারে না বলিয়া, অনেকেই উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন । আর

উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর ফিনিসিয়ান অক্ষর হইতে গৃহীত । বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, অশোকলিপির সহিত ফিনিসিয়ান অক্ষরের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই । টেলর প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত বলেন, ভারতবর্ষীয় লিপি সেবীয় (Sabian) লিপির অনুরূপ । কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেখোক্ত লিপির যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচীন নহে; সুতরাং তাহা হইতে ভাবভীষ্য লিপির উদ্ভব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না । মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ জন্ত এই অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন । টেলর সাহেব স্বয়ং স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; তিনি বলেন, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয়ত ওমান, হাদ্রাম, অরামা, সেবা কিংবা অত্র কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে কালক্রমে আবিষ্কৃত হইতে পাবে ।

অধ্যাপক ডসন, টমাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় অক্ষরমালার জন্ত অত্র কোন দেশের নিকট ঋণী নহে । ডসন লিখিয়াছেন, “হিন্দুরা যে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবিস্বাস করিবার কোনও কারণ নাই । ভাষাতত্ত্বের হৃদয়তত্ত্ব বিষয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা ব্যাকরণের যেরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের যেরূপ হৃদয় বিভিন্নতার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাহাদের নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল । এতদ্ব্যতীত তাহারা অঙ্কশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা সংখ্যানোদক-চিহ্ন-গঠনের যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অননুসাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” ক্যানিংহাম সাহেবও এই মতাবলম্বী । তিনি অনুমান করেন, হিন্দুদের অক্ষর মিসর-দেশীয় চিত্রাঙ্কনের আয় একই প্রণালীতে স্বাশীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে । তদনুসারে তিনি—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ।

১	...	(পালীর 'খ')	...	খননের যন্ত্র (কোদাল) হইতে,
২	...	(অন্তঃস্থ 'য')	...	যব হইতে,
৩	...	(‘দ’)	...	দস্ত হইতে,
৪	...	(‘প’)	...	পাণিতল হইতে,
৫	...	(‘ব’)	...	বীণা হইতে,
৬	...	(‘ল’)	...	লাঙ্গল হইতে,
৭	...	(‘হ’)	...	হস্ত হইতে,
৮	...	(‘শ’)	...	শবণেন্দ্রিয় হইতে,

এই ভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংবা দ্রব্যবিশেষ হইতে অনুকৃত হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের ঐতিহাসিক মূল্য কি বলিতে পারি না, কিন্তু টহাতে কিছু কবিজ্ঞ আছে, সন্দেহ নাই।

যাহারা বলেন, ভারতীয় লিপিমাল্য বিদেশ হইতে আনীত, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এতদেশের প্রাচীনতম ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব।

লিপি (অশোক লিপি) এত সুন্দর ও সুগঠিত (১) যে, উহা যদি দেশীয় সামগ্রী হইত, তবে যে প্রণালীতে ভারতীয় আদিমলিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে সুশৃঙ্খল অশোক-

(১) "The elaborate and beautiful alphabet employed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its scientific excellence : bold, simple, grand, complete. The characters are easy to remember, facile to read, and difficult to mistake, representing with absolute precision the graduated niceties of sound which the phonetic analysis of Sanskrit grammarians had discovered in that marvellous idiom. None of the artificial alphabets which have been proposed by modern phonologists excel it in delicacy, ingenuity, exactitude, and comprehensiveness."

Isaac Taylor's The Alphabet. Vol. II. p. 289.

লিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের শৈলমালায় কিংবা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে অবশ্যই রহিয়া যাইত ; কারণ, আদিম লিপি পরিবর্তিত হইয়া স্মৃতিগত অশোক লিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল । মিসর, চীন, জাপান প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সেই দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তরাদিতে স্মৃতি রহিয়াছে । সেই সকল দেশে দেখা যায়, আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া ভাষা-বিজ্ঞানের উপযোগী নির্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু অশোকলিপির প্রারম্ভ হইতেই উহা স্বরবিজ্ঞানের অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ । এই পূর্বোক্ত পরিণতি প্রাপ্তির আরম্ভস্থচক নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই ; এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, ভাবতবাসিগণ বিদেশ হইতে লিপিমাত্র গ্রহণ করিয়া উহা শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, করিবা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন । তাঁহারা আরও বলেন, অশোকলিপি, নাম দূর্বাকী প্রদেশে একই প্রকার দৃষ্ট হয় ; প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপিমালার প্রচলন থাকিলে, অশোকের অনুশাসন ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত-লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ হইত ।

উক্ত যুক্তিগুলি সমীচীন বোধ হয় না । ভারতবর্ষে প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম স্থানে পুরাতন মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে । প্রাচীন কীর্ত্তির উপর একপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই । সহসা কোন রাষ্ট্রবিপ্লবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমস্ত গৌরব-চিহ্ন নষ্ট হয়, তাহার পুনপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর ; অন্ততঃ সেরূপ আকস্মিক উৎপীড়নে দেশের সমস্ত কীর্ত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে না, কিন্তু ভারতবর্ষ

ক্রমাগত শত শত বৎসর ধরিয়া যে অত্যাচার সহ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে । 'হিউনসাঙ' যে সকল বিগ্রহ ও মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার কয়টি এখন বর্তমান ? কাশীর ১০০ ফিট উচ্চ ধাতুনির্মিত শিববিগ্রহ এখন কোথায় ? এখন আমাদের তীর্থ-গুলির প্রাচীনতার প্রমাণ শুধু কিংবদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি । ভারতের সর্বত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে অশ্রুত পূর্ব নীরব অত্যাচারের ক্বাহিনী অব্যক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে । এ অবস্থায় প্রাচীনগ্রন্থোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অল্প প্রমাণ এদেশে স্বভাবতঃই বিরল হইবার কথা ।

কিন্তু প্রমাণ বিরল হইলেও একবারে হুপ্রাপ্য নহে । ভারতবর্ষের শৈলে ও গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্য্যন্ত অধিক অনুসন্ধান হয় নাই । পূর্ববর্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে । মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচারে নিরত ছিলেন, সূতরাং দেশে দেশে উৎকীর্ণ অনুশাসনের প্রচার দ্বারা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে এভাবে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা এই সময়েই নূতন প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় । পূর্ববর্তী নৃপতিগণ এই ভাবের অনুশাসনপ্রচার আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না । এ দেশে যুধিষ্ঠিরের পর অশোকের ন্যায় রাজচক্রবর্তী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই । সেই অশোকেরই প্রস্তরানুশাসন ভিন্ন তদানীন্তন আর কোন লিপিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না ; এবং সেই চিহ্নগুলিও যে বহুসংখ্যক লুপ্ত গৌরবের মুষ্টিমেয় অবশেষ, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ নাই । কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী ৮৪০০০ অনুশাসনের প্রচার করিয়াছিলেন ; বর্তমানকালে তন্মধ্যে কেবল ৪০ খানি পাওয়া গিয়াছে । সেই ৪০ খানির মধ্যেও যে ধ্বংসক্রিয়া সূচিত হয় নাই, একথা বলা যায় না । দেখা যায়, এলাহাবাদের প্রস্তর-

নুশাসনের কতক ভাংশ কর্তিত করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তন্মধ্যে স্বীয় মহিমাজ্ঞাপক এক প্রস্তরলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন । এমন অবস্থায় যদি তৎপূর্ববর্তী রাজাদের কোন মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপির মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই । কিছু নিদর্শন বে না পাওয়া গিয়াছে, এমন নহে । পঞ্জাবে হরপ নামক স্থানের স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি ইহার অত্যন্ত প্রমাণ । এখনও এই স্তম্ভস্থ প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার পর্য্যন্ত হয় নাই ; তথাচ ইহা যে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরের লিপির নিদর্শন, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে । অধিক দিনেব কথা নয়, আফগান-প্রান্ত হইতে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলি অতি প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । যুরোপীয় প্রধান প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও অহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই । কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় লিপিতত্ত্বের আর এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইতে পারে । ভারতের প্রাস্তসীমার কথা ছাড়িয়া দিতেছি । আমাদের এই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যেই মগধপতি জরাসন্ধেব বাজধানী গিরিব্রজে 'জরাসন্ধ-কা-বৈঠকে'র নিকট পার্শ্বতীয় পথের উপর প্রাচীনতম লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে । তাহা যে কত প্রাচীন, তাহা কেহ এখনও স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, 'ঐ লিপি মগধরাজ জরাসন্ধের সমসাময়িক হইলেও হইতে পারে, উহা চিত্রলিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যবর্তী আকারের, অথচ তদপেক্ষা কোন প্রাচীনতম লিপি ।' অল্প দিন হইল, বস্তী জেলায় প্রাচীন কপিলবাস্তুর অতিসান্নিধ্যে পিপড়া ও গ্রামে মিঃ পেপী একটা স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষবিধিষ্ট উৎকীর্ণ বিবরণযুক্ত প্রস্তরপাত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উক্ত উপহার মহাসমারোহের সহিত শ্রামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । সঁচীর স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দুই শিষ্য সারিপুত্র ও

মহামৌদল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; তাহার সহিত উৎকর্ষ লিপি পাত্রেরও উদ্ধার হইয়াছে। এই উভয় লিপিই যে বুদ্ধনির্বাণের প্রায় সমসাময়িক তাহা বলা বাহুল্য।*

অশোক-অমুশাসনে দুই প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয় ; কপূরদি-গিরির অমুশাসনে যবনলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে ; উহার গতি দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিকে। অপর সমস্ত দেশীয় অমুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষরই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। রাজশিল্পিগণ কতুক খোদিত অক্ষরে রাজধানীর গৌরবরক্ষা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই ; কেবল লোকের বোধসৌকর্য্যার্থ অমুশাসনের ভাষা দেশভেদে কিছু ভিন্ন করা হইয়াছে। অশোকের ন্যায় প্রতাপাধিত রাজা রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ স্বীয় প্রদেশের অক্ষর যে অবদানস্থ জনপদসমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। নানারূপ প্রাদেশিক অক্ষর বর্তমান থাকিলেও দেবনাগর এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব অশোকের অমুশাসনে নানা স্থানে একরূপ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিয়া সেই সেই দেশে অন্য লিপি প্রচলিত ছিল না, একপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বিদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষীয় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। মেগাস্থেনিস ভারতবর্ষে জন্মপত্রিকা লিখিবাব পদ্ধতি ও দূরত্বসূচক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরখণ্ডেব উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসান্দারের সেনাপতি নিয়ার্কস্ লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা তুলা দিয়া একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ললিতবিস্তরে ভারতীয় নানা লিপিমালায় বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পাণিনি ব্যাকরণের অষ্টমাধ্যায়ে 'লিপি', 'প্রস্থ', 'পুস্তক' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়, এবং 'যবনানী' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্র

আর্য্যলিপির সম্বন্ধেই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে ‘কাণ্ড’, ‘পটল’ (যাহাদের অর্থ পুস্তকাধার) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারত, ও মনুসংহিতায় এ দেশে লিপি প্রচলিত থাকার নানারূপ প্রমাণ রহিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেদের ১০৮০০ পংক্তি দোষাবহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যজুর্বেদে পরার্ক সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা পাওয়া যায়। লেখার পদ্ধতি না থাকিলে একপ জটিল গণনা সম্ভব হইত না। কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভ কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থগুলিতে গদ্যরচনারও অভাব নাই। আমরা এই সকল কারণে আর্য্যলিপির মৌলিকতা^১ সম্বন্ধে কোনক্রমেই সন্দেহ করিতে পারি না। ভারতীয় লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী মোক্ষমূলর ১৮৯৯ খৃঃ নবেম্বর মাসের ‘নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী’ নামক পত্রিকায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ক্রোশাক চিহ্ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর হিন্দুগণ নিজেরাই উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহাব যথেষ্ট প্রমাণ আছে; অথচ তাঁহারা সমস্ত অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেন নাই। এ যুক্তি বড়ই অসঙ্গত^২ বোধ হয়।

আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি নামে অভিহিত। তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার লিপিমালার পরিবর্ত্তন, সুবিধা নাই। অশোকের অনুশাসনে যে প্রাচীন বঙ্গলিপি।

অক্ষর দৃষ্ট হয়, ঐ পৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্বে তাহা প্রচলিত ছিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অশোকলিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া যে আকার ধারণ করিল, তাহা সচরাচর ‘গুপ্তলিপি’ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। পাটলিপুত্রের গুপ্তবংশীয় সম্রাটদিগের

* অশোক মৌর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন, এজন্য কোন কোন লেখক এই অক্ষরকে মৌর্য্য লিপি অভিধান দিয়া থাকেন। কানিংহাম ইহাকে হন্দপাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অনুশাসন এই অক্ষরে লিখিত । আৰ্য্যাবর্তের অধিকাংশ স্থলে প্রচলিতঃ এই অক্ষর প্রচলিত থাকিলেও, স্থানভেদে স্বভাবতঃই ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল । গুপ্তবংশের অবনতির পর ‘গুপ্তলিপি’ হইতে ‘সারদা’, ‘শ্রীহর্ষ’, ‘কুটিল’ প্রভৃতি প্রাচ্য অক্ষরের উদ্ভব হইল । ‘সারদা’ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, ‘শ্রীহর্ষ’ আৰ্য্যাবর্তের মধ্যপ্রদেশে এবং কুটিল ও তল্লক্ষণাক্রান্ত অপরাপর প্রাচ্য অক্ষর পূর্বভারতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল । ‘সারদা’ অক্ষর হইতে বর্তমান ‘কান্দোবী’, ‘গুরুমুখী’ ও ‘সিন্ধী’ অক্ষরের উৎপত্তি । বর্তমান সময়েও কান্দোবী ও তল্লক্ষণাক্রান্ত উপত্যকার অধিবাসীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে, গুপ্তলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । ‘শ্রীহর্ষ’ অক্ষর অধিক কাল প্রচলিত ছিল না ; ইহা হইতেই দেবনাগরী ও বিবিধ নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় । এখনও তিব্বত দেশে সংস্কৃত লিখিবার জন্য শ্রীহর্ষ অক্ষরের অনুরূপ একপ্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয় । কুটিল প্রভৃতি অক্ষর বৌদ্ধ পালরাজগণের অধিকার-কালে নেপাল হইতে কলিঙ্গ ও বারাণসী হইতে আসাম, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল । প্রাচীন বঙ্গাক্ষর, কুটিল ও মাগধাদি লিপি, এক-বংশেরই লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয় ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়ার স্মৃতিয়া পাহাড় হইতে মহারাজ চন্দ্রবর্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন । এ লিপিখানি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন সময়ে খোদিত হইয়াছিল । এই লিপির আকার মোটামুটি গুপ্তলিপির মত ; তবে অনেক অক্ষরের জাঁদ গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী বলিয়াই বোধ হয় । দেড় হাজার বর্ষেরও পূর্বে বাঙ্গালা দেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা চন্দ্রবর্মার লিপি হইতে কতকটা জানা যায় । * উপক্রমেই বলিয়াছি, যে, খৃষ্ট জন্মবার

৩০০০বর্ষ পূর্বে, অর্থাৎ এখন হইতে ২২০০ বর্ষ পূর্বেও, মগধলিপি, অঙ্গ-লিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতি ভিন্ন-লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা ললিতবিস্তর হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। তখনও নাগর অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই অথবা কোন অক্ষর নাগরী নামেও গণ্য হয় নাই। * সুতরাং প্রতাপন হইতেছে নাগরী অক্ষর অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন। বঙ্গলিপির রূপ অনেকটা চন্দ্রবর্মার লিপিতে প্রতিলিপিত হইয়াছে। সেই লিপির ক্রমঃ পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে, উড়িয়া অক্ষবগুলিবামাত্রা গোলাকার; উৎকলবাসিগণ তাল-পত্রের উপর ‘খুস্তি’ নামক লোহ-চটী দ্বারা লিখিতেন; স্বস্বাগ্র খুস্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার স্থায় মাত্রা টানিতে গেলে তাল-পত্র ছিন্ন হইয়া যায়, এই জন্য তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা স্থিতিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে কক্ষির নামেব অগ্রভাগ তির্ঘাক ভাবে কাটা হইত; এইরূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত কবা সুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিস্কাররূপে ছুটিয়া উঠে, এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরল রেখার মাত্রা টানা যায়; বলা বাহুল্য, কুটিলাক্ষরের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপিব ইহাই বিশেষত্ব।

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র, ইহাতে কয়েকটি অপ্রচলিত পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে। প্রাচীন মৈথিল ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা ও মৈথিল পুথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। বর্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গাল ও দেবনাগরীর

মধ্যবর্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা বিদ্যমান।

মহারাজা চন্দ্রবন্দ্যার লিপিই বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন। কাশী-খণ্ড পুঁথির বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; উহা ১০০৮ খৃষ্টাব্দের লেখা। শ্রীগয়াকর নামক এক ব্যক্তি বৌদ্ধতত্ত্বসম্বন্ধীয় কতকগুলি পুঁথি বঙ্গাক্ষরে (১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে) নকল করিয়াছিলেন; ইহাদের একখানিতে মগধের পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল দেবের রাজ্যাবিনাশের প্রসঙ্গ আছে; এই পুঁথিখানি নেপাল হইতে সংগৃহীত; এক্ষণে ইহা কেশ্বিজ নগরে রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি বাঙ্গালী হস্তলিখিত পুঁথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালী লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অপরাপর স্থলেও লিপিও বঙ্গাক্ষরেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ। উৎকল-বাজ দ্বিতীয় নৃসিংহ দেবের ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

১১৫৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকবল্ল মহারাজার শিলালিপি (বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত), ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের দামোদর রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলিতেও আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন রূপ বিদ্যমান। প্রাচীন লিপিমালার প্রতিক্রম এই অধ্যায়শেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

বঙ্গাক্ষর বৈরূপ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট লাভ করিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, বঙ্গ-
 অর্থাভাষার পরিবর্তন।
 ভাষাও সেইরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে নানাক্রমে পরিবর্তন ও সন্নিহিত নানা ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া,

বর্তমান আকারে পবিণত হইয়াছে । আর্য্যগণ যে সময়ে এ দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই পবিবর্তনের সূচনা ; ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্য্যগণের কথিত ভাষা গোষ্ঠীয় * অত্যাভ্যাসিত ভাষা হইতে পৃথক্ হইয়া দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিল । কিন্তু কোন্ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিবে ? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই, প্রকৃতিও সৃষ্টি প্রথম কাহিনী যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, আদি বৃত্তান্তের চিববহুভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ । মনুষ্য-জাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন । মনুষ্যভাষার যে সৰ্ব্বপ্রাচীন অবস্থা নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গভাষার আদিরূপ অন্বেষণ করিতে গেলে সেই বেদকেই অবলম্বন করিতে হইবে ।

আর্য্য-জাতির প্রথম ভাষা বেদে, তাহার পর নামায়ণাদির ভাষা সংস্কৃত, সংস্কৃতের পর বৌদ্ধদিগের পাণ্ডি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত, চতুর্থ স্তরে, বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি শোড়শ ভাষাসমূহ । এখানে শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলা হইতেছে । বঙ্গভাষার উৎপত্তি কানের নির্দেশ অসমর্থ নহে, আমরা ইহার লিখিত ভাষার পবিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব । ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভাব, কল্পনা-শীল কবি ও দার্শনিক-দিগের হস্ত অর্পণ কামনা, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ।

বোধ হয়, যে ভাষার আদিরূপ হিন্দুগণ কথন কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল । কিন্তু তৎ-পরিণতি ও কথিত ভাষা । তবে ভাষার ঐতিহাসিকগণের চেষ্টা ও ব্যাকরণের সত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছে ।

হবনদি সাহস নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে ‘শোড়শ ভাষা’ এই সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছেন ।—উড়িয়া, বাঙ্গালা হিন্দী, নেপালী মহাবাষ্ট্রী, মলয়ালী, মালয়ী ও কান্নায়া । আমরাও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব ।

তাই, রামায়ণের ভাষা ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস 'বালেন্দুবক্র পলাশপর্ণে'র বর্ণনা করিতেছিলেন, অথবা জয়দেব 'মদন-মহীপতির কনক-দণ্ড-রুচি কেশরকুম্ভে'র কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সে ভাষায় কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের কত কবি মুখে 'বিদ্যাৎ' কি 'মেঘের ডাক' বলিয়া, লেখনী দ্বারা 'ইরশ্বদ' বা 'জীমূতমস্ত্রে'র সৃষ্টি করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে এবং চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান বর্তমান, কিন্তু সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে; তাহা অতিক্রম করিলে লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিগুঢ় হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্য-পল্লভে স্পৃহা ও শব্দের ত্রিভুজি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে;—তখন ভাষাবিপ্লবের আবশ্যক হয়। যখন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিগুঢ় হইয়া, লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল, তখন বর্তমান গোড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিগুঢ় হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃত্যের বাক্চেষ্টার শাসন করে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা চির-প্রবাহিণী ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ, যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেণ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর বররুচি, পুরন্দর, যাস্ক, ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীপ্তর, চন্দ্রিকালায়ন, শিলাবংশ—ইহারা ব্যাকরণ রচনা

ବ୍ରହ୍ମା
ଏ ଏଞ୍ଜି
ଓ

५३

मकल

५६.५

कषणं ए
वक्क ५
८०६ ८ ५
उथय व न
ययव उय
यबल व
गवम हक्क

ॐ नमः शिवाय

सप्तकूलकमलविक्रमसङ्गवसाम्पदं

শ্রীমতী কুলকমল বিকাশ ভাস্কর নোমি বংশ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାସିଦ୍ଧି ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବକାମେଶ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାସିଦ୍ଧି
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାସିଦ୍ଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାସିଦ୍ଧି

করেন । পূর্ববর্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া কীর্তিত, পরবর্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাকেই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকৃত । তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও মহাবংশ ও লগিতবিস্তর শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি চৈতন্যচরিতামৃত নিন্দনীয় হয় নাই । সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী ;—পূর্ববর্তী অবস্থার রূপান্তর ।

বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ । নহে । বঙ্গভাষা, জননার গর্ভ হইতে শিশুর আয়, কোন শুভ বংশে ভূমিষ্ঠ হয় নাই । বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল । কথিত ভাষা, ব্যাকরণশাসিত ‘লিখিত’ প্রাকৃত হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়া—কিন্তু একদিনে নহে । হবনলি সাহেবের মতে, ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতের যুগ লুপ্ত ও গোড়ীয় ভাষাসমূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল । বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে, হিন্দু জাতির নব চেষ্টার ক্ষুরেণ ও সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিস্থিতি এত দ্রুত হইল,—প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল যে, প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া, কথিত গোড়ীয়ভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল । ইতিহাসেও বৌদ্ধাধিকারের গোপকাল ও হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান-কাল ৮০০খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বলিয়া বর্ণিত আছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গলা ।

ধর্মবিপ্লবে প্রাচীন ভাষা ও ভাষাব সংস্কার এবং নব ভাষা ও ভাষাব

প্রতিষ্ঠা হয় । বোমান বাজকদিগেব প্রভুত্ব
ধর্ম ও ভাষা ।
লোপস সঙ্গে সঙ্গে, লাটিনের একাধিপত্য

নষ্ট হয় । বুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, স্বীয় শিষ্যাগণকে তাঁহাব
বাক্য ও কার্যাবলি পানিভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন । +
ভাবত্বে ভাষাব ইতিহাসে সেইদিন এক নবযুগ প্রবর্তিত হয় । যদিচ
বৌদ্ধগণও মনো মনো সংস্কৃতে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি
বুদ্ধের সেই অনুজ্ঞাপটাবেব সময় হইতেই সংস্কৃতেব অথও প্রভাব
হ্রাসিত হয় । দেবভাষা, দেব ও ঋষিগণেব জন্তু সেই দিন স্বগাবোহণ
করেন ।

বৌদ্ধধর্মিকানে প্রাচীন ভাষা ও ভাষা দলিত হয় । ব্রাহ্মণগণ

কুরিকার্যা আসক্ত করেন, কত বা বৌদ্ধদিগেব
বুদ্ধ পটাব ।

জাবে দণ্ড স্তবণ করিয়া হলাকর্ষণ কার্যে নিবৃত্ত
ভাবাব বিনি প্রণয়ন করেন যথা,—

বৈষ্ণৱপ্রাপি জীবন্ত বাঙ্গল জ্ঞাতিযাঃপি ব স্ফিমাপাৎ পবাবানা বর্ষি
ব্রহ্মণ বজ্রযং ॥ সুনি ২ স্ফিও মঙ্গল সা ব্ধি সাত্তাইত । ভূমি ভ্রামশাং
চৈব চন্দি কাষ্ট্রয়ামুৎ ২ মনুসংহিতা ১৩৩ খ্রিষ্ট ৮৪ খ্রিষ্ট ।—এই অংশ
বৌদ্ধগণ কতক পসবলী কানেব মে জনা বলিয়া বোদ হয় ।

‘আমাব বাক সকল সংস্কৃত অনুবাদ করি ও না, তহা হইনে বিশেষ অপবাবী
হইবে । আমি যেমত পাক্ত ভাষায় পাদশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গম্বাদিত
ব বহাব করিবে ।’ বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইহাব
টীকাকবও করেন, বুদ্ধবাক্য সকল মকনিকতি অর্থাৎ প্রাবৃত ভাষায় রচিত ।

বড় স্থলীর এবং প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন। আমি নিজে অর্থব্যয় করিয়া কুঞ্জঘাটা হইতে একখানি ফটোগ্রাফ তোলাইয়া আনিয়াছি। গৌরান্দ্রসমাজের ছবিতে চৈতন্যপ্রভুর কপালে এবং নাসাগ্রভাগে যে তিলক ও চক্ষুপ্রান্তে যে অশ্রুবিম্ব দৃষ্ট হয়, মৎসংগৃহীত নিগেটিভ এবং ফটোগ্রাফে তাহা পাই নাই, হুতরাং গৌরান্দ্র সমাজের ছবির সঙ্গে আমার ছবির একটুকু পার্থক্য আছে। এই ফটোগ্রাফখানির প্রাপ্তি সম্বন্ধে ফরিদপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে বহরমপুরের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অনারবল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় আমাকে সাহায্য করেন। এজন্য আমি উভয়ের নিকটই কৃতজ্ঞ। ‘দক্ষিণরায়’ দেবের প্রতিমূর্তি আমি বহু চেষ্টা করিয়া হাওড়া—খুন্টপঞ্চাননতলার উক্তদেবের একটি প্রাচীন মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, এতৎপক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ আচার্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল ছবির জন্ত আমার অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে। বলাবনে মহাপ্রভু একখানি অতি প্রাচীন তৈলচিত্র আছে, এই সুবাদ জানিয়া বলাবনবাসী জনৈক মহাশয়ের নিকট, তাহার ইচ্ছাক্রমে অর্থ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছবি পাওয়া দূরে থাক, অর্থ পর্যাপ্ত প্রতাপিত হয় নাই। উদ্ধারণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহা স্মৃদ্বয় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের পেরিত ছবি হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই ছবি খানি সম্বন্ধে অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন—“ছগলীর অঙ্গুষ্ঠচ’বালিগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত বংশীয় ৬জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শিবিকুমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের এক প্রাচীন দাকময়ী মূর্তি আছে; প্রাচীন কালাবধি ইহার যথারীতি সেবা পূজা হয়, পেরিত ছবি সেই প্রাচীন দাকময়ী মূর্তি হইতে গৃহীত।” জগদানন্দের হস্তলিপি আমি শ্রীযুক্ত কালিদাসনাথ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা কবির পদভালেখার প্রতিলিপি। সেই খসড়ায় দেখা যায়, কবির কোন একটি পংক্তি মনোনীত না হওয়াতে সে পংক্তি সংশোধন করিয়া তিনি অপর এক ছত্র লিখিয়াছেন, সে ছত্রটিও ভাল না লাগাতে অপর এক ছত্র দ্বারা উহা সংশোধন করিয়াছেন, এইরূপ উপযুগপরি চেষ্টার পরে যে ছত্র সর্ব শেষ মনোনীত হইয়াছে, তাহা শুকেশলে স্বীয় পদরাশির অন্তর্কর্ত্তা কোনও স্থানে সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। বর্নবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬৮ সালে লিখিত এক খানি প্রাচীন চৈতন্য ভাগবত পুঁথির মলাটে প্রাপ্ত সংকীৰ্ত্তনের যে তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল, তাহা স্মৃদ্বদত্তম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের পুস্তকাগার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দাসী পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মধ্যস্থানে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত কবি জগৎরামরায়ের কাল সংশোধন-উদ্দেশ্যে যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে

সম্মেহের কারণ জরিয়াছে, আমরা এখনও এসম্মেহে কোন মীমাংসা করিতে পারি নাই ।
সুতরাং পুস্তকের সে অংশটি পরিবর্তন করিলাম না ।

এবারও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে আমি স্মরণীয় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি ।

৩৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমরা লিখিয়াছি, স্বর্গীয় হারাদ্বন্দ্ব ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে উমাপতি ধর স্বর্ণবর্ণিক বংশীয় । সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ বায় এবং ভিব্‌ক্‌প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় দ্বয় আমাকে কৃতকণ্ডলি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বারা দৃষ্ট হয়, কবি উমাপতি ধর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিককৃত রত্নপ্রভাংশে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে এবং জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত পিঞ্জারী গ্রামে এখনও উমাপতিধরের বংশধরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন । এই পিঞ্জারী গ্রাম অতি প্রাচীন, লক্ষ্মণসেনের পুত্রবিশ্বরূপ সেন এই গ্রামখানি জনৈক স্থপতিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া যে তাম্রফলক প্রচারিত করেন, তাহা কয়েক বৎসর হইল এমিষ্যটিক সোসাইটিতে জাপান্‌তে প্রকাশিত হইয়াছে । উমাপতিধর বাঙ্গালাভাষায় কবি নহেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গের অধিকতর চর্চা আমাদের বিষয় বহির্ভূত ।

• পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবি নাট্যায়গদেবের কোন বিবরণ ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই । সম্প্রতি এক খামি প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নলিখিত বিবৃতি পাঠ বিশিষ্ট কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে ;—

“নারায়ণ দেহে কহে জন্ম মগদ । মিশ্র শ্রীপতি নহে ভট্ট বিশারদ । মধুকুলাগোত্র হইল গাই গুণাকর । শূদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কাহেন্তর ঘর । নরহরি তনয় জে নরসিংহ পিতা । মাতামহ প্রভাকর কল্পিণী মোর মাতা । চোন্দ বৎসরের কালে দেখিল স্বপন । মহাজন সহিত পথে দরশন । শিশুকপেত গোসাই হাতে করি বাশী । আলিঙ্গন দিয়া বলে যার মুখে ঠাঁসি । গোবিন্দের আসা মোর সেই সে কারণ । প্রণাম করিল মুক্তি ভজিয়া চরণ । সকল সৃজন প্রভু তোমার কারণে । কি করিতে পারি আমি তোমা বিদ্যামানে । গোবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি । কোকিলের নিকটে জেন কাক করে ধ্বনি । শঙ্খের নিকটে সামুকের কিবা শোভা । স্নমের নিকটে যেকপ উলুতোপার প্রভা । অমৃত নিকটে ইক্ষুরের কিবা কাজ । নক্ষত্র নিকটে যেন শোভে ধূতরাজ । ছফের নিকটে ঘোলের কাজ নাই । ক্ষীরোদ নিকটে জেন শোভে গড়খাই । যদিবা অশুভ হয় আমার বচন । পণ্ডিতের মুখে তাহা করিবা শ্রবণ ॥”

এই বিবরণটি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একখানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথি খানিতে পদ্মাপুরাণের অপর লেখক দ্বিজবংশীদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

১৫ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তির প্রারম্ভে ‘কবি’ শব্দের স্থলে “৩৭পুত্র রূপরাম” কথাটি পড়িতে হইবে।

উপসংহার কালে আমি ত্রিপুরের স্বর্গায় বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর পরিতাপ প্রকাশ না করিয়া পারি ন।। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন, আমার নানাকপ বিপদের মধ্যে ৪ বৎসর পূর্বে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুও অন্ততম বলিয়া গণ্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুশয্যার এক প্রান্তে আমার এত সামান্ত পুস্তকখানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার জীবৎ আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনার কারণ। এবার ষাঁহাদেব নিকট পারিবারিক অভাব মোচনার্থ এবং পুস্তকের জন্য অর্থ সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদেব অধিকাংশের নিতান্ত অমত হওয়াতে, নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পেড্‌লার সাহেব বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমূহের জন্য এই নূতন সংস্করণের ৭০ কপি গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদে পাত্র হইয়াছেন।

কলকাতা।
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১।

} শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	অধ্যায় ।	পৃষ্ঠা ।
বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপিৰ উৎপত্তি	প্রথম ।	১—১৫
সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা	দ্বিতীয় ।	১৬—৩৫
পাশ্চাত্যমত—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ	তৃতীয় ।	৩৫—৫২
বৌদ্ধ যুগ		
১ । মণিকটাদেব গান ।	চতুর্থ ।	৫৩—৮১
২ । গোবিন্দচন্দ্রের গান ।		
৩ । ডাক ও খনার বচন ।		
বঙ্গ-কলহে ভাষার শ্রীগ্রন্থ	পঞ্চম ।	৮২—১০১
ও		
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ		
গৌড়ীয় যুগ (খ্রীষ্টেতত্ত্ব-পূর্ব সাহিত্য)		
১ । ‘পঞ্চ গোড়’ ।	ষষ্ঠ ।	১০২—২৪১
২ । অনুবাদ-শাখা ।		
৩ । লৌকিক ধর্মশাখা ।		
৪ । পদাবলী-শাখা ।		
৫ । কাব্যোতিহাসের সূত্রপাত-শাখা ।		
সপ্ত অধ্যায়ের পৰিশিষ্ট ।		
খ্রীষ্টেতত্ত্ব-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ		
১ । খ্রীষ্টেতনাদেব ও এই যুগের সাহিত্য	সপ্তম ।	২৪২—৩৮৬
২ । খ্রীষ্টেতনাদেবের জীবনী ।		
৩ । পদাবলী-শাখা ।		
৪ । চরিত-শাখা ।		
সপ্তম অধ্যায়ের পৰিশিষ্ট ।		
সংস্কার যুগ		
১ । লৌকিক ধর্মশাখা ।	অষ্টম ।	৩৮৭—৫২৮
২ । অনুবাদ-শাখা ।		
অষ্টম অধ্যায়ের পৰিশিষ্ট ।		

বিষয় ।	অধ্যায় ।	পৃষ্ঠা ।
কুঞ্চচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপের ২য় যুগ	}	নবম ।
১। নবদ্বীপ ও কুঞ্চচন্দ্র ।		
২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ ।		
৩। কাব্য-শাখা ।		
৪। গীতি-শাখা ।		
নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।		১১১ - ১৪৬

প্রথম অধ্যায় ।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি ১০০০ বৎসরের ও অনেক পুঙ্খবস্তু।—ভারতীয় অক্ষর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।—ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব।—লিপিমালার পরিবর্তন ; প্রাচীন বঙ্গলিপি।—আর্য্যভাষার পরিবর্তন।—লিখিত ও কথিত ভাষা।—বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ।

১—১৫ পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ধর্ম্ম ও ভাষা।—বৌদ্ধ প্রভাব।—বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া।—সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশে উহার প্ৰভাব।—বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত।—বঙ্গভাষা পূর্বকালে ‘প্রাকৃত’ নামে অভিহিত হইত।—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষা।—সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তনের নিয়ম।—কথিত ও লিখিত ভাষার প্রভেদ।

১৬—৩৫ পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায় ।

বঙ্গভাষা অনাভাষা।—সম্ভূত নহে।—বাক্যের বিভক্তি।—অসভ্যতার ভাষার কথক্ৰিয় মিশ্রণ।—ছন্দ।

৩৫—৫২ পৃঃ

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ।—উহার গুপ্ত অস্তিত্ব, ধর্ম্মপুত্র।—বৌদ্ধ যুগের অপভ্রংশের নিদর্শন।—মাণিকচাঁদের সময় নিরুপণ।—মাণিকচাঁদের গানে বৌদ্ধ প্রভাব।—কবিত্বের নমুনা।—গোবিন্দচন্দ্রের গীতে বৌদ্ধ প্রভাব।—প্রেমকথা।—ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে মন্তব্য।—খনা ও ডাকের বচনে প্রভেদ।—বচনগুলিতে গৃহস্থালীজ্ঞান।—জ্যোতিষে অচলা ভক্তি।—অপ্রচলিত শব্দার্থ।—সংস্কৃতের প্রভাব-হীনতা।—সামাজিক অবস্থা।

৫৩—৮১ পৃঃ

পঞ্চম অধ্যায় ।

ধর্ম্ম-তলহ।—বঙ্গসাহিত্যে শিব, পদ্মা, চণ্ডী ও শীতলা।—লৌকিক দেবতাদের প্রভাব, শৈব ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ।—শিবের নিশ্চেষ্টতা।—পরবর্তী সাহিত্যে বিভিন্ন মতের একতা।—সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রচর্চার বহল বিস্তার।—পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণের জাতির উন্নতি।—রাজসভায় বঙ্গভাষার আদর।—বৈষ্ণবগণের কৃতকার্য্যতা।—ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য।—ইংবেজ কবির স্বাভাবিক-প্রিয়তা।—বাঙ্গালী কবির অনুকরণ-প্রিয়তা ও তদ্দৃষ্টান্ত।—কাব্যের অংশ রচনায অনুকরণ-বাহুলা।—অনুকরণের দোষ ও গুণ।

৮২—১০১ পৃঃ

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পঞ্চ গোড় ।—কাব্যো গোড়েশ্বরগণের মহিমা ।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ আলোচনা ।
 —কবির চিত্র ।—খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ হুলভ ।—রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব ।—
 কৃত্তিবাস এবং বাত্ম্যিকি ।—পাঠবিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ।—কবির অন্ত্যস্ত রচনা ।—
 অনন্ত রামায়ণ ।—মহাভারতের অনুবাদরচকগণ ।—বিবিধ অনুবাদের সাদৃশ্য ।—
 সঞ্জয় কৃত মহাভারত ।—সঞ্জয়ের পরিচয় ।—সঞ্জয়ের কবিত্ব ।—সম্রাট হুসেন সাহ,—
 পরাগল খাঁ ।—পরাগলী ভারত ।—ছুটি খাঁ ।—শ্রীকরনন্দার কবিত্ব ।—জৈমিনি
 ভারত ।—মালাধর বহু ।—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।—শূল ও অনুবাদ ।—লৌকিক ধর্মের
 দেবতা ।—ছড়া ও পাঁচালী ।—লৌকিক দেবতা পূজার উৎপত্তি ।—সাহিত্যে বাস্তব ও
 সর্প ।—চাঁদ সদাগরের চরিত্র ।—পদ্মাবতী নামের সংশ্রব তাজা ।—অনাহারে ষিড়-
 খনা ।—লখীন্দরের মৃত্যুজনিত শোক ।—চাঁদের পরাভব ।—বেহলার জয় ।—বেহলার
 বাসর-গৃহে ।—নিরপরাধিনীর অপরাধ ।—স্বামীর শব্দ ফ্রেড়ে বেহলা সতী ।—বেহলার
 সতীত্ব ।—কোতুকে করুণরস ।—বেহলা, ঘরের চবি ।—কাণা হরিদন্ত ও বিজয়গুপ্ত ।—
 প্রক্ষিপ্ত রচনা ।—বিজয় কবির রসিকতা ।—নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ।—নারায়ণদেব
 ও বিজয়গুপ্ত ।—চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি ।—জনার্দনের চণ্ডী ।—রতিদেব ও অপরাপার
 কবি ।—পদাবলী-সাহিত্য ।—আধ্যাত্মিকত্ব ।—চণ্ডীদাসের নাম ।—চণ্ডীদাসের জীবনী ।
 —চণ্ডীদাসের রাবিক ।—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ।—চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক ভাব ।
 —ভাব-সংশ্লিষ্ট ।—চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন না ।—রামীর পদ ।—বিদ্যাপতির পরিচয় ।
 —পূর্বপুরুষগণের খ্যাতি ।—কবির গ্রন্থাবলী ।—কাল সম্বন্ধে তর্ক ।—ভূমিদান পত্রের
 সত্যতা ।—রাজপঞ্জী ।—বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর দুইটি প্রমাণ ।—কবির উপর বাঙ্গালীর
 দাবী ।—মিথিলার ঋণ ।—বিদ্যাপতি ও অধ্বতাচায়া ।—বিদ্যাপতির উগম ।—
 বিরহ ।—চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব ।—লাউসেন ও ইছাই ঘোষ ।—ধর্মমঙ্গল এখন
 ঐতিহাসিক কাব্য নহে ।—রমাই পাণ্ডিত্যের পদ্ধতি ।—বিবিধ কবির ধর্মকাব্য ।—
 গুণেশ্বর ও বাণেশ্বর ।—সংক্ষিপ্ত রাজমালা ।—কবি-তালিকা—হুসেনী সাহিত্য ।—কবি-
 গণের বাসস্থান ।—বৈষ্ণব কবিগণের সম্মতা ।—পঞ্চ গোড় ও বঙ্গদেশ ।—পঞ্চ শাখার
 বনিষ্ঠতা ।—বঙ্গভাষার সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিলের মিশ্রণ ।—পরিচ্ছদে সাদৃশ্য ।—আহারে
 ব্যবহারে ঐক্য ।—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্রিয়াপদ ।—কালে পৃথক্ জাতিতে পরিণতির
 সম্ভাবনা ।—বৌদ্ধ যুগান্তে ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের বিস্তৃতি ।—প্রচলিত শব্দার্থ ।
 বিভক্তি ।—ক্রিয়া ।—কাব্য গীত ইতি ।—পয়্যারের ব্যতিক্রম ।—ব্রজবুলি ।—রমণীগণের
 পরিচ্ছদাদি ।—সামাজিক আদর্শ অবস্থার নিদর্শন ।—বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রা ।—শিল্পজাত
 দ্রব্যাদি ।—ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যার অবনতি ।—বিনিময় ও মুদ্রা ।—বাঙ্গালীর বীরত্বের
 অভাব ।—বাঙ্গালী প্রেমিক ।

১০২-২৪১ পৃঃ

সপ্তম অধ্যায় ।

প্রেমের অবতার চৈতন্ত ।—পদাবলীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ।—বৈষ্ণব পদাবলীর

গভ্যতা।—নবদ্বীপের তিনটি রত্ন।—১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলন।—
 অলৌকিক লীলা।—চৈতন্তের জন্ম ও বংশপরিচয়।—শৈশবে উচ্ছৃঙ্খলতা।—পাঠে
 একাগ্রতা।—পাণ্ডিত্য ও টোলে অধ্যাপকতা।—দ্বিবিজয়ী জয়।—বাক্য-প্রিয়তা।—সাব-
 ধানতা।—ধর্মহীনতা শুধু ভাণ।—পূর্ব বঙ্গে ভ্রমণ।—স্ত্রী-বিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়।—
 গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছুস।—ময়গ্রহণ, সন্ন্যাস ও ভক্তি-মাধুর্য।—তাহার প্রতি
 লোকানুরাগ।—তাহার পৌকষ ও বিনয়।—তাহার কঠোর বৈরাগ্য।—সোহং।—
 ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও বিনয়।—লালাবসান।—সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।—জীবনী
 লেখার সূত্রপাত ও বিকাশ।—পদাবলা সাহিত্যের তালিকা।—বিভিন্ন গোবিন্দ দাস।—
 বিভিন্ন বলরাম দাস ও অপরাপর কবি।—তালিকায় ভ্রম সম্ভাবনা।—স্ত্রীকবি ও মুসল-
 মুন কবিগণ।—লুপ্ত জীবনী।—গোবিন্দ কবিরাজ।—বলরাম দাস।—জ্ঞানদাস।—
 যদুন্নন্দ দাস ও যদুন্নন্দ চক্রবর্তী।—প্রেমদাস।—গৌরীদাস।—রাঘ বসন্ত।—নরহরি-
 সরকার।—বশু রামানন্দ। ঘনশ্যাম।—পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।—রামগোপালেব
 বসকল্পবল্লী।—জগদানন্দ।—বংশীবদন।—রামচন্দ্র।—শচীনন্দনদাস।—পরমেশ্বরীদাস।
 —যদুনাথ আচাৰ্য।—প্রসাদদাস।—উদ্ধবদাস।—রাধাবল্লভ দাস।—রায়শেখর।—
 পরমানন্দ সেন।—বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দানন্দ।—এনঙ্গয় দাস।—গোকুল
 দাস।—আনন্দ দাস।—কৃষ্ণ দাস।—কৃষ্ণপ্রসাদ।—গোপীরমণ চক্রবর্তী।—চম্পতি
 রায়।—দেবকীনন্দন।—নরসিংহ দেব।—নয়নানন্দ।—প্রসাদ দাস।—মাধো।—
 রসিকানন্দ।—রাধাবল্লভ।—হরিবল্লভ।—রাজ। বীরভাষ্কর।—মাধবা।—কৃষ্ণদাস
 কবিরাজ।—বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি চক্রবর্তী।—শ্রীনিবাস আচাৰ্য,
 নরোত্তম দাস, ও শ্রামানন্দ।—বৈষ্ণব কবিব প্রেম।—পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাল
 বাসার সাহিত্য।—বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস।—জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।—বলরাম-
 দাস ও চণ্ডীদাস।—পদাবলাসংগ্রহ।—পদ-সমুদ্র, পদামৃত, পদকল্পলতিকা, ও পদকল্প-
 তক।—পদসন্নিবেশের সূত্র।—সংগ্রহনেপুণের দৃষ্টান্ত।—বঙ্গীয় গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব।
 চরিত্ররচনাপ্রবন্ধন।—মহুৰাহের এত উপেক্ষা।—চৈতন্ত-জীবনী।—গোবিন্দের
 করচাৰ্য প্রামাণিকতা।—করচাৰ্য চৈতন্তের চরিত্র।—গোবিন্দের পরিচয়।—চৈতন্যের
 ভ্রমণ।—করচাৰ্য বর্ণিত চৈতন্ত-চরিত্র।—প্রকৃতি বর্ণনা।—চৈতন্ত প্রভুর অসাম্প্রদায়িক
 ভাব।—গোবিন্দের চরিত্র।—তাহার প্রভুভক্তি।—তাহার নৈতিক বিসুদ্ধতা।—
 তাহার সত্যপ্রিয়তা।—পূর্বাতে প্রত্যাভর্তন।—করচাৰ্য দোষ।—নিম্ন শ্রেণিতে শিক্ষা
 বিস্তার।—জয়ানন্দ কবির পরিচয়।—চৈতন্তমঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।—বঙ্গ-
 সাহিত্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।—জয়ানন্দের অশ্রান্ত রচনা।—বৈষ্ণব সমাজের
 স্বাভাব্য।—বৃন্দাবন দাসের পরিচয়।—চৈতন্ত-ভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবত-অনুকরণ।—
 ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী।—অলৌকিকত্বে বিশ্বাস।—বৃন্দাবন দাসের ক্রোধের
 কারণ।—চৈতন্ত ভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য।—লোচন দাসের পরিচয়।—চৈতন্ত-
 মঙ্গল।—ভাগবত ও মঙ্গল নাম লইয়া বিরোধ।—কল্পিত ঘটনা।—অবতারবাদের
 ব্যাখ্যা।—প্রামাণ্য নহে।—কবিহ।—লোচনের হস্তলিপি।—অশ্রান্ত রচনা।—মুদ্রিত

চৈতন্যমঙ্গল অনম্পূর্ণ।—কৃষ্ণদাসের পরিচয়।—চৈতন্যচরিতামৃত রচনা আরম্ভ।—
 রচনা শেষ।—গুণ সমালোচনা।—মহাপ্রভুর অষ্টালীলা।—ইহ সংসারের স্মৃতি।—
 রচনার দোষ।—রচনায় বিনয়।—পুস্তক লুপ্তন ও কবিরাজের মৃত্যু।—রচনার নমুনা।
 —নিত্যানন্দ।—অষ্টতাচার্য।—কপ সনাতন।—অষ্টাশু ভক্তগণ।—শ্রীনিবাস,
 নরোত্তম, ও শ্যামানন্দ।—ভক্তিরত্নাকর।—ইউরোপের ইতিহাস।—বৈষ্ণবের লক্ষ্য।—
 ভক্তিবক্তাকরের সূচী।—ভাষাগ্রন্থের আদর।—নবহরির অপরাপর রচনা।—নরোত্তম-
 বিলাস।—খেতুগীর উৎসব।—রচনার নমুনা।—গৌরচরিতচিন্তামণি।—প্রেমবিলাস
 ও অপরাপর পুস্তক।—অষ্টপ্রকাশ।—হবিচরণ দাসের অষ্টমঙ্গল।—নবহরি
 দাসের অষ্টবিলাস।—লোকনাথ দাসের সীতা-চবিত্র।—রসিকমঙ্গল।—মনঃ-
 সন্তোষিণী এবং অপরাপর পুস্তক।—অনুবাদ গুণাবলী।—ভক্তমাল।—রত্নাবলীর
 অনুবাদ।—বিজয় এবং “কৃষ্ণমঙ্গল”।—অপব কথকগণি অনুবাদ ও বাখ্য। পুস্তক।
 —একই ভাবে বিদ্যাপ।—হিন্দী প্রভাব।—বঙ্গ মৈথিলের পূর্ণ বিকাশ।—সত্যরাম
 কবি।—হিন্দী প্রভাবে উচ্চৈশ্বর্যের ভাষার দুর্গতি।—বঙ্গভাষার বিবিধ রূপ।—অপ-
 চলিত শব্দের তালিকা।—ছন্দ।—বিভক্তি।—সামাজিক অবস্থা, শাস্ত্র ও বৈষ্ণবের
 দৃষ্ট।—অবতারবাদ।—বৈষ্ণব সমাজের অধোগতি।—শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন।—
 শেষ জীবন।—সাংসারিক সুখ তৃষ্ণা, ও বৈষ্ণব যন্ত্রের নানাক্রম বিবৃতি।—অপর এক
 চিত্র।—বাজারের ব্যয়।—ঋষভত উপাধি।—শাসন-গণালা।—ভুক্ত শব্দের
 তালিকা।—ভাষ্য হিন্দী পণ্ডিতের স্থায়ী চিহ্ন।—শিবায়ন।—বুদ্ধগুণের নিদর্শন।
 স্বক্টি রায়।—গাথিতো নব যুগ।

২৪২—৩৮৬ পৃঃ

অষ্টম অধ্যায়।

সংস্কার যুগ।—প্রাচীন ও পববর্তী লেখকগণের সম্বন্ধ।—ভাষাৎ ফলতি সর্বত্র।—
 স্বজ্ঞ জনার্দনের চণ্ডী।—বলরামের চণ্ডী।—মাধবাচার্য।—মুকুন্দ ও মাধবাচার্য।—
 স্বাভাবিকত।—ধূয়া।—যুদ্ধ বর্ণনায় ছন্দ।—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।—হিন্দুব
 প্রতি অত্যাচার।—ভাষার সাক্ষ্য।—ডিহিনার মামুদ সরিফ।—কবির দুরবস্থা
 ও স্বদেশ-প্রেম।—প্রথম শ্রেণীর চিত্রকব—দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র।—নারী চরিত্রের
 শ্রেষ্ঠত্ব।—কাব্য নাটকীয় কোশলা।—বাঁটি সংসার চিত্র।—অমুখ্য সমাজের
 ভাষা।—দুঃখবর্ণনায় কুতিত্ব।—পুরুষ পৌকষেব অভাব।—কাব্য কেন্দ্র-শূন্য।
 —বঙ্গী-চরিত্র।—কালকেতুব গল্প।—লোমশমুনি।—নীলাম্বরের “জগদগ্রহণ”।—
 বলাকাল।—বিবাহ ও জীবনোপায়।—ক্ষুধা ও খাদ্য।—চণ্ডীর বর।—পূর্বাভাব।
 —বর্ষ শিকারী।—গৃহের বন্দোবস্ত।—চণ্ডীর স্বর্গী গ্রহণ।—কুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি ও
 দেবীর রহস্য।—সম্মেহে সৌন্দর্য।—দুইটি চিত্র।—দেবীর প্রতি অভ্যর্থনা।—
 অতিপ্রাকৃত।—চণ্ডীর দয়।—শঠে সরলে।—মুকুন্দ ও মাধব।—ভট্টদত্ত।—
 বর্জিত প্রতীমিত্তি।—ঘরের কথা।—ভাড়া দত্ত বাজারে।—রাজদরবারে।—

স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ।—প্রতিহিংসা।—ভাড়াবস্তুর শাস্তি।—শ্রীমন্তের গল্প।—খুল্লনার জন্ম।—কোতুকে বিপদ।—লহনাকে প্রবোধ।—লহনা-চরিত্র : সপত্নীপ্রেম।—সরলে গরল।—খুল্লনা বনবাসিনী।—চণ্ডী দেবীর বরপ্রদান।—প্রত্যাগত প্রবাসী।—শয্যাগৃহের অভিনয়।—পিতৃশ্রদ্ধে বিভ্রাট।—খুল্লনার পরীক্ষা।—পুনশ্চ প্রবাসে।—কমলে কামিনী।—শ্রীমন্তের জন্ম ও শৈশব।—গুরু ও শিষ্য।—সিংহল-বাত্রা।—মশানে শ্রীমন্ত।—বাস্কালদের কাতরতা।—চণ্ডীর কৃপা।—স্বশীলার বার মাঙ্গ্য।—শেষ।—কবির ভাবের পগাচতা।—শিবপ্রসঙ্গ।—রামেশ্বর ভট্টচার্য্য।—কানাবর্ণিৎ বিষয়। শিবাহনে হস্তারস।—রামেশ্বরের সত্যপীর।—মনসার ভাসান-লেখকবগ।—কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ।—বেহলা-চরিত্র।—কবিষয়ের পরিচয়।—বর্দ্ধমানদাসের কবিত্ব।—বৈষ্ণব কবির পভাব।—ধর্ম্মমঞ্জলে বৌদ্ধভাব।—ঘনরামের পকবর্ত্তী কবিগণ।—রামদাস কেবর্ত্তের “আদি মঙ্গল”।—ঘনরামের জীবনী।—ঠাঁহার কৃত ধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচনা।—কপূর।—সহদেব চক্রবর্ত্তী।—লুপ্ত বৌদ্ধতত্ত্বের আভাষ।—সহদেবের কবিত্ব।—বাস্কলাকাব্য সংস্কৃত পদ্য বাঙ্গাল কবিতায় সংস্কৃত উপমা।—সংস্কৃতের অনুবাদ।—অনুবাদ গ্রন্থ সমালোচনা।—লোকনাথ দত্ত।—নাপিত কবি।—দণ্ডীপর্ব্ব।—অনন্তরাম দণ্ড।—কবি জয়নারায়ণ।—নুসিংহদেবের সাহায্য, কাশীখণ্ডের অনুবাদ।—কাশীর চিত্র।—কাশীখণ্ডের পুঁথি।—কবির পরিচয়।—কবির অপরাপর গুণ।—ককণা নিধান-বিনাস।—কুড়িবাসী রামায়ণে প্রকৃষ্ট রচনা।—অপরাপর রামায়ণ রচকগণ।—যটীবর ও গঙ্গাদাস।—ভবানীদাস।—দুর্গারাম।—জগৎরাম রায়।—শিবচন্দ্র সেন।—অজুত আচাৰ্য্য।—শঙ্কর।—লক্ষণ বন্দোপাধ্যায়।—রামমোহন।—রঘুনন্দন গোস্বামী।—মহাভারত উপগল্প।—কাশীদাসের পূর্ব্বগামিগণ।—নিকানন্দ ঘোষ।—কবিচন্দ্র।—তদ্বৎ শঙ্কর।—অপরাপর কবিগণের সঙ্গে কাশীদাসের তুলনায় সমালোচন।—বাল্মীকীদাসের আদিপক।—শকন্তলা উপাখ্যান।—রচনায দোষ ভাগ।—যটীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।—গঙ্গাদাসের আদি ও অষ্টম পর্ব্ব।—গোপী নাথের দোণ-পর্ব্ব।—কাশীদাসের জীবনী।—কাশীদাস সমস্ত মহাভারত লিখিয়াছেন কি না?—কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে অপরাপর অনুবাদের ভাব্যর ঐক্য।—কাশী দাসের ভাব ও ভাষা।—কাশীদাসের অপরাপর কাব্য।—বৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস।—গদ্যধরের “জগন্নাথমঙ্গল”।—নন্দরাম দাস।—কাশীদাসী ভারত কোন কোন কবির রচনা।—রামেশ্বর নন্দী মহাভারত।—ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।—ভাগবতের অনুবাদ।—রঘুনাথ পণ্ডিতের বৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।—কবিচন্দ্র।—অপরাপর ভাগবতানুবাদকগণ।—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অক্ষ ভবানীপ্রসাদ রায়।—রূপনারায়ণ ঘোষ কৃত চণ্ডীর অনুবাদ।—প্রভাসখণ্ড।—সমাজের চিত্র।—বাস্কালী সৈনিক।—কাব্যে বীররসের অভাব।—রাজ ও প্রজা।—বাজার দর।—আচার ব্যবহার ও বেশভূষা।—বিদ্যা-চর্চ্চা।—স্ত্রীশিক্ষা।—স্ত্রীলোকের কুসংস্কার।—বৈষ্ণবপ্রভাব।—পাণপুণ্যবিচার।—শব্দার্থ।—বিভুক্তি।—কতকগুলি বাধা নিয়ম।—কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পূর্বাভাষ।—

নবম অধ্যায় ।

নবদ্বীপের অবস্থাস্তর ।—কৃষ্ণচন্দ্রের রাজনীতি ।—তাঁহার রাজ্যশাসন ।—বিদ্যাসু-
রাগ ।—কৌতুকপ্রিয়তা ।—রাজসভায় বঙ্গভাষা ।—রূপবর্ণনায় উপমার বিকৃতি ।—
করণরসের দুর্গতি ।—কুটনী দাসীর আমদানী ।—বিদ্যাসুন্দরে মুসলমানী প্রভাব ।—
ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রুচি ।—কবিগীতির সরল আবেগ ।—বিদ্যাসুন্দর কাব্য ।—হিন্দু
ও মুসলমান ।—মুসলমানী গ্রন্থে নায়কের পূর্বরাগ ।—আলোয়ালের পাণ্ডিত্য ।—হিন্দী
পদ্মাবতী ।—আলোয়ালের পরিচয় ।—তদীয় গ্রন্থাবলী ।—পদ্মাবতা ।—মুসলমানী
ভাব ।—পদ্মাবতী কাব্য সমালোচনা ।—বিদ্যাসুন্দরের দোষ ।—হীরামাগিনী ।—শব্দ-
মন্ত্র ।—অশ্রুজ কবির বিদ্যাসুন্দর ।—তুলনায় সমালোচনা ।—কৃষ্ণরাম দাস ১৬৬৬ খৃঃ ।
—রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮ খৃঃ ।—রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর ।—কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন ।
—প্রসাদী সংগীত ।—ভারতচন্দ্র ১৭২২ খৃঃ ।—অন্নদা-মঙ্গল ।—দেবচন্দ্রিত্রের দুর্গতি ।—
উপমার বাহুল্য ।—গৃহস্থালীর এক অঙ্ক ।—বর্ণনা প্রাণহীন ।—শব্দমন্ত্র ।—বিদ্যাসুন্দর
উপাখ্যান ।—ছোট কবিতা ।—সাহিত্যের বিপ্লবিত আদর্শ ।—তিনখানি গ্রন্থ ।—
রামগতি ও জয়নারায়ণ ।—আনন্দময়ী ; তাঁহার পাণ্ডিত্য ।—মায়ামিতির চল্লিকা ।—
চণ্ডীকাব্য ।—হরিলীলা ।—আনন্দময়ীর রচনা ।—গীতগোবিন্দের অনুবাদ ।—গঙ্গাভক্তি-
তরঙ্গিণী ।—গীতিসংস্কার ।—গীতিকাব্যে গাহিত্য চিত্র ।—রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও
ধর্মবিশ্বাসের উচ্চতা ।—শ্রীমৎসংগীতকাব্যগণ ।—রাম বশ ১৭৮৬ খৃঃ ।—কমলাকান্ত ।—
বামহুলাল ১৭৮৭ খৃঃ ।—বর্ধুনাথ ১৭৫০ খৃঃ ।—মুসলমান কবিগণ ।—এটুনি ফিরিস্তি ।—
অপরূপের কবিগণ ।—গোপাল উড়ে ।—কৈলাস বাকই ও শ্রীমদ্রাম মুখোপাধ্যায় ।—
দাশরথি রায় ১৮৭৪ খৃঃ ।—পাঁচালী ।—উপমা ।—উপাখ্যান ভাগে অপটুতা ।—
শ্রীমৎসংগীত ।—বৈষ্ণবধর্মের বাগ্য ।—আর একটি গান ।—পুনরায় বৈষ্ণব গীতি ।—
রামনিধি রায় ১৭৪১ খৃঃ ।—কবিওয়ালাগণ ।—রামবশ ।—হক ঠাকুর ।—রাহনুসিংহ
এবং অপরূপের কবিওয়ালাগণ ।—বজ্রেশ্বরী ।—ভোলাময়র ।—পূর্ববঙ্গের রামকপ
ঠাকুর ।—শ্রীকৃষ্ণধাত্রী ।—কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।—বংশাবলী ।—বালাজীবন ।—স্বপ্ন-
বিদ্যাস ।—অশ্রুজ গ্রন্থ ।—শেব জীবন ।—রাইউদ্দীনাধিনি ।—কৃষ্ণকমলের রাধিকা ।—
নিবহ ।—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।—ছন্দ ।—পদ্যের নিয়ম ।—গদ্যসাহিত্য ।—রূপ-গোস্বামীর
কারিক ।—কৃষ্ণদাসের রাগময়ী কণ ।—দেহকড়চ ।—ভাষা-পরিচ্ছেদ ।—বৃন্দাবন-
লীলা ।—সহজিয়া পুঁপি .—স্মৃতিগ্রন্থ ।—তন্ময় গদ্যভাষা ।—নন্দকুমারের পত্র ।—
দরবারী ভাষা ।—আলালী ভাষার প্রাচীন আদর্শ কামিনীকুমার ।—রাজীব-
লোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত ।—অপবাসের গদ্যগন্থ ।—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-
গণ ।—শিশুবোধকের ধারা ।—অনুপ্রাসের বিকৃতি ।—প্রাচীন গদ্য লিখিবার রীতি ।—
গদ্য পুস্তকে অপ্রচলিত শব্দ ।—শব্দের পরিবর্তন ও অর্থান্তর গ্রহণ ।—খেউর গান ।—
শিল্প ও বাণিজ্য ।—শ্রীশিক্ষা ।—সংস্কৃত ও ফারসী ।—নবভাবের সূচনা ।

সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ ।

সাঙ্কেতিক শব্দ	অর্থ		
অঃ মঃ	ভারতচন্দ্রের অন্তদামস্বল ।
উঃ চঃ	উত্তর চরিত ।
কবীন্দ্র	কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরকৃত মহাভারতের অনুবাদ (পরাগলী মহাভারত) ।
ক, ক, চ.	কবিকঙ্কণ চণ্ডী ।
চ, কে,	চণ্ডী কৌশিক ।
চৈ, চ,	চৈতন্য চরিতামৃত ।
চৈ, ভা,	চৈতন্য ভাগবত ।
চৈ, ম,	চৈতন্য মঙ্গল ।
গ, ক, ভ,	গদ্যকল্পতরু ।
বি হু	বিদ্যাসুন্দর ।
বেঃ গঃ পুঁথি	বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের পুঁথি ।
ভু, বি,	ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ।
মা, চ, গা,	মাণিক চাঁদের গান ।
মা, গা	ঐ
মা, চ	মাধবাচার্যের চণ্ডী ।
মুঃ কঃ	মুচ্ছকটিক ।
মুঃ রাঃ	মুদ্রারাক্ষস ।
রা, বি	রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ।
সঞ্জয়	সঞ্জয়কৃত মহাভারত ।
শকুঃ	শকুন্তলা ।
সুঃ লিঃ	হস্তলিপি ।

লিপি ও চিত্রশৃতি ।*

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১। ২য়েকটি পালী অক্ষরের নমুনা—	৪
২। বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রম-বিকাশ—	১৪
৩। সেনরাজগণের লিপি নিদর্শন—	"
৪। দক্ষিণরায়েয় প্রতিমূর্তি—	" ২৭
৫। চণ্ডীদাসের ভিটি (উত্তর পূর্ব দৃশ্য) ।	১৮৪
৬। এ— (দক্ষিণ-পূর্ব দৃশ্য । "	১৮৬
৭। বাসুলীদেবী—	১৮৯
৮। বাসুলীমন্দির—	১৯০
১০। চৈতন্য প্রভু ও পারিষদ সন্ম -	২৪৬
১১। কবি জগদানন্দেব হস্তাক্ষরের নিদর্শন—	২৮
১২। ১৭৬৮ সনের একখানি প্রাচীন চৈতন্য ভাগবত পুঁথির মলাটস্থ সংকীর্ণনের তেল-ছব্বের প্রতিলিপি	৩১৯
১৩। উদ্ধারগদ্যের প্রতিমূর্তি—	৩৪৪
১৪। ভরিলীলার অন্ততম কবি আনন্দময়ীর বংশোদ্ভব ত্রিপুরাচন্দ্রদেবী কর্তৃক ৭০ বৎসর পূর্বের লিখিত ভরিলীলা পুঁথির এক পত্রের প্রতিলিপি—	৫৮৬

* এই চিত্রগুলি সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় বিবরণ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে ।

হল-চালনায় পাছে কোন ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ । মুঞ্জশ্রী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া যেক্রপ আদৃত ছিলেন, অপর দিকে বৌদ্ধগুরু বলিয়াও তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । আদি চতুর্বর্ণ হইতে নানাপ্রকার সঙ্করজাতি উদ্ভব হয়; ব্রাহ্মণ বেণ্যাকে বিবাহ করিলেও সমাজে পতিত হইতেন না ;—সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চাকদত্ত মুচ্ছকটিকের শেষাঙ্কে বারবিলাসিনী বসন্তসেনাকে অনায়াসে বিবাহ করিলেন । যে ভাবে বৌদ্ধগণ রামায়ণ বিকৃত করিয়াছেন, তাহাতেই প্রতীত হয়, বৌদ্ধধর্মিকারে হিন্দুশাস্ত্রের দুর্গতিব একশেষ হইয়াছিল । রাজা দশরথের দুই পুত্র বাম ও লক্ষ্মণ, এবং একমাত্র কন্যা সীতা । বানায়ণের শেষে রাম সহোদবা সীতাকে বিবাহ করিলেন । ' তহা শুধু রামায়ণেব বিকৃতি নহে, সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে বথেষ্টাচারে পরিণত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহাবও আভাস পাওয়া যায় ।

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, একপ নষ্ট ;—ভাষাও বিশৃঙ্খল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল । কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার প্রভাব সর্বদাই দৃষ্ট হয় । সংস্কৃতের আদশ লোক চক্ৰ হইতে অন্তর্হিত হইল ও তাহাব স্থানে শিথিল প্রাকৃতভাষা রাজসভায় প্রচলিত হইল । কথিত ভাষাও পূর্বাপেক্ষা মৃদুলাব অবলম্বন করিল । যথা,—

১। “পশমহ জমন্স চলণে ॥”—মৃদারাক্ষস ; ১ম অঙ্ক ।

২। “শৃণং বিকৃন্তে ? পণ্ডবে বেদকেহু ? পুণ্ডে লাধাএ ? লাবণে ? ইন্দ উত্তে ” অহে । কস্তীএ তেন লামেণ জাদে ? অথখামে ? ধম্মপুত্তে ? জাডট ?”—মুচ্ছকটিক ,—১ম অঙ্ক ।

৩। “পলিধামহু ণাণএ পত্তে দলিদ্দচালদত্তাকে তুমং ॥”—মুচ্ছকটিক ; ৮ম অঙ্ক ।

.. অথ বারানস্তাং দশরথ মহারাজ নাম অগাতি গমনমপভাষ বক্ষ্যেণ রাজাম-কোরসি । তন্ত বোলসন্ন মহীষ সহস্রনম জৈষ্ঠিকা অগমহেযি স্ব পুত্র একণ সবিরম বিজয়ি । জৈষ্ঠ পুত্রো রাম পণ্ডিতো অহোষি । দুর্ভায় লক্ষ্মণ কুমারোথিতা সীতাদেবী নাম ॥” ইত্যাদি ।—বৌদ্ধজাতকঃ ।

সংস্কৃতজ্ঞমাত্রই এইরূপ রচনা বহুবার পড়িয়াছেন । চারুদত্ত, রাম, রাবণ

দরিদ্র, চরণ প্রভৃতি শব্দ স্থলে চালুদত্ত, লাম, বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া ।

লাবণ, দলিদ্ ও চলণ ইহা আছে ! এখন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিম্নশ্রেণীতে কচিং ভাষার একপ শিখিল ভাব প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু কথিত ভাষা ? এখন অনেকপরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে । ইহার কারণ, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিক্রিয়া । জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্য্য আরম্ভ করেন । সাহসবামের প্রস্তরলিপিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশোকের যে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা স্মৃতি সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন । যথা শঙ্করবিজয়ে, --

“হুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান রাজমুখ্যাননেকবিদাপ্রসঙ্গ-
ভেদৈর্নিনির্জিতা তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশিষ্টয়া বহুশ্চ উল্খলেষু নিগ্ধিয়া কঠিনমর্গৈশ্চূর্ণীকৃত্য
চৈবঃ হুষ্ট-মতঃসামচরন্ নিভযো বর্ততে ॥” আদিশূব বৌদ্ধদিগকে পরাজিত
করিয়া গোড় রাজ্য স্থাপন করেন ; যথা,—“জিহা বুদ্ধাংস্চকার যয়মপি নৃপতি-
গৌড়রাজ্যান্নিরন্তান ॥”

হিন্দু-ধর্মের এত উত্থান কেবল উৎপীড়নেই পর্য্যবসিত হইল না ; চতুর্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হইল । খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজমীরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তদীয় পিতা রাজা বিশালদেব, হিন্দু-শাস্ত্র শুনাইয়া তাহার মতি গাঢ়ত পনির্বাহিত করিলেন । চাঁদকাবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । । পাঠক

রাবাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম প্রচুচা ।

† “অতি দুচিৎ ভয়ে সরাস্র দেব । পিত প্রতি করে অবিহিতং সেব ॥ বুধ প্রজ্ঞ
লিয়ে ধাবে ন তেগ । স্ত্রি প্রবণ রাজ নন ভৈ উৎসেগ ॥ ব্রাহ্ম কুবংর সশমাণ কীন ॥
কিহি কাজ তুম ইহ প্রজ্ঞ লীন ॥ তুমং ছাড়ি সরম হম কহৈ বহ ॥ বগিন্ত পুত্র হন
তেং দুচিৎ ॥ ইহ নষ্ট জ্ঞান স্নিয়েণ কাণ ॥ পুরষাতন ভজৈ কিত্তী হান ॥ তুম
রাজবংশ বাজ নহ সংগ । যুগয়া সর খেলো বন কুরংগ ॥ পরমোধ ভজো বোধক
পূর্য্য ॥ রামায়ণ সনহ ভারত নিদান ॥ ইত্যাদি ॥”—চাঁদাধা ।

দেখিবেন, রাজা বৌদ্ধধর্মকে “নষ্ট জ্ঞান” আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন ।

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাগিল ।
সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ‘লাম’ পুনরায় রাম হইলেন । রত্নাকর দস্যুর উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস কৃতিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

“পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে । করিল আমাব মুখে ও কথা না শ্রুত ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মার তবে চিন্তা করিল মনে । উচ্চাখ্যায় রাম নাম এ মুখে কেমনে ॥ মকর করিল অগ্রে রা করিল শেষে । তবে বা পাণীর মুখে রাম নাম আইসে ॥ ব্রাহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া । মানস মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মার কথা বলে রত্নাকর । মৃত মানুষেরে তবে মড়া বলে নর ॥ মড়া নয় মরা বলি রূপ অবিশ্রাম । তবে মুখে তর্কনে শ্রুতিবে রাম নাম ॥ শুদ্ধ কাণ্ড দেখিলেন বৃক্ষের উপরে । অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রাহ্মা দেখান ঠাহারে ॥ বহুগুণে রত্নাকর করি অনুমান । বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠ গান ॥ মরা মরা বলিতে আইল রাম-নাম । পাইল সকল পাপে মুনি পরিবাণ ॥ তুলসীরাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয় । একবার রাম-নামে সর্ব-পাপক্ষয় ॥”—কৃতিবাসী রামায়ণ ; আদিকাণ্ড ।

পরস্বহারক দস্যুর জিহ্বা পাপে জড়, তাহার মুখে রাম-নাম বিকৃত হয় । ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে । ব্রাহ্মার (না ব্রাহ্মণের ?) এত দোহাই ও বক্তের সহিত এই নূতন উচ্চারণশিক্ষা দিবার পর আর কোন্ চাষা রামকে ‘লাম’ বলিতে সাহস করিবে ? এই ভাবে লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল, এবং চালুদন্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্ধ স্থলে চারুদন্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল । সংস্কৃতানুযায়ী বর্ণশোধন কার্য অদ্যাপি চলিতেছে । প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুস্তকগুলির ভাষা-ক্রমণঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে । সেই-

সব পুঁথিতে এমন অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না । যথা,—

পখা—পক্ষ, কাতি—কার্তিকমাস, নিমল—নির্মল, নথতা—নক্ষত্র, মুকথ—মুখ, বিভা—বিবাহ, পুনি—পুনঃ, শুকল—শুক্ল, বগা—বক, দে—দেহ, সভাই—সবাই, বিনি—বিনা ।

বস্তুতঃ, বাঙ্গালার সঙ্গে কালে সংস্কৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইল যে, বাঙ্গালা প্রাচীন কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে । ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, কাশী বা পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন,—

“জয় শিবেশ শঙ্কর, রঘুধরজেশ্বর, মুগাঙ্কশেখর দ্বিপদব । জয় শ্রীশানরাটক, বিবাণবাদক, হতাশভালক, মহত্তর ॥ জয় সুরারিনাশন, রবেশবাহন, ভূজঙ্গভূষণ, জটাধর । জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর ॥”

বিমন্ সাহেব মনে করেন, বঙ্গভাষা গোড়ীয় অত্যাশ্রিত ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের তদিকতর সন্নিহিত ; তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতানুসারে, হিন্দী, পঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে ‘তৎসম’ ও বাঙ্গালাকে ‘তদুব’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ।† বিমন্ নির্দেশ করেন যে, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমানগণের প্রভাববশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবর্তিত হইয়াছিল ; বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে নিরূপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল ।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই । এখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, তখনও হিউনসাঙ সমতট ও বঙ্গদেশের অত্যাশ্রিত স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন । তিনি এই দেশের

* ইহ'র প্রায় সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে ।

† Beame's Comparative Grammar Vol. I. P. 29.

অধিবাসীদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বঙ্গদেশে সংস্কৃতের গৰ্ব চিরদিনই সুরক্ষিত । গোড়ীয় রীতি যথা শব্দাঙ্কুরে পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন । বৈদৰ্ভী রীতির প্রসাদগুণ, মাধুর্য্য, স্নকুমারত্ব এবং গোড়ীয় রীতির সমাসবহুলত্ব, দণ্ডাচার্য্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যথা বৈদৰ্ভী রীতি,—

মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা ।

গোড়ীয় রীতি,—

“যথা নতাজ্জ্বনাঙ্গম্য সদৃক্ষাক্ষো বলক্ষণ্ডঃ ॥”

কিন্তু এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিয়া বোধ হয়, সংস্কৃত এ দেশে বন্ধমূল হইয়াছিল । তাই গোড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতিসন্নিহিত ।

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই ;

উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । গোড়ীয়
বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত ।

ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা 'সংস্কৃতের অতি-
সন্নিহিত হইলেও, টক্ক মত কখনও সমর্গনযোগ্য নহে । দেখা যায়, ডাক ও খনাব বচনের ভাষা ও পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ সহজ নহে । এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা যে সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই দেখা যায় ; কিন্তু বর্তমান ভাষা হইতে তাহা এত দূরবর্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান করাও সম্ভব নহে । সুতরাং সে ভাষাকে প্রাকৃত না বলিয়া আর কি বলা যাউতে পারে ? হয় ত যে সকল প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এতদ্দেশপ্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল না ;—কিন্তু উহাও সাহিত্যদর্পণ-নির্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকাব প্রাকৃতিক ভেদের অন্তর্গত ছিল, একুপ অনুমান, বোধ করি অসম্ভব ও অযৌক্তিক

নহে । দণ্ডাচার্য্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গোড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে ;—

“শৌরসেনী চ গোড়ী চ লাটী চাশ্চা চ তাদৃশী ।

যাতি প্রাকৃতমিতোবং বাবহারেষ্ সন্নিধিষ্ ॥”

বঙ্গভাষার ঠিক পূর্বাবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোন-টীতেই দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্য পাই । নিম্নে শব্দগত সাদৃশ্য-প্রদর্শনের জন্ত কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে । যদিও এই সকল শব্দ বিবিধ পুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নের তালিকায় উল্লেখ কবিরাম ।

প্রাকৃত (সংস্কৃত) বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।

পথর । (প্রস্তরঃ) পাথর ।

†লোণ* (লবণম্) লুন ।

বিজ্জুলী (বিহ্বাৎ) বিজলী ... মৃঃ কঃ ।

বাড়ী (বাটী) ... বাড়ী .. মৃঃ কঃ !

ঘর (গৃহম্) .. ঘব ... ঐ

ছয়ার (দ্বারম্) .. ছয়ার ... ঐ

ঠাণ (স্থানম্) ঠাই .. ঐ

† এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গালা ও হিংরাজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত বিব্রাচ্ছিত । ইহার অধিকাংশই স্থায়রত্ন মহাশয়ের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক, প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ কৃত ‘বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনাতে’, বিম্ব সাহেবেব Comparative Grammar’এ ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়’ যাইবে ।

* ‘লুন’ শব্দ পূর্বে ‘লোণ’ কপেই ব্যবহৃত হইত, যথা কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে,—

“বাহান্ন পুঞ্চ যার লোণের বাপার । সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার ॥”

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।
বকল (বকলম্)	.. বাকল	... শকুঃ ।
+ভদ (ভদ্রম্)	... ভাত	..
+লট্ঠী (যষ্টিঃ)	.. লাঠী	..
+খন্ত (স্তম্ভঃ)	.. খাম্বা	..
+চক (চক্রং)	... চাকা	..
বহু* (বধুঃ)	.. বউ	... মৃঃ রাঃ ।
ঘিঅ (ঘৃতম্)	.. ঘি	... মৃঃ কঃ ।
দহী (দধি)	.. দই	... ঐ
+দুধ (দুগ্ধম্)	... দুধ	...
অন্ধার (অন্ধকারঃ)	.. আঁধার	... মৃঃ কঃ
শিআল (শৃগালঃ)	.. শিয়াল	... ঐ
হথী (হস্তী)	.. হাতী	.. ঐ
ঘোড়* (ঘোটকঃ)	.. ঘোড়া	.. গাথা ।
চন্দ (চন্দ্রঃ)	.. চাঁদ	.. মৃঃ কঃ ।
সঞ্জা (সন্ধা)	... সাঁঝ	.. ঐ
হথ (হস্ত)	.. হাত	... শকু ।
মথঅ (মস্তকং)	... মাথা	... মৃঃ কঃ ।
উত্র (পুত্রঃ)	.. সূত	.. উঃ চঃ ।
কণ (কর্ণঃ)	.. কাণ	... মৃঃ কঃ ।
হিঅঅ (হৃদয়ং)	হিয়া	.. ঐ

* প্রাকৃত 'বহু' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয় । যথা,—

‘বাহার বহু মি দূরে বাসি । তাহার নিকটে বসে অসতী ।’ ডাকের বচন, বেণী-মাধব দেব সংস্করণ ।

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বান্ধালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।
অভা* (মাতা)	আঠি	.. মৃঃ কঃ
রাও, রায় (রাজা)	রায়	.. চঃ কোঃ ও পিঙ্গল
+চ্ছুরা (ক্ষুরঃ)	... ছুরি	..
+মশাণ (মশানম্)	.. মশান	..
বক্ষণ (ব্রাক্ষণঃ)	... বামুন	... মৃঃ কঃ ।
চেড়ীড়ী (চেটী)	... চেড়ী	... ঐ
সহি (সখী)	... সহ	... ঐ
+জোট্ঠা (জোষ্ঠঃ)	... জোষ্ঠা	..
উনজ্জাঅ (উপাধ্যায়ঃ) ওঝা	..	মৃঃ রাঃ
+কজ্জ (কার্যাম্)	... কাব	...
+কম্ম (কন্ম)	.. কাম	...
বহিণী (ভগ্নী)	.. বোন	.. মৃঃ কঃ
রাঠি (রাধিকা)	.. রাঠি	... অপভ্রংশ ভাষা †
কাণ্ণ (কৃষ্ণঃ)	.. কান্ত	.. ঐ
গোয়াল (গোপঃ)	.. গোয়াল	.. ঐ
+বর্ত্তা (বার্ত্তা)	.. বাত	..
অপ্পি (আত্মা)	.. আপন	.. মৃঃ রাঃ
আক্ষি ‡ (অহং)	.. আমি	.. মৃঃ কঃ

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে ‘আতার’ ব্যবহার দৃষ্ট হয় । যথা,—

‘আছিল আমার আতা কিছুই না জানি । ভূতের ডরেতে সেই হিন্দুমানি মানি ॥’

ঈ এই শব্দ পূর্বে খুব প্রচলিত ছিল । ব্রতীবাসী রামায়ণ দেখ ।

† অপভ্রংশভাষামাহ আভীরাদিপিরঃ কাবোষপত্রংশপিরঃ স্মৃতাঃ ।

‡ বান্ধালা ও প্রাকৃতের সান্নিধ্যে দেখাইবার জন্য এই ‘আক্ষি’ ‘তুক্ষি’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।
ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী সমস্ত হস্তলিখিত

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।
তুম্বি (ত্বং)	• তুমি	• উঃ চঃ
শে (সঃ)	•• সে	• মঃ কঃ
তুএ (ত্বা)	তুই	ঐ
ত্বহ (তব)	•• তাহাব	•• শকুঃ
এহ (এবঃ)	•• এঈ	•• ঐ
ইমিণ (অনেন)	এমনে	• মুঃ বাঃ
অজ্জ (অদ্য)	•• আজ	••• উঃ চঃ
ণা (ন)	•• ন	•• গাথা
অ (চ)	• ০	••• ঐ
দঢ় (দৃঢ়ঃ)	•• দড	••• শকুঃ
সচ্চ (সত্যম্)	•• সাচা	••• মঃ কঃ
অদ্ধ (অর্দ্ধম্)	•• আধ	••• ঐ
বুড্ঢ (বুদ্ধঃ)	•• বুডা	•• ৭
দ্বঅ (দ্বয়ং)	•• দুই	••• পিঙ্গল
দ্বণা (দ্বিশৃণ)	•• দুনা	•• ঐ
তিম্ব (ত্রি)	•• তিন	••• ঐ
চাবি (চতুর্)	•• চাবি	• ঐ
ছ (ষষ্ঠ)	•• ছব	••

পুঁথিতেই আমি ও তুমি স্থলে সর্বত্রই ‘আমি’ ও ‘তুমি’ দৃষ্ট হয়। বেঙ্গলাগবর্ণমেটের পুস্তকাগারে পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়-চরিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকেও এই কোতুলজনক প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে।

এই ‘দড’ শব্দ পূর্বে দৃঢ় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—

“মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত দিলবর। কোন দিন আমারে কিলায় পাণ্ডে দড ॥” চৈ, ভা ;
এই “দড” অর্থ এখন নিপুণ হইয়াছে।

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল
সত্ত (সপ্ত)	... সাত	... পিঙ্গল
অষ্ট (অষ্ট)	... আট	.. মৃ: ক:
বার (দ্বাদশ)	.. বার	.. পিঙ্গল
চোদ্দ (চতুর্দশ)	... চৌদ্দ	... ঐ
পঞ্চরহ (পঞ্চদশ)	... পনের	...
সোলা (ষোড়শ)	... মোল	... ঐ
বাঠিসা (দ্বাবিংশ)	... ব্যাঠিশ	.. ঐ
+কেন্তক (কিয়ৎ)	... কতক	...
+এন্তক (ঈয়ৎ)	.. এতেক	..
+জেন্তক (যাবৎ)	... যতেক	..
জথ (যত্র)	... যথায়	... উ: চ:
এথ (অত্র)	... এথায়	.. মৃ: ক:
পল্লাপ (পলায়নম্)	.. পালান	...
মিচ্ছা (মিথ্যা)	.. মিচ্ছা	..
অম্ব (অম্ব)	... আব	...
সরিন্ (সর্ষপঃ)	... সরিষা	...
আঅরিন্ (আদশ)	আরসি	...
রুপ্পা (রোপাম্)	.. রুপা	...
মাচ্ছি (মক্ষিকা)	.. মাছি	...
কেথু (কুত্র)	.. কোথা	..
ছিন্দ (ছিন্ন)	... ছেঁড়া	...
হলদা (হরিদ্রা)	... হলুদ	..
পোথি (পুস্তক)	.. পুঁথি	...
গঙ্গল (লাম্বলম্)	... লাম্বল	...

প্রাকৃত (সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।
মহ (মধু)	... মো	...
তেল (তৈলম্)	... তেল	..
শেজ (শয্যা)	.. শেজ	...

বাঙ্গালা আর প্রাকৃতের ক্রিয়ার নৈকট্য অতি স্পষ্টই দেখা যায় । যে কোন প্রাকৃত রচনা হইতেই ঐ সকল ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অনায়াসে অনুমিত হইবে । প্রাকৃতের হোই, পড়ই, কিণহ, করই, বোলই, গচ্চই, ফুট, গাঅ, থাঅ, বুজ্ব, চিণ, জাণ, লগ্গ, পুচ্ছ ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, বলে, নাচে, ফোটা, গাওয়া, থাকা, বোঝা, চেনা, জানা, লাগা পৌছা ইত্যাদি পাইতেছি । প্রাকৃতগুনিঅ, লভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ ইত্যাদি বাঙ্গালায় গুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া ইত্যাদি রূপ হইয়াছে । প্রাকৃত ‘অচ্ছি’র সঙ্গে ভূধাতুর অসমাপিকা ‘হইয়া’র মিলনে ‘হইয়াছে’ গঠিত দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও ঐরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখনও পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে দুইটি শব্দ পৃথক্ ভাবে উচ্চারিত হয় ; যথা—‘দেখিতে—আছে’ ‘করিতে—আছে’ । অতীত কালের ‘আসীং’-এর অপভ্রংশ ‘আছিল’ পুরোক্তরূপে অতীত ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় ।*

শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র । শুধু অনুকরণপ্রিয়তা-বশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয় । ‘চল’, ‘খেল’ ইত্যাদি ধাতুর ‘ল’ অতীত ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে । যেখানে ‘র’কারের সংস্রব আছে, সেখানে ‘ল’-কারে পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; ‘ডলবোরভেদঃ’—কিন্তু তদ্বিন্নে অনেক স্থলে ‘ল’ প্রচলিত আছে ।

চলিলাম (চলামঃ) খেলিলাম-(খেলামঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে ‘ল’ প্রযুক্ত হইয়াছে । সংস্কৃত ‘ক্রমঃ’ স্থলে প্রাকৃত ‘বোল্লাম’ দৃষ্ট হয় :—‘এ ভগামি এস লুকো নেহম্ম রসেণ বোল্লামো’ যুঃ কঃ ৬ অঙ্ক ।

করসি, খায়সি, করোস্তু, জানেস্তু ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্বে বিস্তরপরিমাণে প্রচলিত ছিল । শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া দেখাইব । পরবর্তী অধ্যায়গুলির উক্ত তাংশে সেইরূপ আরও অনেক শব্দ দৃষ্ট হইবে ;—

- (১) “ভিক্ষুর কথা তুমি কহি আমারে ।
দেবযানি পলহিল কুপের ভিতর ॥”—সঞ্জয় ; আদিপর্ব ।
- (২) “সজ্জন না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর ।
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥”—কবীন্দ্র ; ভীষ্মপর্ব ।
- (৩) “প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাস্ত্রী ।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥”—চৈ, চ ; -অস্ত্রা ।
- (৪) “চতুর্দিকে নরসিংহ অছুত শরীর ।
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি সর্বর ॥”—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।

‘করোমি’র অপভ্রংশ ‘করোম’ ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায়, এবং সর্বত্রই ঐ শব্দ ‘করিষ্যামি’র অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয় । পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে এখনও কক্রম ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয় । ‘মৃগলক’ পুথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,—

“পিতা গোপীনাথ বন্দ্য মাতা বসুমতী । জন্মস্থান সচক্রদণ্ডী চক্রশাল খাতি ॥”

‘করিমু’ প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায় । ‘কুরুঃ’ হইতে ‘করিব’ও ঐরূপেই হওয়া সম্ভব । ‘করিমু’র স্থলে কচিৎ ‘করিবু’ শব্দও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয় ; যথা,—

“নিতি নিতি অপরাধ করে । বলে ডাক কি করিবু তারে ॥”—ডাক । *

প্রাকৃত ‘হউ’ (সং, ভবতু), ‘দেউ’ (সং, দদাতু) স্থলে ‘হউক,’ ‘দেউক’ বাঙ্গালাতে প্রচলিত । এই ‘ক’ কোথা হইতে আসিল ? বাঙ্গালা অনেক ক্রিয়ার পরই ঐরূপ ‘ক’-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; যথা,—কবিরেক, খাইবেক, দেখুক ইত্যাদি । প্রায়সন্ন সাহেব বলেন, এই ‘ক’ কিম্বৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন ; যখন ক্রিয়া (কু, ভু, দা ইত্যাদি) কক্ষ অথবা ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার উত্তর কর্তৃম্বচক ‘ক’ প্রত্যয় হইয়া ঐ সকল পদ (করিবেক, হউক ইত্যাদি) নিষ্পন্ন হয় । (জার্নাল, এসিয়াটিক সোসাইটি, নংখা ৬৪, পৃঃ ৩৫১ ।) উক্ত শব্দগুলির প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ ‘ক’ ছাড়া) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়,—

“জয় জয় জগন্নাথপুর দ্বিজরাজ । জয় হট তোর যত ভকতসমাজ ॥”

চৈ, ভা ;—আদি ।

“সকললোকে শুনিয়া হইল হরষিত । সবে বলে জীউ জীঃ এ হেন পণ্ডিত ॥”

চৈ, ভা—আদি ।

সংস্কৃতের ‘হি’ যথা ‘জানৌহি’ বাঙ্গালায় শুধু ‘স’তে পরিণত । পূর্বে ‘করিহ’ ‘যাইওহ’ রূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল । প্রাকৃতেও অনুজ্ঞা বুঝাইতে ‘হ’র ব্যবহার দৃষ্ট হয়;—

“আঅচ্ছ পুণো জুদংরমহ ।” —মৃঃ কঃ ২ অঙ্ক ।

কোথাও ‘হ’ দৃষ্ট হয় ; যথা,—পিঙ্গলে “মইন্দ করেহ ।” এই হ (হ) হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে । পূর্বে বাঙ্গালায় প্রাকৃতের মতই ‘য’ স্থানে ‘জ’, ‘য়’ স্থানে ‘অ’ বা ‘এ’ লিখিত হইত । প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই ! মুদ্রিত অনেক পুস্তকেও ঐরূপ লেখার সংশোধন হয় নাই, যথা,—

উচিত বলিতে পাড়ে গালি । পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি ॥”—ডাক ।

“পৌষে যার নাহিক ভাত । তার কতু নাহিক সেআথ ॥”—ডাক ।

হস্তলিখিত পুস্তকে যথা,—

“ভীষ্মক মারিতে জায়এ দেব জগন্নাথে । নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥”

—কবীন্দ্র ;—‘বেঃ গঃ পুঁথি’ ; ১০৫ পত্র ।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি ‘স’কার, (শ, ষ, স) দুইটি জ (জ, য), এবং দুইটি ণ (ণ, ন), স্থলে মাত্র স, জ, ন দৃষ্ট হয় ; ইহা প্রাকৃতের অনুরূপ । কেবল ‘ন’ সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্য যে, প্রাকৃতে সাধারণতঃ শুধু ‘ণ’ ব্যবহৃত হইলেও, পৈশাচিকী প্রাকৃতে ‘ণ’ স্থলে ‘ন’ এর ব্যবহারেব ব্যবস্থা আছে ; “পৈশাচিক্যাং রণযোলনৌ” (পৈশাচিক্যাং রেফস্ত লবাবৌ ভবতি ণকারস্ত নকার, চণ্ডপ্রাকৃত, ৩৩৮) অনেক প্রাচীন পুঁথিতে প্রাকৃতেব মত ‘দ’ স্থানে ‘ড’ দৃষ্ট হয় ; যথা,— ‘দাণ্ডাইয়া’ স্থলে ‘ডাণ্ডাঞা’ (তবর্গস্ত চ টবর্গৌ । যথা দণ্ডঃ ডণ্ডো চণ্ড প্রাকৃত ৩১৬) ।

পূর্বকালে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় ‘প্রাকৃত’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইত । বাঙ্গালা ভাষা যে পূর্বকালে বঙ্গভাষা পূর্বকালে প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত । বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে । সঞ্জয়-রচিত একখানি মহাভারতের ২০৩ বৎসরের পুঁথিতে রাজেন্দ্রদাসের ভণিতায়ুক্ত একটি পদে আমরা এই দুইটি ছত্র পাইয়াছি ;—“ভারতের গুণা কথা শ্রদ্ধা দুব নহে । পবিত্র পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহ ॥” বিশ্বকোষ আকসেব ৩৪ নং পুঁথি কৃষ্ণকর্ণামৃত পুস্তকে “তহা অনুসারে লিপি প্রাবৃত কখনে ;” বহ্ননন্দনদাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে “প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ ॥”—লোচনদাসেব চৈতন্যমঙ্গলের মধ্য খণ্ডে—“ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক । প্রাবৃত গবন্ধে কহি শুন সর্বলোক ॥” এবং বিশ্বকোষ আকসেব (২৪৩ সংখ্যক পুঁথি) একখানি গীতগোবিন্দের বঙ্গীয় অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অন্তে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয় ;—

“ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে স্প্রতীপীতাস্বরনামঃ
ষাদশঃ সর্গঃ । এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক পুঁথি)
“ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে” এবং রামচন্দ্র খান প্রণীত অশ্বমেধ পার্কে
(২৯৪ সংখ্যক পুঁথি—“সপ্তদশ পর্ক কথ্য সংস্কৃত চন্দ্র । মূর্খ বৃথিবার কৈল পরাকৃত
চন্দ্র ।” এইরূপ বহু স্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

অপভ্রংশ ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গলাব সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া
যায় ; যথা,—

“রাই দোহারি পঠণ শুনি হাসিঅ কাণু গোয়াল ।”

(রাই এর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কাণু গোয়াল ।)

—ছন্দোমঞ্জরী ; প্রথম স্তবক ।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের
সম্বন্ধ অতি কোতূহল-জনক । প্রাকৃত বৌদ্ধ-
সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষা ।
জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল ; বৌদ্ধ-
ধর্ম হিন্দু ধর্মের অবাধ্য সন্তান ; বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রাকৃতও
তদ্রূপ সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান । সংস্কৃতের বিরাট শব্দের ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত
উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু গোড়ীয় ভাষাগুলি তাহা গ্রহণ করিয়াছে ।
পুঙ্খট উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রবর্তিত হইলে পর, গোড়ীয়
ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে । সংস্কৃতে পুনরুদ্ধারহেতু তদীয়
বৈভবে গোড়ীয়ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল ; ক্রমে প্রাকৃত
হইতে উদ্ধৃত হইয়াও ঐ সকল ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিহ্ন স্থালন করিতে
চেষ্টিত হইল । কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে । কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ
ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গি তাহাকে চিনাইয়া
দেয় । পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূলচক্ষেরই হইয়া থাকে । সংস্কৃতের
অধ্যাপকগণ গোড়ীয় ভাষাগুলিকে অপরিখ্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দে ধনী করি-
লেন । লাম, চন্দ, লাধা লেখা দূরে থাকুক, এখন সাধারণতঃ তাহা আর

কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবারমাত্র ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক ; কিন্তু যাহা দিনে দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে উপাচার্য্যের অনুরোধ ও প্রয়াস বার্থ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক ব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর সংশোধন হইল না। প্রত্যেক ছত্রের গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। শুধু নামশব্দের পরিবর্তন করিলে এ স্থান হইতে অব্যাহত লাভ অসম্ভব। গোড়ীয় ভাষাগুলির কচিদ্ভাবহীন শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক ; কিন্তু প্রত্যেক ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত, বিভক্তিচিহ্নগত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অল্প। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিক্ত, হহাই তাহাব উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে পরিবর্তিত হইয়া, প্রথম প্রাকৃতে তাহার পর গোড়ীয়ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আমরা কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যক্ষর সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তনের দ্রুত হয়, এবং আদ্য বর্ণে আকার যুক্ত হয় ;—
নিয়ম।
বথা,—

হস্তি—হাতি ; হস্ত—হাত ; সপ্ত—সাত ; কক্ষ—কাথ ; মল্ল—মাল ; লক্ষ—লাথ ; অম্র—আম ; বজ্র—বাজ ; পক্ষ—পাথ ; হট্ট—হাট ; অষ্ট—আট ; কর্ণ—কাণ ; কজ্জল—কাজল ; অক্ষি—আঁখি ; ভল্লুক—ভালুক।
কখনও কখনও শেষ বর্ণের পরে আকার যুক্ত হয় ; বথা,—ছত্র—ছাতা ;

* কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির ‘ক্ষ’র উচ্চারণ ‘খ’ এইরূপ ধরা হইয়াছে।

চক্র—চাকা । চন্দ্র—চান্দা । * পক—পাকা ; পত্র—পাতা ; কর্তা—
কাতা । † কখনও বর্ণের শেষ অকার লুপ্ত হয় ; যথা,—লজ্জা—লাজ ;
সজ্জন—সাজ ; ঢকা—ঢাক । আদ্য বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যে
ং কি ‘ন’কার থাকিলে, তাহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ; যথা,—বংশ—
বাংশ ; ষণ্ড—ষাঁড় ; হংস—হাঁস ; দন্ত—দাত ; চন্দ্র—চাঁদ ।

‘অ’ স্থানে ‘আ’ হইবার উদাহরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে ; অনেক
স্থলে স্বয়ংবর্ণ অত্যাশ্রুপেও পরিবর্তিত হইয়া থাকে । যথা,—

‘অ’ স্থানে ‘এ’ ;—বঙ্গন—বেগুন ।

‘আ’ স্থানে ‘ই’ ;—পঞ্জর—পিঞ্জর , সজ্জান—সিয়ানা ।

‘অ’ স্থানে উ ;—ব্রাহ্মণ—বামুন ।

দ্বিপ্রহর—দুপুর ; ঔষধ—ঔষধ ।

ইহা ব্যতীত অত্যাশ্রু অনেকরূপ স্থত্র সঙ্কলিত হইতে পারে ।†

ট ও ড স্থানে ঙ্গে ‘ড়’তে পরিণত হয় , যথা,—ঘোটক—ঘোড়া ,
ঘট—ঘড়া § , ষণ্ড—ষাঁড় ; চণ্ডাল—চাড়া ; ভাণ্ড—ভাঁড় ।

* প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে ‘চাঁদার’ প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় । যথা,—

(১) “দেখিয়া বরের কপ লেগে গেল ধাঁধা । কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে
চাঁদা ॥” ক, ক, চ ।

(২) “জিনিয়া প্রভাত-রবি, সিন্দুর ফোটার ছবি, তাব কোলে চন্দ্রের চান্দা ॥”
ক, ক, চ ।

(৩) “তোমার বদন চান্দা, মোর মন মৃগ বাবা, তিল অর্ধ না দেখিলে মরি ॥”
ক, ক, চ ।

(৪) “কাদিয়া আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, স্মরণ লইল আসি ॥”—চণ্ডীদাস ।

(৫) “লগন চাঁদা ॥”—খনা ।

† “ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাউ ॥”—চণ্ডীদাস ।

‡ Beame's Comparative Grammar দেখ ।

§ “মনে মনে মহাবীর করেন যুক্তি । ধন ঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্শ্বতী ॥”

ক, ক, চ ।

‘ধ’ অনেক স্থলে ‘ষ’ বা ‘ঝ’তে পরিণত হইয়াছে, যথা,—উপাধাষ—ওঝা ; বন্দোপাধাষ—বাঁড়ুয়া ।

স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়, যথা,—‘ক’—স্বর্ণ-কাব—সোণাব ; চর্মকাব—চামাব, কুম্ভকাব—কুমাব, নৌকা—নাও, বা না ।

‘থ’—মুথ—মু*

‘গ’—দ্বিগুণ—দুগা, ভগ্নী—বোন

‘ন’—ভ্রাতা—ভাই, মাতা—মা, শত—শ ।

‘দ’—হৃদয়—হিয়া, কদলী—কলা ।

‘প’—কৃপ—কৃষা ।

‘ভ’—নাভি—নাই ; শ্রীভী—গাই ।

‘ম’—গ্রাম—গাঁ ।

কথিত ভাষা এককপে সরাসর সহজ আকারে পরিবর্তিত হইতেছে ।

কথিত ও লিখিত
ভাষার প্রভেদ ।

বিমল সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত

রচনাতেও প্রবর্তিত হইতক । তিনি বঙ্গদেশের

সাধুভাষাপ্রয়োগশীল লেখকগণের প্রতি সেন

কতকটা বিবক্ত । যাহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, তাঁহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা স্মরণ কবেন কেন ? তখন ‘আশা’র স্থানে ‘আশাব কবা’, ‘ভাণ্ড’ স্থলে ‘অন্ন’ ও ‘জল’ স্থানে ‘নীচ’ ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের মনঃপূত হয় না, আশাদেব মতে এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব স্থলে নিন্দনীয় নহে । বাঙ্গালা ভাষার কল্যাণ-সাধনহেতু সংস্কৃতের নিকট সততই শব্দ ভিক্ষা কবিতো হইবে । যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ম্ববে ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি

* “নাহি নাধে নাহি বাডে নাহি দেখ যু । পবেব বাঁধন খেয়ে চাঁদপানা মু ।”
ক ক. চ. ।

ব্যতীত ক্ষতি নাই । বিশেষতঃ, ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না । দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্ত লিখিত ভাষার স্বাভাব্য আবশ্যক । যদি কলিকাতার কথিত ‘গেলুম’ লিখিতরচনায় স্থান পায়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের ‘গ্যাছলাম’ কি ‘মাইবাম’ সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন ? স্বদেশবৎসলগণ তাহাও চালাইতে কুতসংকল্প হইতে পারেন । বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পৃথক ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে । পাঠ্য ভাষার বিশুদ্ধিরাক্ষা সেই জন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার কুঋটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে । মাটেকেল তাঁহার সুহৃদ্ মনোমোহন বাবু মাতার নিকট পত্রে লিখিয়া-
ছিলেন,—

“আপনি পরম জ্ঞানবতী, হুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবদিত নহে যে, একপা তাঁহা গর শব্দগণ শোক এ সংসারে সর্বদাই মানবকলের হৃদয় বিকল করে । পিতৃ-চরণ-দর্শন-শপ প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান ।”

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিধান দিতে প্ররতি হয় না ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

পাশ্চাত্য মত,—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ ।

এই সকল গোড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, বঙ্গভাষা অনায়াভাষা-
সমূহ নহে ।
অপর কোন অনার্য ভাষা হইতে উহার উদ্ভূত হইয়াছে, কয়েক জন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন । ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, এণ্ডারসন,

কে এবং কন্ডওয়েল, এই মতাবলম্বী । ইঁহারা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি অশ্রান্ত গোড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোন সংস্রব ছিল না । বিভক্তি ও ছত্রগুলির বিভ্রাসপ্রণালী দ্বারাই কোন ভাষার আদি-নির্ণয় সম্ভব, কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দেখিয়া সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে । তাঁহারা বলেন, আৰ্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ-পূর্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনাৰ্য্যদিগেব সঙ্গে বাস হেতু, তাঁহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন । সংস্কৃতেব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাষায় বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল । কিন্তু বিভক্তি-চিহ্ন ও বিভ্রাসপ্রণালীতে উহাদের আদিম অনাৰ্য্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্তমান । এতদনুসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে, হিন্দীর “কো” (যথা ‘হামকো’) ও বাঙ্গালার “কে” (যথ ‘রামকে’) তাঁহাব দেশীয় অন্ত্যবর্ণ “ক” হইতে আগত হইয়াছে । ডাক্তার কন্ডওয়েল, দ্রাবিড়* ভাষার বিভক্তি-চিহ্ন “কু” হইতে হিন্দব “কে” আনিয়াছে; এইরূপ অনুমান করেন, এবং হিন্দী প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড়-ভাষা সম্বৃত, এই মত প্রচার করেন । ডাক্তার হরন্স ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব মতের অমৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । পাদটীকায় কন্ডওয়েলের যুক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে হবন্সের খণ্ডনকারী যুক্তিব সারাংশ সঙ্কলিত হইল ॥ গোড়ীয় ভাষাগুলিব বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হবন্স, দিটার্চি

* দ্রাবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক পণ্ডিতই এই মতাবলম্বী ।
See—Comparative Grammar of the Dravidian Languages by Bishop Caldwell. (P. 46 Ed 1875, also Hunter's British Empire P. 327.

† ডাক্তার কন্ডওয়েল বলেন, আৰ্য্যগণ আৰ্য্যাবর্ত জয় করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তদ্দেশপ্রচলিত অনাৰ্য্যভাষা সংস্কৃত-শব্দেৰ দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল । এই জন্য ঐ সকল অনাৰ্য্যভাষা সংস্কৃতজাত বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে ।

২ জার্মান পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিগুলি সম্বন্ধে এখনও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কবিতায় মিথ্রাক্ষরযোজনারীতি বর্ষর ভাষা-বিশেষ হইতে অমুকৃত, 'এণ্ডেস্' এবং ছয়ে এই মত প্রচার করিয়া-ছিলেন। এই মত এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। গোড়ীয় ভাষাগুলিও কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে, এই মতও এখনও সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। এই সব অদ্ভুত মতপ্রচারকদিগেব যুক্তি—সেক্সপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাদিপি মাহুগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি,—প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির সহিত এক সেলফে বদ্ধ হইয়া থাকিলে। দুই এক জন প্রস্তুকট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীস্থ

কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব নতই প্রবল হউক না কেন, ঐ সকল ভাষার ব্যাকরণ তদ্বারা পরিবর্তিত হয় নাই। তাহার উত্তরে ডাক্তার হার্নলি বলেন, আর্ঘ্যগণ বহুকাল আধ্যাবর্ডে বাস করিয়া সহসা যুগিত অনার্য্যগণেব ভাষা গ্রহণ করিবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহারা যে স্বদীর্ঘকাল সংস্কৃতজাতীয় পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; এবং নাটকাদির প্রাকৃত দ্বারা ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিজিত অনার্য্যগণও তাহাদিগের প্রভুগণের ভাষাই পরিগ্ৰহ করিয়াছিল; এতাবৎ কাল হিন্দুগণ স্বীয় ভাষা ও ব্যাকরণ অনার্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা শেষে যুগিত অনার্য্য ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইবেন? আর গোড়ীয় ভাষাগুলির উৎপত্তির সময়—আর্য্যভাষার স্বদীর্ঘকালবাগী অগণ রাজত্বের পরে যে বিজিত অনার্য্যগণের ভাষা এতদেশে প্রচলিত ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ইতিহাসে অশ্বখ মধ্যে মধ্যে একপও দেখা গিয়াছে যে, বিজিত জাতিগণ বিজিতগণের ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা; নর্মানগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তুর্কীজাতিরা আধ্যাবর্ডে, এবং ফরাসীগণ গলে; কিন্তু এই সব স্থলে বিজিতগণ বিজিতগণ অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ছিলেন, এবং উপনিবেশস্থাপনের প্রারম্ভকাল হইতেই বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছিল। বহুকাল বিজয়ী জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বাভাব্য-গৌরব রক্ষা করিয়া অসভ্যজাতিগণের নিকট শেষে তাহা বিসর্জন দিয়াছেন, ইতিহাসে কোথাও একপ দৃষ্ট হয় না।

পুঁথিতে তাঁহাদের বিচিত্র যুক্তি কুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া বিশ্বয়াপন্ন হইবেন, কিন্তু শিক্ষিতজগৎ সেই সকল মত আর গ্রহণ করিবেন না ; সেই সব প্রাচীন যুক্তির শব, চিরদিনের জন্ত ভূপ্রোথিত হইয়াছে ।

বাক্সালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত ; অনুস্বার কি বিসর্গ বর্জিত হয় এই প্রভেদ । কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃত-
বাক্সালা বিভক্তি ।
তের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায় । প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে কোথাও ‘এ’ সংযুক্ত দেখা যায় ; যথা, ‘ও অণেহ ভিচ্চাণকম্পকে শামীএ নিদ্ধণকেবি শোহেদি ।’ যুঃ কঃ ৩ অঙ্ক । কর্তৃবাচক তৃতীয়াতেও প্রাকৃত ঐরূপ ‘এ’ অনেক স্থানে দৃষ্ট হয় । এই ‘এ’ বাক্সালা কর্তৃকারকে পূর্বে ব্যবহৃত হইত । যথা,—

(১) “ঙ্গনিয়া রাজ। এ বোলে হইয়া কোতুরু ।

সুগন্ধা অপচর। কেন তৈল সুগন্ধপ ॥” সঞ্জয় ; আদি ।

(২) “কদাচিৎ না দেখিছ হেনকপ ঠান ।

কোন মতে বিধাতাএ করিছে নিষ্কাণ ॥”

ব্রাহ্মেশ্বরী মহাভারত ; বেঃ গঃ পুঁথি ; ৮৬ পত্র ।

প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই । অনেক স্থলেই প্রাকৃতে দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা,—“ওব অদি তমসে অঅং দাব পরিসো ভ্রাদো দেউণ ৭ আগমি কুণলবা ।” —উঃ চঃ ৩য় অঙ্ক । ‘কহিংমে পুত্রআ,’—উঃ চঃ ৭ম অঙ্ক ।

প্রাচীন বাক্সালায় বহুবচন-বোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায় । যথা,—

“নরা, গজা বিশেষ সহ, তার অর্দ্ধেক বাচে হয় । বাইশ বলদা, তের ছাগলা” । খনা ।

টম্প অনুমান কবেন, বাক্সালা কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের ‘কে’

সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত ‘কৃতে’ শব্দ হইতে আগত ।* এই ‘কৃতে’র নিমিত্তার্থ প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায় । যথা,—

“বালিশো বত কামাস্মা রাজা দশরথো ভৃশং ।

প্রস্থাপয়ামাস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং স্ততম্ ॥”

রামায়ণ ; অযোধ্যাকাণ্ড ।

ম্যাক্সমুলর বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে ‘ক’ হইতে বাঙ্গালা ‘কে’ আসি-
যাচ্ছে । শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্বার্থে ‘ক’এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ।
আমরা ম্যাক্সমুলরের মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি । বাঙ্গালা প্রাচীন
হস্তলিখিত পুঁথির আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ
থাকিতে পাবে না । এই ‘ক’ (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক,) প্রাকৃতে
অনেক ব্যবহৃত দেখা যায় ।† গাথা ভাবায় এই ‘ক’এর প্রয়োগ
সর্বাপেক্ষা অধিক ; যথা, ললিতবিস্তারের একবিংশাধ্যায়ে,—

“স্ববদগুকে স্বতুবরে অ গতকে ।

রতিমো প্রিয়া ফুল্লিত পাদদপে ॥

বশবর্তি স্তলক্ষণ কেবিচিত্রিতকো ।

তবকপ গুরুপ স্তশোভনকো ॥

বয়ংজাত সজাত স্তসংস্থিতিকঃ ।

স্থখ কাবণ দেব নারায়ণ বসস্তৃতিকঃ ॥

∴ এই ‘কৃত’ শব্দ প্রাকৃতে ‘কিতে,’ ‘কিঙ’ এবং ‘কো,’ এই তিন রূপেই ব্যবহৃত
হইত । টম্পসন অনুমান করেন, শেষোক্ত ‘কো’র সঙ্গে হিন্দির ‘কে’ ও বাঙ্গালা ‘কে’র
সাদৃশ্য আছে ।

† “তাত্ত্বশাসনের ভাবার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ‘ক’এর
ব্যবহার কিছু বেশী । ‘দূত’ স্থানে ‘দূতক,’ ‘ইট’ গ্ৰনে ‘ইটিকা,’ ‘বাট’ স্থানে ‘বাটক,’
‘লিখিত’ স্থানে ‘লিখিতক’ এইরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশ মধ্যেই দেখা যায় ।
সমুদয় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে ।”—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত,—“ধর্ম-
পালের তাত্ত্বশাসন .’ সাহিত্য ; মাঘ ; ১৩০১ ; ৬৫৩ পৃ ।

উখি লঘু পরিভূজ্ঞ শ্রযোবনকং ।

ভ্রম্ভ বোধি নিবর্তয় মানসকম্ ॥” ইত্যাদি ।

বাক্সালায় পূর্বে এই ‘ক’ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল । পূর্ববঙ্গে ২০০ বৎসরের পূর্বের পুঁথিগুলিতে এই ‘ক’ এর প্রয়োগ অসংখ্য । আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ।

(১) “রথ তৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক লৈয়া হাতে ।

ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে ॥” কবীন্দ্র ; বেঃ গঃ ১০৬ পত্র ।

(২) “ভীষ্মক-ভয়ে যত সৈন্ত যায় পলাইয়া ।” এ

(৩) “সে যে ভাষা অন্তঃস্বর্ণ পতিক সেবয় ।” সঙ্কয় ।

(৪) “শিগড়ীক দেগিয়া পাইবা স্নানুতাপ ।” কবীন্দ্র ; বেঃ গঃ ৭৫ পত্র ।

(৫) “পঞ্চ ভাই দেপদীক কুশল জানাইব ।” এ ; ৭৭ পত্র ।

এই ভাবে কর্তা এবং কর্ম উভয় স্থলে ‘ক’ থাকিলে কোন্টা কর্তা, কোন্টা কর্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন । ‘সৌরঙ্গীক কীচক বোলএ ততঙ্গণ ।”৮ ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে । সেই জন্য কর্ম ও সম্প্রদানে বাক্সালায় ‘কে’ব ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল । গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধো মধো ‘কে’ব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা প্রাকৃতে,—

পলি ও আদ্রদাসী এ পুন্তে দসিদ চালুদত্তকে ছম ।” (য়ঃ কঃ ৮য়)

কোন কোন স্থলে বাক্সালা কর্মকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্নে প্রযুক্ত হয় না । যথা,—বাম গাভ কাটিয়াছে । এইরূপ ব্যবহার ৩ পূর্বোক্ত ‘ক’-যুক্ত ব্যবহারের সহিত পূর্বে কোন পার্থক্য ছিল না । কারণ ‘ব’ পূর্বে বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শব্দের অন্ত্যবর্ণ মাত্র ছিল । এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ম ও সম্প্রদান বাতীত অগ্ন্যগ্ন বিভক্তিতেও ‘কে’ ব্যবহৃত হইত, যথা,—

“মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন ।” (চৈ. চ ; আদি ; ৮য় পং)

বহুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু “সব”, “সকল” প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত হইত । যথা,—

“তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার ।

কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র শূন্যক সবার ॥” চৈ, ভা ; আদি ।

ক্রমে “আদি” সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল । যথা, নরোত্তমবিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিল ।

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিল ।

শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে ।

করিলেন নিযুক্ত শীবদাস আচাষ্যেরে ॥

আকাঠ হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায় ।

হইল নিযুক্ত শীবদাসভীকান্ত তায় ॥

এইরূপে “রামাদি” “জীবাদি” হইতে ষষ্ঠী ‘ব’ সংযোগে ‘রামদেব’ ‘জীবদেব’ হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় ।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘ক’ যুক্ত হইয়া ‘ব্রহ্মাদিক’ ‘জীবাদিক’ শব্দে সৃষ্টি স্রাবিক । ফলতঃ, উদাহরণে তাহাই পাইয়া যাই । যথা, নরোত্তমবিলাসে,—

“রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বন্দাবনে ।

কবিরাজ খাতি তার হইল সেমনে ॥”

এহ ‘ক’এব ‘গ’এ পারর্গতও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে । সুতরাং ‘ব্রহ্মাদিগ’ (ব্রহ্মদিগ) ‘জীবাদিগ’ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে । এখন ষষ্ঠী ‘ব’-সংযোগে ‘দিগের’ এবং কর্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত ‘কে’র সংযোগে ‘দিগকে’ পদ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে ।* কাহারও কাহারও মতে পার্শী ‘দিগর’ শব্দ হইতে বাঙ্গালা ‘দিগের’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ।

* এই বিভক্তি চিহ্ন গাঢ়ত হইতে আগত হয় নাই । ইহা সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের পরে

আদি শব্দের সংযোগ ব্যতীতও ‘ক’ বর্ণকে ‘গ’এ পরিণত করিয়া পূর্বাঞ্চলবাসিগণ ‘আমাগো’ ‘রামগো’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেন । ঐ কথাগুলি দ্বারা ‘অস্মাকং’ ‘রামকং’ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচলিত বাক্যের নিকট সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, প্রাকৃত ‘কেরউ’ হইতে বাঙ্গালা ‘গুলো’ শব্দের জন্ম । হিন্দী ‘ঘোড়াকের,’ নেপালী ‘ঘোড়াহেরু’ বাঙ্গালা ‘ঘোড়াগুলো’ একই অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভূত ; + কিন্তু ‘বালকটি’, ‘একটি’ ‘দুইটি’—ইত্যাদি ভাবের ‘টি’ স্পষ্টতই ‘গুটি’ শব্দ হইতে আসিয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে ঐ ভাবে ‘গুটি’ শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই পাওয়া যায় । যথা, “হুইরো হুই কুচুয় আবার আন নাই । দন্দবাদ না করিবি দুই গুটি ভাই ।” (ছয়ের দুই আত্মীয়, আর অগ্র কেহ নাই, দুই ভাই দ্বন্দ্ব করিও না)—অনন্ত-রামায়ণ ।

করণকারকের পৃথক চিহ্ন বাঙ্গালায় নাই বলিলেও হয় । সংস্কৃত ‘রামেণ’ স্থলে প্রাকৃতে ‘রামএ’ ব্যবহৃত হইত । ইহা হইতে বাঙ্গালায় পূর্বে “রামে ডাঁকিয়াছে”, “রাজায়(এ) বণিয়াছে” ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল । এখনও “কুড়ালে পা কাটিয়াছে,” “নৌকায় বাড়ী গিয়াছে” প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রাকৃতে সঙ্গ বাঙ্গালার নৈকট্য দৃষ্ট হয় । “দ্বারা” শব্দ সংস্কৃত ‘দ্বার’ শব্দ হইতে আগত । উহা কথিত ভাষায় ‘দিয়া’তে পরিণত । সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই লিখিত হইয়াছে ; বাঙ্গালায় কর্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কোন প্রভেদ নাই । প্রাকৃতে ‘হিংতো’ শব্দ । পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত । ‘এই ‘হিংতো’ হইতে

গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃতের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট । কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ নাই । ‘দিগকে’ ‘গিগের’ এখনও পূর্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই ।

১. ভারতী, ১৩০৫, ; জ্যৈষ্ঠ ।

+ “ভাসো হিংতো হুংতো ।”—ইতি বরকচিঃ ।

বাঙ্গালা ‘হইতে’ আসিয়াছে । এই ‘হিংতো’ পূর্বে বাঙ্গালায় ‘হন্তে’ রূপে প্রচলিত ছিল, যথা,—

“কা’কে ক’ল্ল নির্বলী কাহাকে বলী আর ।

হাড় হন্তে নিশ্বিয়া করয় পুনি হাড় ॥”

আলোয়াল কৃত পদ্মাবতী ; ২ পৃষ্ঠা ।

এই ‘হিংতো’র অপর রূপ ‘হনে’ ও পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় । যথা,—

“তাকে দেখি মোহ পাইল, না দেখিলু পুনি ।

সেই হনে ধাণ মোর আঁছে বা না জানি ॥”—সঙ্কষ ; আদি ।

প্রাকৃত যষ্ঠীয় চিহ্ন ‘ণ’ * বাঙ্গালা ‘র’কাবে পরিণত হয় । প্রাকৃত ‘অগ্নীণ’ স্থলে আমরা বাঙ্গলায় ‘অগ্নির’ পাইতেছি । ‘ণ’ সচরাচরই ‘র’ বা ‘ড়’তে পরিণত হয় । এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রশ্ন চান, তবে উড়িষ্যা দেশ যুরিয়া আসিলেই, তাহার প্রতীতি জন্মিবে । কিন্তু যষ্ঠীয় সম্বন্ধে মতান্তর আছে ; বপ্ অমুমান করেন, হিন্দীর ‘কা’ এবং বাঙ্গালা যষ্ঠীয় চিহ্ন সংস্কৃত যষ্ঠীয় বহুবচনের ‘অস্মাকম্’, ‘যুস্মাকম্’ ইত্যাদির ‘ক’ হইতে আসিয়াছে ।† কিন্তু হরন্‌লি সাহেব বপের অমুমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন ; এখানে তাহার পুনবল্লিখ নিম্প্রয়োজন ।‡ তাহার মতে, সংস্কৃত ‘কৃতে’র প্রাকৃত রূপান্তর হইতেই বাঙ্গালা এবং হিন্দীর যষ্ঠীয় চিহ্ন আসিয়াছে । ‘কৃতে’ হইতে প্রাকৃত ‘কেরক’ উৎপন্ন হইয়াছে । এই ‘কেরকের’ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় । সেই সেই স্থলে

* টামোর্গ :। অতোহনগুরং টামোহুর্তায়ৈকবচনযষ্ঠীবহুবচনযোগ্যকারে। ভবতীতি ।

—বরকচিঃ ।

† Bopp's comparative grammar. Para 340. Note.

‡ Journal Asiatic Society 1872. No P. 125. •

‘কেরকের’ কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষষ্ঠীর চিহ্নস্বরূপই ব্যবহৃত হয় যথা,—

“তুমং পি অগ্নগো কেরিকং জাদি শুমরেসি ।” যুঃ কঃ ; ৬ষ্ঠ অঙ্ক ।

“কস্ম কেরকং এদং পবণম্ ॥”

এই ‘কেরক’ (বা ‘কেরিক’) হইতে হিন্দী ‘কর’, ‘কের’, ‘কেরি’ আসিয়াছে । যথা,—

তুলসীদাসের রামায়ণে—‘ক্ষত্রজাতিকের রোষ’ লঙ্কাকাণ্ড । ‘বন্দোঃ পদসরোজ সবকেবে’ বাগকাণ্ড । এই ‘কেরক’ হইতে যেকূপ হিন্দীর ‘কের’ ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অত্র দিকে বাঙ্গলা ও উড়িয়া ষষ্ঠীর চিহ্ন ‘এর’ ও ‘র’ উদ্ভূত ।* রাজা রাজেন্দ্রলাল অমুমান করেন, বাঙ্গালা ষষ্ঠীর ‘র’ সংস্কৃত ‘শ্র’ হইতে আগত । এই মতের সাপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ‘স’ এবং ‘ব’ উভয়ট বিসর্গে পরিণত হয় । অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত) স, রেফ অর্গাৎ রকারে পরিণত হয় । সপ্তমীর ‘তে’ সংস্কৃত ‘স্তসিল’ হইতে উৎপন্ন । সংস্কৃতের একার—যথা গহনে, কাননে,—প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রূপই আছে । কিন্তু বাঙ্গালার সপ্তমী একবারে প্রাকৃত-চিহ্ন-বর্জিত নহে । সংস্কৃত শালায়াং, বেলায়াং, ভূমাং এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয় । প্রাচীন

* In using কের in composition with the word in the genitive case, the initial ‘ক’ of the former is elided regularly. Thus we arrive at এর, Take for instance the genitive of সন্তান a child. It would be সন্তানকেরকে; this would change to সন্তানকের and this to সন্তান এর—সন্তানের which is the present genitive in Bengali. By analogy the other Bengali genitive post-position র which it shares with the Oriya, is probably a curtailment of the genitive case ‘কর’—as ঘোড়াকর, ঘোড়াঅর,—ঘোড়ার । Journal Asiatic Society 1872 No. II. P. 132—133.

হস্ত-লিখিত বাঙ্গালা পুস্তকেও ঐ সব শব্দ প্রাকৃতের মতই পাওয়া যায় । আধুনিক ‘শালায়’ ‘বেলায়’, ‘এ’, ‘য়’ হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ ।

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি আবশ্যকীয় । আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম । পণ্ডিত রামগতি ঞায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন “কিন্তু এই সকল বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আসিল তাহা ঠিক বলা যায় না” * • আমরাও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না ।

বাঙ্গালার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আর্য্যদিগের কথিত ভাষা কতক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে । কোন্-অসভ্যগণের ভাষার কথঞ্চিৎ মিশ্রণ ।

গুলি অনার্য্য শব্দ, তাহার নির্ণয় সহজ নহে । এই বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে, যাহা পার্শ্বী, আরবী, কি উদ্ভূতে নাই ;—সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে ও তাহাদের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না । ৮রামগতি ঞায়রত্ন মহাশয় উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কুলা, ঢেঁকি, ধুচনি ; এই ‘ধুচনি’ শব্দ সংস্কৃত ‘ধৌত’ শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । বঙ্গীয় অভিধানে অনেক শব্দ ‘দেশজ’ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে । প্রকৃতিবাদ অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অনূন অষ্টশত শব্দ ‘দেশজ’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে† । এই ‘দেশজ’-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাংশেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । যথা,—আজ, হল, ওছা, পাণ্ডা, ফাঁপা, পোণে ইত্যাদি শব্দ ‘দেশজ’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদা, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, ক্ষীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কোন না কোনরূপে সম্পৃক্ত । দেশজ-আখ্যা-বিশিষ্ট শব্দগুলির কতক

* ৮রামগতি ঞায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ২০ ।

† প্রকৃতিবাদ অভিধান ; দ্বিতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩৩ ।

অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নয়; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ শব্দ বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া কি আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর; ইংরাজীতে মারগ্রেট হইতে ‘পেগ’, এলিজাবেথ হইতে ‘বেস্’ যে ছদ্মের্স নিয়মে উৎপন্ন তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এই প্রাকৃত-সম্ভূত বঙ্গভাষায় পাশী, টংরেজী, আরবী, পৰ্তুগিজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ আছে। তবে অনুকৃতি দ্বারাও অনেক শব্দ আপনা-আপনি গঠিত হয়; যথা,—অবূরের ‘কেকা’, বানরের ‘কিচ্‌মিচ্‌।’ কিঞ্চিৎ অনার্য শব্দের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, ল্যাটিনে আছে, সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালারও আছে, সে জন্য বাঙ্গালা ভাষার জাতি যায় নাট।

এখন বাঙ্গালা ভাষার চন্দ্র পর্যালোচনা করা যাউক। ‘পয়ার’ শব্দটি

‘পাদ’ (চরণ) হইতে আসিয়াছে, ত্রায়রত্ন মহা-
চন্দ্র ।

শব্দের এই নত গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন দ্বিতীয় একটু গোলে পড়িয়াছেন, এবং “করিমা বাবকসাই বর্তুলেমা” ইত্যাদি পাশীর বহুং তুলিয়া গবেষণা করিয়াছেন।

অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে পাত্র পাত্ৰীক গৃহে যশো-গান করিত। পাল-রাজগণের স্তুতি-বাজক কবিতা বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন গীতি। তাহা ভাটগণের দ্বাবাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ গীতির প্রথা ভাবতবর্ষে অতি প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেও অনেক স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

“The institution of Bhats, is as old as Indo-Aryan civilization.” Indo-Aryans Vol. II. P- 293.

† “পহিলে শুনিবু অপকপ ধনি কদমকানন হৈতে॥

তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিত্তে ॥

শুধু ভাট সংগীত নহে, পূর্বে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব-দিগের গীতি সমস্তই গায়কেরা স্বরসংযোগে গান করিত। চৈতন্য-ভাগবতের পূর্বে চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, এ সমস্তই গানের পালা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে ‘লাচাড়ী’ (সম্ভবতঃ লহরী শব্দের অপভ্রংশ) ‘দীর্ঘছন্দ’ বা কোন রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখকগণও স্ব স্ব ভণিতায় “রামায়ণ গান দ্বিজ মন জ্বালাবে” কি “পয়ার প্রবন্ধে গাহে কশীরামদাস” ইত্যাদি ভাবে পাদ পূরণ করিয়াছেন। এই সব গান এক জনে গাইয়া যাঁত ৩ তাহাব সঙ্গিগণ গীতির একভাগ সনাশু হইলেনে সববেত কণ্ঠে ধুয়া গাহিত। প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন গ্রন্থে ঐরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ধূয়াগুলি ভাষার মাধুর্য্যে অতুলনীয়, কিন্তু অত্যাশ্রিত প্রাচীন পুস্তকেও ধূয়া-গুলি বড় মধুর, যথা,—

“দান দিয়া যাও জোরে বিনোদিনী রাই ।

বারে বারে ভাঁড়িয়াছ নাগর কানাই ।”

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ ;—হস্তলিখিত পুঁথি ।

রাম-নামের মহিমা কে জানে,

নাম শ্রবণময় অতি, গঙ্গা-ভাগীরথী

উৎপত্তি ও রাস্তা চরণে ।

বৃন্দাবনী রামায়ণ ; উদ্ভরকাণ্ড (হস্তলিখিত পুঁথি) ।

গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবানি থাকে না, মাত্রার দিকেই অসিক দৃষ্টি থাকে। এতাই পূর্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না।

আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিলে বাহার নাম ।

গুণিগণ-গানে শুনিবু অবশে তাঁহার নাম ॥” প, ক, ত, ৩৩নং

“গীহার মুরলীধনি শুনি

সেই বটে এই রসিকমণি ।

ভাটমুখে যার গুণ গাঁথা ।

দুতীমুখে শুনি যার কথা ॥” প, ক, ত, ; ৩৬ নং ।

আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিক-চাঁদের গানে * অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-সংখ্যা ২৪, ২৫ এমন কি, ২৬ও অতিক্রম করিয়াছে; আবার স্থলবিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ১০ এ অবতরণ করিয়াছে, এরূপও দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। সুতরাং মিল নিয়মাবলী ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কথেকিটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।—

(১) পরিধানের সাদী অন্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া।

যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিয়া ॥

(২) সাত দিয়া সাত জনা গর্জিয়া সোন্দাইল।

চামের দড়া দিয়া বাধিল ॥

(৩) তোর মাইয়া পাইয়াছে গোরকনাথের বর।

নাগাইল পাইলে ময়না না করে ক্সল ॥

(৪) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র।

যত বুদ্ধি শিথিয়ে দেয় নিরাসী সকল ॥

কিন্তু এই গীতি ও ডাকের বচন ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যে কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি হই একখানি পুস্তকে পয়ার অনেকটা নিয়মিত দেখা যায়। অত্র সমস্ত পুস্তকেই ঐক্য নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক। ত্রিপদীর স্থায় পয়ারও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে,—তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। নিম্নলিখিত পয়ার ‘গান্ধার রাগ’ অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাগ শ্রীগান্ধার ।

“যুদ্ধেত মরা হৈলে হয় স্বর্গগতি ।
 পলাইলে অবশ হয় নরকে বসতি ॥
 এ বুনিয়া বৃহন্নলা ধরিবারে জাএ ।
 অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ ॥
 নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে ।
 দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে ॥
 ব'কুতি করএ তবে উত্তর কুমার ।
 না কর না কর মোর প্রাণের সংহার ॥
 সপ বৃহন্নলা মুই করম নিবেদন ।
 রথ বাহুড়াই আমার রাগহ জীবন ॥
 একশত স্তবর্ণ দিমু শুদ্ধ হৃগঠিত ।
 অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত ॥
 বৈদূর্য্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর ।
 দশ হস্তি দিমু তোকে পরম হৃন্দর ॥”কবীন্দ্র—বেঃ,গঃ পুঁথি ৬৫ পত্র ।*

এই পয়ার,—গান্ধাররাগে গীত হইলে কেমন* শুনাইবে তাহা
 আমরা বলিতে পারি না ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়মপালনের প্রয়োজন
 ছিল না, উপরি উক্ত অংশটি আমরা অক্ষর:নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ
 স্বরূপ বাছিয়া উঠাই নাই, তথাপি উহার ১৪ চরণের মধ্যে ৫টি চরণে
 পয়ার-নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় । প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন পুঁথি খুঁজি-
 লেই ১১ হইতে ১৭ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে । আমরা

* আমরা উক্ত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না । প্রথমতঃ
 প্রাবৃত্তের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যিক ।
 দ্বিতীয়তঃ উক্তকারীর প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা
 সন্দেহহীন । বাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত
 ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা, শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হয় ।

কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি ; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম উভয়েরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন ।

(১) সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা । (১৩)

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥ (১৩) চণ্ডীদাস ।

(২) ভৈরব হৃত গজপতি বড় ঠাকুরাল । (১৪)

বারাণসী পয়ান্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে বাহার ॥ (১৫)

রামায়ণ ; হস্তলিখিত পুঁথি ।

(৩) বাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম । (১৫)

তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ (১৪) চৈঃ চৈঃ ১৬ পঃ ।

(৪) থই কদলক আর তৈল হরিদা । (১৩)

প্রাতে কে সবারেঃ দিল শচী সচরিতা ॥ (১৪) চৈ, ম, আদি ।

(৫) ক্ষোপি করতক শীমান দীন দুগতি বারণ । (১৭)

পুণ-কীর্ত্তি গুণাবাদী পরাগল খান ॥ (১৪)

কবীন্দ্র ; বেঃ গঃ পুঁথি । ৪৫ পত্র

(৬) নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে । (১৫)

অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ।

(৭) চেতন্তুচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র । (১৪)

ভক্ত প্রসাদে ক্ষুরে জানিহ নিশ্চিত ॥ (১৩) চে, ভা ।

(৮) অজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো । (১৩)

শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো ॥ (১৩) ক, ক, চ ।

(৯) প্রতি ঘরে শোভে অতি বিচিত্র কপাট । (১৪)

প্রতি গলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ ॥ (২০)

জ্ঞানেন্দ্রের চৈতন্ত-মঙ্গল ।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে । ত্রিপদীর (লাচা-
ড়ীর)* অবস্থা ইহা হইতেও গোচনীয় ছিল । কবীন্দ্র-রচিত ভারত
হইতে নিম্নে ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতেছে । ইহা পদ্য কি গদ্য

এবং কিরূপে সে কালের কাব্যান্বাদীগণ ইহা পড়িয়া স্মৃতি হইতেন, নিরূপণ করা সূকঠিন ।

দীর্ঘছন্দ ।

শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুত্রস্ত,

নাহিক যে পরস্পর ভেদ ।

বিপ্র তপস্বী, সতত করেস্ত,

অভাস করেস্ত ধনুর্বেদ ॥

সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলস্ত ।

প্রতিবর্গের, প্রাণ সমসর,

বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর ।

মাত্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র,

নকল কোমল শরীর ॥

বহু শত্রু ক্ষয়, করিল পুত্র যৌর,

পুনি কি দেখিমু ন্যমেনে ।

কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র,

নকল চলিয়া গেল বনে ॥

কবীন্দ্র ; বেং গং, পৃষ্ঠি ৭৯ পত্র ।

এটরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায় । যে সময় অবধি গান আব কবিতার অধিকার পৃথক্ হইয়াছে, সেই সময় হইতে কবিতায় যতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছে ।

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অনুকরণে, তাহা বলা নিম্প্রয়োজন । যদি আদি হইতেই বাঙ্গালা পয়ারে চতুর্দশ অক্ষর থাকিত, তবেও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পার্শ্বীয় বয়েং খুঁজিতে হইত ! এক অক্ষর হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে ; সুতরাং বাঙ্গালা ছন্দের কাঙ্গাল নহে । নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দশ-অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতার দুটি যতিও বাঙ্গালার মত ।

“ফুল্লং বসন্ততিলকং তিলকং বনালী

লীলাপয়ং পিককুলং কলমত্র রৌতি ।

বাতোব পুষ্প সুরভিমলয়াদ্রিবাতে

বাতো হরিঃ সমধুরাং বিধিনা হতাঃস্ম ।” ছন্দোমঞ্জরী ; দ্বিতীয় স্তবক ।

পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিথিল, এই প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাত
বহুদূর খুঁজিতে হইবে না । বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ
শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের ‘দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল ।
ল্যাটিনও ঐকম কারণেই মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট হইয়াছিল ।* শব্দরের
‘অর্থমনর্থ’ ও জয়দেবের,—

“বসতি বিপিন বিতানে, তাজতি ললিতধাম ।

লুঠতি ধরগীতলে, বহু বিলপতি তব নাম ॥”

প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার
প্রথা সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই । প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার
প্রথা প্রচলিত ছিল । প্রাকৃত “চরণগণবিপ্ল, পচম লইথপ্ল” বা “সত্তা
দীহা জাণেহৌ, কধা তিগ্ধা মাণেহৌ”† ও জয়দেবের ‘রতিসুখ সারে, গতম-
ভিসারে’ প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া
থাকিবে । লঘু ত্রিপদী, লঘু চোপদী ইত্যাদি প্রকার ভেদে নূতন ছন্দ
উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই, কেবল সংস্কৃতের অনুযায়ী পদবিন্যাসের
কৌশল দৃষ্ট হয় । সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত প্রকার ও সে ভাষার অসীম
ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী ঝিগুকে সৈঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র ।

* “But the Latin language abounds so much in consonances, that those who have been accustomed to write verses in it, well know the difficulty of avoiding them, as much as an ear formed on classical model demands ; and as this jingle is certainly pleasing in itself, it is not wonderful that the less fastidious vulgar should adopt it in their rythmical songs.” Hallam’s History of the European Literature, Vol. I. P. 32.

† পিঙ্গল ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৌদ্ধ-যুগ ।

(১) মাণিকচাঁদের গান (২) গোবিন্দচন্দ্রের গান

(৩) ডাক ও খমার বচন ।

৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ ।

বৌদ্ধ-ধর্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে । যে

বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ । অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপ-

ঙ্করকে পাঠিয়াছিলাম, উহা ভারত ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায় । জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে কত শত বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ-দেব-স্তোত্র যেন বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হয় নাই । বাঙ্গালায় হিন্দু-গ্রন্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে । ছএকজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে, যেন অনিচ্ছাক্রমে । প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসা দেবী ও দক্ষিণরায়ে বন্দনাসূচক স্তোত্র অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু বাহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে এক অপূর্ণ উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, বাহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-সংযম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নাই । পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গোড়ায় অত্যাশ্চর্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারণ, এই জন্তই সেই সকল

ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিষ্ণুবিগ্রহপূজা ও তুলসীপত্র স্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন।* শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্মূল করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন, এই ভাবের অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে আরও পাওয়া যায়।

কিন্তু এই বঙ্গদেশেও এক সময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল; সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউএনসাঙ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বর্তী প্রদেশ সমূহে ১১৫০০ বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন; উক্ত সংখ্যক পুরোহিতের অনূন এক কোটি শিষ্য থাকিবার কথা, এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম চিহ্নমাত্র না রাখিয়া নিমুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পালরাজ্যগণের সময়েও বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, উহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধ ধর্মের বিলয়োগ্রুথ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ১৬০৮ খৃঃ অন্ধে তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ এতদ্দেশে উক্ত ধর্মের কথঞ্চিৎ প্রোচুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। মগধের জনৈক কায়স্থ ১৪৪৬ খৃঃ অন্ধে একখানি বৌদ্ধপুঁথি নকল করিয়াছিলেন; উহা কেশ্বিজ নগরে রক্ষিত আছে। এইরূপ অনেক-

“বেদবিনিমিত্তা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।

ন স্পৃশ্যৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্কয়েৎ॥”

কুলাৰ্ণবভট্ট।

গুলি বৌদ্ধ-ধর্মসংক্রান্ত পুঁথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। চুড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব লেখকগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের আয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; চৈতন্যের সময়ে সপ্তগ্রামনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বণিক বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন সমস্ত জগৎ দুঃখসাগরে মগ্ন, তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না। একথা বৌদ্ধদিগেব। প্রচলিত ‘কুন্তিবাসী’ * রামায়ণে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় আছে। *

কিন্তু ভগ্ন ‘স্তুপ’ রাশি, গলিত পুঁথি-পত্র এবং জয়দেবের স্তোত্র ব্যতীত কি সাক্ষ্য সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মের এদেশে আব কোন পরিচয় নাই ? চট্টগ্রামেব সুদূর প্রান্তে এখনও সে ধর্ম কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে কি সত্য সত্যই তাহা তিরোহিত হইয়াছে ? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অল্পদিন হইল এক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক ডোম, পোদ ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে ‘ধর্মপুজা’ প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি এবং এক প্রকার রূপান্তর। এই ধর্মের পুরোহিতগণও নিম্নশ্রেণীর ; ধর্মের মস্তেব এক চরণ এইরূপ “ভক্তানাং কামপুরঃ স্তবনরবরদং চিন্তয়েৎ শৃঙ্গমূর্তিঃ”—

• রঘুরাজা এক ব্যাপারোপলক্ষে “ব্রাহ্মণেরে দিলেন যতেক ধন ॥ অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে । মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে ॥”

এই ভাবের দানশীলতা, আমাদেরকে মহারাজ কনিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজসুগণের “ভিক্ষু” হওয়ার প্রসঙ্গ মনে করাইয়া দেয়। বাস্তবিকের রামায়ণে এ সকল কথা নাই।

এই ‘শূত্র মূর্তি’ শব্দ হিন্দুদেবদেবীর প্রতি প্রণোজ্ঞা নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত ‘শূত্র’ এবং ‘মহাশূত্র’ শব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ‘ধর্মপূজার’ প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত বাইতি-জাতীয় ছিলেন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয় রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্মপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন ; রামাইপণ্ডিতকৃত ধর্মপূজাপদ্ধতির কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্মের পরিষ্কার আভাস আছে যথা :—“ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” (“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরংহস্তিজাতং”) ; শ্রীধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান ।” এতদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মেরই কথা । পরবর্তী কতকগুলি ধর্মমঙ্গলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বৌদ্ধ মহাস্তরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাপদ্ধতিতে সৃষ্টিরহস্তে নাগের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে, ইহাও শেষ সময়ের বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় । ধর্মপূজার মন্দিরেও বৌদ্ধধর্মের নানারূপ লক্ষণ এখনও বিকৃত ভাবে বর্তমান আছে । ধর্মমন্দিরগুলিতে শীতলা দেবীর প্রাতিমূর্তি প্রায়শঃই দেখা যায়, ইহা বৌদ্ধমন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্পষ্টই উদ্ভেক করে ; বৌদ্ধপূজার এক উপকরণ চূণ, ইহা কখনও হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য নহে ; ধর্মপূজায়ও এই চূণ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু পরবর্তী ধর্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কীর্তন দেখিতে পাই, সুতরাং সেই সকল পুস্তক আমরা এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলাম না । ধর্মপূজা বৌদ্ধশাস্ত্রীয় হইলেও উহার পূজকসম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া জানেও না ও উক্ত নামে অভিহিত হইতে স্বীকৃত হইবে না । পরবর্তী ধর্মমঙ্গলগুলি ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব প্রদর্শন চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয়

নাই। এস্থলে বলা উচিত যে বৌদ্ধধর্মের নানা কথাই অলঙ্কিত ভাবে হিন্দু শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অনিবার্য। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ শুধু রামাই পণ্ডিতের পুঁথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গালা পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতেও সম্প্রতি ঐরূপ শূন্য বাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের পূর্বোক্ত পরিচয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একবারে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই বঙ্গভাষায় কতকগুলি নীতিহীন ও স্ততি গীতি রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে উল্লি-

খিত আছে—“যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।

বৌদ্ধযুগের অপরাপর
নিদর্শন।

ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।” কোন রাজার

তিরোধানের অবাবহিত পরেই তদুদ্দেশ্যে

লৌকিক স্তাতিবাজক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক, উক্ত রাজন্যবর্গ মুসলমান আগমনের পূর্বে এতদ্দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন,—এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী ৩ তাহার পূর্ব সময় হইতে যে প্রাপ্ত প্রাশংসা-গীতি সকল বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) মাণিকচাঁদের গান।

বিজয়র গুপ্তারসন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটি'র জারিয়ালে মাণিকচাঁদের গীতিশীর্ষক একটি কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেই

প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলেন, মাণিকচাঁদ
সময়-নিরূপণ।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে আমরা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়া-ছিলাম, যে মাণিকচাঁদ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রাজত্ব করিতেছিলেন।

অপরাপর প্রমাণের মধ্যে বিশেষ এই যে মাণিকচন্দ্র রাজার গীতে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে, এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা হিন্দুশাসনকালে প্রচলিত ছিল। এই পুস্তক পাঠ করিয়া মাত্রাবর গ্ৰীয়ারসন্ সাহেব আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে এখন তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার গান মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। সূত্রে বিষয় শুধু অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া এ সম্বন্ধে আমরা এবার নিশ্চিতরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব। মাণিকচন্দ্র রাজার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের গীতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরে লিখিত হইবে। তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলা-লিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন; গোবিন্দচন্দ্র তাহার সমসাময়িক এবং মাণিকচন্দ্র তৎপূর্বে রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তৎসম্বন্ধীয় গীতি রচিত হইবার কথা। অবশ্য এ কথা বলা সম্ভব নহে, যে মাণিকচন্দ্রের বর্তমান গানটি কিম্বা পরবর্তী গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধীয় গীতির আদান্ত খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। দুর্লভমল্লিকরূত গোবিন্দচন্দ্রের গানটি স্পষ্টতই একটি প্রাচীন গীতি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে,--উহার ভাব-গুণি শুধু বজায় আছে, ভাষা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। মাণিকচন্দ্র রাজার গানটি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু উহারও যে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়া গানটি কতক পরিমাণে আধুনিক করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেবরন্দ হইতে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। গ্ৰীয়ারসন সাহেব বলেন, ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাবনিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত

হইয়াছে । প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অপেক্ষাকৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও সহজ বাঙ্গালায় রচিত দেখা যায় ; গীতির প্রারম্ভ বৈষ্ণব-প্রক্ষিপ্তকারীর হস্ত-চিহ্ন-যুক্ত, তাহা গোপন করা যায় না ;*

“ভাবিও রামের নাম চিস্তিও একমনে ।
লইলে রামের ন্যম কি করিবে যমে ॥
অধমে না লৈল নাম জিভের আলিসে ।
অমৃতের ভাণ্ড তনু গরাসিল বিষে ॥
ঠেটে যাতিতে যে জন রামের নাম লয় ।
ধনুক বাণ লৈয়ে রান্ধিত সঙ্গৈ যায় ॥
রামনামের নোক। থান শ্রীগুরুকাণ্ডারী ।
দুই বাহু পসারিয়া ডাকে আস পার করি ॥

এই রচনার পরেই,—

গুইয়া রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই ।
যাকে বলিলেই সিদ্ধি পাই ॥
মাণিকচাঁদ রাজ। বজ্র বড় সতি ।
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি ॥
দেড়াবুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায় ।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥
এত মাণিকচন্দ্র রাজ। সক্ষয় নলের বেড়া ।
একতন বেকতন করি যে পাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া ॥
বিনে বান্ধি নাহি পিন্দে পটের পাছড়া ।”

সুতরাং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শাখায় বট-বৃক্ষ-সংলগ্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ন্যায় জড়িত হইয়া আছে : তাহার। সে স্বতন্ত্র বস্তু, সে বিষয়ে দৃষ্টিমাত্রই সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

* উদ্ধৃত অংশগুলিতে যে সব কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ পাওয়া যাইবে, তাহার অর্থ পরে দেওয়া গেল । পাঠক তাহার সাহায্যে উহা বুঝিতে পারিবেন ।

এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের । অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য ধর্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ময়নামতী “ধরম শরণ করিয়া” গঙ্গাতীরে “ধর্মের

খান (ধর্মের স্থান) প্রস্তুত করিতেছেন ।
 মাণিকচাঁদের গানে (৩২ শ্লোক) । রায়তদিগকে শিবঠাকুর
 বৌদ্ধ-প্রভাব । “জীউ জীউ রায়ত ধর্ম দিউক বর” (২৩ শ্লোক)

বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন । আধুনিক হিন্দুগণের পূর্বপুরুষগণই অনেকে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মভেদ হেতু তাঁহারা আমাদের সহানুভূতি ও ধর্মসংস্কার হইতে, চীন ও জাপানবাসী-দিগের ত্রায় সম্পূর্ণ দূরবর্তী হইয়া রহিয়াছেন । তাই মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিল-বিন্দুর ত্রায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর ত্রায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেই পক-বিদ্য, দাড়িষ, কদম্ব, পদ্ম-পলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই । গ্রাম্যগীতগুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে, রূপবর্ণনার সহিত ইহারা প্রাচীন সাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত, এস্থলে সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, সর্বত্রই এই যোগ মণিকাঞ্চনবোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই । কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপবর্ণনায় বুদ্ধ বাস, বান্ধীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই । সেগুলি সংস্কৃত প্রভাবশূন্য ; এবং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয় । দ্বীপ দর্শনপংক্তি অতি শুভ্র, গোপীচাঁদ সোলাংর সঙ্গে তাহার উপমা দিতেছেন, সংস্কৃতের অজ্ঞতা হেতু দাড়িষবীজ কি মুক্তাপংক্তির কথা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই । স্থলে স্থলে দু'এককথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতি-বিশ্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাড়িষ কদম্বাঙ্কুর রূপবর্ণনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন । হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে জানাইল ;—

“যেমন রূপ আছে রাজার চরণের উপর

তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর।”

জীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ত ৮০ মণ তৈলপূর্ণ স্নুহং লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, ইহা হিন্দুজগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিব কম্পিত, যমপুরে যম লুঙ্কায়িত। ময়নামতী দেব-বৃন্দকে দারুণ লাঞ্ছনা করিতেছেন, গোদা যম জাহি জাহি ডাকিতেছে; এসকল কথায় কেমন একটা বিজাতীয় ভ্রাণ আছে, উহা হিন্দুর ঘরের কথার মত বোধ হয় না। ইতিহাসে পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ অতীশ* (দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মন্ত্রাদির চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন,— বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব মাণিকচাঁদের ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। হাড়িসিদ্ধা ইন্দ্রকে ডাকিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছেন, অশ্বরাদিগকে অন্ন বাঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চণ্ডাল। বস্তুতঃ এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহা আমরা আরব্যোপাখ্যানের গল্পের আশ পাঠ করিয়াছি। অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলে ও কবিকঙ্কণ-চণ্ডী হইতে ভারতের অনন্দা-মঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা ভিন্নরূপ। সেগুলির

* “In 1042. The famous Atish, native of Bengal came to Tibet. He wrote a great number of works which may be found in the Bstanhgyur and translated many others relating principally to Tantrik theories and practices.”

পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সেগুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাৎ শুধু মন্ত্রশক্তি । গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে হাড়ি সিদ্ধার ইষ্টদেবতা গোরকনাথ ও জনৈক নেপালী বৌদ্ধ-সাধু । বৌদ্ধ জগতের এই সংগীত বোধ হয় এতদিন লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রাক্ষিণ্য অংশ গুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে ঐ গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ ।

এই গীতে বাঙ্গালীহৃদয়ের একটি কথা আছে, শুধু সেই স্থানে আমরা জাতীয় ভাবের তত্ত্ব খুঁজিয়া পাঠি ।
কবিত্বের নমুনা ।
বাঙ্গালী কবির রচনায় আত্মনির্ভরের ভাব ও বিক্রমপ্রকাশ কোন কালেই বেশী প্রশংসনীয় হয় নাই । যেখানে বাঙ্গালী কবি বীরত্ব বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেখানে বাঙ্গালার ব্যঙ্গ—কবি ভাগ্যতউদ্ধার কাব্যের আশ্রয় তীক্ষ্ণ শ্লেষ দ্বারা বঙ্গবীরের যুদ্ধাজ্ঞগুলিকে একটি পটকার ধূমে পর্যাবসিত কারবার সুবিধা পাইয়াছেন । কিন্তু বাঙ্গালী যে প্রেমিক, প্রত্যেক কাব্যেই তাহার আভাস আছে । গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হঠাতে উদ্যত, তাহার স্ত্রী তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, ভাষা জটিল ও গ্রাম্য হইলেও সেই স্থলে একটুকু স্বাভাবিকত্ব আছে । গ্রীয়ারসন সাহেব সেই স্থলের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন ।

“না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশাশ্রয় ।

কারে লাগিয়া বান্ধিলাম সীতল মন্দীর ঘর ॥

বান্ধিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড় কালী ।

এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার কথা গাবুরাণী ॥

নিম্নের স্বপনে রাজা হব দরিসন ।

পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নান্দ্র প্রাণের ধন ॥

দস গিরির মাও বইন রবে আমি লইবে কোলে ।

আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে ॥

খালীঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা ।
 বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও ।
 আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও ॥
 জীয়াব জীবন ধন আমি কন্তা সঙ্গে গেলে :
 রাঁধিয়া দিমু অন্ন জুথার কালে ॥
 পিপাসার কালে দিমু পানী ।
 হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী ॥
 আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু ॥
 গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্ত্রাম বলিমু ॥
 সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও ।
 হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥
 হাত খানি দুঃখ হঠলে পাও খানি যাতিমু ।
 এ রঙ্গর কোতুকর বেল। স্ততি ভুঞ্জিমু এস্ততি ভুঞ্জাইমু ॥
 গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাথার বাও ।
 মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও ॥

গোপীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছে,—

কে কষ এগুলি কথা কে আর পইতায় ।
 পুরুষের সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায় ।
 ওগুলো কথা বুটমুট পালাবার উপায় ॥
 খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর ।
 নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্ত্রামির পদতল ॥
 তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা ।
 রান্ধা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥
 যখন আছিহু আমি মা বাপের ঘরে ।
 তখন কেন ধর্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে ॥
 এখন হইহু রূপর নারী তোরে যোগ্যমান ।
 মোক ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ ।”

(২) গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গোবিন্দচন্দ্রের গানটি ছন্দভঙ্গিমূলক নামক জটিল গ্রাম্য কবির রচিত, রচনা এই গীতে বৌদ্ধ-প্রভাব । অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন একটি গানের শুদ্ধ সংস্করণ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । এই গীতি হইতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায় । ছইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া গিয়াছে ;—“স্ববর্ণচন্দ্র মহারাজা খাড়িচন্দ্র পিতা । তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ।” এই মাণিকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ নাম ময়নামতী ও পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র এবং ইঁহাদের রাজধানী পাটাকা নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য ষোল দণ্ডের পথ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হইতে তাঁহার রাজবৈভবের ইয়ত্তা করা যাইতে পারে, সেকালে কয়েক গ্রাম অন্তরই এক একটি রাজ-চক্রবর্তী মিলিত । ছন্দভঙ্গিমূলক রূপে এই গানটি যদিও নবভাবে সংস্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইহার আদাস্ত বৌদ্ধ-ভাবচিহ্নিত, স্মৃতির ভাষা ভিন্ন ইহাতে আর কিছু পরিবর্তিত হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে ।

প্রথমেই ‘ধর্ম’ বন্দনা করিয়া গীতিটির সূচনা করা হইয়াছে, তৎপরেই হাড়িপা, কালুপা প্রভৃতি “জ্ঞানীবৃন্দের” বন্দনা করা হইয়াছে, ইহার ডোম জাতীয় বৌদ্ধাচার্য্য । এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, শিশুপা প্রভৃতি বৌদ্ধ-পুরোহিতগণেরও উল্লেখ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে । হাড়িপা ডোম হইলেও ময়নামতীর আদেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাহাকে গুরুস্বরূপ বরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন,—গীতিনিহিত ধর্ম্মকথা ও উপদেশগুলিও বৌদ্ধভাবপূর্ণ । ময়নামতী যোগী বেশধারী রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে কিস্তাসা করিতেছেন :—

“কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার ।
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার ॥
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ ।
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ ॥”

হাড়িপার প্রসাদে রাজা উত্তরে বলিতেছেন :—

“শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি ।
“আপনি জল হইল আপনি আকাশ ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগত প্রকাশ ॥”

বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ ও নাস্তিকতা যে প্রাচীন গ্রাম্য-কবির অমার্জিত গীতি হইতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা বোধ হয় সাহিত্যসেবিগণের আশাতীত ছিল । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত বন্দে বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কার-তত্ত্ব প্রাচীন গাথাগুণির দ্বারা বিশেষরূপ প্রমাণিত হইতেছে । রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন প্রকৃত ধর্ম কি, হাড়িপার উত্তর চিরপরিচিত বৌদ্ধ নীতিব পুনরাবৃত্তি মাত্র ,

“রাজা বলে কোন ধর্মে সবলোক তরে ।
ইহার উত্তর শুক আজ্ঞা করে মোরে ।
হাড়িপা কহেন বাচা শুন গোবিন্দাই ।
অহিংসা পরম ধর্ম যার পব নাই ॥”

এই গীতিতে বিশেষ কোন কবিত্বের পরিচয় নাই, মাণিকচন্দ্র রাজার গানের ন্যায় ইহাতেও মন্থ শক্তির নথেষ্ট পরিচয় আছে, এই অদ্ভুত গানে ভোমবর্গ ব্রাহ্মণগণ হইতে বেশী সম্মান লাভ করিতেছেন, ও অধিকতর ক্ষমতা দেখাইয়া রাজচক্রবর্তীর মুকুটালঙ্কৃত শিবে পদধূলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন, কবিত্বের হিসাবে না হইলেও বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ বলিয়া ইহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে ।

গোপীচাঁদকে তাঁহার স্ত্রী সঙ্গে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুনয়

প্রেরণা করিয়াছিলেন, সে স্থানটি উদ্ধৃত
হইয়াছে, সন্ন্যাসী গোবিন্দচন্দ্রের রাণীও

তদ্রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন । আমরা সে স্থানটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম,

হ্রস্বভ নল্লিকের গান অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ এবং পূর্ববর্তী গাথাটির সঙ্গে তুলনা করিলে,—ইহার ভাষা অনেক আধুনিক,—উদ্ধৃত দুইটি স্থান পাশাপাশি রাখিলেই পাঠক ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । ভালবাসা-রূপ মহাবীণাযন্ত্রের তন্ত্রীতে করস্পর্শ করিতে যে বঙ্গের অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবি ও সুদক্ষ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে—

“অভাগী উছন্যারো রাজ। সঙ্গে করি লহ ।

দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥

তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী ।

রাঙ্গিয়া বিদেশে যোগ্য হইব অন্ন পানি ॥

বসিয়া থাকিহ তুমি বনের তিতরে ।

আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥

* * * *

নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন ।

তুষা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥

বনে বনে কাটা ভাঙ্গি জালিব আঙুলি ।

স্থখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনীতু ॥

সকল ছুংথ পাশরয়ে নারী যার পাশে ।

আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে ॥

* * * *

না ছাড়া না ছাড়া মোরে বঙ্গের গোসাঞি ।

তোমার বিনে উছনা থাকিবে কোন্ ঠাঞি ॥

নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ ।

শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥

* * * *

রাজা বলে উছনা আমার হইল কাল ।

বাইব গুরুর সঙ্গে না কর জঞ্জাল ॥

হায় হায় কর্যা রাণী ধুলায়ে লুটায় ।
 উছনার রোদনে পাঁষাণ গলা যায় ॥
 কান্দয়ে নগরবারী রাজা পানে চায় ।
 বাল বৃদ্ধ যুব কান্দে আর শিশু মায় ॥
 রাণীর জন্মনে নদী উথলে সাগর ।
 পাইসালে কান্দে অথ যতক কুঞ্জর ॥
 সারি শুয়া পক্ষী কান্দে না করে আহার ।
 দাসীগণ কান্দে রাজার করি হাহাকার ॥
 ~~~~~  
 থসাইয়া পেলে হার কেবু ব কঞ্চণ ।  
 অভিমানে দূর করে যত অভরণ ॥  
 পুঁছিয়া ফেলল সব সিঁথার সিন্দুর ।  
 নাকের বেসর পেলে পায়ের নুপুর ॥  
 রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কন্তুল ।  
 মোরা সঙ্গে যাব রাজা দেশান্তরে চল ॥ -

এই দুইটি গীতি ছাড়া আমরা আরও কিছু রচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করিব ।

### ( ৩ ) ডাক ও খনার বচন ।

এই সকল বচন রচনার সময় বুদ্ধের প্রভাব স্বল্পদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না । ইহাতে পুষ্করিণীখনন, বস্তুনিষ্কাশন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকার-জনক ধর্ম যে অবশ্যপালনীয়, তাহা অনেকবার নির্দ্বারিত আছে, \* কিন্তু একটীবারও হরি কি অন্ন

\* “ধর্ম করিতে যবে জানি ।

পোখরি দিয়া রাখিব পানী ॥

গাছ রুইলে বড় ধর্ম ।

মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ॥

দেবতার নাম লইবার সূত্র গ্রন্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিকচাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্ত কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্ত সেগুলি ভাষার আদিমতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচনগুলির \* ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

যে দেব ভাত শালী পানী শালী ।  
সে না যায় যুগ্মের বাড়ী ॥  
স্বর্ণ ভূমি কস্তা দান ।  
বলে ডাক স্বগে স্থান ॥”

স্থানে স্থানে চার্কাকের সূত্রও প্রচারিত দেখা যায়, যথা—

“ভাল সব যখন পাব  
কালিকারে তুলিয়া না খোব ।  
দধি তৃষ্ণ করিয়া ভোগ  
ঔষধ দিয়া গণ্ডাব রোগ ॥  
বলে ডাক এই সংসার  
আপনা মইলে কিসের আর ॥”

ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে “ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস” তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরুপত্নী। বন ত \* ‘ঈশ্বর’ শব্দের এক নাম, স্তত্রাং ঈশ্বরের স্ত্রী ‘ভবানী’কে বুঝাইতে পারে।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পবে জানা গিয়াছে, নেপালে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণদ্বারা সুরক্ষিত, সংস্কৃত টিপ্পনসংযুক্ত ‘ডাকার্ণব’ পুস্তকে বঙ্গীয় ডাকের বচনসমূহ উদ্ধৃত আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত ডাকের বচনের ভাষাপেক্ষা সেগুলির ভাষা জটিল। এই পুস্তক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহার মতে ‘ডাক’ শব্দ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ ও একার্থবাচক; যেরূপ ডাকিনী মহাদি দৃষ্ট হয়, ডাকের বচনও সেই শ্রেণীর। বৌদ্ধদিগের দ্বারা এই পুস্তক সম্বন্ধে রক্ষিত হইতেছে, স্তত্রাং ঐ সমস্ত বচন যে বৌদ্ধযুগীয় তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

\* বেণীমাধব দত্ত সংস্করণ, ১২৯৫ সাল।



- ( ১ ) বুদ্ধা বৃষ্টিয়া এড়িব লুণ্ড ।  
আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড ।
- ( ২ ) আদি অন্ত ভুজ্জসি ।  
ইষ্ট দেবতা যেহ পুজ্জসি ।  
মরণের যদি ডর বাসসি ।  
অসম্ভব কভু না থাকসি ॥
- ( ৩ ) ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি ।  
তাতে দিও নানা শালি ॥
- ( ৪ ) ভাষা বোল পাতে লোপি ।  
বাটালব বেলি পড়ি সাপি ॥  
মধ্যস্থে যবে সমাধে স্থায় ।  
বলে ডাক বড় স্থপ পায় ॥  
মধ্যস্থে যবে চেমারি বুদ্ধে ।  
বলে ডাক নরকে পচে ॥

ডাক নামক জনৈক গোঁপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে । সে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের  
ডাক ও গনার বচন সম্বন্ধে  
নস্তুব ।

লীলাবতার ভট্টাচার্য, সেই বংশে বঙ্গের  
সক্রেতিস ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু  
অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জিনীব ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গলায়  
নীতি ও জ্যোতিষতত্ত্ব সংকলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর  
একটুকু বেশী । ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি  
বিকীরণ করিতেছেন । তাঁহাদের জীবনের উদয় অস্ত, পরিতাপমাণ  
কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত ; আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে  
পারিলাম না । কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে  
তাঁহাদের সন্তোষার্থ বিবিধ সদলুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজিয়া বাহির  
করিবেন ।

বোধ হয় বঙ্গভাষা ক্ষুরণের এইগুলি প্রাক্-চেষ্টা ; ভাষা ও ভাব

দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০—১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এইসব বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজাকারে পরিণত হইয়াছে । উহার একজাতির সম্পত্তি ; হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে । কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না । কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন বঙ্গীয় রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানেও সেইরূপ সকালে ডাক ও খনা নামধেয় প্রকৃত কিম্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন ।

এই সব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহার কঙ্কাল-সাব সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির কবে নাই, স্মরণ্য সাহিত্য-সেবিদিগেব প্রীতিকর হইবে কি না জানি না । অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে, বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ সব বচনের ছুহুত্রে তাহা আছে,—উহার এতদূর সত্য যে রেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত কষিয়া দেখ,—কবে মিলিয়া যাইবে ।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী । খনা ক্লষক ও গ্রহাচার্য্যেব নজির । ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র-খনা ও ডাকের বচনে প্রভেদ । তন্ময় কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী । আমরা নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত কবিত্তেছি ; বাঙ্গালী পাঠক, আপনারা হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, এগুলি তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে ।

(১) পাটে খাটায় ল'ভের গাঁত ।

তার অর্দ্ধেক কাঁখে ছাতি ॥

“ ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্য হইতে পারে । “এখনও ডাকের কথায় বনে” প্রভৃতি কথায় কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয় ।

- ঘরে ব'সে পুছে বাত ।  
তার ভাগ্যে হাভাত ॥\* খনা ।
- ( ২ ) খনা ডেকে বোলে যান ।  
রোদে বান ছায়ায় পান ॥
- ( ৩ ) নীতাব নারিকেল, বগিলের বাশ ।  
কমে না বাড়ে না বারমাস ॥ খনা ।
- ( ৪ ) দিনে রোদ, রাত্রে জল ।  
তাতে বাড়ে ধানের বল ॥  
কাঠিকের উনজলে ।  
খনা বলে ছল ফলে ॥
- ( ৫ ) ঘরে আশা বাইরে রাখে ।  
অন্ন কেশ ফুল, ইষা বাধে ॥  
যন ঘন চাষ উলটি ঘার ।  
ডাক বলে এ নারী ঘর উজার ॥
- ( ৬ ) মিয়র পোথরি দূরে যায় ।  
পথিক দেখিয়ে আটড়ে চাষ ॥  
পর সম্ভাষে বাটে থিকে ।  
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥
- ( ৭ ) রাঁবে বাড়ে গাষ না লাগে কাঁঠি ।  
অতিথি দেখিয়া মরে লাঞ্জে ।  
তবু তার পুজার সাজে ॥  
শ্রীলা শুদ্ধ বংশে উৎপাদি ।  
মিঠা বে'ল স্বামীতে ভকতি ॥  
রোদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে ।  
খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে ॥  
কাখে কলসী পানীকে যায় ।  
তেট মুণ্ডে কাকহো না চায় ॥

“বাগিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ” ডুলনা করন ।

যেন যায় তেন আইসে ।

বলে ডাক গৃহিণী সেই সে ॥

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার সূচনা হইয়াছিল, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা । ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না । প্রতি বনে বন-কুসুম প্রতি মেঘে তারাপংক্তি, তাহারা ত কত সুলভ ! কিন্তু তাহাদের মত সুন্দর কি ?

এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয় ।

এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বচনগুলিতে গৃহস্থালি-জ্ঞান ।

বিলাত হইতে বুলি কিনিয়া আনিতে হইবে ।

কিন্তু যখন ঐসব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ডালরূপ গৃহস্থালী জ্ঞানিত ও পরমুখ্যাপেক্ষী ছিল না । কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, প্রৌঢ় বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সন্দের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এসব বচনে প্রচুর আছে । কৃষক জানিত, জৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্ত ধরায় আঁটে না । আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বত্কা হয় । ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাণ্ডন দ্বিগুণ হয় । “ধাত্তের খোর জন্মিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীঘ্র জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীঘ্রভরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই কাটিবান উপযুক্ত হয় । অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না ।”\* এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাঁধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা

\* ধনার বচন, ত্র্যোতিষরত্নাকর ।

পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিবিস্তৃত তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহবিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমরা এতদূব স্বাবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে ভূমি এবং তত্ত্বপন্ন শাস্ত্রাদি সংক্রান্ত অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর বুদ্ধিটুকু একবাবে লম্পট হইয়া বাইতেছে। এই দুর্দিনে তাই এই সব বচন-গুলি বড় প্রিয় বোধ হয়।

কিন্তু এই সব বচনের আশার দিক্ আছে। দৃষ্ট হইবে, বান্দালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিক্‌টিকর জ্যোতিষে অচলা ভক্তি, ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাকাব ভয়ে, বুজোব ভয়ে স্নীষ কুঁটীবে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ কবিতা বঙ্গীয় বীর পাজিব দোহাই দিত; তাহারা কান্ধমুখে জ্যোতিষের বার্তা শুনিয়া কার্শোর ফলাফল নিকপণ করিত। এই অপূর্ণ একদার্শের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

শব্দ—ফল

ক ক—কলাগলাভ

কঃ কঃ—রাজোপভব

করকং করকং—বহুজনেব সহিত সাফাং।

কেতংকেতং—রত্নহানি।

করকো করকো—কলহ।

কোলো কোলো—নিফল বা ক্ষতি।

কোয়ং কোয়ং—রাজা বা প্রভু বিনাশ।

ক্রেং ক্রেং ক্রেং—দ্রবলাভ।

কংকং কংকং—শবদর্শন ইত্যাদি।

জ্যোতিষবত্নাকর, ৪৪৫ পৃঃ।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,—সংসারক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে জাতি একপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষুধা কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই ঐ সব

বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অত্ৰদিকে তাহা-  
দিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই ।

কিন্তু শঙ্কর প্রণেদিত হিন্দুধর্মের চেউ বঙ্গে প্রবেশ কবিল—অনড়  
টলিয়া ; বাহা নড়ে না, তাহা নড়িতে শিখিলে দৌড়ায় । বে বঙ্গদেশের  
প্রতিভ কুসংস্কারে ও জড়তায় মলিন ও নিম্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা  
কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাড়া বদনা বহুযুগ-সাক্ষিত কুসংস্কারের স্তূপচ্ছেদন  
কবিত্তে দাঁড়াইল । আমরা পবনপুত্রী অব্যায়গুণিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক  
বিকাশ দেখাইব

আমরা ‘বৌদ্ধ যুগের’ রচনার সোমসব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, ১১ম্নে  
অপ্রচলিত শব্দার্থ, তাহার তালিকা দিলাম ।

এই সব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল ও তা বসিতে পারি না । কোন কোন  
শব্দ কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থ তাহা ব্যবসৃত হইয়াছে  
বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই দিয়াছি । একই শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য  
করিলে, তাহার প্রকৃত অর্থ বোঝ হয় না । ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক,  
তাহা বঙ্গদেশের সকল প্রচলিত ছিল বলিয়া বোঝ হয় না । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের  
শব্দার্থ-বোধ-সৌকর্য্য কোন অভিধান এখনও রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচনা  
আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে । অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ের ত্রায় বাঙ্গালা চলিত ও অপ্রচলিত শব্দের  
অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে জনৈক কৃতনিদা সাহেবই সর্বপ্রথম চেষ্টা করিলেন । স্ত্রাব  
গ্রেভন্, সি, হক্‌সন মহোদয়ের বাঙ্গালা অভিধান ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত  
হয়, এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই প্রণীর অভিধান বাঙ্গালায় আর বিরচিত  
হয় নাই । আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কপকিং অবতারণা করিলাম মাত্র । এস্থলে  
বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ‘পত্র’ ও ‘নন্দিনী’ শব্দের অর্থ লইয়া ‘সাধনা’  
পত্রিকায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রাচীন  
অপ্রচলিত শব্দার্থের ককিং চর্চা করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত জগদ্বরু ভট্ট মহাশয় তৎকৃত  
বিদ্যাপতি ও চণ্ডাদাসের সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শব্দার্থের তালিকা দিয়াছিলেন, ও  
তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ‘রজনীকান্ত’ ও ‘মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়  
বিদ্যাপতির পদসমূহের দুইই শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ-তালিকা’ প্রকাশিত করিয়া-  
ছিলেন, সম্ভ্রুতি পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎসম্পাদিত চৈতন্য ভাগবতের টীকায়  
এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎসম্পাদিত কুণ্ডবাসী রামায়ণের টীকায় এ সম্বন্ধে  
কিছু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ।

| শব্দ             | অর্থ             | পুস্তকেব নাম । |
|------------------|------------------|----------------|
| অক ...           | উহাকে ..         | মা, চ, গা ।    |
| অচুম্বিতের ...   | আশ্চর্য্যেব ...  | ঐ              |
| অফিগ্না ...      | বাহা উৎপাটিত     |                |
|                  | হষ নাহ ...       | ঐ              |
| অবুধ ..          | বুদ্ধিশূন্য ...  | ডাক ।          |
| আট্টাট্টাউ ..    | হাবুড়বু ..      | মা, চ, গা ।    |
| আউ .             | জানু ..          | ঐ              |
| আউদা ..          | সিদ্ধ ব্যক্তি .. | ঐ              |
| আউড়ে ..         | বক্রভাবে ...     | ঐ              |
| আং ...           | বব ...           | ঐ              |
| আধাবা ..         | খাদ্য ...        | ডাক ।          |
| আপহব ...         | পাহাবা ...       | ঐ              |
| আপ্ত ...         | আপন ..           | মা, চ, গা      |
| আছিল ..          | উপস্থিত ..       | ঐ              |
| আইদা পাতাব... .. | বৃহৎক্ষেত্র ...  | ঐ              |
| আবিবল ..         | আয়ু ...         | ঐ              |
| আসা নড়ি ...     | হাতেব লাঠি ..    | ঐ              |
| একতন যেকতন       | যে কোন প্রকারে   | ঐ              |
| একলা ..          | এক ...           | ঐ              |
| এলায় ...        | এখন ...          | ঐ              |
| উকা ...          | অগ্নি ...        | ঐ              |
| উলী ...          | কুশল ...         | ডাক ।          |

আধার শব্দ পূর্বে মনুষ্যের খাদ্যও বুঝাইত ; এখন ইহাব অর্থ সৌম্যবদ্ধ হইয়া শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝায় ।

| শব্দ      | অর্থ               | পুস্তকের নাম ! |
|-----------|--------------------|----------------|
| কা        | কাক ...            | খনা ।          |
| কাউ       | কাক ...            | ঐ              |
| কাউশিবার  | তাগাদা করিতে       | মা, চ, গা ।    |
| কাতি      | কালী ; কার্তিক মাস | ঐ              |
| কাজী      | ছোট ...            | ঐ              |
| কোনটি     | কোথায় ...         | ঐ              |
| কোটেকার   | কোথাকার ...        | ঐ              |
| কুশলানা   | মঙ্গলাকাজী ...     | ডাক ।          |
| কৈতর      | পায়রা ...         | মা, চ, গা ।    |
| খপবা      | কুটার ...          | ঐ              |
| খোচা      | তৃণ পল্লব ...      | ঐ              |
| গাভুর।    | যুবক, বলশালী... ‘  | ডাক ।          |
| গাবুরাণী† | যৌবন ...           | মা, চ, গা ।    |

এখনও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ।

† বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত ।

গ্রীয়ারসন গাবুরাণী অর্থ করিয়াছেন “bride-hood” এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্নালে ১৮৭৮ প্রথম সংখ্যা ৩য় খণ্ড ২১৩ পৃঃ দেখ । কিন্তু পূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে গাভুর, গাভুরাণী, উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও যৌবন বুঝায় । পাঠক এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত স্থলে গাবুরাণী শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে । এষ্ট শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন,—With reference to the word “Gaburani” about which I wrote to you the other day, I have since found out that the word “Gabur” is very common in Chittagong. It means “young” also “a boy” hence “a servant”. The word “Gaburani” therefore means “youthfulness,” and has the same meaning as ‘yauvana.’ It has nothing to do with the Sanskrit “Garva ”



| শব্দ            | অর্থ               | পুস্তকের নাম |
|-----------------|--------------------|--------------|
| গিরি            | গৃহ                | মা, চ, গা    |
| গোবিন           | গভীর               | ঐ            |
| গোধলা           | গোময়              | ডাক ।        |
| ঘরজুয়ান        | চিরবোবন            | মা, চ, গা ।  |
| চতুরা           | চতুর্দার           | ঐ            |
| চাম্বর          | চামর               | ঐ            |
| চরিরচর          | চরির উপায়         | ঐ            |
| ছামুর           | সম্মুখের           | ঐ            |
| ছুছু            | শূন্য              | ডাক ।        |
| জীউ             | জীবন               | মা, চ, গা    |
| জ্ঞাস্তা        | জ্ঞাতি             | ঐ            |
| ঝোলান্স         | ঝুলি               | ঐ            |
| ডাঙ্গ*          | কাটি               | ঐ            |
| ডারিয়া         | বাঁধিয়া           | ঐ            |
| ডাঙ্গাইবার      | প্রহার করিতে       | ঐ            |
| ডাঙ্গাডোল       | বহুজনতার শব্দ      | ঐ            |
| ঢেবা ডোর        | ঢোলের দ্বারা ঘোষণা | ঐ            |
| ঢলমল            | ঝলমল               | ঐ            |
| তেতকে           | তত                 | ঐ            |
| তৈল পাঠের খাড়া | পাঠা কাটার ছুরি    | ঐ            |
| দায় †          | ডাক                | ঐ            |

\* হফটন কৃত অভিধানে, ডাঙ্গ শব্দ সংস্কৃত দন্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত, এইখণ্ড উল্লিখিত হইয়াছে ।

† এই দায় শব্দ পূর্বের নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত । মাণিকচাঁদের গান আছে,—

“যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল,  
ঘরর গ্রামক আইল বাপ দায় দিয়া ।”

| শব্দ    | অর্থ              | পুস্তকের নাম ।  |
|---------|-------------------|-----------------|
| দোয়াদস | ... করঙ্গ         | ... মা, চ, গা । |
| দামরা   | ... ঢোল           | ... ঐ           |
| দোন     | ... ছুই           | ... ঐ           |
| থবীরা   | ... স্থবির        | ... ডাক ।       |
| ধরেক    | ... ধরিও          | ... ঐ           |
| ধল      | ... ধবল           | ... মা, চ, গা । |
| নঠ      | ... নষ্ট          | ... ডাক ।       |
| নিন্দ   | ... নিদ্রা        | ... মা, চ, গা । |
| নিতে    | ... বিনা          | ... ঐ           |
| নেওয়া  | ... প্রলেপ        | ... ঐ           |
| নেয়াই  | ... ভ্রায়        | ... ঐ           |
| পঠিতায় | ... প্রত্যয় করে  | ... ঐ           |
| পোখবি   | ... পুষ্করিণী     | ... খনা ।       |
| পাহাড়  | ... পার           | ... ডাক ।       |
| পাকেরা  | ... ঘুরাইয়া      | ... মা, চ, গা । |
| বাবন    | ... ব্রাহ্মণ      | ... ঐ           |
| বাক্রণ  | ... ঝাঁটা         | ... ঐ           |
| বাদে    | ... জন্তু         | ... ঐ           |
| বেনামুখ | ... মুখ ফিরাইয়া  | ... ঐ           |
| বুন্দা  | ... রুষ্টি-বিন্দু | ... ঐ           |

রাজার কাপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের সান্নিধ্যকে বাপ বলিয়া আসিল । অনেক পরে চৈতন্য ভাগবতে পাইতেছি, “অন্তের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন” অর্থাৎ অন্তের কথা চূরে থাকুক ইত্যাদি ।

| শব্দ          | অর্থ                   | পুস্তকের নাম |
|---------------|------------------------|--------------|
| ভুসঙ্গ ...    | ভাস্ম ...              | মা, চ, গা ।  |
| বেআলি ...     | অনৈকা ..               | ডাক ।        |
| মাও ..        | মাতা ...               | মা, চা, গা । |
| মধুকর* ...    | নৌকা বিশেষ ..          | ঐ            |
| মাল্লি ...    | পথা ...                | ঐ            |
| মাড়াল ...    | পথ ...                 | ঐ            |
| মিঠ ...       | মিষ্ট ...              | ডাক ।        |
| মুচ্চল ...    | বাদ্য-বস্ত্র বিশেষ ... | মা, চ, গা ।  |
| মেটে ...      | যে স্থানে ...          | ঐ            |
| যেত্বে ...    | গত ...                 | ঐ            |
| যোগ্যবান ...  | যোগ্য ...              | ঐ            |
| যেনমত ...     | যথম মাত্রি ...         | ঐ            |
| লহড় (লড়) .. | দৌড় ...               | ঐ            |
| সয়ল † ...    | সকল ...                | রা, প ।      |
| সমাধে ...     | বোঝে ...               | ডাক ।        |
| সাধে ...      | সংগ্রহ করে লয় ...     | মা, চ, গা ।  |
| সানে ...      | ইঙ্গিত ...             | ঐ            |
| সরুয়া ...    | সরু ...                | ঐ            |
| সাঁও ...      | সাপ ...                | ঐ            |

\* “মধুকর” নৌকা বিশেষের নাম । পদ্মপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ‘মধুকর’ নৌকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায় ; স্বয়ং সদাগর ‘মধুকরে’ যাইতেন । বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়াছি, এগনও মধুকর অর্থে একরূপ নৌকাকে বুঝায় ।

“একল রামাই পণ্ডিত সয়ল অবধান ॥”

| শব্দ          | অর্থ              | পুস্তকের নাম . |
|---------------|-------------------|----------------|
| সেঁওয়ালী ... | সন্ধ্যাকালীয় ... | মা, চ, গা ।    |
| হীন ...       | শূন্য, বিয়োগ ... | খনা ।          |

এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতির প্রভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি । মাণিকচাঁদের গানে রাজ্য-সংস্কৃতির প্রভাব-হীনতা । ভাল হইলে তাঁহাকে ‘সতী’ এবং ছুঁই হইলে তাঁহাকে ‘অসতী’ বলা হইয়াছে । খনা শনিকে ‘ভানুতনুজা’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । বহু পূর্ক-রচিত মেয়েলী ছড়ায় ‘গুণবতী ভাই’ গুনিয়াছিলাম, সেও বৃষ্টি এই যুগের রচনা হইবে । মাণিকচাঁদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপ ছিল । ‘ঘটন ন। ধশ্বি রাজ। পরদেশক লাগিয়া ।’ ( মা, চ, গা ২২২ শ্লোক ) প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্র লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, অথচ ভূত্যা নেত্রাকে রাণী বলিতেছেন, ‘কেন। কেন নেত্রা আইলেন কি কারণ’ ৪৯ (শ্লোক) মাণিকচাঁদরাজা তাঁহার প্রহারক বমদূতের প্রতি জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, কে মারেন আমারে বিস্তর করিষা’ ( ৭২ শ্লোক ) কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ‘তুমি চাইলেন দুব’ ( ৩০০ শ্লোক ) প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয় ।

এই সময়ে রাজ্যবা সোণার খাটে বাসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন ( ৩০৭ শ্লোক ) ও স্বর্ণ খালে ৫০ বাঞ্জনসহ অন্ত সামাজিক অবস্থা । আহার ( ৪৬৭ শ্লোক ) করিলেও নিত্য জীবন-বাত্মা-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না । ‘ইন্দ্রকম্বল’ ( ৫৫৫ শ্লোক ) ‘দণ্ডপাখা’ ( ২৫৩ শ্লোক ) ও ‘পাটের সাড়ী’ ( ৫৮০ শ্লোক ) শিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল । পর-বর্তী এক অধ্যায়ে দেখিব কৃতিবাস পণ্ডিত গোড়েস্বরের নিকট একখানা ‘পাটের পাছড়া’ পাইয়াই ধন্য হইতেছেন । কিন্তু কবিকঙ্কণ ‘মেঘ ডম্বুর

কাপড়' ও 'জগন্নাথী থান' নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্বেসর সহিত উল্লেখ করিতেছেন \* ও চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট কঙ্কলই মহার্য বলিয়া গণ্য হইতেছে (চৈ, চ মধ্যমখণ্ড, ২০ প)। সে সব এ সময়েরও অনেক পরে। খ্রীস্টের মধ্যে "ইন্দ্রমিঠা" (২২৫ শ্লোক না, চ, গা) নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য উপাদেয় ছিল ও 'বংশহরির গুয়া' (২৫৭ শ্লোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। 'বংশহরির গুয়া খাইয়া' দস্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচাঁদ জ্বরী মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্র-লোকগণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন এবং জ্বীলোকগণ পযাস্ত্র অক্ষকৌড়াসক্ত ছিলেন। জ্বীলোকগণের অক্ষকৌড়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে 'সাদিনা', দশদিন পরে 'দশা', এবং ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব করা হইত।

\* রাজার জন্ম সাধু "নিল জগন্নাথী থান দশ ছোড়া।" ক. ক, চ।  
সাধুর স্ত্রী "বাছিয়া পরিল মেঘডগ্ধর কাপড়।" ঐ

## পঞ্চম অধ্যায় ।

১ । ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ।

২ । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ ।

বঙ্গে হিন্দুশ্রমের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে নিয়োজিত হইলেন । ঐহাদের তর্ক-বুদ্ধি  
ধর্ম্মকলহ ।  
অতীব কোতূহল-উদ্দীপক । গোড়বাসী  
প্রাচীন পণ্ডিত চিবঞ্জীর ভট্টাচার্য্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা চিত্রপট  
রাখিয়া গিয়াছেন : সে চিত্রখানি সন্মতসুন্দর হইয়াছে—তাহার নাম  
“বিন্মোদতরঙ্গিণী” ।

হিন্দুশ্রমের অভ্যর্থানকালে লোপ হয় শৈবধর্ম্মই সর্বপ্রথম শির উলো-  
লন করে । শৈব ধর্ম্ম কীভূনোপলক্ষে ভাষায়  
বঙ্গসাহিত্যে শিব, পদ্ম,  
চণ্ডা ও শীতলা ।  
কোন বৃহৎ কাব্য রচিত হয় নাই । “ধান  
ভান্তে শিবের গীত” প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য  
দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট  
হইলেন না । চট্টগ্রামের প্রাচীন ‘মৃগলক্ক’ পুঁথিতে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত

প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর  
নিজকৃত একটি ঠংরাজ্য অনুবাদসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন ।

+ ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার বতিদেব সম্বন্ধে এই বিবরণ  
পাওয়া যায় ।

“পিতা গোপীনাথ বন্দ্য মাতা বহুমতী ।

জন্মস্থান হুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥

জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দ্য রাম নারায়ণ ।

ধরণী লোটায়ে বন্দ্য যত গুরুজন ॥

আছে ; এইরূপ দু'একখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্মের ভগ্নকীর্তি স্বরূপ বর্তমান আছে । উহার। ক্ষুদ্র-কলেবর হইলেও জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা আদরে রক্ষা করিয়াছি । রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন আধুনিক সামগ্রী । উহাতে শিব অপেক্ষা দেবীর শক্তিসামর্থ্যের বর্ণনাত্মক ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীত বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন । সংস্কৃতের বচন স্পর্শ-লৌকিক দেবতাদের প্রভাব, শৈবধর্মের প্রতি আক্রমণ । মণি তুল্য, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্র ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; এইজন্ত ব্রহ্মবেবর্ত্তপুরাণে মনসা-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্তিত হইয়া এবং বৃহৎসমুদ্রপুরাণে কালকেতু ও শাল-বাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা হইয়াছিল ।

শৈবধর্মের উপর এত সব গৌরীগণিক ও লৌকিক ধর্মতত্ত্ব উপর্যাপার আঘাত করিয়াছে । শিবোপাসক ধনপতি সদাগর ‘ডাকিনী’ দেবত-চণ্ডীর ষট পদ-৭ হারে ভগ্ন করিয়া ‘মেয়ে দেব’-সেবিকা খুল্লনাকে ভর্বসনা করিবাছিলেন,† বিষহরিকে শিবোপাসক চাঁদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখা দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, হেঁতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়া-

অন্নপূর্ণা শাস্ত্রী যে খণ্ডের শঙ্কর ।  
মন্দতৌ দয়ালী মোক্ষদা ঠাকুর ॥  
গোপীনাথ দেব স্তত রতিদেব গায় ।  
সুগলক পুঁথি এহি হর গৌরীর পায় ॥”

এই পুস্তকে শিবচতুর্দশীত্রয়ের মাহাত্ম্য কীর্তন উপলক্ষে এক ব্যাখ্যার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ।

“হং কালকেতুবরদা ছলগোথিকাসি ।  
‘বা হং শুভাভবসি মঙ্গলচণ্ডিকায়া ॥’ ইত্যাদি ।

ধনপতির সিংহলযাত্রা, ক, ক, চ ।

ছিলেন । \* শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজা ও শীতলাদেবীর প্রতি সেইরূপ  
তীব্র অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন । † কিন্তু বঙ্গীয় কাব্য-  
শ্রুতিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসকভক্তগণের জন্ত যেরূপ কার্য-  
তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া  
মনে হয় । খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউসেনের দুঃখে চণ্ডীও  
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । স্বীয় পূজা প্রচারের জন্ত চণ্ডী ও বিষহরির দিনে  
শাস্তি ও রাতে নিদ্রা ঘটে নাই । সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা  
চৌর্য্যে ও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই । বিষহরিকে পূজা করিয়া বিপুল  
(বেহুলা) কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কে না জানে ? ভক্তের স্মরণমাত্র  
ইহারা কখনও সাক্ষ্যনেত্র, কখনও খড়্গহস্ত । কিন্তু প্রায়শঃ ইহারা  
সামান্য মানবীর ত্যায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পবিচয় দিয়াছেন । হৃৎক  
স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডীদেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন । মুকুন্দরাম  
ক্রুদ্ধ চণ্ডীর যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গম্ভীর রসে মিল্টনের  
লেখনী-যোগ্য । দেবীর ক্রোধ দেখিয়া বরুণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্দ্র  
বজ্র, শিব শূল, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, সূর্য্য রশ্মি ও লোকপালগণ  
তাহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ দিয়া প্রণত হইতেছেন । ত্রিলোকের এই  
ভীতিকর শক্তি-পুঞ্জ একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহার-রূপিণী সিংহের উপর  
দাঁড়াইলেন । ইজিপ্টের পিরামিড কি ব্যাবিলনের প্রস্তর-গৃহ যাহারা  
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারা ভিন্ন এ বিগহ গঠন করিবে কে ?

“হেঁতালের বাড়ি দিলগো আগো তাতে বাখা পাইলাম বড় ।

জালুয়া মটপে গিয়া কাঁকালী কৈলাম দড় ॥” বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ ।

“জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর ।

শুন রে অজ্ঞান বুড়ি এথা হৈতে ছুর ॥”

৩৭পর শীতলাদেবী যখন তাহার রাজ্যে মহামারী উপস্থিত করিলেন, তখনও  
নির্ভীক চন্দ্রকেতু বলিয়াছিলেন—



কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না । চাঁদ-  
সদাগরের সাতখানা ‘মধুকর ডিঙ্গা’ খান খান  
শিবের নিশ্চেষ্টতা ।

ইয়া সমুদ্রে পড়িল । চাঁদবেণে ‘শিব শিব’  
বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, \* কিন্তু শিবঠাকুর নিশ্চেষ্ট,  
নিশ্চম । ধনপতির অশ্রু মোচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন  
নাই । স্তুরাং বিষহরি ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি  
পাইবে, তাহাতে তার আশ্চর্য্য কি ? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, উক্ত  
দেবতারায়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসায় ছিল । †

এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের সে কলহ বর্ণনা  
করিয়াছেন ও দাশরথি যাহার আভাস দিয়া-  
পরবর্তী সাহিত্যে  
বিভিন্ন মতের একতা ।

তাহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত  
করিয়াছেন মাত্র । ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে বাইয়া নানা  
মতের সামঞ্জস্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; তদ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব, শাক্ত  
প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক  
পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছিল ; স্তুরাং তাহারা  
ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল ।

“রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ ।

কদাচিত আমি তার না লব প্রসাদ ॥”

দৈবকীনন্দনের শীতলমঙ্গল । সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১৩০৫ সন ১ম সংখ্যা ৩৯ পৃঃ ।

“ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তট ।

শিব শিব বলি সাতবার করে গড় ॥” কেতকাদাস ।

পুনশ্চ,—“বা করেন শিব শূল, এবার পাইলে কুল,

মনসায় ববিব পরাণে ।” কেতকাদাস ।

•† “দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পুজিয়া ।

কেনা ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া ॥ চৈ, ভাঁ, আদি ।

শৈব, শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ও  
 তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্তমান ছিল । এখনও এক  
 সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার  
 পুষ্টি ও শাস্ত্রচর্চার বহন  
 বিস্তার ।  
 এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ-স্বত্র  
 প্রচারিত হইয়া ধর্ম বিশ্বাসের ইতিহাস জটিল  
 করিতেছে । বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে রামো-  
 পাসক ও শ্রামোপাসকেব দ্বন্দ্ব বর্ণিত আছে, বটতলার কুন্তিবাসী রামায়ণে  
 সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,—

“এতক মঞ্চা করি বিনতানন্দন ।  
 পাগাতে করিল স্নান অদ্বুত রচন ॥  
 ভকতবৎসল রাম তাহার গিতরে ।  
 দাড়াইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম কপ ধরে ॥  
 ধনুক তাজিয়া বাঁশা ধরিলেন করে ।  
 হনুমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে ॥  
 হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু হিত ।  
 পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত ॥  
 দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি ।  
 ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥  
 হনুমান নলে পক্ষী এত অহঙ্কার ।  
 ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আবহার ॥  
 যদি ভূতা হই মন থাকে শ্রীচরণে ।  
 লইব ইহার শোণ তোর বিনামানে ॥  
 বাঁশী খসাইয়া দিব বনুঃশর করে ।  
 লইব ইহার শোণ কৃষ্ণ অবতারে ॥”

কুন্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ।

শ্রীচৈতন্যদেব এক রামোপাসককে শ্রামোপাসনায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন ।

“ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রসন্ন কৈল ।  
 কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥

পূর্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম ।  
 এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥  
 বিপ্র বলে এই তোমার দর্শনপ্রভাবে ।  
 তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম পতাবে ॥  
 বালাববি রামনাম গ্রহণ আমার ।  
 তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আঁটল এটবার ॥  
 সেট ততে কৃষ্ণনাম জিহ্বাগ্রে বসিল ।  
 গুননাম ক্ষুণ্ণে রামনাম দূরে গেল ॥”

চে, চ, মধ্যমখণ্ড ৯ম পঃ ।

এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাদের মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া-  
 ছিলেন, ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্ম্মতত্ত্ব  
 পৌছাইতে বঙ্গপর হইয়াছিলেন । আমরা অগ্নিপুরণ, বায়ুপুরণ,  
 কালিকাপুবাণ, গাণ্ডপুবাণ এইরূপ প্রায় ত্রাবং পুরাণেরই অতি প্রাচীন  
 বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি । ধর্ম্মভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাট, ধর্ম্মভিন্ন  
 কোন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাট ।

প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লইয়া দেশময় ভাবের বত্মা ছুটিল । কিন্তু  
 বৌদ্ধধর্ম্মে জীব-তনন বর্মপার একান্তরূপ নিষিদ্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষে বুদ্ধ-  
 স্পৃহা ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল ; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত-  
 বর্ষ হইতে নিকরাসিত হইয়াছিল মতা, কিন্তু বৌদ্ধতাব হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গী-  
 ভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও জিঘাং-  
 সাত্তিবিরোধী করিয়া তুলিল । মায়াবাদে একান্তরূপ আশ্রয়পরায়ণ,  
 বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিখল মুষ্টি হইতে পার্শ্ববস্তুসম্ভোগে ব্রতী রণপটু  
 মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ  
 হইল । অবশ্য শেষ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা

\* বৌদ্ধধর্ম্ম শেষ সময়ে নাস্তিকতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল । বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে  
 তাহাদের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে :—

উন্মূলিত হওয়াতে ভারতবর্ষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, সেট ধর্ম ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও সাবিত্রী মূর্তি অঙ্কিত হইল—আমাদের এই লাভ । কৃষ্ণভক্তিতে দেশ ভূমিয়া গেল । বৌদ্ধধর্মের অবসানে নর হৃদয়ে নবভাব অঙ্কুরিত হইল, তাই আমরা খ্রীষ্টতত্ত্বদেবকে পাইয়াছি । আমরা ধর্মজগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি । ভারতবর্ষ অতীদিকে লাভালাভের গণনা করে না । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অত্ৰ কথা নাই । পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন । কুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন ( ক, ক, চ ), লহনা দ্বৈষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীব গৃহে গাঠিতে নিষেধ করিলে, খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের

(১) “ন স্বগো নৈব জন্মান্তপি ন নরকো নাপাধমো ন ধর্মঃ, কৰ্ত্তা নৈবান্ত কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভৰ্ত্তা ন ভৰ্ত্তা । প্রত্যক্ষাণ্ডমমানং ন সকলফলভৃগুদেহভিন্নোঃগতি কশ্চিন্মিথ্যাত্বতে সমস্তোপান্তভবতি জনঃ সৰ্বমেতদ্বিমোহাৎ ।”

অর্থ,—স্বগ নাই, জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম নাই, ধর্ম নাই, এই জগতর সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, সংহারকর্ত্তা নাই, প্রত্যক্ষ ভিন্ন পমাণ নাই । দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যদি সমস্ত কর্মের ফলভোগী কোনও আত্মাদি নাই । এই মিথ্যাত্ব অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে ।

(২) “অহিংসা পরমো ধর্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্ ।

অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোত্তমলক্ষিতাশনম্ ॥

স্বদারপরদারেণু গণেচ্ছং বিহরেৎ সদা ।

গুণশিষ্যপ্রণালীঞ্চ তাজেৎ স্বহিতমাচরন ॥”

অর্থ,—অহিংসাই পরম ধর্ম, পাপমাত্মপ্রপীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অতি-লম্বিত দ্রব্য ভোজনই স্বগ । নিজ পত্নীতে ও পরদারে সততই যথেষ্টা বিহার করিবে ; আপনার ভিত্তজনক আচরণ করিয়া গুণশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবে ।

(৩) “কা সৃষ্টৌ পরিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপতোস্তবঃ ।

কৃষ্টাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্ত্বকূললাদিতঃ ॥”

অর্থ,—যখন মাতা, পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুস্তকারাদি কর্ত্তক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্ত ভাবনা কি আছে ?

নজির দেখাওয়া সপত্নীর তর্ক-কুহক দূর করিতেছে (ক, ক, চ), বিপুলাকে যখন তাঁহার ভ্রাতা স্বামীর শবতাগ করিতে বলিতেছে, তখন বিপুলা তদ্বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাটা প্রমাণ দেখাইতেছে (হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ), কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সম্ভান না হওয়ার কষ্ট বশত হঠাতে অনুন্নয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধরণে পরা-জুথ হয় নাই (শ্রীধর্মঙ্গল ৪র্থ সর্গ)।

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শাস্ত্রচর্চা সমাজের নিম্নতম স্তর ও স্ত্রীজাতি পর্যাস্ত প্রসারিত হইয়াছিল, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংস-নদীর জল পান করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই। প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তিভূমি সংস্কৃত হইয়া দাড়াইয়াছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবর্ণ পুরোহিত্যায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই। যদিও ভাষাগ্রন্থ-পুনরুত্থানে ব্রাহ্মণের গুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণের স্তব দৃষ্ট হয়, \* যাঁহার নব হিন্দুধর্মের নেতা হইলেন, তাঁহার সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবীর জোলাতাতি, রাইদাস চন্দ্রকার,

\* “যাঁর ক্রোধে যদুকল হইল নিকাশ ।

যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥

যাঁর ক্রোধে কলঙ্ক হইল কলানিধি ।

যাঁর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি ॥

যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্বগন্ধ ।

যাঁর ক্রোধে ভগাস্ত্র হইল সহস্রাঙ্গ ॥” কাশীদাস। ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ।

পরীক্ষিত রাজা বলিতেছেন ;—

“এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ ।

দংশুক আমারে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ বচন ॥” ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর।

দাত্তপত্নীপ্রবর্তক প্রসিদ্ধ দাছ ধুনরী, পীপা রাজপুত, ধনা জাট এবং সেন-পত্নীপ্রবর্তক সেন \* নাপিত ও তুকারাম শূদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণের এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন। † ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল, তাই চর্ম্মকার ও বর্ম্ম-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মিনু পারিষ্কটন যেকপ স্বীয় কুটীরের দিকে আটল্যান্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাড়াইয়াছিলেন, সেইকপ সমাজের গোড়াগণও এই বর্ম্মপ্রবাহে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান-বিস্তারের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন ;—

“কুত্ৰিনাসী, কাশীদাসী, আর বামুণ ঘোঁষা, এই তিন সর্কনাশী”। † এবং সংস্কৃতে এই ভাবসূচক শ্লোক রচনা করিয়া ভাষা সাহিত্য অঙ্কুরে নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন, “অষ্টাদশ পুবাণানি বামশ্চ ঠরিয়ানি চ। ভাষায়ান মানবঃ শ্রদ্ধা রৌষবঃ নরকং ব্রজেৎ।” কিন্তু তথাপি এই শাস্ত্রানুবাদ ও শিক্ষার স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় নাই।

\* সেন পুৰুষ বঙ্গভাষার ( গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী ) রাজাদিগের কুলনাপিও ছিলেন। শেষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনিও তাঁহার পুত্র পে’হাদি সহানুরাট্ট রাজবংশের কুলপুত্র হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৬৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রসিদ্ধ ‘কড়চা’ লেখক ( পদকর্ত্তা নহেন ) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন।

“বদ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।

গ্রামদাস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোর নাম ॥

অথ হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।

মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥’ কড়চা।

Mahamahopādhyāya Hara Prasad Shastri's pamphlet on old Bengali Literature, P. 13.

পূর্ব এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভব-রাজসভায় বঙ্গভাষার আদর। শালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করিতেন : প্রত্যেক রাজসভাতেই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্মবিশ্বাসানুকূল্যে কাব্য রচনা করিতেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গোড়েশ্বরগণ বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিাধনার্থ অনুবাদ গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীকাব্য, অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীর্তন-রচকগণও উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্যরচনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু স্ববিক্রমে বাহা দাঁড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহার ও চণ্ডীপূজার ত্রায় বৈষ্ণবগণের কীর্তন ও ভজন বৈষ্ণবগণের কৃতকাব্যতা। অর্গপ্রদ কি সম্মানাস্পদ ছিল না। \* নিম্ন শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কাব্যক্ষেত্র।' যে ভট্টাচার্য্যের দল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিগেন, তাহাদেরই পূর্বপুরুষগণ চৈতন্যপ্রভুর প্রবর্তিত নবধর্মের প্রতি কুলে বদ্ধপবিকর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। ঢকানাদে তাহার কলঙ্ক প্রচাষিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।। মহাপভূব অনুচরগণও নানাক্রমে উৎপীড়ন ও নিন্দা

চৈতন্যপ্রভু শ্রীধরকে বলিতেছেন,—

“লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।

অন্ন বস্ত্রে ছুংগ পাও কহ দেখি শুনি ॥”

এবং লাভজনক বিষয়টির ও চণ্ডীপূজা অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। চে, ভা আদি।

“ছুংগের কথা কেতে গেলে প্রাণ কান্দি উঠে।

মুপ ফুটে বলতে নারি মরি বুক যেটে ॥

ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গামে দেয় হে।

চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে ॥”

বিকুপ্রিয়া-পত্রিকা, ৪০৩ গৌরাঙ্গাব্দ ১৬ই মাঘ।

সহ্য করিয়াছিলেন, \* তথাপি তাঁহারাই বঙ্গসাহিত্য গঠন করিয়াছেন ।  
সংস্কৃতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য মুকুল-অবস্থায়ই শুষ্ক হইত, ইহার

“কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই ।  
কেহ বলে রাত্রি নিদ্রা যাইতে না পাই ॥  
কেহ বলে গোমাঞ্চিত কষিবে এই ডাকে ।  
এগুলার সর্বনাশ হেবে এই পাকে ॥  
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার ।  
গরম উদ্ধতপান। কোন বাবহার ॥  
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয় ।  
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥” চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড ।

ভট্টাচার্যগণ সর্বদাই চৈতন্যপ্রভুকে বিবেচ্য করিতেন ; তাহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর  
মহাত্মা বুঝিতে পারেন না, বৃন্দাবন দাস তাঁই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

“মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল ।  
সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥” চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড ।

চৈতন্যপ্রভুকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা পম্পাভূত পরিবার আশায়, এই মহাত্ম্যগণ তত্ত্বরত্না-  
কবে কতকগুলি শ্লোক সোজন। করিয়া দিয়াছিলেন । এতাত্তে আছে “বটুক ভৈরব  
একদা ভগবান গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে, তাহার অস্তর-তেজ  
নষ্ট হইয়াছিল, কি কোন কপে বিলম্বন ছিল ?”

গণদেব উত্তর করিলেন,—

“স এষ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাশিনঃ ।  
নমস্যা পরয়াশিষ্ট আত্মানমকরোজ্জ্বলা ॥  
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে ।  
জিংসার্থঃ শিবভক্তানাংমুপাযান স্বজঘ্জন ॥  
অংশেনাদেন গোরাগং শচীগর্ভে বভূব সং ।  
নিত্যানন্দোদিতীয়েন প্রাজুরাসীম্মহাবলঃ ॥  
অশ্বেতাশাস্ত্রতীয়েন ভাগেন দমুজাবিপঃ ।  
প্রাপ্তে কলযুগে ঘোরে বিজ্জহাব মহীতলে ॥  
তো হুরাক্সা বিপুরঃ শরীঃ রত্নিভিরাশ্রয়ৈঃ ।  
উপপ্রবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশং ॥”

ইহার সারার্থ এই, “ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্মনাশের জন্ত  
গোরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অশ্বত এই তিনরূপে আবির্ভূত হইলে, পরে নারীভাবে ভক্তনের  
উপদেশ দিয় লোকসমূহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন ।” ইহার পর এই ভাবের  
আরও অনেক নিন্দাবাদ আছে ।



পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিত না ; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া সজীব করিয়াছেন । এপর্যন্ত বঙ্গভাষা শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষার বস্তু ছিল । কিন্তু যে দিন ( ১৫৩৭ শকে ) সংস্কৃতভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, অশীতিপর বুদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহুবৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃতের জ্ঞায় অপরূপ দর্শনাত্মক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার এক যুগ । আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালা ‘পদামৃতসমুদ্রের’ সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই আর এক যুগ । দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত ?

## ২ । প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ ।

যাহারা টেন্, ডাউডন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই-  
বেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন .  
ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য ।  
বিলাতী লিলি আর দেশী পদ্মে, জেসিমাঈন  
আর জুইএ একটা প্রভেদ আছে ; ইংরেজী ও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ  
একটা প্রভেদ আছে ; জাতীয়সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতিবিম্ব  
পড়িয়াছে ।

ইংরেজী কবি চছার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্সার তাহা স্পশ  
করেন নাই ; আবার ক্যান্টারবারিটেল্ কি  
ইংরেজ কবির স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ।  
ফেরারিকুইনের সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত প্যারা-  
ডাইস্‌লষ্টে লক্ষিত হয় না । এইরূপে জনশ্রুতিবস্তুর, ফোর্ড, বেনজনসন্,  
চ্যাটারটন্, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা  
করিয়াছেন ; একজনের চিহ্নিত পথ অপর কবি অনুসরণ করেন নাই ।  
একজনের রাগিনীর সঙ্গে অস্ত্রের রাগিনী জড়িত হইয়া যায় নাই ।  
উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ ।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ববর্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হয়েন নাই । অনুবাদ-গ্রন্থের আদি বাঙ্গালী কবির অনুকরণ-লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি মালাধর বসু প্রিয়তা ও তদ্দৃষ্টান্ত । ইতিতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ববর্তী কবির চেষ্টার পরের পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ । আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না ; এক কবির পুঙ্খ আর এক কবি, তৎপক্ষে অথ এক জন, এইভাবে একই কবির রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায় । আদি-কবি একজন নানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তিনি দোক-পরম্পরা-এক আখ্যানটি গাতে পরিণত করিয়াছেন । চণ্ডীকাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা জানি না । চৈতন্যভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডী গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; আমরা 'দ্বিজ জন্মানন্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাওয়া ছ' । যোবাইয় এইরূপ কোন মান মসলা বইখা নানবাচার্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন । তিনি পূর্ববর্তী কাব্যগণের তপস্বী বলে নিজে অমর-বল লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দশঃ হরণ করিয়াছেন । কবির কল্পণের পর লাল জয়নারায়ণ আবাব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন । আমরা কাণাহরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত ইতিতে আরম্ভ করিয়া একুনে ৩১টি মনসার গীত-লেখক পাঠিয়াছি । কৃষ্ণরাম বিদ্যা-সুন্দর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন । ভারতচন্দ্রের পর, পাগল গোবরাম তাঁহার দৃঢ় যশের দুর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেঁক গড়িয়াছিলেন ।

দক্ষিণরাযের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি

নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম । মৃগলক রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন । ধর্ম্মমঙ্গলের কবি অনেক পাওয়া যাইতেছে, যথা,—রামাঠি পণ্ডিত, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্তী, মথুর ভট্ট, খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম প্রভৃতি । অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হইবে, সঞ্জয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দা, নিত্যানন্দ ঘোষ ও পরে কাশীদাস প্রভৃতি শারৎ বিবিধ মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন । বামাবণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কুড়িবাসের আদি-গৌবধ কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই । গুণরাজ ণ্ডাবপথ অনুসরণ কবিরা মাধবাচার্য্য ও দাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেক কবির ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন । এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় সমুদয় প্রাচীন কবির কথাই বালতে হইবে । পরবর্ত্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ববর্ত্তী কবির রচনাব খুঁজি বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন । আমরা ‘ভেলুয়া সুন্দরী’ কাব্য ও কৃষ্ণরামের ‘বায়মঙ্গলোৎসব’ ভূমিকা ইত্যে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি ;—

“পুস্তকের কথা এই কর অবগতি ।

যেদপে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁপি ।

ভগ্নীশ্বর নাম এক ভক্তমূল আলি ।

আছিল আমার জেন সবাকারে বলি ॥

অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান ।

না ছিল পণ্ডিত গুণা না ছিল বিদ্বান ॥

লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি :

রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাচিনী ॥

আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল ।

অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল ॥

না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন ।  
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন ॥

একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান ।  
তেনকালে বধুগণ আসি বিদ্যমান ॥  
কহিল আমাকে সবে করিয়া মাস্ততা ।  
ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা ॥  
আদি অন্ত ভেলুয়ার যতক কাহিনী ।  
বিরচিয়া কহ মিত্র আমি সব শুনি ॥  
গীতরূপে গায় সবে শুনিতে হৃদয় ।  
না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর ॥  
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার ।  
স্পষ্টরূপে নাই তাতে সমস্ত প্রচার ॥

...

অলজ্ঞা তাসব বাক ধরি আমি শিরে ।  
'ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক ।"  
হামিদুল্লা প্রণীত "ভেলুয়া স্মরনী ।"

"শুনহ সকল লোক অপূৰ্ব কথন ।  
যেমতে হইল এই কবিতা রচন ॥  
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর ।  
বড়িস্তা তথায় একতপ্তা বিশ্বাস্বর ॥  
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে ।  
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে ॥  
বজ্রনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন ।  
বাঘ পীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥  
করে ধমুঃশর চাক সেই মহাকায় ।  
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ॥





ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের প্রতিমূর্তি ।

পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার ।  
 আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচাব ॥  
 পূর্বেতে স্কুরিল গীত মাএব আচাষ ।  
 না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কাষ ॥  
 চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ।  
 মসান নাহিক তাহে, সাধু গেলে পাশা ॥”  
 বৃক্ষরাম প্রণত ‘বাম মঙ্গল’ ।

এই পুঙ্খগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র । নূতন পথে লেখনী প্রবর্তিত করিবার অস্বীকার আছে, প্রাচীন কবগণ, বোধ হয়, একথা স্বীকার করিতেন না । তাই তাঁহারা কল্পনাব পুষ্পকবথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হ্যাডি কি ডোনাঙ্গুলিয়া সংগ্ৰহ করিয়া বেড়ান নাই । ধর্ম্মের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি করনা অল্প জগতের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে নাই । একথা প্রশংসনীয় হইক, কিন্তু যখন বিদ্যা-সুন্দরের মত কাব্যকেও বিষপত্র এবং তুলসীদল দ্বারা শোষণ করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্ম্মের গাঙী অনেকদূর প্রশ্রিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে ।

বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যেব এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই । আমবা যাহাদিগকে আদিকবির যশোমালা দিওঁছি, তাঁহারা হই আদি কি না ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । প্রত্নতত্ত্ববিংগণের দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে, তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার ফলাফলপ্রাপ্তে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না ।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়ও তাহাই, সৌর-জগতে যে নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রেও সেই নিয়ম দৃষ্ট হয় । কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যেব অংশগুলিতেও সেই অনুকরণ-বৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয় । একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাওয়া কবিকে প্রশংসা

কাব্যের অংশ রচনায়  
 অনুকরণ-বাহুল্য ।

কবার পথ নাই ; কোন্ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে । আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও খুল্লনার ‘বারমাস্তা’ পাইয়াছি । এতদ্ব্যতীত বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণে’ পদ্মাবতীর ‘বারমাস্তা’, পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ায় ‘বারমাস্তা’, ( ১৭৮৩ পদ ), বিদ্যা-সুন্দরশুলিতে বিদ্যার ‘বারমাস্তা’, সৈয়দ আনোয়ার কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর ‘বারমাস্তা’ “মুবারি ঝঝাঃ নারিত” শ্রীধর প্রণীত সীতার ‘বারমাস্তা’, সেক কমরানী বিরচিত রাবাব ‘বারমাস্তা’, সেক জালাল প্রণীত সখীর ‘বারমাস্তা’ । এইরূপ রাশি রাশি ‘বারমাস্তার’ সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেব ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি । যেখানে একটি সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপবেই তাহা উপযুক্ত কবিগণের চেষ্টায় তন্তুসার হইয়াছে । বিদ্যাপতির,—“না পড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে । মরিলে রাগিও বাবি তমালেব ডালে ॥ কবজঁ সো পিয়া যদি আসে বন্দাবনে । পরাণ পায়ব হাম পিয়া দশনে ॥” এত কবিতার ভাবটি পাখামোহন ঠাকুর,—“এ সগি কব ওতঁ পর ডিপুকার । ইত বন্দাবনে দেহ উপোষ, মুত তন্তু রাগবি হামার ॥ কবজঁ গাম ওনু পরিমল পাওব, তবজঁ মনোবথ পুবা ।” ( পদকল্পতরু ৪৬ পদ ) যত্ননন্দন দাস—“উত্তর কালে এক করিহ সহায় । এই বন্দাবনে যেন মোব তনু বয ॥ তমালের কাপে মোর ভুজ লতা দিয়া । নিশ্চয় করিবা তুমি বাগিহ বাঁবিয়া ॥ কুষ কভু দেখিলেই পুরিহেক আশ ।” ( পদকল্পতরু ১৮৬ পদ ), নরহরি ( ঘনগ্রাম ),—“করিহ উত্তরকালে কিয়া । রাগিহ তমালে তন্তু যতনে বাঁবিয়া ॥ লেহ এ ললিতা মণিহার । অনুখণ গলায গরিহ আপনার ॥ কপিহু মলিক নিজ করে । গাঁথিখা ফুলের মালা পরাইহ তাণে ॥ তোমরা কুশলে সব রৈযো । এই বনে বারেক আঁসতে তারে কৈযো ॥ নরহরি কৈরো এই কাম । সে সময়ে কাণে শুনাইও তাঁর নাম ।” ( সাহিত্যপত্রিকা, ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯ ) কৃষ্ণকমলা,—“দেহ দাহন ক’র না দহন দাহে । ভাসা’ও না তাহা যমুনা প্রবাহে । আমাব শ্যামবিরহে পোড়া তনু, আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ—সব

শেষোক্ত তিনটি “বারমাস্তা” চট্টগ্রামের সুলমাঠাব ‘আলো’ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে ।



সহচরী, ছুটি বাহু বরি, বাঁধিও তমালের ডালে । যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার প্রাণের হরি, বধূর শ্রীঅঙ্গসমীর পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে ।” কবিশেখর,—“কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে এজপুরে । নিবুঞ্জে রাখিহু এই মোর হিয়ার হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ।” (প, ক, ত, ১৬৭৯ পদ, সর্ভাশ বাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা ।) অজ্ঞাত আর এক জন কবি,—“সখি প্রাণ যদি দেহ ছাঁড়ে, না দ’হ বক্তিতে মোরে, ভাসায়ো না যমুনা সলিলে । তুলসীদাস বিছাইয়ে, চন্দন তাজ লেপিয়ে, লিগিয়ে তাহার হরির নাম, গাবিযা রেগো সখি তমালের ডালে ।” (“সাহিত্য”, মাঘ, ১৩০২, ৬৫৬ পৃষ্ঠা ।) এবং ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি—“আমি ম’লে এই করিও, না পোড়াযো না ভাসায়ো” ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন । জয়দেবের,—“জদি বিসল গা পারে। নাথ ভুজঙ্গ নাথকঃ ।” ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি,—“হাম নহ শঙ্কর ভ’ বননারী ।” ও রামবসু “হর নই ছে আমি যুবতা । কেনে জালাতে এনে রতিপতি ॥ কনো না আমার হুতি । বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি স্বপ্নের আবৃতি ॥ ক্ষীণ দেগে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, গকি রঙ্গ ছে তোমার । হর এম শরাঘাত, কেনে করিছে বার বার । হিন্ন ভিন্ন বেণ, দেগে কও মহেশ, চুননা পুষষ প্রবৃতি । কঠে কালকূট নছে, দেগ পরেছি নীল রতন । অশ্লি লোচন, করে পতি বিরহে রোদন । এ অঙ্গ আমার, ধুলায় ধূসর, মাগি নাই বিবৃতি ।” (বিদ্যাপতি, শব্দভূষণ ভট্টের সংস্করণ, ১৫৫—১৫৬ পৃঃ ।) গানের ভাব চুরি করিয়াছেন । অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবি-শেখর, “নিজ কর পল্লব দেহ না পরশই শস্য পঙ্কজ ভানে । মুকুরতলে নিজ মণ হেরি স্নানরা শিশি বলি হেরে গগনে ॥ (পদকল্পতক ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন ; চোরের উপর বাটপার কৃষ্ণকমল উহা হইতে “পারী হেরি নিজ করে, নথর নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে” (দিবোদ্যাদ) ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন । চণ্ডীদাসের—“এগন কোকিল আসিয়া ককক গান, ব্রমর ধকক তাহার স্তান, মলয় পবন বহক মন্দ গগনে উদয় হটক চন্দ ।” (রমণমোহন মল্লিকের সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠা ।) পরে বিদ্যাপতির “সোহি কোকিল অবলাখ ডাকউ, লাগ উদয় কক চন্দা । পাঁচবাণ অবলাখ বাণ হই, মলয় পবন বহ মন্দা ॥” এবং পরে মাধবাচার্যের চণ্ডীতে—“আজি মোর

মন্দিরে আওবে কাল।, কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা।” (মা, চ, ২৪৬ পৃঃ) প্রভৃতি পাওয়া বাইতেছে। ইহা ইংরেজীর Parallel passage অর্থাৎ অনুরূপ-রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিনে ছপরে ডাকাতি।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকগুলি ধর্ম-প্রসঙ্গের সীমা-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রভৃতি আবদ্ধ ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কোর কেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দেব মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাচালী, শনির পাঁচালী, ধাত্তপূর্ণিমা ব্রত-গীতি প্রভৃতি অসম্ব্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে, দ্বৈত স্বর্ণে পার্ণত্য লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডী কাব্য, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে অনুকরণের দেশ ও গুণ। গতিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিম্বা উদ্ভ্রাম ও সহজ ক্ষুদ্রতম চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষ চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অত্যাচিত বিশ্বাস পরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব,

তাহাদের সাহিত্যে অশ্লীলরূপ হইবে কেন ? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে ? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে ?

কিন্তু সদাঃ প্রেমুটিত পুষ্পবাসের ত্রায় বৈষ্ণবীয় গীতি-বাণী, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর ভাব-জাত । সেই ভাবের বৈষ্ণবগীতির স্বাধীনভাব ।

নাম . প্রেম । ‘লম্বোদব’, ‘নাভি স্নগভীর’,  
 ‘আজানুলম্বিতবাহু’র ত্রায় রাশি রাশি সংস্কৃতির আবর্জনা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছিল । সদাঃজাত এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির স্তূলে “শীতের ওটনী পিয়া, গিবিষীর বা বরষার ছত্র পিয়া, দবিয়ার না ॥” ( বিদ্যাপতি ) প্রভৃতি প্রকৃত কথা জাগাইয়া দিয়া ।<sup>\*</sup> জয়দেব ঐহরিকের দিয়া যে দিন “দহি পদপল্লবমুদার” গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-তারা নন্দ প্রায় মানুষ দাতে জিত কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা কবিয়াছিল ; কিন্তু জ্ঞানদাস যে দিন “নিদে যায় চান্দবদন শ্রাম-অঙ্গে দিয়া প ” ( পদকল্পতরু ১১০০ পদ )<sup>\*</sup> ও কৃষ্ণকমল “অতুল রাতুল কিবা চরণ দুগানি, আলতা পরাত বধু কতই বাখানি” ( দিবোদাদ ) বচনা কবিয়াছিলেন, সেদিন আব ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না । জাতীয় জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়া-ছিল ; তাই বলিতেছিলাম, এই অদীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবীয় পদে স্বাধীনতাব বায়ু খেলা করিতেছে ।

# ষষ্ঠ অধ্যায় ।



## গৌড়ীয় যুগ ।

অথবা

### শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য ।

- ১ । ‘পঞ্চগৌড়’
- ২ । অনুবাদ-শাখা ।
- ৩ । লৌকিক ধর্ম-শাখা ।
- ৪ । পদাবলী-শাখা ।
- ৫ । কাব্যোতিহাসের সূত্রপাত-শাখা ।

মুসলমান-বিজয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ও পরে বিষ্ণুপর্বতের উত্তর-

বর্তী ০ প্রাক্জ্যোতিষপুর্বের পশ্চিম স্থিত বৃহৎ  
পঞ্চগৌড় ।

ভূভাগ,—সারস্বত, কাণ্ডকুজ, গৌড়, মিথিলা

০ উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল ; এই পঞ্চবিভাগেব সাধারণ নাম  
ছিল, ‘পঞ্চগৌড়’ । এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-বাক্যক, বস্তুতঃ  
গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য ।\* পূর্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজা-  
দিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেক্সনদিগের

---

\* গৌড়ের রাজধানী ৭৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্থাপিত হয় । ইহাকেই বোধ হয় টলমি  
‘গঞ্জারিজিয়া’ সংজ্ঞায় বাচা করিয়াছেন । উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা  
বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্বাংশে বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল । এক রাজার  
শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে ‘গৌড়দেশ’ এই সাধারণ নামে অভিহিত  
হইত । মোগল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ ‘বঙ্গালা’ নাম গ্রহণ করে । See—  
Major Ronnel's Map of Hindoostan.

‘ব্রটওয়াল্ডার’ আয় গর্ব-পূর্ণ ‘পঞ্চগৌড়েশ্বর’ উপাধি গ্রহণ করিতেন । খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ শিলাদিত্য মহারাজকে এই ‘পঞ্চ গৌড়েশ্বর’ উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান ।\* গৌড়দেশীয় রাজাগণ অনেকবার এই গর্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কিরণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কগুপ্ত কাথকুজাধিপতি রাজাবর্দ্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন । বৌদ্ধরাজাদিগের মনো গোপান, দেবপাল ও জয়পাল সমস্ত আর্থ্য বর্ভ জয় করেন । হঁহার। এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজচক্রবর্তীদিগের মনো স্থিতির সঙ্গ সঙ্গ হঁহাদের নামও উল্লিখিত দেখা যায় । বলাবাহুল্য হঁহারাই ‘পঞ্চ গৌড়েশ্বর’ উপাধির প্রকৃতরূপে বাচ্য ছিলেন । এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহিত বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ । বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতি-সমূহ ‘পঞ্চ গৌড়েশ্বর’ সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয় কালক্রমে কবি ও স্ততি-জীবগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল ।

আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে বৌদ্ধরাজত্ববর্গের স্ততিই বঙ্গীয় কাব্যের বিষয় ছিল । যোগীপাল, গোপীপাল ও মহীপালের গীত শুনিতে

লোকবৃন্দ আনন্দিত হইত । পূর্ববর্তী অধ্যায়ে  
কাব্যে গৌড়েশ্বরগণের  
মহিমা ।

মাণিকচাঁদ এবং গোস্বিন্দচন্দ্রের গানের বিষয়  
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । পরবর্তী রচনাগুলি

তেও গৌড়েশ্বরগণের মহিমার অজস্র কীর্তন আছে । কৃতবাস গৌড়েশ্বরের আত্মক্রমেই রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্মরণ্য তিনি গর্বের সহিত বলিয়াছেন,—“পঞ্চগৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা । গৌড়েশ্বরপূজা কৈলে, গুণের হয় পূজা ।” শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের লেখক ও গৌড়েশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া গুণ-

\* বিল ( Beal ) সাহেব-কৃত হিউনসাঙএর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদে ‘পঞ্চগৌড়েশ্বর’ শব্দের স্থলে “Lord of the Five Indies” দৃষ্ট হয় ।

রাজ্ঞ খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, “নিষ্ঠুর অধম মুক্খি, নাহি কোন গ্রাম । গোড়ে  
 খর দিল নাম গুণরাজ্ঞ খান ॥” গোড়েখর নসরতখান মহাভারতের অনুবাদ  
 করাষ্টয়াছিলেন,—“শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান । রচাইল পাঞ্চালী বেণুগের  
 নিদান ॥” (কবীন্দ্র, যে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র ।) এই দৃষ্টান্তে পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ,  
 সেনাপতিদ্বয়, দ্বিতীয়বার মহাভারতের অনুবাদ সঙ্কলন করিতে দুইজন  
 প্রতিভাবান কবিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই দুই কবিও পঞ্চগৌড়ের  
 গৌরব বিশেষরূপে ছাত্র ছিলেন, আমরা বারংবার তাঁহাদের রচনায়  
 পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাঠি,—“নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি । পঞ্চগৌড়েতে  
 বার পরম স্তম্ভাতি ॥” (কবীন্দ্র, যে, গ, পুঁথি ১ম পত্র ।) “লক্ষর পরাগল গুণের সাগর ।  
 অবতার, কল্পতরু, রূপে বিনোদন ॥ পিয়পুত্র তাতান বিখ্যাত ছুটিখান । পঞ্চম গৌড়েতে বার  
 নামের বাখান ॥” (কবীন্দ্র, যে, গ, ২২৭ পত্র ।) এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির “চিরঞ্জীব  
 রত্ন” পঞ্চগৌড়ের, কবি বিদ্যাপতি ভণে ।” বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে পঞ্চগৌড়ে-  
 খর হুসেন সাহকে “মনাতন” “নৃপতি-ভিলক” প্রভৃতি গর্ভিত উপাধি দ্বারা  
 স্তুতি ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে “পঞ্চগাউ নামে দেশ পৃথিবীর সার ।  
 একবার নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥” (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, চৈতন্যের সংস্করণ ৮ পৃঃ )  
 প্রভৃতি পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি । পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি,  
 প্রাচীনকালে বঙ্গের ধনী ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষার আদর করিতেন । তাহার মূল  
 কারণ বোধ হয়, গোড়েখরগণের সদ্‌দৃষ্টান্ত । আমরা জগদানন্দের সঙ্গে কবি  
 ষষ্ঠীবরের, \* রবুনাথদেবের সঙ্গে মুকুন্দরামের, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিব-  
 সংকীর্্তন-লেখক রামেশ্বরের †, বিশারদের সঙ্গে অনন্তরামের ‡, কৃষ্ণ-

\* “অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণর চরিত্র শেষ পর্কে । শ্রীযুত জগদা-  
 নন্দ, অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্কে ॥” সঞ্জয় যে, গ, পুঁথি, ৭৮৯ পত্র ।

† “যশোমন্ত, সবগুণবন্ত, তস্ত পোষা রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি যর, বিরচিত শিব-  
 সংকীর্্তন ।” রামেশ্বরের শিবসংকীর্্তন ।

‡ “বিশারদ পদে সেই রেণু অভিশ্রয় । পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায় ॥” অনন্ত-  
 রামসুত ক্রিয়াযোগসার, হস্তলিপিত পুঁথি ।

চন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের, মগনঠাকুরের সঙ্গে কবি আলা-ওলের + ৩ রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের + প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবি ৩ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাবিপতি মহারাজা (২য়) ধর্মমাণিক্য মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজদন্ত সুবর্ণজড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান মর্যাদাব এই যোগ তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন এই অধ্যায় ‘গৌড়ীয় যুগ’ সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। গোড়েশ্বরগণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা ‘গৌড়ীয় সাধু ভাষা’ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।

## ২। অনুবাদ-শাখা—(ক) কৃত্তিবাস।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক। গোড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আদি কালে রামায়ণ, মহাভারত ও

ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। এই কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ পুস্তকের প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ আলোচনা।

একপ্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আরও কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—সুহৃদব শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি পুঁথিতেও আমরা এঁর বিবরণটি পাইয়াছি। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বলা উচিত যে, স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয়ই আমার বিশেষ আগ্রহ নিবন্ধন তাঁহার স্বীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের

\* বিরহ মত্তমাতঙ্গ, বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সসৈন্ত হইল ভঙ্গ। অতি রসিক হুজুন, রূপ জিনি পঞ্চবাণ, শ্রীযুত মগন, আরতি কারণ, হীন আলাওলে ভণে। পদ্মাবতী ২০৪ পৃঃ।

+ “কহেন ভবানীদাস, ত্রিপুরার পদে আশ, জয়চন্দ্র রাজার বচনে।” লক্ষ্মণদ্বিজয়। রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ, ( ২৮৫ নং আপার চিংপুর রোড ) : ২২ পৃঃ।

একখানি প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া এই আত্মবিবরণ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম,—ইহার রচনা ও ভাব অতি সুন্দর, স্বভাবের প্রতিবিম্বের আশ্রয়; ইহা যিনি একবার পড়িবেন তাঁহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ। এই আত্মবিবরণে যে বেদানুজ রাজার বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তিনি কে তৎসম্বন্ধে জানা নাগ নাই, তবে কুন্তিবাসের পূর্বপুরুষ উল্লিখিত নৃসিংহ ওঝা পিতামহ উঃ। দনোজামাধব রাজার সভাসদ ছিলেন। তাহা কুলজীগ্রন্থে পাওয়া যায়; দনোজা মাধব ১২৮০—১৩৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন, কুন্তিবাস উপো হইতে অশ্বস্তন সপ্তম পুরুষ, স্মরণ্য ১২৮০ হইতে প্রায় ১০০০ শত বৎসর পরে কুন্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা ধরা যাইতে পারে। ১৪০৭ শকে বচিচ ক্রপানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে “কুন্তিবাসঃ কবি ধামান সামো। শাস্ত্রধনাশ্রয়ঃ।” এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মাধব খানকে লইয়া ১৪৮০ খৃঃ অব্দে মালদহী মেল প্রবর্তিত হয়, এই সময়ে কুন্তিবাসের বিদ্যমান থাকা সম্ভব; কুন্তিবাস যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ,—ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতোছিলেন। নিম্ন বিবরণোন্নিখিত জগদানন্দ ইহার ভাগিনেয়, তাহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ এষ্ট রাজার মহাপাত্র ছিলেন এবং তৎসভায় যে মুকুন্দ “পণ্ডিত প্রধান” বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ভাড়াই হইবেন। ইহার সকলেই বারেন্দ্রকুল উজ্জল করিয়াছিলেন। নৃসিংহ ওঝা যে রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া স্থায়ী আবাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক ফুলিয়াতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, উহা সম্ভবতঃ কক-কদ্দিন কর্তৃক স্বর্ণগ্রাম অধিকারকালে (১৩৪৮ খৃঃ অব্দে) সংঘটিত হইয়াছিল। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে কুন্তিবাসের প্রৌঢ়াবস্থা প্রমাণিত হইলে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্বে তাহার জন্মকাল অবধারিত করা অসম্ভব হইবে না।



তাহা হইলে ১৪৪০ কিম্বা তৎসম্মিহিত কোন সময়ে কুলিয়া গ্রামে, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন ।

কৃষ্ণিবাস মূৰ্খ ছিলেন, তিনি কথাকাঁদগেব মুখে রামায়ণাখ্যান শুনিয়া তাহা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, প্রভৃতি মিথ্যা সংস্কার এখন দূরীভূত হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ কুণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, এবং বিদ্যাব গৌরবে অর্থস্পৃহা পরিহার করিতে সমর্থ ছিলেন । “পাব মিত্র সবে বলে শুন স্বজবাজে । যাহা ঈচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥ কারো কিছু নাহি লই কবি পরিহার । যথা যাউ তথায় গৌরব মাত্র সার ॥” এই অর্থাবাক্যামিরহিত জ্ঞানপানিত ব্রাহ্মণের চিত্র, পতিত হিন্দুসমাজে এখন আর স্মৃভ নহে, উদ্ধৃত স্থানটি পড়িয়া স্বভাবতঃই আমাদের দুঃখের সহিত এ কথাটি মনে হয় ।

কৃষ্ণিবাসের আত্মবিবরণ । ‘

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহাবাজ ।  
 তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝ ॥  
 বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্তির ।  
 বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥  
 স্তম্ভভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাবূলে ।  
 বসতি করিতে স্থান গুঁজে গুঁজে বুলে ॥  
 গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায় ।  
 রাত্রিকাল হইল ওঝা শুভিল তথায় ॥  
 পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী ।  
 আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥

\* নৃসিংহ ওঝা অগ্নিত হইতে অগ্নস্তম্ভ ঋত পুঙ্খ । ইহার পরবর্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তাহা কুলঙ্গী গ্রন্থের সঙ্গে সকলই ঐক্য হইয়া যাইতেছে ।

কুক্করের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায় ।  
 হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায় ॥  
 মালীজ্ঞাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এখান ।  
 ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥  
 গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি ।  
 দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা হরজিগী ॥  
 ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি ।  
 ধন ধাত্তে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সম্ভতি ॥  
 গর্ভস্থর নামে পুত্র হৈল মহাশয় ।  
 মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয় ॥  
 জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত ।  
 সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥  
 জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব ।  
 রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥  
 মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি ।  
 ধর্ম্মচর্চায় রত মহাস্ত যে মানী ॥  
 নদ-রহিত ওঝা স্নন্দর মুরতি ।  
 মার্কণ্ড বাস সম শান্ত্রে অবগতি ॥  
 শুনীল ভগবান তথি বনমালী ।  
 প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥  
 দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার ।  
 বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিহ স্থথের সংসার ॥  
 কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাক্ষি প্রসাদে ।  
 মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥  
 মাতার পতিব্রতায় যশ জগতে বাখানি ।  
 ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥  
 সংসারে সানন্দ সতত কুন্তিবাস ।  
 ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥

সহোদর শাস্তি মাধব সর্বলোকে ঘৃষি ।  
 শ্রীকর\* ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥  
 বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর ।  
 আর এক বত্তিন হৈল সতাই উদয় ॥  
 মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী ।  
 ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥  
 আপনার জন্মকথা করিব যে পাছে ।  
 মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥  
 সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর ।  
 সর্বত্র জিনিয়া পাণ্ডিত্যে সোমর ॥  
 সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল ।  
 সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে বাহার ॥  
 রাজা গোড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া ॥  
 পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাষা জোড়া ॥  
 গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর ।  
 বিদ্যাপতি রত্ন ওঝা তাহার কোঁড়র ॥  
 ভৈরব স্তত গজপতি বড় ঠাকুরাল ।  
 বারাগসী পর্য্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে বাহার ॥  
 মুখটি বংশের পদ্য, শাস্ত্রে অবতার ।  
 ব্রাহ্মণ সঙ্কনে শিখে বাহার আচার ॥  
 কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে ।  
 মুখটি বংশের বশ জগতে বাখানে ॥  
 আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস ।  
 তখিমধ্যে জন্ম লইলাম কুণ্ডিবাস ॥  
 শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িলু ভূতলে ।  
 উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ।

---

\* মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধরবৃত্ত রাধ'র 'বারমাস্তা' নামক একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । ৯৮ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে ।

দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস ।  
 কৃত্তিবাস বলি নামকরিল। প্রকাশ ॥  
 এগার নিবড়ে \* যখন বারতে প্রবেশ ।  
 হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥  
 বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার ।  
 পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥ †  
 তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার ।  
 যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥  
 সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।  
 নানা জন্মে নানা ভাষা আপন হৈতে শ্রুত ॥  
 বিদ্যা সাজ করিতে, প্রথমে হেল মন ।  
 গুণকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥  
 বাস বশিষ্ঠ যেন বাণ্ময়ীকি চাবন ।  
 হেন গুরুর ঠাকুরি আমার বিদ্যা সমাপন ॥  
 উদ্ধার সদৃশ গুণ বড় উদ্ধার ॥ ‡  
 হেন গুরুর ঠাকুরি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥  
 গুণ স্থানে মেলানি ॥ লইলাম মঙ্গলবার দিবসে  
 গুণ প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥  
 রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে ।  
 পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম § রাজাগোড়েশ্বরে ॥  
 দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম ।  
 রাজাক্ষয় অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥

\* নিবড়ে,—অতীত হইলে ।

† বড় গঙ্গা যশোহরে : “পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গাপার”—অন্নদামঙ্গল ।

‡ উদ্ধার—তেজস্বী

¶ মেলানি—বিদ্যুৎ ।

§ ভেট ( উপহার ) দিলাম, পাঠাইলাম ।

সপ্তমটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি ॥  
 শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥  
 কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃতিবাস ।  
 রাজ্যের আদেশ হৈল করহ সস্তাষ ॥  
 নয় দেউড়ী পায় হয়ে গেলাম দরবারে ।  
 সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে ॥  
 রাজার ডাহিণে আছে পাত্র জগদানন্দ ।  
 তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥  
 বামেতে কেন্দার গাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।  
 পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥  
 গন্ধর্ব্ব রায বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার ।  
 রাজসভা পূজিত তিহ গৌরব অপার ॥  
 তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে ।  
 পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥  
 ডাহিণে কেন্দার রায বামেতে তরুণ ।  
 সূন্দর শ্রীবংশ আদি ধর্ম্মবিকারিণী ॥  
 মুকুন্দ বাজার পণ্ডিত প্রধান সূন্দর ।  
 জগদানন্দ রায মহা পাণ্ডের কোঙর ॥  
 রাজার সভাখান যেন দেব অবতার ।  
 দেগিয়া আমার চিত্ত লাগে চমৎকার ॥  
 পাত্রেরে বেষ্টিত রাজা আছে বড় স্তখে ।  
 অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে ॥  
 চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোক হাসে ।  
 চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওসে ॥\*  
 আজিনায় পড়িয়াছে রাজা মাজুরি ।  
 তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥

\* আওস—গৃহ, অর্থেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা, “তার মধ্যে দেব পদ্মাবতীর আওস । সমীর সকার নাহি পক্ষীর প্রকাশ ॥” আলোয়াল-কৃত পদ্মাবতী ।

পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর ।  
 মাঘমাসে খরা \* পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥  
 দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে ।  
 নিকটে বাইতে রাজা দিল হাত সানে † ‡  
 রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চঃস্বরে ।  
 রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥  
 রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে ।  
 সাত গ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥  
 পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।  
 সরস্বতী-প্রসাদে গ্লোক মৃথ হৈতে স্মরে ॥  
 নানা চন্দ্রে গ্লোক আমি পড়িমু সভায় ।  
 গ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ।  
 নানা মতে নানা গ্লোক পড়িলাম রসাল ।  
 গুণি হৈয়া মহারাজ দিলা পদ্মমাল ॥  
 \* কেদার খাঁ শিরে চালে চন্দ্রনেব ছড়া ।  
 রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥  
 রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান ।  
 পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥  
 পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা ।  
 গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥  
 পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে ।  
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥

\* খরা,—রৌজ খরা,—খনা,—“জোটে খরা, আবাটে ধারা, শস্তের ভার না সহ্যে ধরা ।”

† সানে,—সঙ্কত, ‘সপীসব দেখাঠিয়া অকুলীর সানে’, রাজেন্দ্রনাথের শকুন্তলা ।

‡ পাটের পাছড়া, পট্‌বস্ত্র । ‘পাটের পাছড়া’ শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—“বিনে বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া” মা, চ, গা, ১০ গ্লোক ।

“পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায় ।

খড়ার আঁচল লুট পাএ পড়ি যায় ॥” শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার ।  
 যথা বাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥  
 যত যত মহাপণ্ডিত আছেয়ে সংসারে ।  
 আমার কবিতা কেহ নিম্নিতে না পারে ॥  
 সন্তুষ্ট হইয়া স্বাক্ষা দিলেন সন্তোষক ।  
 রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥  
 প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সন্তরে ॥  
 অপূৰ্ণ জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ।  
 চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত ।  
 সবে বলে ধন্ত ধন্ত কুলিয়া পণ্ডিত ॥  
 মুনি মধ্যে বাখানি বাঙ্গালীক মহামুনি ।  
 পণ্ডিতের মধ্যে কৃষ্ণিবাস গুণী ॥  
 বাপ মাযের আশীর্বাদে, শুক আজ্ঞা দান ।  
 রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥  
 সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের স্মৃতিত ।  
 লোক বুঝাবার তরে কৃষ্ণিবাস পণ্ডিত ॥  
 রঘুবংশের কাণ্ডি কেবা বর্ণিবারে পারে ।  
 কৃষ্ণিবাস রচি গীত সরস্বতীর বরে ॥”

সেই সময়ের কবির বিদ্যামর্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবন্ত ।

উহাতে সদ্যোজ্ঞাত যুথি জাতির সৌরভ  
কবির চিত্র ।

আছে । গুণগ্রাহী গোড়েশ্বরের উৎসাহে কবির

গর্ভিতমস্তক নক্ষত্র-লোক স্পর্শ করিয়াছিল । যে দিন রামায়ণ রচনার ভার  
 কবি হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার শুভদিন, তাঁহার নিজের  
 শুভদিন ; সে দিন তাঁহার শবীরে দিব্য লাভণ্যের জ্যোতিঃ বাহির  
 হইয়াছিল, তাই লোকবৃন্দ ‘চন্দনচর্চিত’ প্রতিভাপূর্ণ ‘কুলিয়ার পণ্ডিতকে’  
 দেখিয়া ‘অপূৰ্ণ জ্ঞানে’ ধন্ত ধন্ত বলিয়াছিল । এই বর্ণনাটি সরল  
 ভাষায় অঙ্কিত প্রকৃষ্টতার একখানি ছবি বিশেষ !

কিন্তু যে রচনা আমরা কুন্তিবাসী রচনা বলিয়া পাঠ করি, তাহাতে ঋগ্‌বৈদ্য কুন্তিবাসী রামায়ণ ভুলভ । কুন্তিবাস কত দূর বিদ্যমান, ইহা একটি যুগের সমস্তা ; পরিষৎ ইহার কিরূপ মীমাংসা করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না ; কিন্তু আমার নিকট কুন্তিবাস-নামধেয় কবি বর্তমান ছিলেন, এ কথা যেরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করা অসম্ভব, এই কথাও তেমনি আর একটি সত্য বলিয়া বোধ হয় । কুন্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাস্তবিকর গণ্ডী কেন অতিক্রম করিবেন, একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে । ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত ‘কুন্তিবাসী রামায়ণ’ পাইতেছি, তাহাতে বীরবাহু, তরঙ্গীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ডীপূজা, এই সমস্ত মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয় দৃষ্ট হয় না । \* সে অনুবাদ গুলি কতকাংশে বাস্তবিকর; প্রতিভা-বজ্র-বিন্দু পথে বঙ্গীয় কবির সূত্র নিষ্কমণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে । ইহাদের কোনগুলি বিশ্বাসযোগ্য ? কুন্তিবাসী রামায়ণ যে, পূর্ববঙ্গে পৌঁছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে ঐক্য হইতেছে ; আমরা ‘ভূমিতে পড়িয়া রাজ্য করে ছটকট । শীঘ্র করি রঘুনাথ গেলেন নিকট ।’ ( পরিষদের পুঁথি \* ) ও “বরিষা গোয়াই গেল শরত প্রবেশ । রাম বলেন না হইল সীতার উদ্দেশ ॥” ( পরিষদের পুঁথি ২৬ পত্র)

---

\* পরিষদের জন্ত আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি, সে রামায়ণ খানা খুব প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; উহা নিম্ন-শ্রেণীর লোকের হাতের লেখা ; ও অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ, কিন্তু এখানে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা শুধু পরিষদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব বঙ্গে যে ১২১৪ খান রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষ্য । আলোচনার সুবিধার জন্ত পরিষদের পুঁথির উল্লেখ করিলাম ।



প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পুঁথিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্তচিহ্ন অনুভব করা যায় । “খুল্লতা পড়িল ছই তিন সাহোদর । রবিল অতিকা বীর বমের দোসর ॥” ( পরিশব্দে পুঁথি ২২৭ পত্র ) এই ছই ছত্র ৩ প্রায় একরূপ । কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই ছই ছত্রের পরে “চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন । অঁচরণে হান দেও কোশলানন্দন ॥” রাবণ-সন্তান বলি দখা না করিবে । দয়াবয় রামনামে কলঙ্ক রহিবে ॥” আছে, এইরূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ পূর্ক বঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না । এরূপ হইল কেন ? সুমধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যান, রাম ‘কমল-নাথির’ কমলাক্ষ রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব । দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া চণ্ডী পূজার উদ্যোগ প্রভৃতি সুন্দর কাহিনী পূর্ববঙ্গের পুঁথিগুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন ? আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে ; শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে । বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তব গান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন ; এই ছই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । ইহাকে ঠিক বিকৃতি বলা যায় না । বীরবাহুর সম্বন্ধে—“ধরণী লুটাবে রহে যুড়ি ছই কর । অকিঞ্চনে কর দখা রাম রঘুর ।” এইরূপ উক্তি পড়িয়া ভূপতিত কৌপীনসার শিখায়ুক্ত বৈষ্ণবের কথাই মনে পড়ে, নতুবা যাকে বলে রাক্ষস, তাহাব এ দৈন্ত্য কল্পনা করি-  
 . বার কবিগুরু বাঙ্গালীকি কোন সুযোগ দেন নাই ; শুধু রামলক্ষ্মণের প্রতি এই ভক্তি নহে, বীরবাহু “প্রণমিল ভক্তবৃন্দ বত কপিগণে ।” এই কপিগণ যে চৈতন্য-প্রভুর পারিষদবর্গের ভ্রায় স্পষ্টরূপে গুণচূড়া, ললিতা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট । তৎপর বাবণের মুখে “জন্মিয়া ভরতভূমে আমি ছরাচার । করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার । অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময় । কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয় ॥” রামের

নিকট এই মিনতি পড়িলে অতুতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী, চৈতন্ত-প্রভুর নিকট যে ক্ষতি পাঠ করিয়াছিল, তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক ; লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর বিস্মৃত হইয়াছেন যে রাবণের লক্ষা ভুলিয়া তাহাকে ভারত-ভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন । কিন্তু বোধ হয়, তরঙ্গীসেনের উপরই বৈষ্ণবপ্রভাব সর্ক্সাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে, তিনি রীতিমত বৈরাগী সাজিয়া যুদ্ধে গমন করিতেছেন, গঙ্গা-মুক্তিকার হরেকৃষ্ণ ছাপ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, “অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারি পাশে । তরঙ্গীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ।” হাসিবার ত কথাই, এবস্থিৎ হরি-সংকীৰ্ত্তনের যাত্রী পথ ভুলিয়া খোলার পরিবর্তে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আসিলেন, তাহাতে কপিগণ কেন হস্তসম্বরণ করিতে পারিবেন ? তৎপর তরঙ্গীব রাম-শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন ; এইখানে বঙ্গীয় রামায়ণ ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াছে । এই রামায়ণে রাম লক্ষণ ত নিত্যানন্দ ও চৈতন্ত প্রভু সাজিয়া কেবল ভক্তের অশ্রুজল লক্ষ্য করিতেছেন এবং সেই উচ্ছ্বাসে নিজেরাও কাঁদিয়া বিভোর হইতেছেন ; কখনও সমাগত যুদ্ধার্থীর ভক্ত দেখিয়া বলিতেছেন—“রাম বলেন ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয় । আশীর্বাদ করি বেন বাহ্য পূর্ণ হয় ।” কিন্তু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, —“কুত্র পুরী লক্ষা দিয়া ভাণ্ডিবে আমারে । না পারিবে কদাচন এই ছুরাচারে । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গৌসাই তোমার শরীরে ।” বলিয়া ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে গোস্বামীমহাশয়ের বর প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিক-রেণু-রঞ্জিত সংকীৰ্ত্তন-ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা রোল খোল বাদ্যের মুহূর্ত্তা গ্রহণ করে । যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপবোধী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার স্নেহে নরনাশ্রয় বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, চক্ষুজল এতদেখের একটি

প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস করিবার কোন কারণ নাই । রামায়ণ উক্তরূপে পরিবর্তিত হইলেও ইহা ঠিক বিকৃতি বলিয়া আমরা অগ্রাহ করিতে পারি না । যদিও রাক্ষস বীরবাহুর শ্রীরামচন্দ্রকে “রাক্ষসঘিনাশকারী ভুবনমোহন” বলাতে রাক্ষসী বীর্ষ্য-বস্তার বিরুদ্ধ ভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাত্‌কালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি উল্লঙ্ঘন করে নাই । বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্য-করী হইয়াছিল ; এই বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অমুবাদ সম্পূর্ণরূপে শাসিত । এ সমস্ত রচনা পরবর্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বঙ্গীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অমুকুল হইয়াছে, এই জন্ত যোজনা হইলেও উহা বিকৃতি নহে । ত্রিপুরা, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে মূলগ্রন্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না । সে সব দেশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যামন্ডর, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না ; শুধু ‘ফা’ স্থলে ‘ফাল’, ‘মা’ স্থলে ‘মাও’ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের শব্দগুলির দিকে অমুকুলতা দৃষ্ট হয় ; পরিবর্তন শুধু শব্দের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্তন ত দেখা যায় না । তবে এক কৃত্তিবাস পূর্ব ও পশ্চিমে দুই রূপে উপস্থিত হইলেন কেন ? যদি প্রকৃতপক্ষেই পূর্বোক্ত উপাখ্যানগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশগুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্তন করিতে পারি ? তরঙ্গীর কাটামুণ্ড ‘রাম রাম’ বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয় ; আমরা রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসিক বৈষ্ণবভাবেরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব ? আমরা একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইরূপ নূতন পাইয়াছি,—

“বান্ধীকী বলিলা গোসাঞি তুমি অন্তর্যামি ।

ডোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি ।

কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার ।

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম অবতার ।

সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত ।

যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেড়িত ।

সর্ব সুলক্ষণ যার হয় অবিষ্টান ।

হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সূর্য্যের সমান ।

ইন্দ্র যম বায়ু বকণ সেই বলবান ।

জিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান ॥”

ইত্যাদি,—বে, গ, পুঁধি ৪ পত্র ।

বিক্রমপুং ইহাতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পুঁথির প্রারম্ভও এইরূপ  
কৃত্তিবাস এবং বান্ধীকী ।

হটক, ত্রিপুরা, ত্রিহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি  
স্থলের কাঁতিপয় হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণ-  
সম্বন্ধে জটিল সমস্তার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি । ঐ সব উপাখ্যান  
বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে, তাহাও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা  
যায় না । ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্পায়তনে অথচ  
যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বান্ধীকীর রামায়ণ সেইরূপ  
প্রতিবিম্বিত হয় নাই ; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা  
নহেন,—দেবোপম ; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবহ্নার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে  
ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র । কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম নৈবেদ্য-  
হারী গড়া পুতুল, তুলসীচন্দনে লিপ্তবিগ্রহ । তিনি কোমল কন-  
পল্লবের ইজিতে সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর  
ব্রাতা, প্রেমাক্র-পূর্ণ-চন্দ্র ; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরট  
ভূগীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন, মূলে আছে, কোশল্যা বনগত পুত্রকে

স্মরণ করিয়া স্মৃত্ত্বের নিকট বলিতেছেন,—“রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া নিজা হৃৎ উপভোগ করিত, এখন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভূজে শির রক্ষা করিয়া কিরূপে শরন করিবে ?” রামের চিত্র পাছে কঠোর হয়, এই ভয়ে কুন্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভূজের কথা উল্লেখ করেন নাই । কি তীক্ষ্ণ ! প্রকৃতই যদি রামের ভূজ কোমল কিশলয়োগম হইত, ও “চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা”\* থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখন-কার ঐতিহাসিকদিগের মতামুসারে, আৰ্য্য-ভূজ বলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত ! শৌর্য্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা নহে । মূল রামায়ণে বামের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস বলিয়াছেন,—“বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্ত্তি দর্শন করি, ধমুস্পাণি রামমূর্ত্তি ছায়ায় কাননের সর্বত্র দর্শন করিয়া নির্জনে চমকিত হই।” যখন গদগদনাদী গোদাবরীতীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বৃক্ষকে শোকরক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পান নাই, পথে রক্তহিন্দু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্তৃক সীতাবধ আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরট ধমুতে জ্য় আরোপণ করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর ভ্রায় করাল বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, ত্রিপুরাস্তক হরের ভ্রায় কি যুগান্তকারী কালের ভ্রায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ । সে সব কথা প্রলাপ হউক, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর ! সেই ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া পড়িয়াছে । কুন্তিবাসী রামায়ণে এই সব ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই । যে আনন্দে প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত, পদ্মসম্পীড়িত পম্পাবারি, কান্তোপভূক্তা অলস-গামিনী প্রভাতকালে রমণীর ভ্রায় বর্ষা-ক্ষয়ে নদীর ধীর মধুরগতি, শৃঙ্গধারী ককুদ্বানের ভ্রায় বালেন্দুশীর্ষ মেঘের পট, হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এই নানাবিধ প্রকুলতার উদ্ভাদকর ছবি, কুন্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই । কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের

\* লঙ্কাকাণ্ড, বিদ্যাৎজিহ্বা কর্তৃক মারামুণ্ড নির্দ্বাণ দেখ ।

সৌহার্দ্য, কোশল্যার শোক, সীতার ( ক্ষাত্ত্রের তেজ ও ব্রহ্মচর্য্য নহে )  
 গৃহস্থবধূর স্তায় ত্রীড়ানত মাধুরী,—বোধ হয় মূল্যাপেক্ষা অল্পবাদে আরও  
 স্নন্দর হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠই  
 ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বস্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,—  
 তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা । ইহা  
 খৃষ্টীয় কোমলতা হইতেও স্নন্দর ; ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্তু পূর্ণতা  
 বৈষ্ণবীয় পদাবলীতে ।

বাঙ্গালীর নিজভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত  
 হওয়াতে ‘রামায়ণ’ বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে । মিত-ব্যয়ী  
 বণিক্ কুদ্ৰ দৌপাধার অকাতবে তৈল পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দ্ধরাত্র  
 জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল  
 করে ; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত । উহাব  
 অপরিষ্কৃত মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তরের কথা  
 স্মরণ করাইয়া দেয় ।

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত  
 করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের আশানুব  
 পাঠ-বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা । উপর উৎপীড়ন হইতেছে । কিন্তু যাহারা  
 উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা  
 প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন পুস্তকের  
 হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন ;  
 পরবর্তী পুঁথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয় ।\* এক জয়গোপালের

---

\* “Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later MSS. always giving a smoothed down version of the ancient dialects.” Mahámahopádhyaýa Hama Prashad Shástri's Pamphlet on 'old Bengali Literature'. P. 3.

উপর জুড় হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে তাহা দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি? প্রত্নতত্ত্ববিদগণের প্রীতি অর্থকরী নহে।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুঁথিগুলির এইরূপ পরিবর্তন সর্বাত্মকই পরিতাপের বিষয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময়-উপযোগী ভাবে ভাষাব একটু একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের বচিত রামায়ণ এখন পর্য্যন্তও এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংরেজী চচ্চারের গীতি কয় জনে পড়ে?

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কাবণেই উদ্ধার করা আবশ্যিক। আধুনিক শব্দের মনোহারিত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল রামায়ণশ্রবণে সূখী হইবে কি না বলা যায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদিগোরব কৃত্তিবাসকে সমুচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহাব না হয়?

আমরা যে সব রচনা কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্বগোরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিষপত্র হয়ত এই জয়গোপাল কি পূর্ববর্তী কোন জয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে, কৃত্তিবাস হয়ত তাহা পাইলেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে,—অবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই,—

“সোলাধরী নীরে আছে কমল তানন।

তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।

রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।

চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।  
 চন্দ্রকলা জমে রাহ করিলা কি প্রাস ॥  
 রাজ্যচ্যুতা বদাপি হয়েছি আমি বটে ।  
 রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে ॥  
 আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে ।  
 কৈকয়ীর ঘনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥”

রামায়ণ ভিন্ন ‘যোগাখ্যার বন্দনা,’ ‘শিবরামের যুদ্ধ,’ ‘রুম্মাজদ রাজার  
 একাদশী’ প্রভৃতি অপর কয়েকখানি: কুজ  
 কবির অন্ত্যস্ত রচনা ।  
 পুঁথিতে কুজিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় ,

### ( খ ) অনন্ত-রামায়ণ ।

কুজিবাসের পরে ষাঁহার রামায়ণ রচনা করেন, তন্মধ্যে ‘অনন্ত-  
 রামায়ণ’ খানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় । শ্রীবৃন্দ  
 কক্কণানাথ ভট্টাচার্য্য ‘মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন ;  
 ইহা বকলে ‘লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণ শীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি  
 পত্র নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতির স্মরণ নির্ধারণের উপায় নাই ; বকলে লিখিত  
 ও “দেখিতে অতি প্রাচীন” ইহাট এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ,  
 ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা । শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান  
 বড় নিরাপদ নহে, অল্প প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ  
 করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফস্বলের  
 ভাষা এখনও প্রাচীন শব্দপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে  
 যে, বর্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্ত পল্লীর প্রচলিত ভাষা  
 লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অল্প গবেষণার সাহায্যে আমরা  
 তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌছাইতে পারি ।  
 তবে অল্প প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা পরীক্ষা ভিন্ন সময় নির্ধারণ  
 সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই ; অনন্তরামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও



প্রাচীন, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত ; আমরা ইহা নূন পক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান কি তৎসংক্রান্ত অত্র কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্বিত পুঁথি-খানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব্দ দৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহট্ট কিম্বা তৎসম্বন্ধিত কোন জনপদের অধিবাসী ; ‘চ’ স্থলে ‘ছ’ ব্যবহারের দ্রষ্টব্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্টবাসী বঙ্গুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পুঁথিতে ‘চরণ’ স্থলে ‘ছরণ’ ‘বচন’ স্থলে ‘বচন,’ ‘চাস’ (চাহিস) স্থলে ‘ছাষ’, প্রভৃতি রূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অত্যান্ত শব্দে শ্রীহট্টপ্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয় ; তবে এ কথাও একবার মনে উদয় হয়, যে কবি না হইয়া গ্রন্থলেখকও শব্দের এবম্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন ;—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তদ্রূপ বিকৃতির উদাহরণ ৩ আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি।

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না।—আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্বোত্তর কিম্বা পশ্চিমোত্তর সীমান্ত-স্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত ককর্ণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুঁথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই।

অনন্ত রামায়ণের ভাষা জটিল ও বহুর, শুধু কাব্যামোদী পাঠক ছাড়া পৃষ্ঠা পাঠান্তেই ক্লান্ত হইয়া সুললিত বটতলার কুন্তিবাসী আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, “এটি বুলি মকমকি কান্দে রঘু রাই”—(রঘুরায় ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগি-

লেন) প্রভৃতি রূপ রামবিলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি শ্রবণে পাঠক হস্ত না করিলেই করুণ রসের মর্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। তবে, বজ্র ও হুরারোহ স্থল ভ্রমণেরও একরূপ আকর্ষণ আছে, তাহা না হইলে দিল্লীর তাজমহাল ও কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের সুন্দর সুপ্রাণস্ত পথ থাকিতে গোমুখীর উৎপত্তিস্থল দেখিবার জন্ত বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আর্টিক সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া বরফের রাজ্য খুঁজিবার জন্ত এ্যাক্সির মত লোক ক্ষেপার মত প্রাণ উৎসর্গ করিতে চান কেন? সেইরূপ প্রাণান্ত উদ্যমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ও 'তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি স্তবিস্মল আশ্চর্য্যপ্তি আছে; এই সব প্রাচীন পুঁথি পাঠের উৎকট ধৈর্য্যেরও তদ্রূপ এক আকর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক জীবনোৎসর্গ না করিতেছে, এমন নয়।

অনন্ত নামক কোন কবি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া স্বাক্ষর (ভণিতা) দেওয়ার সময় নিজকে 'মূর্থ'—“মহামূঢ়” প্রভৃতিরূপে বর্ণনা দ্বারা সৌজত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি স্থলে শঙ্কর নামক কবির কথাও ভণিতার পূর্বে দৃষ্ট হয়, যথা “জয় জয় শ্রীমন্ত শঙ্কর পূর্ণকাম। কীর্তনের ছন্দে বিরচিত গুণনাম।”—যে স্থলে অপরাপর পুঁথিতে ‘ধূতা’ শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, অনন্ত “ঘোষা” শব্দ ও শ্রোতৃবর্গের স্থলে ‘সভাসদ’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

অনন্ত-রামায়ণ মূলতঃ বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে অধ্যাত্মরামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে, এবং কবি যতই কেন নিজের অবনতি-সূচক ব্যাখ্যা দ্বারা মূর্থত্বের ভাণ করুন না, আমরা বলিতে বাধ্য, তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, কোন অনর্থক বাগাড়ম্বরে তৎকৃত রামায়ণ ক্ষীণ হইয়া উঠে নাই, রূপ-

বর্ণনার আতিশয্য দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে নিবিড় করিয়া তুলেন নাই, অনুবাদ মূলানুযায়ী হইয়াছে, তবে মূল কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, সংস্কৃতের বহ্বাতয়নত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অনুবাদটি সরস রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাহাদুরী বটে।—অনন্ত রামায়ণ জটিল, দুঃসহ শব্দবহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূর্ণ ভাষার বন্ধুরতাহেতু সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও একটু ভাবিয়া পড়িলে পুঁথি-খানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনন্ত রামায়ণের অন্তত ভাষাময়ী কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরগী। কিবা নাম তোমার কহিবে মূলকণি। জনকনন্দনি মঞ্জি নাম মোর সিতা। দশরথপুত্র শ্রীরামবিবাহিতা। পিতৃবাক্য পালি রাম বনে আসিলন্ত। লক্ষ্মণে সহিতে যুগ মারিবে গৈচন্ত। আসি লভ ফুল জলে পুজিবা ছরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করি যৌক মহাজন। উদবিগ্ন মনে সিতো বোলে ধব করি! তপসি নহিকে মঞ্জি জানিবা মন্দরি। জগত রাবণ জাক হুনি আছ কর্ণে। জাহার সদৃষ বড়া নাহি ততুবনে। হেনয় রাবণ আসি ভৈলো তবু গাব। রামক তেজিয়া বাঁকৈ কর মোতে আব। বত পাটেশ্বর মোর সব তোর দাসি। জোহাখোজ সেহি দিবো থাকিবো উপাসি। মানুষ রামকে বাঁকৈ হুঁরে পরিহর। মঞ্জি সমে যুগে যুগে রাজ্য ভোগ কর। হেন হুনি ক্রোধে সিতা বুলিলন্ত বাণি। ছুর গুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘুপ্রাণি। নিকোট গোটর তোর এত মান সাব। ছুর ডাকুলি হঁরা গঙ্গা নানে জাব। রাঘবর ভার্যাত তোহোর ভৈল মন। তিখাল খাস্তাত জিহ্না ঘবস দুর্বন। হাতে তুলি কালকূট গিলিবাক ছাস। সপুত্র বাকবে পাপি হৈবি সর্বনাশ। আনো বঁহতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত দিক দিবেনু জুআই।” আরণ্যকান্ত।

কবি যখন নিজেই বলিতেছেন রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদিত হইল তখন উদ্ধৃত অংশে “ভীরাংশুঃ শিশিরাংশু ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি। নিক্ষিপ্ত স্তরবো নদাশ্চ ভ্রমিতোদকঃ।” প্রভৃতি রাবণোক্ত তেজঃপূজ কথ্যগুলি না পাইয়া আমাদের হৃৎখিত হইবার কারণ নাই,—কালকূটবিষ পীড়া স্বত্ত্বমান গন্তমিচ্ছসি, ও জিহ্নয়া লেচি চ কুরম” প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দলালিত্য ও

শব্দবাৎসর্যচ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে, কবি সংক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাগ্মীকিও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন । অনন্ত রামায়ণ, পরাগলী মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ বঙ্গভাষার এক অতি প্রাচীন স্তর উদ্ঘাটন করিবার দেখাইতেছে—যে যুগে প্রাকৃত, হিন্দী, ও উড়িয়া এই তিন ভাষার লক্ষণাক্রান্ত বাঙ্গালা এক বিকট মিশ্ররূপ ধারণ করিয়া আধুনিক মার্জিত অবয়বের বহু ব্যবধানে সুললিত সংস্কৃত শব্দাদির সাহচর্য্য-বিরহিত হইয়া, 'গ্রাম্য ক্ষেত্রে কৃষকমণ্ডলীর ভোগ্য ছিল,—এ যেন সেই যুগের ভদ্রসমাজের অনাদৃত ভাষা,—সে সময়ে যে সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইতর সাধারণেব ব্যবহৃত ও শিক্ষিতগণের চক্ষে ঘৃণিত সেই কালের বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য্য সর্বসাধারণের আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের কঠিন ও অশুদ্ধ রচনা আমাদের চক্ষে এক পবিত্র স্বদেশহিতৈষিতার উচ্চ মূল্য বহন করে, আমরা তাঁহার জটিলতা, অমার্জ্জনা ও গ্রাম্য দোষরাশির মধ্যেও সেই নির্ভীক ভাষা গঠনের প্রাক্ চেষ্টার সৌন্দর্য্যানুভব করিয়া—অন্তরূপে এই সকল উদ্যমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি ।

### অনুবাদশাখা ( গ ) ।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এবং শ্রীকরনন্দী ।

৪৫০ শত বৎসরের আর্বিক হটল রামায়ণের প্রথম অনুবাদ রচিত

হইয়াছিল, আর ৩০০ বৎসরের কিছু অধিক

মহাভারতের  
অনুবাদবচকগণ ।

হটল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন,

মধ্যবর্তী দেড় শত বৎসরের মধ্যে অল্প বেহ

মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাট, একপ অনুমান কথা বোঝ হয়  
সঙ্গত নহে, এই বিশ্বাসে মহাভারতের লুপ্ত অনুবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত

হই। স্মৃতির বিষয় পূৰ্ব বঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন; শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যকরূপ প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের যে ভূশিলাভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বহুসংখ্যক অনুবাদ রচকগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। নক্ষত্র-রাজির জায় অসংখ্য মহাভারতের অংশরচকগণের নাম এস্থলে উল্লেখ নিশ্চয়োজন। অনুমান ও কল্পনার দূরবীক্ষণবোণে এই সকল কবি নক্ষত্রগণ এসময় হইতে কত দূরে অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও এস্থলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব না।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হইবে, স্মতরাং

৪০০ বৎসর পূর্বের অনুবাদ পাওয়া গেল,  
বিবিধ অনুবাদের সাদৃশ্য।

এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন;—“শ্রীযুত নাথক সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।” বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র। স্মতরাং কবীন্দ্র রচিত মহাভারতাপেক্ষাও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি “বিজয় পণ্ডিতের মহাভাবত” নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের সঙ্গে এত বেশী মিলিয়া যাইতেছে, যে কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাহার পৃথক্ উল্লেখ নিশ্চয়োজন। “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত”-অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়া ও সঞ্জয়রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী ভারতানুবাদগুলি

রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতানুবাদক কবি কে ? কোন আধ্যাত্মিক শক্তিসন্ধারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মাদিগকে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন এ বিষয়ে খাঁটি সত্য অবধারণ করার দ্বিতীয় পন্থা নাই ; তবে আর একটি অনুমানও আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়, মাগধ ভাটগণ প্রাচীন কাল হইতে রাজস্ববর্গের স্তুতিপ্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, এখনও গ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন, যাহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানি অতি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-বিরচিত।  
 সঞ্জয়-কৃত মহাভারত। ইহার ঐতিহাসিক কোন তথ্য পাওয়া গেল না ; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। কবীন্দ্র-রচিত প্রাচীন পুঁথি যেখানেই পাওয়া বাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুঁথির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন 'হস্তাক্ষরযুক্ত' দুই চারি খানা সঞ্জয় ভারতের পৃষ্ঠাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, 'এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের প্রচার অনেক বেশী ; সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, গ্রীহট্ট,

ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি সর্বস্থলেই পাওয়া যাইতেছে স্মৃতিরূপে এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে। সঞ্জয় রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীজ্ঞের ভারতে দৃষ্ট হয় ; যযাতি ও দেবযানির মিলন-বর্ণনা আমরা উভয় কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিব ;—

“কলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময় ।

সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয় ॥

বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে ।

কস্থা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে ॥

কেহ মিষ্ট ফল পাই, কেহ মধু পিএ ।

শশ্বিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবএ ॥”

সঞ্জয়, বে, গ, ১১ পত্র ।\*

“একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি,

শশ্বিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা ।

ঋতুরাজ মধুমাংস, ক্রীড়াখণ্ডে অর্তিলাব,

চলি আইল পুষ্পবন যথা ॥

নানা পুষ্প বিকশিত, গন্ধে বন আমোদিত,

কুসুমের নমিত হৈছে ডাল ।

কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিন্দুরে প্রাণী,

ভ্রমর করয়ে কোলাহল ॥

১. সঞ্জয় গবর্ণমেন্টের জন্ত যে হস্তলিখিত সঞ্জয়ের পুঁথি খরিদ করা হইবাচে, এহার শেষ পত্র এইরূপ ;—

“এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইছে। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্মাণঃ র ইহার দক্ষিণা জন্মাবধি সামান্ততাক্রমে অল্পপত্রে প্রতিপালা হইয়া সপ্রজ্ঞাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবারহ আজ্ঞা হইল। শুভমন্ত শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কা্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিব। দ্বিতীয় গ্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রীমূলগ্রাম লেখকের নিজ গ্রাম।”

সানন্দিত বন দেখি,                      মিলিয়া সকল সখি,  
 ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে।  
 মলয় স্থধীর বাণ্ড,                      ধীরে ধীরে বহে বাণ্ড,  
 প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে।  
 হেন সময় যযাতি,                      বিধাতা নির্বন্ধ গতি,  
 মৃগয়া কারণে সেই বনে।  
 ভ্রমিয়া কাননে চাএ,                      মৃগ কোথা নাহি পাএ,  
 কন্তা সব দেখি বিদ্যমানে।  
 তার মধ্যে এই কন্তা,                      কাপে গুণে অতি বন্তা,  
 জিনি রূপে রক্তা উর্ধ্বশী।  
 অবারে বাধুলি জ্যোতি,                      দশন মুকুতা পাতি,  
 বদন জ্বলষে যেন শশী।  
 নয়ন কটাক্ষ শরে,                      মুনি জন মন হরে,  
 জয়গে কাম ধনু ধারা।  
 চারিত্রিতে সহচরী,                      বসি আড়ে সারি সারি,  
 রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা।  
 শয়ন করিয়া আড়ে,                      রতি কাম অভিলাষে,  
 বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।  
 শর্পাঙ্গা চাপে পাও,                      কোন সখি করে বাণ্ড,  
 কোন সখী যে গায় তাম্বুল।

কবীন্দ্র, হস্তলিখিত পুঁথি।

এইরূপ অনেক স্থানে কবীন্দ্র সঞ্জয়ের উপর তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি  
 বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থানে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত  
 হইয়া বোম্বন্ধপু গাজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমবক্ষেত্রে অবতরণ  
 করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থানে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে  
 এই প্রসঙ্গ এবং অত্যাশ্চর্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই।



সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্ক ১৪ পত্রে, অমুশাসন পর্ক ৩ পত্রে, মহাপ্রস্তা-  
নিক পর্ক ৩ পত্রে ও সৌপ্তিক পর্ক ৫ পত্রে সম্পূর্ণ ; সুতরাং প্রায় স্থলেই  
বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত । মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন সামগ্রী ছিল,  
এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয় । খাঁটি  
কৃত্তিবাসী রামায়ণের ছায় খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি দুর্ঘট । আমি  
একখানি মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অকুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছি ।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্বন্ধে কত কবি শাখা-কাবোর উৎ-  
পত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । শকুন্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ্র-  
দাস কবি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয় ভারতের অন্তর্বর্তী  
করিয়া দিয়াছেন ; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্কটি সংযুক্ত করিয়াছেন ;  
গোপীনাথ কবি জ্যোৎস্না পর্ক সংলগ্ন করিয়াছেন । তাঁহাদের বাক্য-বিশ্বাস  
উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকৃষ্ট, ভাব নব-যুগের প্রভা-ধারী ; কিন্তু  
সঞ্জয়ের রচনা অনাড়ম্বর, সংক্ষিপ্ত ও সরল । অথচ এই সমস্ত উপকরণ-  
বাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত ‘তালের বড়াব’ ছায়া নামমাত্র  
তালের কীর্তিই ঘোষণা করিতেছে । কোন কোন পুঁথির আধিকাংশই  
অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম ‘সঞ্জয়কৃত’ মহাভারত ।  
নাট্যগদ্যে ও বিজয়গুপ্তের পদ্যপুর্বাণেব অবস্থাও এইরূপ ।

এই সংক্ষিপ্ত সবল বর্ণনায়ুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এত বেশী হইল  
কেন ? কবি যজ্ঞবল্ক্য, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনেব, এবং বাজচন্দ্র দাসের  
উজ্জ্বল পংক্তি নিচয়ের যশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন ?  
বোধ হয় ইহা প্রাচীনতম কীর্তি, এই জন্ত ।

আমরা সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ  
প্রমাণ দেখিতেছি,—যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক  
বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন একথা নিশ্চিত হইয়াছে ।  
মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোকহিতসংকল্পে তাহা বীজালা ভাষায়

প্রচার করিতেছেন, প্রতি পত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়\* ; “অতি অন্ধকার বে মহাভারত সাগর । পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জল ।” (বে, গ, পুঁথি, ৪৬২ পত্র) প্রভৃতি কথা পাঠ করিলে মনে হয়, মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগমা ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণে প্রচারিত করেন ।

কুন্তিবাস ভিন্ন অত্র কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় না । মহাভারতের পূর্ববর্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না ।

এই সঞ্জয় কে ? তাঁহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই, একবার ভাবিয়া-  
 সঞ্জয়ের পরিচয় ।  
 ছিলাম বিদুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্য-  
 প্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি ? দ্বুতরাষ্ট্রের  
 নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন, স্মতরাং যুদ্ধপর্য্যন্তলিতে সঞ্জয়  
 কহিতেছেন, এ কথা মহাভারত মাঝেই থাকিবেক । এই সঞ্জয় কি সেই  
 সঞ্জয় ? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সঞ্জয় কবি নিজেই সতর্ক  
 হইয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন,—

“ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময় ।

সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয় ॥”

বে, গ, পুঁথি ৫৭৭ পত্র ।

“সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয় ॥” ৫৮৭ পত্র ।

“সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি,

শুনিলে আপদ হৈলে তরি ।” ৫৯৬ পৃঃ ।

“প্রথম দিনের রণ ভীষ্মপর্ক পোখা ।

সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা ॥” ২৩৩ পৃঃ ।

\* বেঙ্গল গ্লবর্ণমেণ্টের পুঁথির, ১৫৯, ১৭০, ১৮২, ৪৪৬, ৫০২, ৫০৫, ৫২৫ প্রভৃতি পত্র দেখুন ।

সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ ; তাহার পরিচয়স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট লাইব্রেরীর জন্ত আমি যে পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই ছুটি ছত্র পাওয়া যায়,—“ভরষাজ উত্তমবংশেতে যে জন্ম । সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মৰ্ম্ম ॥” ৪৬৩ পত্র । যে বংশে শ্রীহর্ষ, কুন্তিবাস ও ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাত কবিত্ব সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন ?

সঞ্জয় কৃত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় লিপিনৈপুণ্য স্থলভ নহে ।

গ্রাম্য ভাষা ও প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা  
সঞ্জয়ের কবিত্ব ।

অনেক স্থলেই বিরাক্তকর, তাহা আদ্যস্ত পাঠ করিবাব ধৈর্য্য শুধু অসামান্য সহিষ্ণু পাঠকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে পাঠক কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন ; গ্রাম্য সরল সৌন্দর্য্যে অনুবাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদু ও কুসুম-সুকুমার হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমার্জিত ভাষার মধ্যেও সংস্কৃত চিত্তের ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ কতকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন কবির উত্তেজনা প্রথরতার পরিচয় দিতেছে । আমরা নিম্নে ছইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম ।

দ্রৌপদীর অপমান ।

“রাজার আদেশ পাই,                      হুঃশাসন গেল ধাই,

সভাতে আনিল একেইয়া ।

একবস্ত্র রজস্বলা,                      দ্রুপদ নন্দিনী বাল।

রাহএ যেন চল নিল হরি ।

মল বোলে সভাজন,                      ধর্ম্মশাস্ত্র অকারণ,

উচিত না বোলে কোন জনা ॥

বাঁদয়ে স্তম্ভরী রামা,                      রূপ গুণে অমুপমা,  
নয়নে বহয়ে জলধারা ।  
অপনে হারিল পতি,                      মোহোর যে কোন গতি,  
উত্তর না দেও সভাজন ।  
দ্রোপদীর বাকা শুনি,                      সভাসদে কাণাকাণি,  
অশ্রুে অশ্রুে মুখ নিরীক্ষণ ॥

তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর ।  
বজ্রসম গদা হস্তে কম্পে থর থর ॥  
থাউক সেবিয়া ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রাজা ।  
কুবল মারি আজি যমে করো পূজা ॥  
কোথায় আছেয়ে ধর্ম্ম কেবা তাহা জানে ।  
কোন ধর্ম্ম সেবি রাজা পাইল দুয়োধনে ॥  
কিবা যে অধর্ম্মে আমি হারি পাশা খেরি ।  
কিবা অধর্ম্মে আনে দ্রোপদীর কেশ ধরি ॥  
কোন অধর্ম্মে বিবস্ত্র। করয়ে রজস্থলা ।  
কোন অধর্ম্মে সভাতে এদয়ে স্তম্ভরী বাল। ॥  
এই দুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ ।  
অস্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অজুন ॥  
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর ।  
তাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির ॥  
বত অপরাধ মোর ক্ষম ভাতৃ সব ।  
আপন অধর্ম্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥  
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল বম ।  
বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম ॥”

সঙ্খ্য বে, গ, পৃথি, ১১৫ পত্র ।

কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ।

“তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে ।  
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে ॥

কে আজি অর্জুনে দেখাইতে পারে ।  
 রত্নের শকট ভরি দিমু আজি তারে ॥  
 বৎসের সহিত দিমু ধেনু একশত ।  
 যে আজি অর্জুনে দেখাইয়া দিব মোত ।  
 লেজ কালা ধোপ ঘোড়া বহে যেই রথ ।  
 তাক দেই অর্জুনেরে যে দেখায় মোত ॥  
 ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সোণ ।  
 তাকাদিমু অর্জুনক দেখায় যেই জনা ॥  
 শ্রাম তরুণী গীত বাদো যে পণ্ডিতা ।  
 একশত সুল্লরী স্তবর্ণ অলঙ্কৃত ॥  
 তাক দেই যেই মোকে দেখায় অর্জুন ।  
 শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে স্তবর্ণ ॥  
 সবৎসা তরুণী ধেনু স্তবর্ণ ভূষণ ।  
 তাক দেহো যে আমারে দেখায় অর্জুন ॥  
 শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গ্রাম একশত ।  
 তাহা দেহো যেই অর্জুন দেখাএ মোত ॥  
 কাশ্মোদ্রিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান ।  
 তাক দেই অর্জুন দেখাএ আশুমান ॥  
 ছএ শত হস্তি যে স্তবর্ণ বিভূষিত ।  
 সাগর তীরেতে জন্ম বীৰ্য্যে স্থানিত ॥  
 চৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সুচরিত ।  
 নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত ॥  
 একরাজ্য এক গ্রাম জুয়াএ ভূষিতে ।  
 মগধের এক শত দাসী দেই তাতে ॥”

এই অংশ পড়িয়া এ্যাকিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্ত এগামামননের চেষ্টা মনে পড়ে,—

“Ten weighty talents of the purest gold,  
 And twice ten vases of refulgent mould ;  
 Seven sacred tripods whose unsullied frame,  
 Yet knows no office nor has felt the flame ;

## শল্যের উত্তর ।

“কোপ বাড়িবার শল্য বলে আরবার ।  
 ফুটিলে অজ্ঞান বাণ না গর্জ্জবে আর ॥  
 অহুদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে ।  
 অগ্নিতে পতঙ্গ মরে তারে কেবা রাখে ॥  
 অজ্ঞান মাংসের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে ।  
 চল্ল ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতূহলে ॥  
 সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দাকণ ।  
 রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অর্জুন ॥  
 চোকা ধার ত্রিশূলেতে যয কেন গাও ।  
 হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও ॥  
 মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থল ।  
 সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নিশ্চল ॥  
 স্তূতপুত্র হৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে ।  
 মশা হৈয়া মত্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে যেনে ॥  
 গর্ভের কাল সাপ ঝোঁকাও কাটি দিয়া ।  
 সিংহকে ডাকহ তুমি শৃগাল হইয়া ॥  
 সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক ।  
 সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জুনক ॥  
 চল্ল উদয় যেন সাগর অন্তর ।  
 বিনি নোকাএ পার হৈতে চাহসি বকর ॥  
 সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন ।  
 শেষ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গর্জন ॥” \*

সঞ্জয়, বে, গ, পুঁথি, ৪৭৭ পত্র ।

Twelve steeds unmatched in fleetness and in force,  
 And still victorious in the dusty course ;  
 Seven lovely captives of the Seshian line,  
 Skilled in each art, unmatched in form divine,  
 All these, to buy his friendship, shall be paid &c.”  
 Iliad, Book IX (Pope's Translation.)

## কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী ।

১৪৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ হুসেন সাহ

গোড়দেশ শাসন করেন ; চৈতন্য-চরিতামৃতে  
সম্রাট্ হুসেন সাহ ।

উল্লিখিত আছে, হুসেন সাহ প্রথমে সুবুদ্ধি  
রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন । একদা পুষ্করিণী-খনন  
কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্তব্যে অমনোযোগী হওয়াতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে  
বেত্নাঘাত করেন । হুসেন সাহ উচ্চবংশজাত ছিলেন, তিনি রাজ-সর-  
কাৰে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৪৯৪  
খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মুজাফর সাহ নিহত হইলে গোড়ের সম্রাট্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত  
হন । মুসলমানী ইতিহাসে এ কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা নাই বলিয়া  
কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন ; বৈষ্ণব গ্রন্থকার সেই সময়ের  
লোক, তিনি হাওয়া হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়  
না ; বরং ইতিহাস আলোচনায এ কথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয় ।\*

বদিও প্রথমতঃ হুসেন সাহ উড়িষ্যার দেব দেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন,†  
তিনি পবে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়া-  
ছিলেন, সন্দেহ নাই । চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি  
চৈতন্য-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ; এ কথার  
অনেকটা বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানতে হইবে, তিনি চৈতন্য-  
প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন । হুসেন সাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্ট-  
গ্রামে নগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বরও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া

“It is however certain, that on his first arrival in Bengal, he  
was for some time in a very humble position”

Stewart's History of Bengal. P. 71.

† “যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে ।

দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে ॥” চৈ, ভা, অস্ত্যখণ্ড ।

পড়িয়াছিলেন । পৃথিবীর যে কোন সম্রাট্ বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘ-কাল শাস্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অসি বল হইতে প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । যে গুণে আকবর ভারত-ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেনসাহ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন । একাকবরী মোহরের স্তায় হুসেনীমোহরও লোকপ্রীতির কল্পিত মূল্যে মূল্যবান । রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

“হুসেন সাহাৰ রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মৰ্যাদা পাইতেন । গোড় বা পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয়, তদ্বারাও বাঙ্গালার ঐশ্ব্যের ও তাৎকালিক শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় ; বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গোড়ে যেখানে সেখানে মূৰ্ত্তিকা খনন করিলে যেকপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূমালিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও বিস্তর ছিল ।”

হুসেন সাহ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন ; যে সভায় রূপ, সনাতন ও পুরন্দর খাঁ সভাসদ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন ; মালাধর বস্তুকে হুসেন সাহ “গুণরাজ খাঁ” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে হুসেন সাহের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, পদাবলীতেও হুসেন সাহের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা “শ্রীযত্ হসন, জগত ভূষণ, মোহ এরস্ জ্ঞান । পঞ্চ গোড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে বলরাজ খান ।\* হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ “ভারত পাঞ্চালী” রচনা করাইয়াছিলেন, এসকল কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি ।



পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ-পর্বে পত্রে পত্রে হুসেন সাহের প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয় ।

এই বাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ বোদ্ধা মগীরাজার সৈন্তদিগকে

চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়া-  
পরগল খাঁ ।

ছিলেন.; একজন স্বয়ং রাজকুমার,—ভাবী

সম্রাট্ নসরত সাহ, অপর—সেনাপতি পরাগল খাঁ ।

ফণী নদীর ( আধুনিক ফেণী ) তীরে চট্টগ্রাম জোয়ারগঞ্জ থানার অধীন ‘পরাগলপুর’ এখনও বর্তমান, ‘পরাগলী দোব’ অতি বৃহৎ এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয় ; পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাসীকৃত ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত । ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্ত-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোকশ্রুতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত, কীটদংশিতবিদ্ধ, লুপ্ততন্তুজড়িত প্রাচীন পুঁথি লুপ্ত শ্রুতির উদ্ধার করিয়াছে ; সে পুঁথিখানি—

‘পরাগলী ভারত ।’

অথবা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত

মহাভারত । \*

তাহার ভূমিকা এইরূপ :—

“নৃপতি হুসেন সাহ ইএ মহামতি ।

পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম স্থপাতি ।

অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার ।

কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার ।

\* কবীন্দ্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুঁথি খরিদ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি তাহা ছাড়া আরও দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি, তাহার এক খানি ২০০ শত, আর একখানি পায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন ।

নৃপতি হসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর ।  
 তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥  
 লস্কর পরাগল খান মহামতি ।  
 হুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥  
 লস্করী বিষয় পাই আইবস্ত চলিয়া ।  
 চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥  
 পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি ।  
 পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি ॥”

কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি ১ পত্র ।

পরাগল খাঁর পিতার নাম 'রাস্তা খাঁ' ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই তাহাদের উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অল্পগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা-রসে পয়ারের বাধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাঁড়াইয়াছে দেখুন ;—

“ফৌগা কল্লতক শ্রীমান্ দীন দুগতি বারণ ।

পুণাকীর্তি গুণাধারী পরাগল খান ॥” বে, গ, পুঁথি ৮৮ পত্র ।

কোন কোন স্থলে “শ্রীযুত পরাগল পদ্মিনী-ভাস্কর” এইরূপ পদ দৃষ্ট হয় ।

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ । এ পুস্তকখানা

উদ্ধাব করা একান্ত আবশ্যক ; শুনিয়াছি

পরাগলী ভারত ।

পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্তমান এবং

তাহারা অবস্থাপন্ন লোক , ইহা প্রথমতঃ তাহাদেরই কার্য ।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না ; সহজ স্থল বাঁছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি :

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন ।

“তার পাছে দ্রৌপদী সৈরকীরূপ ধরি ।

অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী ॥

দূর হৈতে যায় যেন আসিত হরিণী ।  
 নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী ॥  
 দ্রোপদী বোলেন্ত সৈরকী মোর নাম ।  
 দ্রোপদীর পরিচর্যা কৈলু অনুপাম ॥  
 অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল ।  
 স্তদেক্ষা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল ॥  
 সত্য কহ আক্ষাতে ( ' ' ) কপট পরিহারি ।  
 কি নাম তোক্ষার কহ কাহার বরনারী ॥  
 দুই টক গুণ তোর অতি স্তবলিত ।  
 নাভি গভীর তোমার বান্ধা স্তললিত ॥  
 দশন ডালিষ বিজ্জুলি নয়ন ।  
 রাজার মতিষী যেন সব স্তলক্ষণ ॥  
 কিবা গন্ধর্বেয় তুমি হয়নি বনিত ।  
 নাগকন্যা তুমি কিবা নগরদেবতা ॥  
 বিদাধরী কিবা তুমি কিন্নরী রোহিণী ।  
 অনুসূয়া কিবা তুমি ঈর্ষাণী মানিনী ॥  
 উল্লের ইন্দ্রাণী কিবা বকণের নারী ।  
 তোমাকপ দেখি আক্ষি লহতে না পারি ॥  
 স্তদেক্ষার বচন যে শুনিআ তৎপর ।  
 সেইখানে দ্রোপদীএ দিলেন্ত উত্তর ॥  
 আক্ষি দেবকন্যা নহি গন্ধর্বেয় নারী ।  
 সহজে সৈরকী আক্ষি কেশকর্ষ করি ॥  
 মালিনী মোহোর নাম দ্রোপদী ধরিল ।  
 তোক্ষাকে সেবিতে মোর স্তদয বাঙ্ছিল ॥  
 তেকারণে আইলুঁ হেথা বিরাট নগর ।

---

\* 'আমি' স্থানে 'আক্ষি' ও 'তুমি' স্থানে 'তুমি' পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সমস্ত পুঁথিতেই দৃষ্ট হয় । সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয় । শুধু বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের কাপিতে 'আমি' 'তুমি' কপ পাইয়াছি ।

সত্য কথা কৈল এহি তোক্ষার গোচর ॥  
 অদেখাএ বোলেস্ত শুনহ বরনারী ।  
 মাথে করি তোক্ষারে রাখিতে আক্ষি পারি ॥  
 নারী সব তোক্ষা দেখি পাসরিতে নারে ।  
 কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে ॥  
 রাজাএ দেখিলে তোক্ষা মজিবেক মন ।  
 বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন ॥  
 আপন কণ্টক আক্ষি আপনে রোপিব ।  
 মৃত্যুএ ধরিলে সেন বৃক্ষ আরোহিব ॥  
 ককটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ ।  
 তেনমত দেখি আক্ষি তোক্ষারে ধারণ ॥”:

কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি ৫৭ পত্র ।

\* কবীন্দ্র সংস্কৃত উপাধিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন । সেকালের অনুবাদ-প্রণেয় পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে । স্থানাভাবে সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না । দোপদীর বিরাট নগরে আগমনের অধ কওকাংগ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভরত হইতে নহে, মূল বাসের মতান্তরত হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন ।—

### অদেষ্ণেবাচ ।

মুর্দ্ধি, হাং বাসয়েং বৈ সংশয়ো মে ন বিদাতে ।  
 ন চেদিচ্ছতি রাজা ভাং গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা ॥  
 দ্বিয়ো রাজকুলে যাক্ষ যাক্ষেমা মম বেগ্ননি ।  
 প্রসক্তান্তাং নিরীক্ষন্তে পুমানং কং ন মোহয়েঃ ॥  
 ব্রহ্মাশ্চাবস্তিতান পশ্য যত্নমে মম বেগ্ননি ।  
 তেহপি ভাং স সন্নমস্তীব পুমানং কং ন মোহয়েঃ ॥  
 রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুঃসামুদয়ম্ ।  
 বিচায় মাং বরারোহে ভাং গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা ॥  
 অব্যারোহেৎ যথা বৃক্ষানবধায়ৈবাস্বনো নরঃ ।  
 রাজবেগ্ননি তে শুভে অতিভাং শ্রান্তথা মম ॥  
 তথাচক্ৰকটকী গর্ভমাধন্তে মৃত্যুমাশ্বনঃ ।  
 তথা বিধমহং মন্ত্রে বাসন্তব শুচিস্মিতে ॥”

## শ্রীহরির রূপ বর্ণন ।

“পরিধান পীতবর্ণ কুম্ভ বসন ।

নবমঘ গ্রাম অঙ্গ কমললোচন ॥

মঘের বিদ্রুত তুলা হসিত মুখেত ।

শঙ্খা চক্ৰ গদা পদ্ম এ চারি করেত ॥

শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ ।

দগ্ধিমা মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ ॥” ৪৪ পত্র ।

## ভাষ্য পৰ্বে—যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ ।

“দেহ সাতাকি মৃৎ চক্ৰ লইল হাতে ।

ভাষ্য দেণ কাটিয়া পাড়িম্ রথ হৈ ॥

প্তরাষ্ট্র পুত্র সব করিম্ সংহার ।

যুবতির নৃপতিক দিম্ রাজ্যভার ॥

এ বলিয়া সাত কীরে করি সদোধন ।

হস্তেত ঢাউল চক্ৰ দেখে জনাৰ্দন ॥

স্বধেব সমান জ্যোতি সতশ্র বজ্রসম ।

চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম ॥

রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্ৰ লৈয়া হাতে ।

ভাষ্যক নারিতে জ্ঞাএ দেব জগন্নাথে ॥

এম অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন ।

বিন্দু ত সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন ॥

দগ্ধিমা সকল লোক বলিল তখন ।

কোব'বর ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ ॥

পশ্চরে কৃষ্ণের কম্পিত বস্ত্রমতী ।

গজেন্দ্র ধবিতে যেন জ্ঞাএ নৃপপতি ।

সত্তম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃ ॥

নির্ভএ বোলেস্ত তবে সংগাম ভিতর ॥

দীক্ষু পরাগল খান পদ্মিনী-ভাঙ্গর ।

কবাল কহন্ত কথা শুনন্ত লঙ্কর ॥” ১০০ পদ ।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সম্রাট হুসেন সাহ  
সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর

গৌরব কবীন্দ্র বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

“তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল ।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত সকল ॥” বে, গ, পৃথি ৮৮ পত্র ।

ছুটি খাঁও পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধপর্বে  
অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহী লতার  
থায় আকাশ ছুঁইতে ইচ্ছুক । ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তৃষ্টি কিরূপে করিতে  
হয় বিশেষরূপে জানিতেন । কল্পনার তৈলাবাব মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি  
খাঁর পদ সেবা করিয়াছেন । আমরা সাহিত্যপত্রিকায় † বাহা উদ্ধৃত  
করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এখানেও উদ্ধৃত করিতেছি,—

“নসরত সাহ তাত † অতি মহারাজা ।

রানবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥

নুপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি ।

সামদানদণ্ডভেদে পালে বহুমতী ॥

তান এক ক্ষেপতি লক্ষর ছুটিখান ।

ত্রিপুরাব উপবে কবিল সন্নিধান ॥

চ টিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে ।

চন্দ্রশেখর পর্কত কন্দরে ॥

চারলোল গিরি তাব পৈত্রিক বসতি ।

বিধিএ নির্মিল ঠাক কি কহিব অতি ॥

\* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০১ ।

† নসরত সাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পিতা অপেক্ষা তিনি সে দেশে  
বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন । নসরত  
সাহ বঙ্গ সাহিত্যের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ; আমরা  
বৈষ্ণব পদাবলীতেও নসরত সাহের উল্লেখ দেখিতে পাই—“সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে  
হানিল মদন বাণে ।” ( সাধনা, শ্রাবণ ১৩০০, ২৭২ পৃঃ )

চারি বর্গ বসে লোক সেনা সন্নিহিত ।  
 নান গুণে প্রজা সব বসয়ে তথা ॥  
 কণা নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার ।  
 পূর্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার ॥  
 লক্ষর পরাগম্বু খানের তনয় ।  
 সমরে নির্ভেছ ছুটিখান মহাশয় ॥  
 আজ্ঞানুর্লভিত ব.৩ কমল লোচন  
 বিলাস হৃদয়ে মত গজেন্দ্র গমন ॥  
 চতুষষ্টি কলা বসতি গুণেব নির্ভ  
 পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নিপুণতর নির্ভ :  
 ৮৩ বনি কর্ণ সম অগার মতিম ।  
 শ্রেণে বায়ে গাছাবো ন.৩৬৮ উপমা ।  
 ৩৩৩ন য ৩৩৩ ননিয়া নৃপতি ।  
 নথ দিয়া অনিলেক কতৃহতা মতি ॥  
 নৃপতি অগ্রে ৩ তার বচন সম্মান ।  
 যেটিক প্রসাদ পাতল চুটি খান ॥  
 লক্ষনী বিষয় পাওয়া মহানতি ।  
 সমাদান চণ্ড ভেদে পালে বসন্ততা ॥  
 ত্রিপুর নৃপতি য ৩ ৩৩৩ এ.৩ ৩৩৩ ।  
 পকত গহবরে গিয়া করিয়া প্রবেশ ॥  
 গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান ।  
 মহানন মধ্যে তার পূবার নিপুণ ।  
 অদ্য পি ভয় না দিল মহামতি ।  
 তথা পি আতঙ্কে বেসে ত্রিপুর নৃপতি ॥  
 আপনে নৃপতি সন্তুপিয়া বিশেষে ।  
 স্তম্বে বসে লক্ষর আপনার দেশে ॥  
 দিনে দিনে বাড়় তার রাজসম্মান ।  
 যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান ॥

পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাধণ্ড মহামতি ।  
 একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥  
 স্তনস্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা ।  
 মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥  
 অথমেই কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয় :  
 সভাধণ্ডে আদেশিল ধান মহাশয় ॥  
 দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার ।  
 সঞ্চারক কীৰ্ত্তি মোর জগত সংসার ॥  
 তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া ।  
 শ্রীকর নন্দী কহিলেই পয়ার রচিয়া ॥”

ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটি দ্বার পদে পুষ্প বিবদলে অর্চনা । ইতিহাসজ্ঞ মাত্রের স্বীকার করিবেন, এগুলি বুট্টা ফুলের অঞ্জালি ; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধনুর্মানিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়া ছিলেন—ত্রিপুরপাহাড়ের তীব্র বায়ু তাহার সস্থ করিতে অশক্ত । তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে ধনুবাদ দিব ; সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সুন্দর হয়, চার্লস্ সেকেন্ডের নিকট একবার এক কবি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

নন্দী কবির কবিত্ব একটুকু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই মনোরম হইয়াছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের শ্রীকর নন্দীর কবিত্ব ।  
 উত্তর প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিতেছি ।—ভীম যুবনাশ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের জন্ত মনোনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই । অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,—

“বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থল কলেবর ।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্যা যাহার সহচর ॥



ভীমের উত্তর ।

কুঙ্কের বচনে ভীম রুবিয়া বলিল ।  
 মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ।  
 তোমার উদরে বসে বসে ত্রিভুবন ।  
 আক্ষার উদরে ক্ষত অন্ন ব্যঞ্জন ।  
 সংসার উপালম্ব সব খাইল। তুষ্ণি ।  
 তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আক্ষি ।  
 ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাহ্নবতী ।  
 তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী ।  
 তুষ্ণি নারীজিৎ না হও আক্ষি নারীজিৎ ।  
 আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত ।

ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে ত্রুটি-ত্রুটির রাগ মনে পড়ে ।  
 কাশীদাস এস্থল মন্তণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণত্ব হ্রাস হইয়াছে ।  
 একথানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা  
 পাইয়াছি ।—

“কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকর নন্দী” এই গঙ্গানন্দী আবার কে ?  
 শ্রীকর নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে  
 নাগিলেন কেন ? হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় নানা রূপ  
 জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলোয়া ভিন্ন  
 অনেক সময়ই পথ আবিষ্কারের অল্প উপায় দেখা যায় না ।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী ও পরবর্তী অনুবাদকারিগণের প্রায়  
 সকলেই জৈমিনি-সংহিতা \* দৃষ্টে অনুবাদ  
 জৈমিনি-ভারত ।

সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ লিখিয়াছেন ।  
 বাসের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে

\* জৈমিনি ভারতের কেবল অষ্টমের পর্ব পাওয়া গিয়াছে, এখনকার ঐতিহাসিক-  
 গণের মতে জৈমিনি শুধু অষ্টমের পর্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন । ভারতীয় প্রাচীন  
 পুঁথির অনুসন্ধান শেষ না হইলে এই মত অকাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ।

এই পর্য্যন্ত । বঙ্গের মূহু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পাড়িয়াছিলেন ? জৈমিনির প্রতি সকলের লক্ষ্য হইল কেন ?

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ষাঁহাণা হিন্দুসম্মেলন পুনরুত্থানকারী, জৈমিনি তাহাদের অগ্রণী ; তাঁহাদের শিষ্য ভট্টপাদ, রাজা সুধম্মার সভায় বৌদ্ধকুল বজয় করেন । শঙ্কর ইহাদের পরবর্তী । জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন ; মহাভারত শাস্ত্রকারাদিগের ন্যে ছুস্তর ভবসাগর পান হইবাব একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসকৃত সেতুবন্ধ প্রায় ভবসমুদ্রেণ আঘাট বিরাট, তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার কারবা ভবারণের বিপন্ন পথিকদিগকে ত্রাণ করিলেন । জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচাৰিত হইয়াছিল, অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায় । যথা চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তে বিদ্যাশাস্ত্রে,—

“জৈমিনি-ভারত, স্তম্ভ,

তবে পণ্ডে মঘদুত,

নৈষাধ বমার সন্তবে।”

### অনুবাদ-শাখা—( গ ) মালাধর বসু ।

কুলীনগ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন ; গ্রামখানি দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল ; এত পথের যাত্রীগণ মালাধর বসু । বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে ‘ডুরি’ প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ তীর্থে যাইতে পারিতেন না । মালাধর বসু ও ছসেন সাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু ( উপনি পুবন্দব ষাঁ ) এক সময়ের লোক ।\*

\* মালাধর বসু গোপীনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ ছিলেন । পীতাম্বর দাসের ‘রসমঞ্জরী’ নামক পুস্তকের একটি পদদৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বসু ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন । ভগিনীর অংশটি এইরূপ “শ্রীযুত হসন, জগত-ভূষণ, সোহ এ রসজ্ঞান । পঞ্চ গোড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান ।”

বসু পরিবার বৈষ্ণব-ধর্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন ; মালাধর বসুর পৌত্র বসুরামানন্দেন্দ্র নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপারচিত ।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অবন্তন ২৪শ পুরুষ : ইঁহাব পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুবতী দাসী ।

মালাধর বসু হুসেন সাহ হইতে ‘গুণরাজ খা’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । সেকালের উপাধিগ্ৰহণ কিছু অভ্যুত-কমেই ছিল ; ‘পুন্দর খা,’ ‘গুণরাজ খা’ এই সব রাজ-দত্ত খেতাব । আমরা একপাশি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তবাক্যকে ‘কবিত্ত ভূষণ’ উপাধিবিশিষ্ট দেখিয়াছি । এই ‘কাবিত্ত-ভূষণ’ রাজ দত্ত উপাধি অথবা পুণ্ড-নোথকের জাতি প্রশংসাপত্র, স্থির কারণে পাবল্যাম না ; যাহা হউক, ‘গুণরাজ’ উপাধি দেশে প্রচলিত ছিল ; আমরা যষ্ঠাবন কবিত্তে ‘গুণরাজ’ উপাধিযুক্ত পাইয়াছি । অব্যাপকগণ দক্ষণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকেও ‘কমলাক্ষ’ নাম দিতে পারেন, কিন্তু গৌড়ীয় সম্রাট্‌নগুণকে গুণরাজ উপাধি দেন নাহ ; বৈষ্ণবোচিত বিনয় মহাকারে মালাধর নিজকে ‘নিগুণ’ ‘অবন’ প্রভৃতি মংজ্ঞান জ্ঞাপন করিয়াছেন ।

প্রাচীন ভাস্কর্য্যলক ইত্যাদিতে ভোগ এক সচিব অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পুরন্দর এবং যশরাজ খান যে এক ব্যক্তি এত প্রমাণিত হইতেছে না ; অপিচ পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগে ইন্দ্রতুলা, একপ অর্থ করিলে ‘পুরন্দর’ শব্দকে আর মনুষ্য-বিশেষের সংজ্ঞা ব্যপে গণ্য না করিলেও চলে । যাহা হউক সামান্ত্র্য একটি পদের সন্দেহাত্মক ভণিতার উপর নির্ভর কবিয়া আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না । মালাধর বসু আদিশূর আনীত দশরথ বসু বংশীয় ; বংশাবলী নিয়ে প্রদত্ত হইল ।

১। দশরথবংশীয় বৃষ্ণ বসু ( বঙ্গালসেনের সমসাময়িক ), ২। ভবনাথ, ৩। হংস, ৪। মুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর, ৮। ত্রীপতি, ৯। যজ্ঞেশ্বর, ১০। ভগীরথ, ১১। মালাধর বসু ( গুণরাজ খা ) । মালাধরের উদ্ধৃতন ৫ম পুরুষ গুণাকরের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণ হইতে পুরন্দর খা অবন্তন পঞ্চম স্থানীয় ।

১৩৯৫ শকে ( ১৪৭৩ খৃঃ ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে

প্রবৃত্ত হন ও ৭ বৎসরে দশম ও একাদশ  
শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।

স্বক্কের অনুবাদ সমাধা করেন । \* এই অনু-  
বাদ-গ্রন্থের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়,’ কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে  
‘গোবিন্দ-বিজয়’ নাম দৃষ্ট হয় ; শেষ স্বক্কে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত  
হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ নাম দেওয়া হইয়াছে,  
প্রাচীনকালে ‘মৃত্যু,’ বা ‘যাত্রা’ এই দুই অর্থে ‘বিজয়’ শব্দ ব্যবহৃত  
হইত । ভগবতী যে দিন পৃথিবা হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন  
‘বিজয়ার দিন’ নামে পরিচিত ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । মূল

গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে  
মূল ও অনুবাদ ।

অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের  
মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত পাঠ  
করিয়াছিলেন । সেকালে ঠিক অক্ষবে অক্ষবে মিলাইয়া অনুবাদ করা  
পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না ; ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে  
মূলেব সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংশ্রব না আছে এমন নহে ; নিম্নে উদা-  
হরণরূপে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি ।

মূল হইতে অনুবাদিত ;--

( ১ ) “কোন সময় বনেতে প্রথম ভে জন করিব,র মানসে প্রত্নাষে হরি গাত্রোথান  
করিলেন, এবং বৎসপালক বয়স্তদিকাকে প্রবে বিত করিয়া ননোহর শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে  
করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন ।

কতিপয় বালক বংশী বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে,  
কতিপয়াভর্তক ভৃঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অস্ত্র বালকেরা কোকিল সঙ্গে কলরব করিতে

১. “তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ অরম্ভন ।

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥” শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ।

করিতে খেলা করিতে লাগিল। অপর শিশুরা পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক সঙ্গে উপবেশন, ও ময়ূর সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।” শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় \* ;—

“প্রভাতে ভোজন করি শিক্ষা বাজাইয়া ।

পিছে পিছে চলৈ যত বাছুর চালাইয়া ।

একত্র হইল সব যমুনার তীরে ।

নানামতে ক্রড়া করি যায় দামোদরে ।

কথাতে কোকিল পক্ষিগণে নাদ করে ।

তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে ।

কথাতে মর্কটশিশু লাফ দেহি রঙ্গে ।

সেই মতে যায় বৃক্ষ বালকের সঙ্গে ।

কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাদ করে ।

সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে ।\*

কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই ।

তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকান্ধাই ।

কথা বা স্তম্ভকি পুষ্প তুলিয়া মুরারি ।

কত হৃদে মস্তকে এবণে কেশে পরি ।

মূল হইতে অনুবাদিত :—

(২) কোন কোন গোপাঙ্গনা গো দোহন করিতেছিল, তাহার দোহন বিসর্জন পূর্বক স্বেচ্ছক হইয়া গমন করিল। অত্যাচ্ছ গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদায় কাথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা গোপী গোধূম কণায় রন্ধন করিতেছিল, পক অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতে-

\* মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় আমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ এবং পরবর্তী অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

ছিল, অল্প কয়েক জন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্ত্ব কৰ্ম্ম তাগ করিয়া গেল ।  
অল্প গোপালনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবা মাত্র আহাৰ তাগ করিয়া চলিল ।”  
১০ম স্কন্ধ, ২০ অঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,—

সবার জন্মে কান্ত পাবে করিয়া ।  
বেণুধ্বারে গোপীচিৎ শুনিল হরিষা ॥  
হাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন ।  
নিজপতি সঙ্গে কেহ কেহে ছয়ন ॥  
গাভী দোহাযেতু কেহ দুগ্ধ আবর্তনে ।  
গুৰুজন সমান ক'ব কোই জনে ॥  
ভোজন করএ কেহ করে আচমন ।  
বন্ধনের উদোগ করষে কোই জনে ॥  
কাষা হেতু কেহ কাবে ডাকিবাব যায ।  
ঠেল দেখি কোইজন গুৰুজন পাএ ॥  
কেহ কেহ পরিবাব জনেবে প্রবেধে ।  
কেহ ছিল কাব কাষা অনুরোধে ॥  
তেনহি সময়ে বেণু শুনিল প্রবণে ।  
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে ॥

আমরা বাচ্ছিয়া উঠাই নাই ; মূর্খের সঙ্গে মোটামুটি বেশ ঐক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-বহিভূত ।

এই দেবী প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৩ অঃ কয়েকখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আৰ্গ্যাবর্তের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন ; চিত্র-শুদ্ধে দেব দেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণ-হীনা নগ্ন-সৌন্দর্য্যাময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন ; সদ্য-চ্যুত অনাব্রাত মালতী পুষ্পের ত্রায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল ; চিরারাম্য ভূর্গা ও কালীৰ উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া

দিল। বঙ্গদেশে কুসুম-সিংহাসনে, ফুল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্ৰ তুলসী-দলে সাজিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য্য তাঁহারই চরণকমলের স্বর্গার্ক। রাই কান্ন নাম বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ৭ ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতাব শিবে বজ্রাঘাত করা হয়; এই দেশে সেই সব গীতিব তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই।

দানলীলা অংশে কবি মালাগর বসু এত নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দৈব শক্তিতে। বশ্যাসেন সঙ্গে জড়ত, স্তবরাং তাহা কতকাংশে বিশ্ববেরই উচ্ছ্বাস; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়া অলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল ফুটি পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা, কাষ্ঠী-পুর্ণিমা নাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না; চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

“কি ছার চকোর চাঁদ,—ছুই সম নহে।”

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাগর বসু এত স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার থণ্ডে, রাবিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভবে গান দিতে রাখিয়াছে; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতবরা-পরিহিত বংশীবাদী একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নহেন; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুরশিরোমণি; ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেম দান করিয়া অনুগৃহীত করেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নাটক প্রেম দিয়া বৈরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাঠিয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে তখন,—

“ফি হৈল কি হৈল বলি কাদে গোপনারী।”

এবং “কাধকে রুমাল করি হাসয়ে মুরারি।” শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ঃ।

ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন, যে যে উৎকোচ দিবেন তাহার ফল এইরূপ :—

“কেহ বলে পরাইমু পীত বসন ।  
 চরণে নুপুর দিমু বলে কোহু জন ।  
 কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে ।  
 মণিময় হার দিমু কোহু সখী বলে ।  
 কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহু জন ।  
 কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন ।  
 শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায় ।  
 কেহ বলে শ্রগন্ধি চন্দন দিমু গাএ ।  
 কেহ বলে চূড়া বানায়িমু নানা ফুলে ।  
 মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিবলে ।  
 কেহ বলে রনিক শ্রজন বড় কাণ ।  
 কর্ণূর তাধূল সমে জোপাইব পান ।” শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ সব কিছুই চান না । গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—“তিনি বলিলেন,—“প্রথম মণিএ আমি যৌবনের দান ।” রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এ প্রস্তাবে নিজকে বড় অপমানিত মনে করিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া—

“কান্ন বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই ।  
 নবীন কণ্ঠারা আমি নৌকা নাহি বাই ।” শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ।

এই খানে প্রাণের খেলা,—মাদুর্য্যের এক নব বিকাশ চেষ্টা যাহা পদকর্তাগণ সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন, ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরম্ভ ও আরম্ভকের এই গূঢ় চিন্তাসংসোগ—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্তু । তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক সঙ্গারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই, ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল,



স্বীকার করিতে হইবে। ত্রৈচৈতন্যদেব যে সমস্ত ভাষাগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া স্মৃতি হইতেন ত্রীকৃষ্ণ-বিজয় তাহার অন্ততম ।

### (৩) লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা ।

( ক )—লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি ।

( খ )—টাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা ।

( গ )—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও  
কবি জনার্দন প্রভৃতি ।

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সতানারায়ণ, দক্ষিণেন বায় ইঁহার বাঙ্গালীর  
লৌকিক ধর্ম্মের দেবতা ।

ঘরের দেবতা । ইঁহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই  
লিখিত ; বঙ্গীয় গৃহস্থ বধুগণই ইঁহাদের পূজার  
উৎকৃষ্ট পুরোহিত, ইঁহাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধুগণের  
অবশ্য কর্ত্তবোর মধ্যে গণিত ছিল ; ইঁহার কেহ সপ্তাহান্তে কেহ মাসান্তে  
খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন । আমরা পূর্বেই  
বলিয়াছি এই সব দেবতার ছড়া, পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত

হইয়া কালসহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্ত  
ছড়া ও পাঁচালী ।

স্পর্শে সিংহাসন কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে ;  
ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া বহিয়া-  
ছেন । এই সব ছড়া, পাঁচালী শিশুর ক্রীড়নকের ত্রায় নগণ্য, কিন্তু এই  
উপকরণরাশির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি  
করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে  
অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেবল  
কাব্যমোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতি-  
বিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ  
করিবেন ।

লৌকিক-দেবগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে ।  
 লৌকিক দেবতা-পূজার উৎপত্তি ।  
 যেখানে আমরা ছুৰুল হইয়া গড়ি, সেইখানেই  
 একটি ছুৰুলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয় ।

শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত চিন্তিত মাতা  
 কি মাতামহী ব ছুৰুলতাস্থত্রে বস্তু করিত হইলেন । চাওকা ও হার চির-  
 প্রসিদ্ধ দেবতা ; কিন্তু বিপদানবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে  
 এই দুই দেবতা ঈশ্বর নাম ও ভাব পারবর্তন করিয়া ছুৰুলের সহায়রূপে  
 উপনীত হইলেন ; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম  
 হইল, সতানারায়ণ । এ চণ্ডী শুধু বিপদ-ত্রাণ-কারিণী ; ইনি বসন্তকালে  
 শিশুর ধ্যান ভঙ্গ করিতে যে মধু-মূর্তি ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিম্বা যে  
 বেশে বৎসরান্তে পিত্রাণয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে আসেন  
 নাই—এখানে ইনি শুধু বিপদ-বারিণী । সতানারায়ণ ননোচোরা গোপাল  
 হইতে পৃথক বস্তু ; ইনি অর্থসম্পদদাতা, কুবের স্থানীয় ।

বঙ্গদেশ যখন নীচ সমুদ্র-গর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি ছিল এবং  
 সাহিত্যে ব্যাঘ্র ও সর্প ।  
 আর্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন  
 করেন, তখন সর্প ও ব্যাঘ্রের যুদ্ধ করিয়া  
 তাঁহাদের এই বনপ্রদেশে আধিক্য করিতে হইয়াছিল ; সিংহবাহুব জন্ম-  
 ব্রতান্ত সম্বন্ধে কোড়ুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন ।  
 প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় । বাল-  
 কেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রযুদ্ধ চণ্ডীকাব্যে ও শ্রীধর্মমঙ্গলে পাইয়াছি,  
 কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে মোল্লাদিগের সঙ্গে একটি ভীষণ ব্যাঘ্রযুদ্ধবৃত্তান্ত  
 বর্ণিত আছে । এই সব উপাখ্যান বর্ণিত ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর সঙ্গে মানুষের  
 আলাপ ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দূর গড়াইয়াছে সন্দেহ নাই,  
 কিন্তু অসির সঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্বন্দ্বতা ঠিক কল্পনার কথা নহে ;  
 এই প্রতিযোগিতায় অসি-অগ্রভাগে শৃঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়াছিল, এবং

অসিধারীকে শৃঙ্গী ও নখিগণ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল । সভাতার দ্বিতীয় পর্যায়ে গুলির নিকট আসি হটিয়াছে ; হায়, কবে প্রীতির নিকট আস, গুলি, নখ, শৃঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজয় স্বীকার কাববে !

সুন্দববনের জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রাচার্য্যদের সঙ্গে বিবোধ করাও মনুষ্যেব পক্ষে ববং সহজ ; অন্ততঃ উভয় পক্ষেরই তুলা সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলিতে পারে ; কিন্তু কেউটার দস্ত অক্ষো দংশন করে । বিশেষতঃ ব্যাঘ্র গুধু বনবাসী শত্রু, সর্প গৃহস্থেব গৃহ-শত্রু ; কোন্ ছিদ্র হইতে বিষ উদগীরণ করিবে, নিশ্চয় নাহ ; এইজন্ত ব্যাঘ্রেব দেবতা ‘দক্ষিণের রাব’ অপেক্ষা সর্পেব দেবতা ‘মনসাদেনীব’ প্রতিপত্তি বেশী হইয়াছিল । ইহা ছাড়া বৌদ্ধগণেব হারিতীদেবীও দ্বন্দ্বপূৰ্ব্বাৎ এবং পশ্চিমাভিমুখ কয়েকটি শ্লোক হইতে নব শক্তি লাভ কাবয়া এহ বিস্ফোটক জব পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন । ডোমাচার্য্যগণেব পূজিত সিন্দূব মাণ্ডত ব্রণচিহ্নাঙ্কিত ধাতুময় মুখাবশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণাল তন্তু সদৃশী, মার্জ্জনী কলসোপেতা, স্পর্শালঙ্কৃতমস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাড়াইলেন, তাহার পূজাপ্রচারার্থেও কয়েকখানি নাতিবহুং কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল ।

## লৌকিক ধর্ম্মশাখা ।

(খ) চাঁদ সদাগর ও বেহুলা ।

মনসা পূজা উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ । মনসার ক্রোড়ে চাঁদের চরিত্র ।

ছয় পুত্রাবনষ্ট হইল, ‘মহাজ্ঞান’ লুপ্ত হইল, ‘সপ্তডিঙ্গা মধুকর’ অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল, এই উপর্য্যুপরি বিপদরাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাঁদ সদাগর অক্ষুণ্ণহীন । পুত্র-

শোকোন্মত্তা শনকার মধ্যভেদী ক্রন্দনে তাহার গৃহের পাষাণ প্রাচীর-  
গুলিও বুঝি দ্বিধা হইতোছিল, কিন্তু বজ্রাদপি স্নকঠিন পণ ভঙ্গ হয় নাই ।  
মনসাদেবীর ক্রোধে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু  
একটুকুটিল ললাটে চাঁদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছে,  
পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় নাই, তাহার হৃৎথবজ্জ-  
খিন্ন বীরোচিত উন্নত মস্তকে ক্ষাত্রতেজ আশ্রয় লিপিতে অঙ্কিত রহিয়াছে,  
উহা প্যারাডাইস লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে, এ ধনুর্ভঙ্গ  
পণের উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল । চাঁদের নৌকা সমুদ্রবক্ষে  
ঝটিকা তাড়িত, জলমগ্ন হইতে উদাত ; বিপদের মূল মনসাদেবী । এই  
শত্রু তর্জনী দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে বাঙ্গ করিতেছেন ; চাঁদ এ  
বিপদেও হেঁতালের লাঠিগাছি ছাড়ে নাই :—

“এত যদি বলে পদ্মা রঞ্জে করি ভর ।

হেঁতালের বাড়ি স্বপ্নে কাঁপে থর থর ॥

মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া ।

সাহস যদ্যপি থাকে কহ আশু হৈয়া ॥

মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার ।

তবে কেন কাণা আঁখির গুণ না কর ॥”

বিজয় গুপ্ত ।

চাঁদ সমুদ্রে পড়িল, লোনাজলে প্রায় সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পদ্মা  
কয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়া দিলেন ; পদ্মার  
পদ্মাবতী নামের সংশ্রব ত্যজা । তাহাকে মারিতে ইচ্ছা নাই, চাঁদ মরিলে পূজা  
প্রচলিত হয় না ; চাঁদ সেই অন্ধকার রাত্রে ঈষৎ বিদ্যতালোকে মুমূর্ষু  
অবস্থায় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল ; কিন্তু পদ্ম-  
স্পর্শে পদ্মাবতীর নাম-সংশ্রব স্মরণ করিয়া ঘুণায় হাত ফিরাইল, লোনা  
জলে মরিতে ডুব দিল ।

তিন দিন উপবাসের পর চাঁদ বন্ধুগৃহে থাইতে বসিয়াছে ; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ; অনাহারে বিড়ম্বনা । ক্ষুধার্ত চাঁদ গণ্ডুষ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু চাঁদকে মনসার সহিত বাদ ক্ষান্ত দিতে উপদেশ দিলেন । “বর্ষের ভাঁড়ায় খাও কাণি” বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ অন্ন ব্যঞ্জে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল ।

ছয় পুত্রের শোকে জর্জরিত চাঁদ শেষ পুত্র লখিন্দরকে লাভ করিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লৌহের বাসরে লখিন্দরের মৃত্যুজনিত শোক । মনসাদেবীর সর্প লখিন্দরকে দংশন করিল । বিবাহ-শয্যা মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল । সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিবাদে চাঁদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে ; তবুও চাঁদ কাঁদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেঁতাল কাঁধে তুলিয়া লইল ।

কিন্তু পদ্ম-পূবাণের শেষ অঙ্কে পরাভব । সে পরাভবও চাঁদের ছায়ার উপযুক্ত । মনসা ইতিপূর্বে কতবার চাঁদের পরাভব । ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাঁচাইয়া দিবেন, ‘সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর’ জল হইতে তুলিয়া দিবেন, কিন্তু চাঁদবীর লুপ্ত হইয়া অবনতি স্বীকার করে নাই । এই শাল্মলী তরু কিসে নত হইল ? বেহলার স্নেহ চাঁদবেগে রোধ করিতে পারিল না ; সনকার মর্মভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বেহলা রমণী হইয়াও তাহারই মত এক জন । সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভাসিয়াছে ; সে কত প্রলোভন দলন করিয়া, স্থলকুম্ভীর ও জলকুম্ভীরের লেলিহান জিহ্বা ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বর্ণগবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে ; চাঁদ কোন প্রাণে এমন

পুত্রবধূকে বহু-কৃচ্ছুর-অর্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে বলিবে ?

এখানে বিধাতা নীলোৎপলপত্রে শশীতরুচ্ছেদন করিলেন, মেহে

বশীভূত, ততোধিক গুণে চমৎকৃত চাঁদ পদ্ম-  
বেহলার জয় ।

পুরাণের শেষ অঙ্কে অত্মদিকে মুখ ফিরাইয়া  
বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন । বে হস্ত শিবের পদে অঞ্জলি  
দানে নিযুক্ত, ‘চৈতন্যমুড়ি কাণি’ সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন  
নাট ; এ অঞ্জলি বিষহরির পদসেবা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতা-  
জ্ঞাপক নহে ; ইহা পতিব্রতা সতী-সাম্বদী পুত্রবধূর শিরে আশীর্বাদ ;  
তহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি ; গুণশীলা পুত্রবধূকে চাদবেগে কষ্ট  
দিতে পারেন নাট । মনসাদেবী যখন চাঁদ সদাগরের হাতে হেঁতালের  
লাঠিগাছি দেখিয়া পূজামণ্ডপে নামিত সাহসী হন নাট, তখন বেহলা  
বিনয় করিয়া ঋগুরের হাত হইতে লাঠিগাছি কেগিয়া দিলেন । বেহলার  
সেই বিনয় মধুর গঞ্জনা কোকিলকুজনের ত্রায় মিষ্ট ;—

“যদি মোর পূজা করিবে চাদ বেগে ।

হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে ॥

একথা শুনিয়া হেল চাদবেগের হাস ।

হেঁতালের বাড়িতে আর নাতি কর ত্রাস ॥

বেহলা বিনয় কবে আসিয়া ঋগুরে ।

হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে কেঁদা দূরে ॥”

ক্ষেমানন্দ ।

বেহলা ।

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বেহলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব । বেহলা

রূপে গুণে অতুল্যা ; তথাপি ভাগ্য-দোষে  
বেহলা বাসর-গৃহে ।

বেহলা বিবাহের রাত্রেই স্বামী-হীনা হইল ;  
স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ত চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি

জালিয়া, নারিকেল দ্বারা উন্নত প্রস্তুত করিয়া ভাত রান্না করিয়াছিল ; একটি একটি করিয়া কৌশলক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী করিয়াছিল ; কিন্তু বিধিলিপি নিষ্পন্ন, অথগুনীয় ; ঈশ্বর নিদায়ে বেহুলা চক্ষুপুট মুদিত হইয়া আসিয়াছে, কালদর্প এমন সময় লখন্দরকে দংশন করিল ; লখন্দর ডাকিয়া বলিল,—

“জাগ ওহে বেহুলা সাধবেশের শিখ ।

তোরে পাইল কাল নিদা মোরে খাটিল কি ?”

কেওকা দাস ।

বেহুলার কাল নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, এমন ও মনো যখন স্বামিধন খুঁজিতে গাত বাড়াইল, তখন আর স্বামী নিরপরাধিনীর অপরাধ । জীবিত নাহ, শবসম্মুখে শিহরিত হইয়া বেহুলা কাঁদিয়া উঠিল ; সেই ক্রন্দনে স্বাপুড়ী সনকা ছুটিয়া আসিল ও বেহুলার ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কাদিতে কাদিতে বেহুলাকে গাঢ় দিয়া বলিল,—

“সনকা কাদিয়া শেয় বেহুলাকে গাল ।

সিঁতার সিন্ধুরে ওর ন পড়িল ক'না ।

পরিধান বয়ে তোর ন পড়িল মলি ।

পায়ের আলতা ওর ন পড়িল বসি ।

থগু কপালিনী বেহুলা চিব্বা দাঁড়া ।

বিবাহ দিনে খাটিল পতি ন পোড়াও রাঁধি ।”

কেন্দানন্দ ।

কিন্তু বেহুলা সে গাল শুনে নাহ, স্নান বাঞ্ছা আলিঙ্গন চাহিয়া-  
ছিনে, ন হুত নববধু দস্তান তাহাতে  
স্বামীর শব ক্রোড়ে বেহুলাসত্তা । স্বীকৃতি হয় নাহ, সেই কথা স্মরণ করিয়া  
তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রু-প্রাণিত হইতেছিল । তারপর আর  
এক দৃশ্য । বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাসি-

তেছে ; বেহুলা এই স্থলে নিরুপমা সুন্দরী ! যে স্বাগুড়ী গালি দিয়া-  
ছিলেন, তিনি সাধিতেছেন,—

“সনক! কাঁদিয়া বলে অ'লো অভাগিনী ।  
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না স্তনি ॥  
বালিকা যুবতী দুজ্জা যার পতি মরে ।  
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ॥  
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে ।  
প্রভীত কাহার বোলে কাস্তে জিয়াইবে ॥”

কেতকা দাস ।

তাহার ভ্রাতাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে-  
ছেন,—

“হরি সাধু বলে ভণ্ডি মোর বাকা ধর ।  
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিম্বরে পোড় ॥  
এহ ক্ষণ চল বেতলা মৃত্ত সাহের বাড়া ।  
গনি বদলে দিব কাচা পাটের শাড়ী ॥  
শস্য বদলে দিব স্ববর্ণের চুড়ি ।  
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥”

বিজয় গুপ্ত ।

কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন দিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছে,  
সে আর এ আলিঙ্গন ছাড়িবে না ; শব ক্রমে গলিত হইল,—

“দেখিয়া বেহুলা কাদে পায়ে বড় শোক ।  
ধরিয়া মরার গায় হানে এক জোক ॥  
ছাড়াইতে নাই ছাড়ে মাংসেতে লুকায় ।  
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায় ॥

\* \* \* \*

অবিরত নেত্র জল নবায়িতে নারি ।  
নোয়াটার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী ॥”

কেতকা দাস ।



এই দুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্তুগণ শব কাড়িয়া থাইতে আসিয়াছে, অপরদিকে,—

“পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।  
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥  
ত্রিভুগংমোহিনী কেন মরা লৈয়ে কোলে।  
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোনে ॥”  
কেতকী দাস ।

কত লোকে তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে, সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দূরের জোরে বেহুলা বেহুলার সতীত্ব । চাণতেছেন, তাঁহাকে কে স্পর্শ করিবে ? একজন বৈদ্য আশুপ্রেস্তাব করিয়া শব বাচাইয়া দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, বেহুলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন । গোদা, ধনা, মনা তাহার লোভে সাঁতার দিয়াছিল, বেহুলা ঈদবববে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃত পাইলেন ; কিন্তু ! জলমগ্ন গম্পটত্রয়ের জন্ত করণার অশ্রুবিন্দু রাখিয়া গেলেন । স্নেহে দুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখনও স্নেহ মমতা দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্টভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্বদা আরও প্রস্ফুট হইয়াছে । শবের পার্শ্বে বাসয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৈশ আধারে সতী লক্ষ্মী ভাসিয়া যাইতেছেন ; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার ক্ষীণ আলো নিবু নিবু, এসময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,—

“যতেক শৃগাল,                      হয়ে এক পাল,  
একত্রে বেহুলারে ডাকে ।  
মরা ফেলাইয়া,                      যাহ না ফিরিয়া,  
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥”                      কেতকী দাস ।

কিন্তু শৃগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া 'যাইতেছেন, এ তাঁহার জীবন

অপেক্ষা প্রিয় স্বামীব শব, ইহা তিনি দিতে পাবেন না, ইহাতে তিনি  
জীবন প্রতিষ্ঠা কবিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন, তখন, —

‘এত কথা শুনি,                      যত শূণ্যদিনা,  
এ পড়ে চ্ছব গাষ ।  
অপক কঠিন।                      কত নাশি শুনি  
মবা নাকি পাণ পায ।’      কতক দাস

কিন্তু, —

“শূণ্য কখন                      বেহলাব মন,  
বিছু নাই অভিমন ”

আধারে বাঁধা শব গাভতে মুগ বাঁদনে কবিব, বেহলা বদি  
গোন, — ‘অগণির্না বজ্রস্রব শব কবা মন’ আগতে আমাব পাও প্রভুবে  
গেও পঃ ৷” বিজয় গুপ্ত ।

নৃনাগীতে অন্তরাগ পদ্যিনী এমনই বর্ণনা বর্ণিত আছে ।  
ছোট বেলা বেহলা নাচতে গাহিতে শিখিয়া-  
কে তুকে কবণবস  
ছিল, তাহান নৃত্য দেখিয়া তাহাব মাতা  
অন. মোহ ঘাইত । পুনরায় এষ্ট দুঃখেল এমন হস্তমুখে বেহলা দেব-  
সভায় নাচিয়া গাহিয়া স্বামাব ও তাহান দাতাগণের জীবন পুনরায় লভ্যা  
কিনিয়া আসিলা । এত দীঘ দুঃখ কথান অবসানে বেহলাব সে কোতৃহলা-  
দীপ্ত স্বপ্রফুল্ল চিত্রখানি কবিগণ আঁকি যাছেন, তাহাব মাধুর্য্যেব মধ্যে  
দুঃখনিশ একটু সন্ধান ভাব জড়িত আছে, সেই মণিন অথচ নম্র  
সৌন্দর্য্য আনাদিগের মন্থ স্পর্শ করে । বেহলা স্বামীবে লটব ডোম  
সাজিয়া পিত্রাবলৈ গোনেন, সেখানে বঙ্গচ্ছন্দে সে কবণ কান্না ও পুন  
মদনর শোক-মন্দ আনন্দদ্বারা প্রবাহিত হইল, তাহা সেট ‘জ্ঞ ও  
কোতৃকগেণাব মধ্যে ও সাক্ষীর কষ্টসহিষ্ণু দৈত্য এং পদমান মাধুরীতে  
এক অপকূপ আত্মসমর্পণের শোকগাথা চিব অঙ্কিত কবিয়া রাখিয়াছে ।

কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন, স্বামিবিয়োগের পব  
বেহলা, ঘরের ছবি ।

সাম্বী হিন্দু মহিলা উচ্ছলিত অশ্রু নিরোধ  
করিয়াছেন, ললাটের সিন্দূরবিন্দু মুঁড়িয়া  
ফেলেন নাট, সতীত্বের প্রতিমা স্বামীৰ সঙ্গে পুড়িয়া ছাট হইয়াছেন ;  
এই আগুনে কবিত সত্যই গিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে  
বেহলাচিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব । প্রেম ও সৌন্দর্য্য রমণী-চরিত্রে শ্রেষ্ঠ  
ভূষণ, যুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ তদ্বারা আদশ রমণী সৃষ্টি  
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । কিন্তু দেখানে প্রেম অর্থ আত্মসমর্পণ ও  
স্বীয় সঙ্গার সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌন্দর্য্য অর্থ চারুনাহাওয়া, সেই স্থানেই  
আদশ সর্ব্বকালের উপনোগ্য হয় ; তদ্রূপ রমণী-চরিত্র সাহিত্যে বড় বিরল ।  
বেহলা চরিত্র আঁকিতে কোন কবিশুধু বাস্তবিক দেখনী ধারণ করেন  
নাট । গ্রাম্য কবিগণ বংশদণ্ডাগ্রে ব্লটিং কাগজের অভাবে বালুকা দ্বাৰা  
শোষিত তুলট কাগজের উপর বেহলা সতীর রেখাপাত করিয়াছেন ;  
কিন্তু উহা একটি আদশ সাম্বীর চিত্র হইয়াছে । আমাদের দেশে  
রমণীগণের কষ্টের সীমা নাট, দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থ আত্মোৎ-  
সর্গ, উপবাস ব্রতাদির কঠোরতা ও স্বামীৰ জন্ত প্রাণত্যাগ—এই নানাবিধ  
সৎকর্ম্মের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতি-  
বিম্বিত হইয়া বেহলার ছায় আদশ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবি-  
গণের সাহিত্যদর্পণ পড়িতে হয় নাট । সাহিত্যদর্পণের সূত্র এরূপ উচ্চ  
রমণীচরিত্র আয়ত্ত করিতে পারে নাট ; আর লেখা পড়ার হিসাবে নিতান্ত  
নগণ্য গ্রাম্য কবিকে পণ্ডিতের ব্যবস্থা গুনিয়া লিখিতে হইলে তাহার  
আর লেখা চলিত না । অকৃত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা,  
স্বভাব ইহাদের হাতে খড়ি দিয়া তাহাদের নিজ গৃহ দেখাইয়াছিলেন,  
তাহারা নিজ বাড়ীর কথা লিখিতে বাটীয়া অজ্ঞাতসারে এক অমর কাব্য-  
কথা গাহিয়া ফেলিয়াছে । বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির পয়ার ও লাচাড়া

ছন্দরূপ কয়লার খনিতে অনেকগুলি মাণিক আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি ।  
সাহিত্যিক আবর্জনা ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে পারিলে উহারা জগতের  
আদর দৃষ্টিতে পড়িয়া স্বীয় মূল্য লাভ করিবার সুবিধা পাইবে ।

( গ )—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও  
কবি জনার্দন প্রভৃতি ।

মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কাণা হরিদত্ত নামক জনৈক কবি রচনা  
করেন ; কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই,  
কাণা হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত ।  
তাই তিনি কুনাশ্রী গ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্তকে  
স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেন—

“মর্থে রচিল গীত না জানে মহাশয় ।  
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত ॥  
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে ।  
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥  
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক শৃঙ্গর ।  
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥  
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল ।  
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥”

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ।

এতদবস্থায় বিজয়গুপ্তকে দেবীর অহুরোধে পড়িয়া এ কার্যে

৪ বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে ৮ রামগতি আশ্বরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

“ক্ষীত গলিত কীটাকুলিত পুতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্বিকার চিত্তে ও  
নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা । ভ বিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অসিদ্ধ  
সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয়, এবং বেহুলাকে  
পতিরত্নের পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয় ।”

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১১৮ পৃঃ ।

ব্রতী হইতে হইয়াছিল ; আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে গ্রন্থ-  
রচনার সময় উল্লিখিত পাঠিয়াছি । বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু  
ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুলভ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের অন্তর্গত  
আছে,—

হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ ।  
নাগরথে চাড়ি দেবী গেল নিজ দেশ ॥  
স্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে ।  
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া পোবিন্দে ॥  
প্রভাত সময়ে কাক প্রকীর্ণে দশ দিনে ।  
মান করি বিজয়গুপ্ত পুজিল মনসা ॥  
হরি নারায়ণ স্মরি নিশ্চল কৈল চিত্ত ।  
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত ॥  
যেইমতে পদ্মাবতী করিল সন্নিধান ।  
সেইমতে করে সব গীতের নির্মাণ ॥  
ছায়া শূন্য বেদ শাণী পরিমিত শক ।  
সনাতন হসেন সাহ নৃপতি তিলক ॥  
উত্তরে অর্জুন রাজ্য প্রতাপেতে যম ।  
মুগ্ধক ফতেজাবাদ বাঙ্গ রোড়াতক সীম ॥  
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর ।  
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥  
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল ।  
বৈদ্যজ্ঞাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল ॥  
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর ।  
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ॥  
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময় ।  
হেন ফুলশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥”

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ।

অত্ৰ এক স্থলে,—

“সনাতন তনয় রুক্ষিণা গৰ্ভজাত ।

সেই বিজয়গুপ্তে রাণ তব পদ সাত ॥”

প্রথমাংশ বিজয়গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ঐ অংশের অবাবাহিত পরেই এই দুই পংক্তি পাওয়া যায়,—

“গায়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি ।

বিজয়গুপ্তে বন্দিয়া ভাই গীতে দেও মতি ॥”

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা

সহজ কন্ম নহে । বিজয়গুপ্তের চন্দ্রাবেশে  
প্রাক্ষিপ্ত রচনা ।

জয়গোপালগণ ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎ-  
পাদন করিতেছেন, এই গাঢ়-ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে বাইয়া  
অনেক সময় শব্দ লইয়া দিহিতে হয় । পূর্ববর্তী কাব্যগুলির স্থায় বিজয়-  
গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্তস্পর্শে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত  
ও পরিবর্তিত হইয়াছে । ভুবন্ত দিবালোক ও উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ  
সাক্ষাগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের  
লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে ; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশ-  
ভাবে অত্যাশ্রয় কবির ভণিতারও অভাব নাই ।

বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই

বিজয় কবির রসিকতা । ব্যঙ্গই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে ।

এই নগ্নপদ, উত্তরীয়-সার, ঔষধের পুটলিকক্ষ  
‘বেঙ্গ মহাশয়’ সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ  
নাই । সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু  
বিজয়গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না ; নিম্নে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা  
দির্ভে,—

পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ ।

“দামাই এনেছি পূণ্যবান,      কল্যা করিব দান,  
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে ।

এনেছি মূনির স্তত,      কপে গুণে অকুত,  
কল্যা সমপিব তার তরে ॥

ভাসি বলে চণ্ডী আঁঠি,      তোমার মূপে লজ্জা নাই,  
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে ।

এযো এসে মঙ্গল গাওতে,      তারা চাবে পান থাইতে,  
গার চাবে তেল নিন্দুরে ॥

ভাসি বলে শূলপাণি,      এযো ভাঙাইতে জানি,  
মধো দাঁড়াব নেট' হয়ে ।

দেখিয়া আমার ঠান,      এযোর উড়িবে প্রাণ,  
লাজে সব যাবে পলাইয়ে ॥

অছুক পানের কাজ,      এযোগণ পাবে লাজ,  
পান গুয়া দিবে কোন জনে ।

বিজয়গুপ্তেতে কর,      একপ উচিত নয়,  
ঘরে গিয়ে কর সম্বিধানে ॥’

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ।

শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ ।

“ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর ।

এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চূর ॥

আঁচলে আঁচলে গিট বাধি এক ঠাই ।

রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই ॥

কপট চরিত্র তোমার থলের সঙ্গে চঙ্গ ।

যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ ॥

পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল ।

ভাঙ্গ খুতুরা খায় পরিধান ব্যাত্রচাল ॥

প্রেতের সনে অশানে থাকে বাথায় ধরে নারী ।  
 সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥  
 নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে ।  
 চড়ে বেড়ায় ছুপ্ত বলনে তারে খাউক বাঘে ॥  
 আশুন লাগুক কাকের খুলি ত্রিশূল লটক চোরে ।  
 গলার সাপ গকড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥  
 ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাসুক লাউ ।  
 কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাহ ॥”

বিজয়গুপ্ত ।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটির নিদ্বিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য  
 হইতে অত্র কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, ‘তাহা বিজয়গুপ্তের  
 পদ্মাপুরাণে লক্ষিত হইবে ; আমরা ভারতচন্দ্রের—

“জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া ।  
 নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥  
 হরিষে অবশ অলস অঙ্গে ।  
 নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥”

ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি । এইরূপ ছন্দে  
 ভারতচন্দ্রের বহু পূর্বের কবি বিজয়গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

“জগত মেহন শিবের দাস ।  
 সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥  
 রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ ॥  
 নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥  
 হাসিতে খেলিতে রঙ্গে ।  
 নন্দী মহাকাল বাজায় বৃন্দঙ্গে ॥  
 বিশাই নাচেরে হাতেতে বাঁদ্য বাজে ।  
 হাতেতে তালি দিয়াই মুখেতে গীত গাহে ॥



বিকট দশনে ক্রকুটি ভাল সাজে ।

ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বুর বাজে ॥

বিজয়গুপ্ত মধুস্বরে সরস গায় ।

পদ্মার চরিত্রে সবে ধন্দ্ব হয় ॥”

হামিল্টনের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে কতই প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণের আশা ছাড়িয়া মুক্তার লোভে অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয় ? বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পারিপাটা সাধন করে, এই পৃথিবীতে তাহারই মন্মান অধিক ।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে পড়িতে পরবর্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে ; সে সব কবিগণ যাহাদের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাহার অতীতের বিরাট ছায়া পাছে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাঁহাদিগের শৌজ করে ? প্রশংসা, সম্পদ, বণঃ সমস্তই ভাগ্যাবধীন ; সংসারক্ষেত্রের নায় সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রতিভা অপেক্ষা ভাগোরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে ।

### নারায়ণদেব ।

সম্ভবত বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করেন । ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ । সংযোগস্থলে জ্ঞানসাহী পরগণায় কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন । দয়ালচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত লেখক ইহার জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও ভারতী পত্রিকায় ( ১২৯০ সন, কাষ্টিক ) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্য শেষ করিয়া যাইতে

পারেন নাহ । তিনি নারায়ণদেবকে পদ্মাপুরাণের আদি লেখক বলিয়া নিদেগ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত কথা ।

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে—কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া যেক্রপ পাটলাম, সেইরূপই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

### বেহুলা ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন

“নারায়ণা শুনি বোলে বিপুলা বচন ।

কি কারণ কৈলা ভইন ( ১ ) অশকা কথন ॥

বিষম সাগস্ ( ২ ) ভইন কৈলা কি কারণ ।

দেবতা মনিষা কোথা হইছে দরশন ॥

আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে ।

একধর কেমনে যাইব দেবঘরে ॥

কেমতে ছাড়িআ দিমু সাগর ভিতর ।

কথাতে পাইব তুমি দেবর নগর ॥

অগোরি ( ৩ ) চন্দন কাটে ( ৪ ) লখাই পুড়িমু ।

লক্ষ্মিন্দর কর্ম ( ৫ ) ভইন এইপানে করিমু ॥

নেচটিআ চল ভইন আপনার ঘরে ।

একধর কেমতে যাইব দেবঘরে ॥

মংস্ত মাংস এড়ি ভইন যত উপহার ।

সর্ক দর্ক দিমু আমি তুমি খাইবার ॥

সংঘ সিন্দূর মাত্র না পড়িবা তুমি ।

নানা অলংকার তোমা দিমু আমি ॥

মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর ।

বিপুলা রাখিআ আইল জলের উপর ॥

( ১ ) ভইন—ভয়ী । ( ২ ) সাগস—সাহস । অগোরি—অগুরু । ( ৪ ) কাটে—কাটে । ( ৫ ) কর্ম—শবদাহাদি ।

বিপুল। রাগিতে সাধু করএ ক্রন্দন ।  
 বিপুল।এ বোলে কিছু প্রবোধ বচন ॥  
 জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ ।  
 কেমনে মুখেত জঙ্ঘ দিবাম তুলিয়া ॥  
 অসতী হইব মনিষা লোকেত প্রচার ।  
 কি কারণে এতেক জে রাখিমু পাথার ॥  
 গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর ।  
 তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর ।  
 বিপুল। শুনিআ বাকা নিষ্ঠুর বচন ।  
 সকলণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন ॥  
 শুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালা ।  
 নারায়ণ কবণ। শুন একটি লাচাডি ॥  
 কাদে নারায়ণি সাধু কহএ বিপুল। চাইআ ।  
 গ্রাণে না সয় ছুঃখ ন। দিমু এড়িয়া ॥ .  
 অবুদ্ধিযা সদাগর বুদ্ধি অতি ছার ।  
 জাযতা ভাসাইআ দিতে সইতে মরার ॥  
 বিমম সাগরে ঢেউ তোলপার করে ।  
 জ্বলিত পড়িলে পাইব মৎস্ত মকরে ।  
 মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর ।  
 কি কথা কহিব আমি উজ্জানী নগর ।  
 বিপুল। রাগিতে সাধু করএ ক্রন্দন ।  
 নারায়ণদেবে কহে ননসা চরণ ॥  
 বিস্তর যতন করি রাখিতে না পানিয়া  
 চিত্তে ক্ষেমা দিয়া বায় ভেকআ ভাসাইঅ  
 ভাইত বিদায় করি বিপুল। শুনরী ।  
 লাডাইয়া জ।এ তবে ভূরাগান মেলি ॥  
 নগর সঞ্চারে যেন ভুরার চলন ।  
 সম্মখে বাঘর বাকে দিলা দরশন ॥”

এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক যে নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত । ভাবে কথা কহিতেন, সেই ভাবেই শব্দগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাতে বিদ্যা না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব আছে । বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জিত দেখিয়া নারায়ণদেবকে অগ্রবর্তী কবি মনে করা সম্ভব হইবে না । বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুর্ণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণদেবের পুঁথিখানা গত ২০০ বৎসর যাবৎ কোনও রূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই ;—এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু জয়গোপালগণ সেরূপ সুরূপ পান নাই ।+

মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব ।

চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি । ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পকনগর আছে,

পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখীন্দরের কাণ্ডকারখানাটা হইয়াছিল । লখীন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় ছুঁপা প্যা নহে । এদিকে বর্দমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর, ও তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । আসাম ভ্রমণ প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবা নির্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাঁদ-সদাগরের নিবাসভূমি । উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলেন বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থানে চাঁদ সদাগর ও লখীন্দরের বাড়ী ছিল । কেহ কেহ দার্জিলিংএব নিকটবর্তী রনিং নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের বাড়ী নির্দেশ করেন ।

\* ২৮৫ নং আপার চিংপুর রোড বর্ণমাধব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের পদ্মাপুর্ণ দ্বিজ বংশীদাস ও কবি বল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া বোধ হয় । উহার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলেও অত্যন্ত হইবে না । উহা ব পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ,—

( ১ ) “দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ ।

ভবসিদ্ধি তরিবারে বোলে নারায়ণ ॥”

( ২ ) নারায়ণদেবে কয়, স্কবির বল্লভে হয়, ইত্যাদি ।

আবার দিনাজপুর জেলায় কান্তনগরের নিকটবর্তী সনকা গ্রামে চাঁদ-সদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন । ভূগোলবিৎ পণ্ডিতমহাশয়ের একটু গোলে পড়িবারই কথা । চাঁদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সম্ভাব্য ছবি ; ইনি চণ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের বাড়ীতে পুষ্পমালা পাইতেছেন, জয়নারায়ণেব চণ্ডীতে ইঁহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাঁহার বাটীর একটা জমকালো বর্ণনা আছে ; বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়াও এদিক সেদিক হইতে উঁকি মারিতেছেন ; সুতরাং চাঁদসদাগরের ত্রায় প্রযোজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক ।

কিন্তু হুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণেব গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক । পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার আরম্ভও ঠিক সেইরূপ ছিল । এক এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষাক পরাইয়াছেন,—চাঁদ সদাগর কল্পনার লাল পাগড়ি মাথায় বাঁধিয়া সত্যসত্যই আমাদের ভয় জন্মাট-তেছে । কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুমান করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না । মনসার সঙ্গে বাদে চাঁদসদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছু-মাত্র সত্য থাকিতে পারে না । স্বর্গে বাইরা নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথাও পৃথিবীবাসিগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে ? উপাখ্যানের ভিত্তি স্বরূপ ছুঁইট মূল ঘটনাই কল্পনার ঠষ্টকে গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে । সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হয় ; যথা,—পলাশীর যুদ্ধ কাব্য । কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে । তবে যদি চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক হয় যে, বাহারা শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম-

প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদসদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই।

মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাঁদ সদাগর ও বেহুলার প্রতিবিম্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব চিত্রের ন্যায় স্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইল। এই বঙ্গদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীর্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থলের ঐষ্টকল্পপরিণামে চাঁদবেণের ভূতের স্মৃষ্টি বাসাবাড়ী নির্ধারিত হইল; বর্ধমান ও ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতনোপানীর ষাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। চাঁদের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালীর নায়কের হইতে পারে নাই।

### কবি জনার্দন প্রভৃতি।

মঙ্গল চণ্ডীর ক্ষুদ্র ছড়াও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর ( ১৫৭২ খঃ ) পূর্বেও মঙ্গলচণ্ডীর গীতি ছিল; চৈতন্যপ্রভুর পূর্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গানকগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

“মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

দম্ব করি বিবহরি পদে কোন জনে ॥” চৈ, ভা, আদি।

সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা দ্বিজ জনার্দনের জনার্দনের চণ্ডী।

একটি চণ্ডী পাইয়াছি—উহা কাব্য নহে,

ব্রত কথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫০ শত বৎ-

সরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন,

সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়—অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক্ বিকশিত, বড় ও স্পষ্ট হইয়া উঠে—জনার্দন, মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে তাহা অসু্মিত হইবে। কাব্য-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃশ্য, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, স্পষ্ট ও বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

১ম অংশ ।

“নিতা নিতা সেই বাধ আনন্ডিত হইয়া ।

পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া ॥

ধনুকে বুড়িয়া বাণ লগুড কাঁধেতে ।

সর্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিকাগিরিতে ॥

বাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে ।

পাছে ধাএ বাধ মৃগ মারিবার আশে ॥

বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ ।

মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ ॥

বাগধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল ।

দুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল ॥

স্ববর্ণগোধিকারূপ ধরিয়া পার্শ্বতী ।

ব্যাধ-পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী ॥

মৃগয় না পাইয়া বাধ হইল চিন্তিত ।

স্ববর্ণগোধিকা পথে দেখে আচম্বিত ॥

স্ববর্ণগোধিকা! পাইয়া হরষিত মনে ।

ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে ॥

মনে মনে ভাবি বাধ-ধীরে ধীরে হাঁটে ।

সম্মুখ গমনে গেল বাড়ার নিকটে ॥

হরষিত মনে ব্যাধ গদগদ বাণী ।  
 উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী ।  
 যেন মতে গৃহে নিয়া খুঁইল গোধিকা ।  
 পরম স্নানরূপ রূপ ধরিল চণ্ডিকা ।  
 দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু ।  
 গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু ।  
 মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর ।  
 তুষ্ট হযে দেখা দিল তোমার গোচর ।  
 সম্প্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ ।  
 পঞ্চশত স্বর্ণস্কুরী কর উপভোগ ।  
 আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন ।  
 দুগ না মারিবা এহি শুনহ বচন ।  
 অন্ন দবা অঙ্গুরী দিলা যে আমারে ।  
 ইহা খাইয়া কি করিব বল তার পরে ।  
 মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা সদয় ।  
 স্বর্ণ ভাণ্ডদ্বয় তাকে দিলেক নিশ্চয় ।  
 চণ্ডিকা প্রসাদে ব্যাধ কুতর্ক হইল ।  
 তার পর ভগবতী অন্তর্দ্বান হৈল ।  
 ধন পাইছে হেন রাজ্যে শুনিয়া ।  
 শীঘ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া ।  
 বন্ধনে পীড়িত হৈয়া ব্যাধ মহাজন ।  
 কাদিয়া মণ্ডলচণ্ডী করিলা স্মরণ ॥” ইত্যাদি ।

এস্থলে শুভরাত্রি যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির  
 সহিত যুদ্ধ-বর্ণনা নাই ; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ  
 নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন ; পদ্মা-পুরাণের ঘটনার  
 কেন্দ্রভূমিও এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ;  
 ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেকারী চাপাইয়া তাঁহার



প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

“বর্দ্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে এবং এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া পূজাপাদ রামগতি আশ্রয়ত মহাশয় মালিনীর বাটী অম্বেষণার্থ বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই স্তম্ভঙ্গ দিয়া এখনও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।” \*

২য় অংশ ।

“অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা ।

চলহ খুলনা গৃহে সাধুর দুহিত ॥

ব্রতের বিধান সর্ব ত্রতা এ কহিল ।

প্রণাম করিয়া তবে পুসন চলিল ॥

হারাইয়াছিল ছাগল পশে পাইল তারে ।

গৃহে আসি পুসন যে বিবিধ প্রকারে ।

চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে ॥

মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি ।

ব্রত হতে স্তম্ভা হৈল খুলনা যুবতী ॥

দিবা বস্ত্র অলংকারে সাধুএ তুষিল ।

কতকাল পরে কন্তা গর্ভবতী হৈল ॥

পুসনার গর্ভ ছয়মাস হৈল যবে ।

বাণিজ্যে চলে ধনপ্তি সাধু তবে ॥

স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভক্তি ।

বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি ॥

ছয়মাস গর্ভ মোরানানা হৈল মোরারে ।

জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে ॥

হীরা মণি মণিকা আরানানা স্রবা যতে ।

হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে ॥

ডিক্রাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে ।  
 গুলনা আসিতে আস্থা করিল তখনে ॥  
 মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ ।  
 অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন ॥  
 বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন ।  
 চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন ॥  
 \* \* \* \* \*  
 মঙ্গলচণ্ডীর বরে গুলনা যুবতী ।  
 পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি ॥  
 দিনে দিনে বাড়ে কুমার চল্লুর সমান ।  
 শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান ॥  
 লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান ।  
 আমারে লিখায়ে দেহ এই ষড়ি থান ॥  
 হাসিয়া সকল ছাত্র বলিলেক বর্ণি ।  
 জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিনী ॥  
 অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার ।  
 হেঁট মাথা করি গৃহে গেল আপনার ॥  
 বিবাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন ।  
 মাথাএ বসন দিয়া করিল শয়ন ॥  
 অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন ।  
 স্নান হৈয়া নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন ॥  
 মাতা বিমাতায় বৃষ্টি পুত্রের লক্ষণ ।  
 সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন ॥”

শেষ শ্লোকের ক্ষুদ্র ‘বিমাতা’ শব্দটি হইতে লহনা-চরিত্রের স্তত্রপাত ;  
 শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্দ্যাহত হইবার কথাটি এখানে সেরূপ আছে,  
 মাধবাচার্য্যও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকক্ষণ সে স্থানটি  
 ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন ।

রতিদেবকৃত মৃগলক পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি\*—উহা শৈব ধর্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্বেই রতিদেব ও অপরাপর কবি। উল্লেখ কবিরিয়াছি; বঙ্গসাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেইখানেই ভবানীর জ্রুকুটি-ভঙ্গীতে অতি ক্লপা-যোগ্যভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

‘মৃগলক’ গীতি শৈব ধর্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত ; উক্ত ধর্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।

শনির পাঁচালী, যজ্ঞীর পাঁচালী,— অতি আদি সময়ে ও বিদ্যমান ছিল ; মেয়েলী ছড়ার খোঁজ করিতে করিতে সেই সব প্রাচীন গীতির ভগ্নাংশ কোন বন্ধুর পাকস্থালী হইতে জীর্ণ প্রায় অবস্থায় বহির্গত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

### শীতলা-মঙ্গল ।

শীতলা পূজার আদি খুঁজিতেও আমরা শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে পারি ; প্রাচীন শাস্ত্রের কোনও স্থলে যে যে দেবতার সামান্য মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও হুঃখবিমোচনের অনুরোধে পর-বর্তী ব্রাহ্মণগণ সেই সামান্য উল্লেখকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশীয় সংস্কারোপযোগী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথর্ববেদের “তন্মন্” শব্দের অর্থ “শীতলা” বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, অপর কোন লেখক বৈদিক শাস্ত্রোক্ত, “অপ্‌দেবী”কে শীতলাদেবীর আদি

মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বেদের এই আভাষ পুরাণকারদের হস্তে ক্রমে বিকাশ পাইয়া শীতলাদেবীর বর্তমান রূপ কল্পিত হইয়াছে । স্বন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং কাশীতে দশা-স্বমেধ ঘাটের উপর শীতলা দেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখনও দৃষ্ট হয় । বর্তমান সময়ে শীতলাদেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই ডোমজাতীয় দেখা যায় ; ইহানে আব একটি অনুমান করিবার অনুকূল যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; বৌদ্ধ শাস্ত্রে হারিতীদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে । এতদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যের সময় ডোমপুরোহিতগণ হারিতী পূজা করিতেন, এই হারিতী ও শীতলা উভয়েই ব্রগনাশিনী দেবী । হিন্দুশাস্ত্রে শীতলাদেবীর যে সুন্দর মূর্তি বর্ণিত আছে, শীতলা-পণ্ডিত ডোমবর্গের প্রদর্শিত মূর্তি সেকপ নহে, এ সম্বন্ধে সুহৃদর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় বলেন, “শীতলা পণ্ডিতগণের শীতলা কর-চরণহীন, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রগচিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডল মাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র । ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায় ; এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খনির্মিত রুইতনের ফোঁটার ত্রায় বা পেরেকের মাথার ত্রায় টোপতোলা যে বসস্তচিহ্ন লাগান থাকে, তাহান সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোপতোলা পেরেক-চিহ্নের যেন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় ।” ডোম-পুরোহিতের পূজার অধিকারই এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সংশ্রবের অকাটা প্রমাণ ।

এই শীতলাদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গ-ভাষায় রচিত হইয়াছিল । সেই সব গীতির নিতাস্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে দুই তিন শত বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন কবিরাজ, ও রঘুনাথ দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ।

## ( ৪ ) পদাবলী শাখা ।

ক । পদাবলী সাহিত্য ।

খ । চণ্ডীদাস এবং রামী ।

গ । বিদ্যাপতি ।

বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায়

অদ্বিতীয় । বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম

পদাবলী সাহিত্য ।

মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গ-

সাহিত্যে পবিত্রতার সূধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে ।

পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য । পূর্বরাগ, উক্তি, প্রতুজ্জি, প্রথম মিলন, সন্তোগ, অভিসার, কারণমান, নিহেতু মান, প্রেম-বৈচিত্র্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুন-র্গিলন, প্রেমের এই বহুবিভাগের পর্যায়ে পর্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস ; ইহাতে স্বার্থের আহতি, অধিকারের বিলোপ ; বাস্তবের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল আশ্রয় করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় কতকগুলি অপ্রাকৃত ভাব-পন্ন পাগল কাদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাহাদের অশ্রুর ইতিহাস ।

বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মান-

বীর প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা

আধ্যাত্মিকত্ব ।

সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিনী

ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে ।

সহস্র ভিন্ন দেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদন্ত-নিহিত মধুময় আধ্যাত্মিকত্ব উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ; পণ্ডিত গ্রীয়ারসন্ মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—“কিন্তু

মৈথিল ভাষায় অভূত পদাবলী রচনার জন্তই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পৌরব ; সে সমস্ত পদে শ্রী-  
রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেমবর্ণনার রূপক বার। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ভালবাসা সম্বন্ধই  
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ।” \* ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন জন্ত রাধার রূপক  
অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ  
নহি, তবে বোধ হয় পাঠকগণ পদাবলীবর্ণিত রাধিকার ভাবগুলির  
সঙ্গে চৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাউবেন, এবং তদ্বারা  
পদাবলী যে ধর্ম সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে পারা যায়, তাহা স্বীকার  
করিতে বাধ্য হইবেন । রাধিকার রূপক সম্বন্ধে আমরা পণ্ডিত নিউম্যান  
সাহেবের এইরূপ বিষয়ে একটি মন্তব্য উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপ-  
সংহার করিব ;—“যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্মরাজ্যের পবিত্রতায় প্রবেশ করিতে  
অভিলাষী হয়, তবে তাহাকে রমণী-বেশে যাইতে হইবে । মনুষ্য সমাজে তোমার যতই কেন  
পুরুষকারের গর্ব থাকুক না কেন, এখানে আত্মার রমণী সাজা ভিন্ন গতান্তর নাই ।” †

খ । চণ্ডীদাস ।

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ‡ নান্দুর গ্রামে জন্ম-  
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কেন্দুবিষ ও বিসপী  
চণ্ডীদাসের নান্দুর ।  
হইতে নান্দুর বড় তীর্থ ; চণ্ডীদাসের নিবাস-

\* “But his ( Bidyapaty's ) chief glory consists in his match-  
less sonnets ( Pada ) in the Maithili dialect dealing allegorically  
with the relations of the soul to God under the form of love which  
Rádhá bore to Krishna. These were adopted and recited enthusi-  
astically by the celebrated reformer Chaitanya.”

Modern Vernacular Literature of Hindustan by Grierson.

† “If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it  
must become a *woman* ; yes, however manly thou may be among  
men”—Newman.

‡ “বিধুর নিকট নেত্র পঞ্চ পঞ্চপাণ । নবহ নবহ রস, ইহ পরিমাণ ।”

এই পদটি যদি কালচাচক বলিয়া গণ্য হয়, তবে ১৩২৫ শকে ( ১৪০৩ খৃঃ ) চণ্ডীদাস  
তাঁহার পদাবলী সম্বলিত করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে ।



চণ্ডীদাসের ভিটি । ( উত্তর পৃষ্ঠ দৃষ্ট । )





ভূমি পবিত্র নান্দুর-পন্নী এখনও আছে,—পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাণুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে । সেই ক্ষুদ্র পন্নীটিতে প্রেমের যে অপূর্ণ ক্ষুধা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল, এজগতে তাহার তুলনা নাই ; প্রেমিকের নিকট নান্দুর-পন্নী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য অদৃশ্য ; কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্মৃতি বহন করিতে সেই স্থানে কোন সমাধিস্তম্ভ নাই—এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ হয় ; নতুবা আমাদের দেশের লোকে অশ্রুরূপে স্মৃতি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল,—সমাধি-স্তম্ভ এদেশের সামগ্রী নহে ; তাহারা ঘরে ঘরে মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুণ্যলোক নহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত ।

পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ডীদাসের কবিতা আমার আটশেখব সুখ হুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ, হৃদয়ে প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার নথানথ আলোচনা সম্ভবপর হইবে কি না বুঝিতে পারি না ; আর একটি বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতাম না ; স্মরণ্য তাঁহার কথা লিখিতে হৃদয়ের আবেগ-জনিত নানা কথা আসিয়া পড়িবার কথা ।

নান্দুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত —শাঁকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী হইতে পূর্বাংশে ১২ কোশ । বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির তপোবন আছে ; বক্কেখর আদি উষ্ম প্রস্রবণ, ময়ূরাক্ষি, অজয়, সাল, হিংলা, দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । বীরভূমের বেলকুল বড় বড়, শ্রীমতীগোলাপসুন্দরীরাও তাহাদের সৌন্দর্য্য, অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবেন । স্বভাবের সুরমা নিকেতন বীরভূম—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি । তাঁহাদের হৃদয়ও

সেই বড় বড় বেলফুলের আয় সুন্দর ও বড় ছিল, তাঁহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিম্ব রহিয়া গিয়াছে ।

চণ্ডীদাসের পিতা ‘বিশালাক্ষীদেবীর’ পূজক ছিলেন, \* তজ্জন্তই

চণ্ডীদাসের জীবনী ।  
বোধ হয় পুত্রের নাম ‘চণ্ডীদাস’ রাখা হইয়া-  
ছিল ; এখনও নান্দুর গ্রামে বাগুসীদেবী

অধিষ্ঠিত আছেন ও তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্বাহিত হইয়া থাকে । চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন । উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিকা রামমণি ( নরহরির মতে তারা ধুবনী ) † কবির হৃদয়ে অপূর্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল ; এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে ; যাহা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের আয় ভাবুক শ্রেণীর মনো-রঞ্জন করিতে ইচ্ছা নাই ; বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে ।

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, ‡ তাহাতে তাঁহার নিজ বিবরণ কিছু পাওয়া গিয়াছে । রজকিনীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন ; একদা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন, “হন হন চণ্ডীদাস । তোমার লাগিয়া আমরা সকল জিন্মাকাণ্ডে সর্ব্বনাশ ॥ তোমার পিরাতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে । ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠাব কুলে ॥” কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তবে

\* ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছিলেন—  
“চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শাকে জন্ম ও ১৩৯৯ শাকে মৃত্যু হয়, ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি, ইহার বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ।” একথা কতদূর প্রামাণিক বলা যায় না ।

† শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভট্ট মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ইহার নাম “রামতারা” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ( ৪৫ পৃঃ ) । এই নামই বোধ হয় ঠিক, তাহা হইলে নরহরির ‘তারা ধুবনী’ বৃত্তিতে কোনও গোল হয় না ।

‡ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা ১৭৩ পৃঃ ( ১৩০৫ সন ) ।



চত্বীদাসের ভিটি—দক্ষিণ-পূর্ব দৃশ্য ।



তাহার ভ্রাতা ( ১ ) নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জ্ঞাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল ; তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জ্ঞাত বিনয় অনুময় করিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে “নীচপ্রেমে উনমাদ” বলিয়া এবং “পুত্র পরিবার, আছেয়ে সংসার, তাহারা সন্মতি নহে ।” ইত্যাদি রূপ আপত্তি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ করিলেন, কিন্তু তাহারা শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্তে মুগ্ধ হইয়া “তুমি একজন, বট মহাজন, সকল করিতে পার” ইত্যাদি আদরবাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-সূচক পাণ দান করিলেন ।

এ দিকে এ কথা শুনিয়া রামী—“নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে ।” এবং “গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া, সয়ন করিল তায় । কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাগিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায় ।” কিন্তু তাহাতেও শাস্তি নাই, আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল । ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে ; ‘সীতামিস্ত্রী’, ‘আলফা’ প্রভৃতি নানারূপ মিষ্ট দ্রব্য যখন ভোজনস্থলে আনীত এবং ব্রাহ্মণগণ গণ্ডুষ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং যখন “দ্বিজগণ ডাকে, ব্যঞ্জন আনিতে, খোবিনী তখন ধায় ।” এই বর্ণনা দ্বারা যে অনর্থোৎপাত সূচিত হইয়াছিল, তাহার শেষাক্ষ আর জানা গেল না, ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্পের প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন ।

চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন,  
তখনই উন্মাদিনীর বেশ ; প্রেমের হাওয়ায়  
চণ্ডীদাসের রাধিকা ।

তিনি ফুটিয়া রহিয়াছেন । স্বীয় নিবিড়-  
কৃষ্ণকুস্তল আচ্ছাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,—  
তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে ; করজোড়ে মেঘপানে তাকা-

ইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না,—মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পড়িতেছে,—কারণ ক্রষ্ণের বর্ণ মেঘের ত্রায় ; একদৃষ্টে তিনি ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু ক্রষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,—নব পরিচয় এইরূপ । তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা, কত বিনয়, কত অনুনয়, মধুমাখা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিন্যমাত্র নাই, ফুলদলে সেই ক্রোধের সৃষ্টি,—মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া,—আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আঘাত পাইয়া আসা,—কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত হৃৎখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি ; প্রেম করিয়া লোক কত হুঃখী হয়,—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, স্রুধুনী-তীর ইহাতে যেন গুঞ্চকণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই হৃৎখ চণ্ডীদাসের কবিতায় ছত্রে ছত্রে । তথাপি সেই কণ্ঠের মধ্যেই কণ্ঠ বহন করিবার যোগ্য উপকরণ আছে,—কণ্ঠের মধ্যেই কণ্ঠের ঔষধ সূত্র আছে ।

“যথা তপা বাই আমি বতদূর পাই ।

চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ।”

সেই চাঁদ মুখের কথা বলা যায় না । বলিতে গেলে সূত্রে হৃৎখে, সূধা বিধে, হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । তাঁহার অশ্রুতে সূত্র হৃৎখ জড়িত,—প্রভাত-পদ্মের ত্রায় দুটি চক্ষু আলো পাইয়া উন্মীলিত হয়, কিন্তু নৈশ-শিশির-ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হইয়া পড়ে,—কোনটি পুলকাক্রান্ত কোনটি শোকাশ্রু, কোনটি প্রাতঃশিশির, কোনটি নৈশ-হিম-কণা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না ।

“গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,

সদা চল ছল আঁখি ।

পুলকে আকুল, দিক বেহারিতে,

সব শ্রামময় দেখি ।

দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে ।

পুলকে পুরয় তনু শ্রাম পরসঙ্গে ।



বাঙালী দেবী ।





পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার ।

নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥”

তাহার প্রসঙ্গেই কাদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,—সে নাম শুনিতে বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে ; আবার এই সুখ পাছে অপর কেহ দেখে,—পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বোঝে না,—তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা যায় না । এই সুখের মধ্যেও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ অপূৰ্ণ সুখ হইত না ; না ভাঙ্গাইতেই ভাঙ্গাইবার ভয় ;—

“এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায় ।

হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥”

ভালবাসাব দুঃখের প্রতিশোধ,—অভিমান ; কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনা-মাত্র—

“এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনব ।

আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া রব—ও নাম শুনব না ॥”

ইহাট চূড়ান্ত সীমা । চণ্ডীদাসের মান করিবারও সাধ্য নাই ; দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরূপে ? স্বীয় শরাসন মত্তমুগ্ধ শর নিক্ষেপ করা অসাধ্য,—

“যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় ।

আন পথে ধাই তবু কাণু পথে যায় ॥

এ ছার রসন। মোর হইল কি বাস ।

বাঁরি নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম ॥

এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ ।

তবুত দারুণ নাসা পায় শ্রাম গন্ধ ॥

সে কথা না শুনিব করি অনুমান ।

পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥

ধিক রহে এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব ।

সদা যে কালিয়া কাণু হয় অনুভব ॥”

ইহা অপূৰ্ণ তন্ময়ত্ব ।

আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না । যে পাঠক প্রেমিক, তিনি হৃদয় নিভুতে সেই পদ-কুসুমগুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া মুখী হউন । মিষ্ট দ্রবোর যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অল্প প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির উৎকর্ষেরও পাঠ ভিন্ন অল্প প্রমাণ হইতে পারে না ।

আর একটি কথা, কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে । তাহা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি । হওয়া বিচিত্র নহে, কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্ত পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন ; চারু-চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হই, — কিন্তু মানসসৌন্দর্য্য ও গরিমা সেক্ষপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ত্রায় শিক্ষিত ছিলেন না,—ইহাই সাধারণ মত । লেখা পড়া পুষ্পের ত্রায়, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয় ; শাস্ত্র ভাব কি ভক্তির নিকট পোঁছাইতে চেষ্টা করে ; যিনি নিজের ভাবুক বা ভক্ত তিনি শাস্ত্রের মুকুরে প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির মূর্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন ;—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ত্রায় উপমা প্রয়োগ কবেন নাই,—সুন্দরের স্বভাব ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক ; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য,—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে গোণবস্ত্র দ্বারা মুখ্যবস্ত্রর আভাস দিতে চেষ্টা করেন । তাই উপমার রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট । এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ,—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ ।



বাঙলুর মন্দির ।



চণ্ডীদাসের প্রেম গীতিসমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা  
 এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না ; সাধা-  
 চণ্ডীদাসের অধ্যাত্মিক ভাব। রণ প্রেম দ্বারা উহা সর্বত্র ব্যাখ্যা করা সু-  
 কঠিন হয় ; পূর্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য-প্রচার—নাম মধুময়, তাহা  
 “বদন ছাড়িতে নুহি পারে ।” নাম শুনিয়া অমুরাগের দৃষ্টান্ত মাহুতী ভালবাসার  
 সাহিত্যে বিরল, কিন্তু “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো ।” এই নাম  
 জপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একবারে দুস্ত্রাপ্য,—মনে হয় যেন  
 ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে তত্ত্বচিন্ত আপনা ভুলিয়া যায়,  
 এত দৈহিক বন্ধন বেন তখন থাকিয়াও থাকে না,—ইন্দ্রিয়প্রশমিত মনে  
 —নামের মধুভরা মোহ সর্বদা শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে ; এই  
 পূর্বরাগ সাধারণ প্রেমের পূর্বরাগের উন্নততম আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যাত  
 হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐশ্বরীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয় ব্যাখ্যা করা সহজ  
 হয় । তার পর শ্রীমতী রাধিকার “বিরতি আহারে, রাজ্যবাস পরে, যেমন  
 ষোগিনী পারা ।” নীল নিচোলপরিহিতা রাধিকা-মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে  
 সুলভ, কিন্তু রাজ্যবাস-(গেরুয়া)-পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত,  
 তাহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ) ও  
 মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে করজোড়ে সকাতির অনুনয়, একদৃষ্টে ময়ূব  
 ময়ূবীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ণব সাধু-  
 ভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় । “যে করে কামুর নাম তার ধরে  
 পায় । পায় ধরি কাল্দে সে চিকুর গড়ি যায় । সোণার পুতলি যেন ভূতলে লুটায় ॥”  
 এই স্বর্ণ-পুতলি প্রেমিকের নয়ন-পুতলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে  
 করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না । যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণভূমিতে ইতর  
 জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুপ্তিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন,  
 সেই স্বর্ণ পুতলি গৌরহরির ছবিরই পূর্বাভাষ যেন এই পদে স্ফুট  
 হইতেছে । “সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নুহি জানি । কহে

চণ্ডীদাস পাণ্ডা পুণ্য নম, তোমার চরণখানি ।” পদটি “হুয়া হুয়াকেশ যদি স্থিতেন, বথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” প্রভৃতির দ্বারা উদার অহংকার-বর্জিত আত্মসমর্পণের ভাব ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করে ।

চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে । উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদানপ্রদানময় প্রেমভাব তত উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না । রামীর কথা কহিতে যাওয়াও চণ্ডীদাস মানুষী-প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্চর্য্যরূপ পবিত্রতার সহিত ধর্মজগতের কথা কহিয়াছেন ; “কামগন্ধ নাহি তার” কথা বহু পরিচিত ; তাহা ছাড়া “তুমি হও পিতৃ মাতৃ”, “তুমি বেদমাতা গায়ত্রী,” “তুমি সে মন্ত্র তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস” এসব কথা ধর্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায় । ধোপানীর পায় যে পুষ্পাঞ্জলি—সে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন অজানিত স্বর্গলোকে অলঙ্কিতভাবে পৌঁছিয়া চির-পবিত্র হইয়া রহিয়াছে । চণ্ডীদাসের সরল কথাগুলি সর্বত্রই মনোম্পর্শী “বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম” পদে তিনি ব্যাকরণকে তুচ্ছ করিয়া তীক্ষ্ণ অন্তঃসম্বলে ‘অবলা’ শব্দের এক সুন্দর ও নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন । চণ্ডীদাস সহজ বক্তা, সরল বক্তা ও সুন্দর বক্তা । বিদ্যাপতির পূর্বরাগের “ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই । ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই ।” প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদ্ভিত্তিরসোবনা রাধিকার রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে, এবং চৈতন্য প্রভুর দুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । সেই মূর্তি ভাষার ফুল পল্লবের বহু উর্দ্ধে নির্মল অধ্যাত্মরাজ্যস্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে ; সে স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য বিরল, কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান ; এখানে শব্দের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শব্দের

অন্নতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্য্যকরী হয় ; প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চ ভাবের শোভা অবগতির জগ্ৰাই যেন, ভাষার শোভা তনুতাগ করে এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের বাহুলা না থাকিলেও হৃদয়ের অন্তঃপুর-শোভা চির বসন্তের চারু চিত্র-পটে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যায় । চণ্ডীদাসের প্রেমগীতিতে, ‘নারিকা রাধিকা’ অপেক্ষা ‘রাধাভাবে’রই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ।

চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায় ;  
 ভাব-সম্মিলন ।  
 ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অত্যা-  
 হইবে না, সৈগুন্দির মত প্রেমের স্নগভীর মন্ত্র  
 ধম্মপুস্তকেও বিরল । “বধু কি আর বলিব আমি”—প্রভূতি গান শুধু  
 বৈষ্ণবের কণ্ঠে নহে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া স্ত্রীশ্রাব্য মনোহরসাহী রাগি  
 গীতে ব্রাহ্মগায়কের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়া থাকে । ‘আমরা আর একটি’  
 পদ উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করিব :—

বধু তুমি সে আমার প্রাণ ।

দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কল শীল জাতি মান ॥

অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আর, ধা ধন ।

গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন ॥

পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায় ।

তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায় ॥

কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ ।

বধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে স্তথ ॥

সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি ।

কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি ॥”

চণ্ডীদাস মূৰ্খ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, নকুলঠাকুর কর্তৃক তিনি  
 চণ্ডীদাস মূৰ্খ ছিলেন না । ‘বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম’ ও ‘বিজ্ঞ’ বলিয়া  
 প্রশংসিত হইয়াছেন, দেখা যায় । চণ্ডীদাসের

ছুই একটি গানে ভাগবত পড়ার আভাস আছে, “কেহবা আছিল দ্বন্দ্ব আবর্তনে,  
চুলাতে রাখিয়া বেসানী” পদটি দেখুন ।

### রামীর পদ ।

প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের  
মূল প্রসবগন্ধরূপ রজকিনীরামীর পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । রামীর  
ভণিতায়ুক্ত পদ আমরা চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না,  
কিন্তু নিম্নোক্ত দুইটি পদের সারলা ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই  
যোগ্য বটে ।

( ১ ) “কোথা যাও ওহে, প্রাণ-বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি ।

না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈর্য ধরিতে নারি ।

বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিষু, মনে আন নাহি জানি ।

কি দোষ পাইয়া, মথুরা বাইবে, বল হে সে কথা শুনি ।

তোমার এ সারথি, কুর অতিশয়, বোধ বিচার নাই ।

বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিধু-নীরে, অবলা ভাসাইতে নাই ।

পিরীতি জ্বালিয়া, যদিবা বাইবা, কবে বা আসিবে নাথ ।

রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ ।”

( ২ ) “তুমি দিবাভাগে, লীলা অমুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে ।

তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ।

ক্রটি সমকাল, মানি স্বজঞ্জাল, যুগ তুলা হয় জ্ঞান ।

তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, বাকুলিত হয় প্রাণ ।

কুটিল কুন্তল, কত স্থনির্দল, শ্রীমুখমণ্ডলশোভা ।

হেরি হয় মনে, এ ছুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা ।

বাহে সর্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে ।

ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে ।

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, হৃদয় কে আছে আর ।

“খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার ।”



রামীর পদ দুইটির মধ্যে আমরা একটুকু আখ্যানিকত্ব খুঁজিয়া বাহির করিব,—প্রথম পদে “মথুরা বাইবে” পদটির অর্থ ‘সমাজে উঠা’ ও “তোমার এ সারথি কুর অতিশয়” পদে অক্রুরের নামে নকুলঠাকুরের হৃদয়হীনতার উপর রোষ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাভাগে রামী চণ্ডীদাসের প্রীতি-প্রফুল্ল মুখখানি দেখিবার সুবিধা পাইতেন না, দ্বিতীয় পদটিতে তজ্জন্তু হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি পদ রামীর বিরচিত কি না, সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। রামী ধোপানীকে বঙ্গ-দেশের সর্বপ্রথম স্ত্রীকবি বলিয়া গ্রহণ করার পূর্বে এতৎসম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনার প্রয়োজন।

### গ। বিদ্যাপতিঠাকুর।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতিঠাকুর ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। ইহাদের গাঞি ‘বিষয়বারবিস্ফী’, স্মরণ্য বিদ্যাপতি-বিদ্যাপতির পরিচয়। ঠাকুরের পূর্ণ নামটি একটুকু অদ্ভুত ও জাঁকালো রকমের—‘বিষয়বারবিস্ফী বিদ্যাপতিঠাকুর’ মহারাজ শিবসিংহের সভাসৎ পণ্ডিত এবং চণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি ছিলেন, শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে এই দুই কবির সন্মিলন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে ‘বিস্ফী’ নামক গ্রামখানি প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তদ্বংশী-য়েরা কেহ সেখানে নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সৌরাট নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির বংশধর বনমালী ও বদরীনাথ এখন বিদ্যমান আছেন।

বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরম স্নহৎ গণপতিঠাকুর তৎ-পূর্বপুরুষগণের খ্যাতি।

প্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী”র কল মৃত স্নহদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্ত উৎসর্গ করেন। এই গণপতিঠাকুর \* বিদ্যাপতির পিতা। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যাপন্ন ও পরম ধার্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি ‘যোগীশ্বর’ আখ্যা প্রাপ্ত হন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বর হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বরপ্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘বীরেশ্বরপদ্ধতি’ অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজও তাঁহাদের ‘দশকন্ম’ করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন, চণ্ডেশ্বর ধর্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল “মহামন্ত্রক সাক্ষিবিগ্রহিক”। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির উর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ স্থানীয় পূর্বপুরুষ ধর্মাদিত্য (কাবাবিশারদ মহাশয়ের মতে কন্মাদিত্য) হইতে সকলকেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রাতিষ্ঠিত দেখা যায়।

২৬ “জননদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর  
মৈথলী দেশে কর’ বাস।  
পঞ্চ গৌড়ারিপ, শিবসিংহ ভূপ  
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ ॥  
বিসন্ধি গ্রাম, দান করল যুঝে  
রহতহি রাজ সন্নিধান।  
লছিম চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে  
বিদ্যাপতি ইহ ভাণে।”

शुद्धमनुष्य ।

মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে “পুষ্ক-পরীক্ষা” নামক পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি কবির গ্রন্থাবলী। শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কৃষ্ণবর্ণ দেহ-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহার পূর্ণ নাম “রূপনারায়ণপদাঙ্কিত মহারাজা শিবসিংহ ।” রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি ‘শৈবসর্বস্বহার’ ও ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’ নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক বচনা করেন। মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে তৎকর্তৃক ‘কীর্ত্তিলতা’ গ্রন্থ বিরচিত হয় ; তাঁহার সর্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ ‘দুর্গভক্তিতরঙ্গিণী’ ভৈরবসিংহ মহারাজের ( হরিনারায়ণ ) রাজত্বসময়ে, দুবংশ রামভদ্রের ( রূপনারায়ণ ) উৎসাহে বিরচিত হয়।\* পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি ‘দানবাক্যাবলী’ ও ‘বিভাগসার’ নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি “কবিকণ্ঠহার” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।†

এক্ষণ বিদ্যাপতির বিষ্ণী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাম্রলিপি ও মিথিলার রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানা-কাল সম্বন্ধে তর্ক। রূপ গোলযোগে পড়িতে হয়। ভূমিদানপত্রের কাল ১৪০০ খৃঃ (১১৩ ল-সং)। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় হয় ১৪৪৬ খৃঃ। সুতরাং শিবসিংহকে রাজা হওয়ার ৪৬ বৎসর পূর্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি “দিগ্বিজয়ী

\* দুর্গভক্তিতরঙ্গিণীর ভূমিকায় “স্মৃতি” স্থলে “অস্তি” পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

† “ভগহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।

কেটি হঁন ঘটয় দিবস অভিসার ।” Grierson's Maithil Songs' A. S. J. Extra No. 193

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপাধি ‘কবিরঞ্জন’ ছিল,—“চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল” ও “পুহত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে” প্রভৃতি পদ দৃষ্টে সেরূপও বোধ হয়।

মহারাজাধিরাজ' বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন । ভূমিদানকালে বিদ্যাপতিব বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,—তদূর্দ্ধ বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতিব জীবনী ১২৩ বৎসরেরও অনেক বেশী হইয়া পড়ে । ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান পত্রে “মহাপণ্ডিত” এবং “নবজয়দেব” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায় । একপ নবযুবককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে একখানি বড় গ্রাম দান করিবেন—ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান । ২০ বৎসর বয়সে ( ১৪০০ খৃঃ ) কবি বিদ্যাপতি ‘মহাপণ্ডিত’ উপাধি এবং বিষ্ণী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলে ০ ১২৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ( ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬-১৫২০ খৃঃ ) তাঁহাকে ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ লিখিতে হয় । আর কাব্য-নিশারদ মহাশয়ের মতানুসারে ঐ পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অনূন ৯৬ বৎসর বয়সে ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ প্রণয়ন কবিতে হব । একপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য লিখবার সামর্থ্য ক্টিৎ দৃষ্ট হয় ; বিষ্ণী গ্রাম দান কালে কবির অনূন ২০ বৎসর বয়স এবং ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ রচনার সময়ে তাঁহার অনূন ৯৬ বৎসর বয়স—দুই কষ্টকল্পিত “অনূনের” সাহায্যেও এই জটিল প্রশ্নেব বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গেল না ।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্নপৃষ্ঠায় এতরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন ।

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়ই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে । ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বহুদিন হইল

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়া-  
ভূমিদানপত্রের সত্যতা ।

ছিলেন :—

এই সন্দেহে কেবল লক্ষণাঙ্গের টুল্পে আছে এমন নহে, সন্দেহের অন্তর্ভাগে আরও

৩টী অঙ্ক লিখিত হইয়াছে, যথা—সন ( হিজরি ) ৮০০ । সঘৎ ১৪৫৪ । শাকে ১৩২১ । আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টী অঙ্ক কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্মল হিন্দুদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অঙ্ক লিখিত হয় নাই এবং সেই অঙ্ক যে কোন্ রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই, কিন্তু এ সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্যগাঙ্গ, হিজরি সন, বিক্রমসম্বৎ, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এবংপ্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।” \*

অল্পদিন দিন গত হইল শ্রীযুক্ত গুণয়ারসন সাহেব ভূমিদানপত্রখানি জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার যুক্তি অকাটা বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমিদান-পত্রে যে হিজরিসন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত করেন ; আইনআকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নির্দিষ্ট আছে এবং এ কথা সর্ববাদিসম্মত। ভূমিদান পত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ববর্তী, অথচ তাহাতে সেই হিজরি অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাম্রলিপির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তাম্রলিপির অক্ষর ; —উহা দেবনাগর, কিন্তু তৎসাময়িক বহুবিধ পুস্তক ও তাম্রশাসনে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মৈথিল। সে সময়ের লিপিমালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাম্রলিপিব্যবহৃত অক্ষর যে সে সময়ের নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাম্রশাসনখানি জাল, কিন্তু উহা এক হিসাবে জাল নহে ; আকবরের সময় সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়, রাজা টোডর-মল্লই তাহার অনুষ্ঠা, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাপতির

বংশধরগণ যে ভূমিদান পত্রের বলে বিক্ষী গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত কালক্রমে হারাইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের নিকট যে একটি নকল ছিল সেই নকল দৃষ্টে নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকিবে এবং হিজরি সনটি তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিক্ষী গ্রাম তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত পদেই জানা গিয়াছে,—শুধু বাজকশ-চারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্ত বিদ্যাপতির বংশধরগণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম তাম্রাঙ্গন প্রস্তুত করা আবশ্যকীয় বোধ করিয়াছিলেন । ইহাও একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট এ অনুমানটি সঙ্গত বোধ হইতেছে ।

রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের সংহাসন আরোহণ-কাল ১৪৪৬ খৃঃ অব্দ, ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাপতির নিজকৃত একটি মৈথিল পদ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে, তদ্রূপে দেখা যায় শিবসিংহ ১৪০০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন,—

“অনলরন্ধকর লবণ গরবই সফ সমুদ্র কর অগ্নি সসী ।

চৈতকারি ছাঠি জেঠা মিলিঅ বার বেহঙ্গই জাউলসী ॥

দেবসিংহ জং পুহমী ছুড়ুই অঙ্কাসন সুররাঅ সকা ।

দ্রুত সুরতান নিদৈ অব সোঅট তপনহীন জগ ভকা ॥

দেপতও পৃথিমীকে রাজা পৌকস মাথ পুগ বলিও ।

সত্তবলৈ গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও ॥

একদিস জবন সকল দল চলিও একদিস সৌ জমরাজ চক্স ।

দ্রুতএ দলটি মনোরথ পুরও গকএ দাপ সিংসিংহ কর ॥

সুরতককুম্ম ঘালি দিস পুরেও তুঙ্গি সুরর সাদ ধক্স ।

বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোঠৈ গগন ভক্স ॥

আরসী অধস্তেটি মহামণ রাজসুঅ অধমেধ জই ।

পণ্ডিতস্বর আচার বখানিঅ বাচককি ধরদান কই ॥

বিজ্ঞানবই কইবর এহ গাবএ মানত মন আনন্দ ভণ্ড ।

সিংহাসন সিংহবই বইটো উছবৈ বিসরি গণ্ড ।” \*

হে নগরবাসিগণ । তোমাদের পূর্ব রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লক্ষণাঙ্কে চৈত্র মাসে বৃক্ষপক্ষে জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন । রাজা রাজশূন্য হয় নাই : তাহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন ; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান । তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তুণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া কটাক্ষমাত্রে যমরাজ সৈন্তগণকে পরাভূত করিয়াছেন । তাহার পর যবনরাজ, তাহার সঙ্গে অগণিত সৈন্ত ; তোমাদের নুতন বাজা অকুতোভয় ; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । তোমরা অনুপস্থিত ছিলে ; দেখ নাই ; আকাশে সারি গাধিয়া দেবতাগণ দাঁড়াইয়া দণ্ডিতে লাগিলেন । মহর্ষমধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল । স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল । শিবসিংহের মাথার উপর কতই না স্তরতরুকুণ্ডল পড়িতে লাগিল । বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, সেই শিবসিংহ এগন তোমাদের রাজা হইয়াছেন ; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর ।

রাজপঞ্জীর নির্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমাদের আরও নানারূপ আপত্তি আছে ।

এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আব দুইটি প্রমাণ বাকী । মিথিলার

তদানীন্তন রাজধানী গজবতপুবে শিবসিংহের

আর দুইটি প্রমাণ ।

সভাসদ বিদ্যাপতিঠাকুরের আদেশে এক

খানি সংস্কৃতপুঁথি ( কাব্যপ্রকাশেব টীকা ) দেবশর্মা নামক জনৈক বিপ্র নকল করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার এইকণ :—

“সমস্তবিষ্ণুদাবলীবিরাজমান মহারাজাবিরাজ ত্রিংশশিবসিংহদেব সমুজ্জ্বলমানতীর-ভুক্তো ত্রিগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সত্ৰপাধ্যায় ঠাকুর ত্রিবিদ্যাপতীনামাজ্জয়া গৌরালসং শ্রীদেবশর্মা বলিয়াসসং ত্রিপ্রভাকরাত্মাঃ লিখিতৈষা পুস্তীতি । ল-সং ২৯১ কার্তিক বদি ১০ ।”

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি

সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির কালসমস্তায় একটি নূতন আলো প্রদান করিয়াছেন ; এই পুঁথি ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে লিখিত হয় । দ্বিতীয় প্রমাণ, বিদ্যাপতির নিজের লেখা ভাগবত গ্রন্থ, এই পুঁথির কালবাচক লেখাটির পাঠোদ্ধার হয় নাই, এ সম্বন্ধে প্রকৃততথ্য নিরূপণার্থ প্রেবিত হুই জন পণ্ডিতের মতদ্বৈধ জন্মিয়াছে, সুতরাং আমরা আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম । বিদ্যাপতিঠাকুর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যথাযথ ভাবে নির্দেশ করিতে পারিলাম না ; খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে ।

খাস মিথিলায়ও বিদ্যাপতির খাটি বচনা উদ্ধার করা অসম্ভব । \*

মিথিলাব পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গ-কবির উপর বাঙ্গালীর দাবী । দেশের প্রচলিত পাঠও বিকৃত, সুতরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলদিগের দাওয়া তুল্যরূপ । মিথিলা বাঙ্গালার পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ছিল এবং মিথিলার রাজসভায় লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীকবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন । পাঠবিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অথ দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজ্জ কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া অনুচিত । বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিক্ষৌভেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ক করিবেন । তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে ; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও

---

\* সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে অবিকৃত বলিয়া বোধ হয় ।\* এই পুঁথি সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করিতেছেন ।



প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে ; ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন ; আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়া করিয়াছি ; জগতে এই প্রথম বার নকলটি আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে । আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি না । এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ ; ঐতিহাসিক এ আদার নাও মান্ত করিতে পারেন ।

আমাদের অনেকগুলি প্রথম 'শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য ।

মিথিলার ৭৭ ।  
মিথিলার রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী,

মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল,—সমস্ত ভারতবর্ষে গুরুস্থানীয় । মিথিলা রাজ ইক্ষ্বাকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়া কপিলবস্ততে নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব । নবদ্বীপের অজ্ঞেয় টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত ; 'বৃজ্জি' নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রজবুলি বঙ্গ সাহিত্যের বহুপৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে । মিথিলার পণ্ডিতগণ "এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ" + বলিয়া যদি আমাদের একটু গালি দেন, তাহা সহ করা আমাদের অমুচিত হইবে না ।

আমরা ঈশাননাগরকৃত অষ্টদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাঈ, বিদ্যাপতি

এবং অষ্টদ্বৈত প্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল,  
বিদ্যাপতি ও অষ্টদ্বৈতচার্য্য ।

তখন বিদ্যাপতি বয়ঃবৃদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই ; অষ্টদ্বৈত ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং বর্ণিত সাক্ষাৎ-

---

\* বিদ্যাপতি কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ উপক্রমণিকা ৮/১ ।

কারের সময় তাঁহার বয়স ১৪।২৫ ছিল, সুতরাং ১৪৫৮ কিংবা তৎসম্মিলিত কোন সময়ে এই দেখা শুনা হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, ও তাঁহার পদরচনাব সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগবাগিণ্যাতির উৎকৃষ্ট জ্ঞান ছিল।

বিদ্যাপতির ধর্ম-বিশ্বাস কি ছিল জানা যায় নাই। তিনি ‘হুর্গা-ভক্তি-তবঙ্গিনী’ লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ ছিলেন। বিক্ষীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব এখনও আছে। কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবতখানি তাহার বৈষ্ণব ধর্মে প্রীতির সাক্ষী,— তাঁহার বাধাক্ষয়-সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস; একটি শিব-বন্দনায় তিনি বিগিষাছেন, “হবি উৎকৃষ্ট চাঁপা ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন, শিব তুমি সামান্য ধূতুরা ফুলেই প্রীত হও।” তিনি বাহিরে নাহাট থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্মের অন্তকূলে ছিল, একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্বীয়

পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন ;  
বিদ্যাপতির উপমা।

সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন ; একটি সুন্দর চিত্র দেখিলে পৃথিবীর নানা কপের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হইত—তাঁহি তাঁহার উপমাগুলি এত সুন্দর। নায়িকার সুন্দর চোখ দুটী তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন—দেখুন,—কজ্জল শোভিত সলিলার্দ্ৰ চক্ষু ঈষদ্-রক্তাভ হইয়াছে,—পদ্মদলে যেন ঈষদ্-সিন্ধুরের লেপ পড়িয়াছে, (১) চক্ষুর তারা যেন স্থির ভঙ্গের জ্বায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছে না। (২) কজ্জলযুক্ত

(১) “নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।

সিন্ধুরে মণ্ডিত জামু পঙ্কজপাতা।”

(২) “লোচন জমু খির ভূঙ্গ আকার।

মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।”

চোখের বক্সিম চাহনিতে বৃক্ষতারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া কেলিতেছে । -

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই ; উপমা ভিন্ন কথা নাই । পৃথিবীর সুন্দর পদার্থগুলি পৃথক্ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে ; চাঁপাফুলের ভ্রাণেও বেহাগ রাগিণীব কথা মনে পড়িতে পারে ; এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন, জগতের এই লতাফুলপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলিব আলেখ্য ; সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের শ্রায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমায়োজনার বাক্ত হয । বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ছিল; বৈদ্য মেকপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্লব হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচবাচর দৃশ্য হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন । উপমার বশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না । বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি—সৌন্দর্য্যের একটা পরিস্কার চিত্র আকিয়া দেওয়া । বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,— কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি । বয়ঃসন্ধির ছবিখানি এইরূপ,—

রাধা কখনও ( বালিকা-মূলত ) উচ্চহাস্ত হাসিয়া ফেলেন, কখনও ( নবাগত যৌবনের ভাবে ) ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি পেলা করে । কখনও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখনও তাঁহার গতি (যুবতীর শ্রায়) মৃদুন্দ ; ফুলধনুর পাঠশালায় ইনি নূতন শিক্ষার্থী ; নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোব হইয়া তাহাই দেখেন, কখনও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন । প্রেম-বিহাবেব কথা শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার

“চঞ্চল লোচনে বন্ধ নেহারনি  
অগ্নন শোভন তায় ।  
জম্বু ইন্দীবর পবনে ঠেলল  
অলি ভরে উলটায় ।”

দিকে নত করিয়া একাগ্র কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে কান্না ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ-বিন্যাসাদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সঙ্গীতমুগ্ধ হরিণীর স্থায় সেই দিকে আকৃষ্ট হন। \*

আর একখানি ছবি লজ্জার :—

“একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুখালু ভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে (কমলনয়ন) কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিক্ ঢাকিতে অস্ত্রদিক্ মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরণী ফাটিয়া যাউক, তাহাতে প্রবিষ্ট হই, \* \* \* কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিলেন। +

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর ছবি দেখিয়া কবি কটো তুলিয়াছেন; তুলি দ্বারা ফলিত বর্ণ মুছিয়া যায়, কিন্তু লেখনীর আঁকা ছবি মে'ছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরেও এই নারী চিত্রগুলি সদ্য-প্রস্ফুট মালতীর স্থায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা

“কর্ণে কর্ণে দশন ছটাছুট হাস।

কর্ণে কর্ণে অধর আগে কর বাস ।

চৌঙকি চলয়ে কর্ণে, কর্ণে চল মল ।

মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ।”

“হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর ।

কর্ণে আঁচর দেই কর্ণে হোয় ভোর ।”

“কেলি রভস যব শুনে ।

আনত হেরি ততহি দেই কাণে ।

ইণ্ডে যদি কোই করয়ে পরচারি ।

কাঁদন নাথি হাসি দেই গারি ।”

“মুকুর লেই অব করত সিদ্ধার ।

সখিরে পুছই কৈছে...বিহার ।”

“শুনিতে রসের কথা ধাপয়ে চিত

বৈসে কুণ্ডলিণী শুনই সঙ্গীত ।”

“একলি আহিনু ঘরে হীন পরিধান

অলখিতে আগল কমল নয়ান ।

জয়দেবের রাধার স্নায়—শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প । কিন্তু  
বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে

কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত  
বিরহ ।

হইয়া পরমভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন ।

তাহার ফ্রেমে-বাঁধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব  
রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল । তাহাব উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের  
জলে ভিজিয়া নবলাবণ্য ধারণ করিল । বিরহ ও বিরহানন্তর মিলন বর্ণ-  
নায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য । কেহ কেহ বলেন, চণ্ডী-  
দাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাহার কাবিতায় এই অপূৰ্ব পরিবর্তন  
সাধিত হইয়াছিল ।

শ্রীহরি মথুরায় বাইবেন শুনিয়া রাধা জ্ঞান-হীনা, কৃষ্ণ আসিলে তাহার  
হাত ছুথানি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া যেন রাধা নীরবে এই অভিপ্রায়  
ব্যক্ত করিল—“আমার মস্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না ।” কৃষ্ণ সেইকপ  
শপথ করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিল । বিদ্যা-  
পতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞা । কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন,  
শুক ও শীর্ণ কুসুমকাস্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ কৃষ্ণ আসিবেন  
বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, মুমূর্ষু রাধিকা কাতরে বলিতেছেন,—

চলকরে নলিনীলতা শুকাইয়া গেলে, বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে ? তপনতাপে

এদিকে ঝাপিতে তনু ওদিকে উদাস ।

ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥

\* \* \* \*

ধিক যাত্ৰিক জীবন যৌবন লাজ ।

আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥”

কচির অনুরোধে আমরা অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি ।  
তজ্জন্ত আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাই । নিখুত স্ব-চিসম্পন্ন রচনা  
বিদ্যাপতির পূর্বরাগ, সম্ভোগ-মিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্র্য প্রভৃতি অধ্যায়ে একরূপ ছন্দোপায়া ।

অঙ্গুর জলিয়া গেলে, বর্ষার জলে কি করিবে ? হরি হরি, একি দৈব দুঃখ ! সিদ্ধুতীরে যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে দূর করিবে ? আমার কর্ণদোষ ভিন্ন চন্দনতক সোরভবিচ্যুত হইবে কেন, চল্লকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন এবং চিন্তামণি যগ্গণহারি। হইবে কেন ? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না, এবং করতল আমার পংক বন্ধা হইল । \*

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমৈশ্বর্যের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুক্তার মৃত্যু-বাতনাও আমাদিগকে মোহিত করে, সে বিরহ-কথা মর্শ্মাস্তিক হইলেও তাহা এক স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যগুণে চিত্ত আকর্ষণ করে, “শ্রবণহঁ শ্রামনাম কব গান। জগহিতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥” প্রভৃতি কেমন মিষ্ট ! সেই চিরশ্রুত “নারায়ণ তন্তুত্যাগে” চরণার্দ্ধ মুমূর্ষুভক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, ইহাও কি তাহারই কবিত্বময় রূপান্তর নহে ?

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে । বিরহের দুঃখের পর, মিলনের সুখ বর্ণনার বিদ্যাপতির গীতির আয় গাঢ় প্রেমের উজ্জ্বল পদা-সাহিত্যে অল্পট আছে ।\* রাধিকা চল্লকিরণে কোকিলের কুহস্বরে পাগলিনী হইয়াছিলেন,

“হিম-কর-কিরণে                      নলিনী যদি জারব  
কি করবি মাধবী-মাসে ॥

অঙ্গুর, তপন                      তাপে যদি জারব  
কি করব বারিদ-মেহে ।”

“হরি হরি কো ইহ দৈব দুঃখ ।

সিদ্ধু নিকটে,                      যদি কণ্ঠ শুণায়ব  
কো দূর করব পিপাসা ॥

চন্দন তরু যব                      সোরভ ছোড়ব  
শব্দবর বরিথব আগি ।

চিন্তামণি যব                      নিজগুণ ছোড়ব  
কি মোর করম অভাগি ॥

শ্রাবণ মাহ যন                      বিন্দু না বরিথব  
সরবত বাঁধকি ছান্দে ;

—এখন বলিতেছেন,—সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদ্ভিত হউক, পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিষ্কিপ্ত হউক ।

কৃষ্ণ আসিবেন—প্রাণবঁধুকে প্রণাম করিবেন, বাণা এই সুখের আশায় মুগ্ধা ।

“কি কহব বে সখি আনন্দ গুর ।

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥”

প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন । “জনম অবধি” পদ বহুবাব উদ্ধৃত হইয়াছে ; এখানে আর উঠাইব না । ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাক্লাদ বর্ণনায় কৃতার্ণ, উপমা ও পরিহাস রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা দৃষ্টে প্রীত হইবেন, তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন । কিন্তু আমরা বিদ্যাপতি হইতে শ্রেষ্ঠ, খাঁটি প্রেমিক, ‘আড়ম্বর-হীন আর একটি কবির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, বঙ্গদেশের গীতি সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবিস্মৃতিত শ্রেষ্ঠত্ব ; তাঁহার কতিপয় অপ্রসিক্ত পদ কুসুমের সুরভির ত্রায় প্রকৃতি

আপনা আপনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া  
চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব ।

প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই ;—তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কটকাকর্ণ কুসুমের ত্রায় সুধা ও বিষ মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রন্থিত রহিয়াছে—কাব্যক্ষেত্রে

“সোহি কোকিল অব লাগ ডাকউ

লাখ উদয় কক চন্দা ।

পাঁচবাণ অব

লাখ বাণ হউ

মলয় পবন বহু মন্দা ॥”

চণ্ডীদাসপ্রভু কৰ্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্তপ্রভুর ত্রায় অন্ম এক প্রেমাবতার।  
বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের  
পদ যিনি নিজে আশ্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর  
বৈষ্ণবীয় পদেব সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে, তাদৃশ পাঠক  
সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

“কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।

গুপ্তা রতন করই সমতুল।

যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।

নীর ক্ষীর দুহঁ করই সমান।”

## ৫। কাব্যোতিহাসের সূত্রপাত।

ক। শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল অথবা গোড়-কাব্য।

খ। রাজ-মালা।

এই অধ্যায়াংশে বেশী কিছু লিখিবার নাই। মেদিনীপুর ময়নাগড়ে  
লাউসেন এবং ইছাই ঘোষ।  
লাউসেনরাজার ভগ্ন-প্রাসাদের অবশেষ  
এখনও দৃষ্ট হয়। অজয়নদের তীরে ইছাই-  
ঘোষের বাড়ীর রানীকৃত ইষ্টকাবলী এখনও পড়িয়া আছে। এসব  
চাঁদসদাগরের নিবাসস্থানের ত্রায় কল্পিত রাজ্য নহে; গোড়ের  
প্রবল প্রতাপাধ্বিত মহারাজগণের সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত ঐতিহাসিক  
তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। পাঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তিগণের তালিকায়  
লাউসেনের নাম দৃষ্ট হয়। হাণ্টার সাহেব তাঁহার ‘এনালস্ অব্‌ ক্লরাল  
বেঙ্গল’ নামক পুস্তকে ইছাইঘোষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই  
দুইটি ঐতিহাসিক বীরকে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্য কল্পনার গাঢ় ভূহিনে আবৃত  
করিয়া উপস্থিত করিয়াছে;—কল্পনার নানাবিধ উজ্জ্বলবর্ণ-বিশিষ্ট কুয়াসার  
চাপে সত্যের জীবনটুকু একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।



কিন্তু তথাপি ইহার গোড়ায় একটুকু সত্য আছে, এই জন্ত আমরা  
ইহা এই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম । প্রকৃতপক্ষে  
ধর্মমঙ্গল এখন আর ঐতি-  
হাসিক কাব্য নহে ।  
গোড় ইতিহাস এখন আমরা যে অবস্থায়  
পাইতেছি, তাহা পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের

মত । উহা আশ্রয় করিয়া কবিগণ প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের এবং  
তৎপরে চণ্ডীদেবীর বিজয়কেতু উদ্ভিত করিয়াছেন । প্রাচীনকালের  
হুইজন বীরকে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবাদের থানা হইতে উত্তোলিত  
করিয়া, অধুনা শিবজুর্গার প্রিয় সেবকরূপে পরিণত করা হইয়াছে, সুতরাং  
এখনকার শ্রীধর্ম-মঙ্গলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক অল্প ।

হাকন্দপুরাণ নামক লুপ্ত গ্রন্থে এই ইতিহাসের প্রথম প্রচার হয় বলিয়া  
বামাইপণ্ডিতেব পদ্ধতি ।  
উল্লিখিত আছে । আমরা পূর্বে একবার  
লিখিয়াছি, মহারাজ ধর্মপালের সমকালিক  
বাইতি জাতীয় রমাইপণ্ডিত সর্বপ্রথম ধর্মপূজার এক পদ্ধতি প্রণয়ন  
করেন । সেই পদ্ধতির কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই অংশটুকুও  
যে সমস্তই তাহার রচনা, একথা বলা যায় না ; তাহার ভগিনী যোগ  
করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট  
করিয়াছেন ; জাজপু ব্রাহ্মণের মুসলমান বিবরণটি অবশ্য রমাইপণ্ডিত  
লিখেন নাই । পদ্ধতি হইতে আমরা বমাইপণ্ডিতেব খাঁটি রচনা বলিয়া  
যে সকল অংশ বিশ্বাস কবি, তাহার একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

জ্ঞানের মন্ত্র ।

ওঁ হারতি ভারতি গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । সরযাং গওকী পুণ্যা খেতগঙ্গা কৌশিকী ।  
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী ভবা । সদা স্বয় মনোভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ । জল লইয়া  
জ্ঞান করেন ধর্ম আগম জলে । অখণ্ড তুলসীপত্র দিয়া পদতলে । অভিগঙ্গা চূড়ামণি  
। করেন ভকতি । তুরিতে যে জ্ঞান লেন গোঁসাক্ষি যুবতী । ঢোল সমুদ্র এল গোঁসাক্ষি  
ক্ষীরনদী । গঙ্গা যমুনা এল বসন্ত বদরী । শোভাধাত্রীগণ এল হোম্যে এক স্থানে ।

মান করেন প্রভু ভগবানে । মান আচলিত গীত পণ্ডিত রমাই গান । একল রমাই-  
দ্বিজ শয়ল অবধান ।”

এই অদ্ভুত মস্তুর ব্যাখ্যা করিতে ইহার আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায়  
বিবিধ কবির ধর্ম কাব্য । শাস্ত্রী মহাশয়ও অসমর্থ হইয়াছেন । বাঁকুড়ায়  
ময়ূরভট্ট প্রণীত গোড়কাব্য এখনও প্রচলিত  
আছে । আমরা তাহা পাঠ নাট । মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মকাব্য পরিষদ  
হইতে ছাপা হইতেছে । রামচন্দ্রপ্রণীত ধর্মমঙ্গল আমরা দেখি নাট ।  
খেলারাম প্রণীত গ্রন্থট, বোধ হয়, উহাদের পরে লিখিত হয় ।  
৬ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছিলেন ;  
কিন্তু তিনি যে পুস্তকখানি পাঠিয়াছিলেন, তাহার শেষের অনেকাংশ  
একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । সুতরাং দ্বিতীয় একখানি পুস্তক না  
পাওয়া পর্য্যন্ত খেলারামের কাব্যখানি ছিন্নচিত্র কি ভগ্নবিগ্রহের ন্যায়  
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখিবার যোগ্য হইবে ।

খেলারামের পুস্তক ১৫২৭ খৃঃ অব্দে রচিত হয় ; কবি তাহা নিম্ন-  
লিখিত পংক্তি কয়েকটিতে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

“ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন ।

খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥

হে ধর্ম এ দাসের পুরাণ মনস্কাম ।

গোড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম ॥

তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয় ।

অষ্ট মঙ্গলার দিব আশ্ব পরিচয় ॥”

তাহার শেষ অধ্যায় ( অষ্টমঙ্গলা ) পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং

: ভুবন=১৪ ; বায়ু=৪০ । শরের বাহন—ধর্মু=পৌষমাস । ১৪৪০ শক,  
পৌষমাস । এইসব কবিতা ৬ ভক্তিনিধি মহাশয় আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ।

আত্মবিবরণটি নষ্ট হইয়াছে । খেলারামের কবিতা সরল ও সরস ; কিছু নমুনা এই ;—

“স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে ।

মুরম্য সরসী এক তার মাঝে ঝলে ॥

কমল কুমুদ আদি নানা ফুল দল ।

বিকাশিয়া ভূষে তার নীল উরঃস্থল ॥

শুন বাছা লাউসেন বলিরে তোমায় ।

এওজাং দিও, নেড়া বেউল তলাষ ॥”

ঘনরামের পূর্বে রামদাস কৈবর্ত \* এবং কপবাম নামক দুইজন কাব ও হীহাদের পরে সহদেব চক্রবর্তী এবং সীতারামদাস ধর্মমঙ্গল-কাব্য লিখিয়াছিলেন ; কলিকাতার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে উক্ত পুস্তকদ্বয় এখনও প্রচলিত আছে ।

## খ । রাজ-মালা ।

ত্রিপুরাব মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময় ( ১৪০৭-১৪৩২ খৃঃ ) রাজ-

মালা বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আরম্ভ হয় ।  
শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ।

ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার বিরূপ উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল । এসিয়াটিক সোসাইটির জারুয়ালে ঐকবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল । বাঙ্গালা রাজমালা অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারে লুপ্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সম্প্রতি আমরা একখানি প্রাচীন রাজমালা পুঁথি দেখিতে পাইয়াছি । ত্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে উক্ত পুঁথি হইতে অনেক

স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটি নিম্নে প্রদান করিলাম :—

“শ্রীধর্ম্মমণিকা দেব ত্রৈপুৰ সন্ততি ।  
 রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী ॥  
 পুস্তক শুনিলে ভূপে পূৰ্ব্ব রাজকথা ।  
 ততঃপর নৃপচর্যা না হইছে গাথা ॥  
 অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি ।  
 পয়ারে লিখাহ তুমি রজমালা পুথী ॥  
 শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ ।  
 রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন ॥  
 প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান ।  
 ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান ॥  
 সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ কুমার ।  
 বাণেশ্বর শুক্রেস্বর বিদ্যাতে অপার ॥  
 ইন্দের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি ।  
 সেই মত দ্বিজগণ হয় মহামানী ॥  
 দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান ।  
 পূৰ্বকথা জানে সেই অতি সাবধান ॥  
 রক্তার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন ।  
 নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ ॥  
 সিংহাসনে একদিন বসিয়' নৃপতি ।  
 বংশ কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ ততি ॥  
 শুক্রেস্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর ।  
 চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥  
 নানা তত্ত্ব প্রমাণ করিয়া তিন জন ।  
 রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন ॥  
 রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা ।  
 বাক্য্য কালির্ণয় আর লক্ষ্মণমালিকা ॥

হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভস্মাচলে ।

নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে ॥

এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয় ।

রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥”

ইতি দুর্য্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায় ।

বঙ্গদেশের<sup>\*</sup> অতীত রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয়  
বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নপর হইতেন,  
সংক্ষিপ্ত রাজমালা ।

তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের  
কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না । যে সময় রাজ-  
মালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্পায়তনে দেখাইবার  
জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল—আমরা তাহা হইতেও  
কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

“যযাতি রাজার পুত্র দুর্য্য নাম যার ।

তান বংশে দৈত্য রাজা চল্ল বংশ সার ॥

তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে ।

তস্ত পত্নী গর্ভে ত্রিলোচন রাজা জন্মে ॥

তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি ।

তস্ত পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চাকমতি ॥

তস্ত পুত্র হৃদক্ষিণ ছিল মহীপাল ।

তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল ॥

তস্ত পুত্র ধর্ম্মতর রাজ-নীতি অতি ।

তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি ॥

তস্ত পুত্র হৃদধর্ম্ম ছিলেন মহারাজা ।

তান স্তত তরঙ্গ স্থখে পালে প্রজা ॥

তস্ত পুত্র দেবান্দ্র হইল মতিমাত ।

তান পুত্র নরাস্তিত নৃপতি আখ্যান ॥”

ইহা বঙ্গে ইতিহাস লেখার সূত্রপাত । ইহার বিকাশ বৈষ্ণব-সাহিত্যে—  
চৈতন্য-ভাগবতের আশ্রয় ঘটনার উৎকৃষ্ট সমাবেশযুক্ত ইতিহাসে ও চরিতা-  
মৃতের আশ্রয় অপূর্ব ভক্তিপ্লুত দর্শনাত্মক ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে । কিন্তু  
বাঙ্গালা ভাষায় চরিত-শাখা মাত্র বিকাশ পাইয়াছে । রাজত্বের ইতিহাস  
কি রাজনীতির আলোচনা বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে দুস্তাপ্য ; বাহা কিছু  
পাওয়া যায়,—রাজমালায়ই তাহার শেষ ।

আমরা যেসকল কবিগণকে গোড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহি-  
ত্যের অন্তর্গত করিলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের সমকালিক  
হইয়া পড়িলেন । চৈতন্য প্রভুর পূর্বে সাহিত্যের যে নানাবিধ উদ্যম  
হইতেছিল, আমরা এষ্ট অধ্যায়ে তাহার আরম্ভ ও ক্রম-বিকাশ নির্দেশ  
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । যদিও উল্লিখিত কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ  
চৈতন্য প্রভুর সময়ে আসিয়া পড়িলেন, ইহাদেব কেহই তাঁহার প্রভাবা-  
শ্রিত নহেন ও ইহাদের সময়েও চৈতন্য প্রভু অবতার বলিয়া সাধারণের  
নিকট গৃহীত হন নাই ।

# ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করি-  
লাম । এ স্থলে তাঁহাদের আনুমানিক কাল  
কবি-তালিকা ।  
৩ গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

| নাম               | সময়                                                                     | রচিত গ্রন্থের নাম ।                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। রমাই পণ্ডিত ।  | রাজা ধর্মপালের সময়                                                      | পদ্মতি ।                                                                                                                                                                                                                                  |
| ২। চণ্ডীদাস ।     | গুঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে<br>পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত । | পদাবলী ।                                                                                                                                                                                                                                  |
| ৩। বিদ্যাপতি ।    | ঐ                                                                        | ১। পদাবলী । ২। পুরুষ-<br>পরীক্ষা । ৩। শৈবসর্বস্ব-<br>সার । ৪। দান-বাক্যাবলী ।<br>৫। বিবাদ সার । ৬। গয়া-<br>পত্ন । ৭। গঙ্গাবাক্যাবলী ।<br>৮। দুঃখভক্তিতত্ত্বসির্গী । ৯।<br>কীর্তিলতা । পদাবলী ব্যতীত<br>সবগুলিই পুস্তকই সংস্কৃত<br>রচিত । |
| ৪। কৃত্তিবাস ।    | পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ।<br>( কংস-নারায়ণের কাল ) ।                     | ১। রামায়ণ । ২। শিব-<br>রামের যুদ্ধ । ৩। যোগা-<br>ধার বন্দনা । ৪। রুক্মাক্ষদ-<br>রাজার একাদশী ।                                                                                                                                           |
| ৫। সঞ্জয় ।       | সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের সমকালে ।                                             | মহাভারত ।                                                                                                                                                                                                                                 |
| ৬। মালাধর বসু ।   | হসেনসাহের সময় ।<br>( গুণরাজ খাঁ ) ।                                     | ১। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ।<br>২। লক্ষ্মী-চরিত্র ।                                                                                                                                                                                               |
| ৬। কাণা হরিনন্দ । | সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর<br>আদি ভাগে ।                                    | মনসার ভাসান ।                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                      |                                      |                       |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ৮।  | বিজয় গুপ্ত।                         | হুসেন সাহের সময়।                    | পদ্মাপুরাণ।           |
| ৯।  | নারায়ণ দেব।                         | সম্ভবতঃ ঐ সময়ে।                     | ঐ                     |
| ১০। | বিজ্ঞ জনাৰ্দ্দন।                     | ঐ                                    | মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান। |
| ১১। | রতিদেব।                              | ঐ                                    | মৃগলক্ক।              |
| ১২। | গুপ্তেশ্বর এবং<br>বার্ণেশ্বর পণ্ডিত। | } ১৪০৭—১৪৩৯ খৃঃ।                     | রাজমালা।              |
| ১৩। | খেলারাম<br>প্রভৃতি।                  |                                      |                       |
|     |                                      | পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর<br>মধ্যে।    | ধর্মমঙ্গল।            |
| ১৪। | কবীন্দ্র পরমেশ্বর।                   | হুসেন সাহের সময়।                    | মহাভারত।              |
| ১৫। | শ্রীকর-নন্দী।                        | ঐ                                    | অশ্বমেধ পর্ব।         |
| ১৬। | বিজ্ঞ অনন্ত।                         | সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ<br>ভাগে। | রামায়ণ।              |

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকর-নন্দীর অনুবাদিত  
হুসেনী-সাহিত্য।

উৎসাহের ফল; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ  
ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রন্থে হুসেনসাহেব যশ ও কীর্তি বর্ণিত আছে।  
তিনি অন্তর্দৃষ্টিবলবন্তী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত উদার ও বঙ্গ-  
ভাষার উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে  
গোড়ীষ যুগের মধ্যে এক খণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে “হুসেনী  
সাহিত্যের কাল” আখ্যা দান করা অসুচিত হইবে না। উপরি উদ্ধৃত  
১৬ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলাস্থ বিষ্ণুর, চণ্ডীদাস বীরভূমাস্তর্গত  
নান্দুরেব, খেলারাম সম্ভবতঃ হুগলী জেলার ও মালাধর বসু কুলীনগ্রামের  
অধিবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট কবিগণের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের কবি। ইহা-  
দের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল ফুলশ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের,  
কবিগণের বাসস্থান। রাজমালালেখকদ্বয় ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র-  
পরমেশ্বর, শ্রীকর-নন্দী ও রতিদেব চট্টগ্রামের



অধিবাসী । বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশেই একবারে প্রতিভাশূন্য মরু ছিল না । আরণ্যকুসুম ও গ্রাম্যকবিতা সর্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে বহুকালের আবদ্ধ ধূসরবর্ণ তুলট কাগজের সমাধিক্ষেত্র হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উত্থোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে ?

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ । যে সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইত না । “কেবল গুপ্তকের বিষয় ধর্মপ্রসঙ্গীয় হওয়া আবশ্যক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা কি স্বকীয় মনোস্থিতার বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না । এইজন্ত প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই শঠতার সাধারণ মার্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে হইত । দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল । সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না । কুন্তিবাস লিখিয়াছিলেন,—“কুন্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে” তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া অসংখ্য লেখক ‘স্বপ্ন’ কি ‘বরের’ দোহাই দিয়া কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন । ‘কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গায়ে বাস । স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু বাস ।’—মালাধর বসু লিখিয়াছেন । ‘বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে ।’—ইহার স্বপ্নের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে । ‘পাঁচালী সম্ভয় রচিত দেববলে ।’—(বে, গ, পৃথি ৪৫১ পত্র) সম্ভয় লিখিয়াছেন । পরবর্তী সময়ে কবি-কঙ্কণের “চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে” পদ সকলেই জানেন । কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিলে পাঠকের সর্বাঙ্গ শিহরিত হয় ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানিকে ভাল বলিতে হয় । স্বপ্নে কবির নিকট

আদেশ এই,—“তোমার কবিতা বার মনে নাহি লাগে । সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে ॥” কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে ; ভগবতী মজুমদারের নিকট ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কহিতেছেন,—

“জ্ঞানবান হবে সেই আমার কুপায় ।

এই গীতি রচিবার স্বপ্ন কব তায় ॥

বৃষ্ণচন্দ্র আমার আঁজার অনুসারে ।

রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে ॥

সেই এই অষ্টমঙ্গলার অন্তসারে ।

অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥

ডিউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ ।

এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥”

দেবীর অপার লীলাগুণে কানোর উৎপাত, বিকাশ ও গায়েন কতুক তৎপাঠ, সমস্তই স্বপ্ননিরাস্তত্ব ।

পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত চিন্তাদিকাব্যতঃ কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তৎকালের দলে পড়িয়া সত্যভাষী সারস-পক্ষীটিকেও বেক্রপ কুসঙ্গহেতু বন্দী হইয়া শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির উপরও সেক্রপ ব্যবস্থা হইতে পারে ।

বঙ্গের বড় বড় কবিগণও স্বপ্ন কি দেবাদেশের কথা না বলিয়া কবিতা

লিখিতে পারেন নাহি । কিন্তু বৈষ্ণবগণ  
বৈষ্ণব কবিগণের সত্যতা ।

প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন ।

তাহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত বাজ্যে বিহার করিয়াছিল । তাহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিনয়-মাথা ; প্রত্যাদেশের খুঁটা গিণ্টি তাহারা দেখান নাই । ঐ সব আদেশগর্ভিত লেখকগণের সঙ্গে সাফাতের পর নরোত্তম দাসের,—  
‘শ্রীশ্রব বৈষ্ণব পদ জদয়েতে ধরি । চৈতন্তের হাটে নিতা ঝাড়ুগিরি করি ॥’

বৃন্দাবন দাসের,—“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দ জ্ঞান । বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥”  
কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের,—“মুখ নীচ ক্ষুদ্র মুক্তি বিষয়লালস । বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি  
করি এতেক সাহস ॥” প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন ; সরল ও বিনম্র কথাগুলি  
ফুলমালার খায় আপনিই সুরভিময় ।

পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । এই পঞ্চগৌড়ের

মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ।  
পঞ্চগৌড় ও বঙ্গদেশ ।

মিথিলার ভাষা ‘ব্রজবুলি’ বাঙ্গালা সাহিত্যের  
একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে , মিথিলার সংস্কৃত-টোল নবদ্বীপের  
শিক্ষাপুরু, এসব যষ্ঠ অধ্যাবে লিখিত হইয়াছে । ‘মৈথিল অক্ষর ( তিরুটে  
অক্ষর ) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল ।\* মিথিলার পরে কাশ্যকুজ বঙ্গ-  
দেশের শিক্ষা-প্রদানে সহায়তা করিয়াছে , কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ  
ও পঞ্চকার্যস্বরূপ সুবর্ণমুষ্টি দান করেন ; কিন্তু এইখানেই এ ঋণের শেষ  
নহে । ‘পঞ্চালী’ নামক গীত পঞ্চালেই ( কনোজে ) উদ্ভূত হওয়া  
সম্ভব ; এই ‘পঞ্চালী’-গীতের আদশ লহযা বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি  
রচিত হইয়াছিল । সারস্বত প্রদেশেব একাদা বঙ্গদেশে গৃহীত হয় ।  
এইরূপে দেখা যায়, আর্যজাতির এই পঞ্চাশাখা পূর্বে সন্নিকটবর্তী ছিল ;  
ইহাদের সমস্তটির ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস  
লেখা সম্ভব নহে । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা কবিলে হিন্দুস্থানী,

মৈথিলী, ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক  
পঞ্চাশাখার ঘনিষ্ঠতা ।

শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালি\* শব্দের ঐক্য দৃষ্ট  
হয় , এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই,—  
কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর

\* ব্রহ্মতের ভ্রমের একটী বিশেষ ভাব এই যে, ‘ব’এর নীচে সর্বত্রই শূন্য আছে,  
( See Grierson’s Maithil Grammar J. A. S. Extra No 1880 ) আমরা  
প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে ‘ব’ এর নীচে শূন্য এবং পেটকাটা ‘র’ পাইয়াছি ।

নিকটবর্তী ছিল, এইজন্ত এই সাদৃশ্য । আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ‘ব্রজ বুলি’-চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না ; ‘ব্রজ-বুলি’ মৈথিলভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা,—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি । বঙ্গসাহিত্যের ব্রজবুলিচিহ্নিত অংশ বাদ দিলেও খাঁটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সেকালে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয় । নিম্নে কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাউতেছে ;—

যেত্কে, তেত্কে, ভুধা, বড়ুয়া ( বড় ), পইতায় ( প্রত্যয় করে ) স্তবোধিয়া, সরয়া,  
 বঙ্গভাষার সঙ্গে হিন্দী পোখরি, বাবন ( ব্রাহ্মণ ), দোন, ডাবিয়া, ( মা, চ, গা, )  
 ও মৈথিলের মিশ্রণ । সাসিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবাঁই, বড়ি ( বড় ), টুট,  
 পাকনা, ফাণ্ড, সোয়াণ্ডি ( বিজয়গুপ্ত ); বহিন ;

গুতিল, এড়া ( কুন্তিবাস ) আবর—( আওর ) আর, করিলোঁ—করিলাম, ভৈল—, হইল, বড়া—বড়, হঁয়া—হ’য়ে, বহঁতর—অনেক, হরোক—হউক, আবে—এখন, হইমুই— হই কি না, পালটায়—ফিরে, কিসক—কেন, ভাহাই—ভাই, নজাঁবো—বাচিব না, পিকুই—পরিধান করে । ( অনন্ত রামায়ণ ) কঁরো, কৈল, দোঁহা, আঁইল, শকুনিয়া, করিলেস্ত, বায়, পড়িলেস্ত, আইবেস্ত ইত্যাদি, মোহর ( আমার ), চাহসি, কহসি, করসি ইত্যাদি, নিয়ড়ে, কাহা ( কোথায় ), তুমি সব, বাও ( বাতাস ), বোলাও, এহি বিহা, চিহি ( চেনা ), নির্দ, কেহে, পাকায় ( সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকর-নন্দী প্রভৃতি ) ইহা ছাড়া ‘পরদেশক লাগিয়া’, ‘জলক লাগিয়া’ ( মা, চ, গা, ) ‘ঘরকে গমন’ ( কুন্তিবাস ) । ‘কাঁধকে রূমাল’ ( শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ) “করে বীর বেণেরে জোহার” ( ক, ক, চ, ) প্রভৃতি পদেও হিন্দীর কথা স্মরণ করাটয়া দেয় ।\*

\* উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে ‘গুতিল’ শব্দ এখনও মৈথিল ভাষায় প্রচলিত আছে ( See Grierson’s Maithil Grammar J. A. S. Extra No. 1880 ) । করস্ত, বোলেস্ত প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয় . ‘শকুনিয়া’, প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ ; এস্থলে বলা বাহিত্যে পারে সম্ভবতঃ খোট্টার মূখে বঙ্গাধিপের নাম ‘লক্ষ্মণিয়া’ শুনিয়া আবুল কাজেল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ‘লক্ষ্মণের’, নাম ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্ট হইয়া স্ব-ইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে । “আবে” শব্দ হিন্দী অব শব্দের মত এখনও

শুধু ভাষার ঐক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর পশ্চিমের ভ্রাতাদের সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল ; বিজয়-পরিচ্ছদে সাদৃশ্য ।

গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ চাঁদসদাগরের নিকট পট্টবস্ত্র পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,—“একখন কাচিয়া গিলে, আর একখন মাথায় বান্ধে, আর একখন দিল সর্বগায় ।” মা মরিয়াছেন, খেতুরি রাজাকে বলিতেছে, ‘কার জন্তে পাগড়ি রাখিছ মন্তকের উপর’—মাণিক-চাঁদের গান ( ৩৫২ শ্লোক ) এই সকল বর্ণনায় মালকৌঁচামারা পাগড়ি মাথায় ঠিক খোঁটোর ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে । ‘লম্বোদর’, ‘নাভি স্নগভীর’ প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোঁটাদের মত বাঙ্গালীরাও উন্মুক্ত উদর ও নাভি দেখাইয়া প্রশংসিত হইতেন । এইরূপ বস্ত্রপরিহিত স্বামীর পার্শ্বে কাঁচুলিআঁটা রমণীই শোভা পায়, প্রত্নত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও খোঁটার দোকানে ক্রীত ।—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিজয়গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন । কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজার সময়ও এই রীতি একবারে পরিত্যক্ত হয় নাই ;—“রাজীও রাজবধু এবং রাজকন্তারা কার্পাস বা কোষেশাটী পরিতেন, কিম্ব প্রায় সমস্ত শুভ কর্ণোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের স্থায় কাঁচুলি, ষাগরা ও গুড়না পরিধান করিতেন । ( ক্ষিতীশবংশ-বলীচরিত, ৩৫ পৃঃ ) আমরা বৈষ্ণব কবির পদেও পাঠিয়াছি—“নীল গুড়নার মাঝে মুখ শোভা করে । সোপার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥” ( প, ক, ত, ১৩৭৭ পদ ) এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,—“কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ভাল সাজে । বতন মঞ্জরী রান্ধা চরণেতে রাজে ॥” নীবিবন্ধের উল্লেখও অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া যায় । এই সব নরনারীগণ যে ছএকটি হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিম্বা

পূর্ববঙ্গের নিম্নপ্রণয়ী লোকগণ কোন কোন স্থানে ‘গ্রাবো’ ( এখন ) শব্দ ব্যবহার করে । আমরা উক্ত শব্দসংগ্রহে চণ্ডীদাস কি অথ কোন ‘ব্রজবুলি’-অধিকৃত লেখকের সাহায্য গ্রহণ করি নাই ।

ব্রজবুলীর ভাষা অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ?

উড়িয়া, মাদ্রাজ, এং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের অধিবাসীর ভাষা বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন ; তাহারা দীর্ঘকেশ বাঁধিয়া রাখিতেন এবং কখনও তদ্বারা বেণী প্রাথিত করিতেন ; রাখার সখীগণ শ্রীশ্রামচাঁদকে বলিতেছেন,—“আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ।” (চণ্ডীদাস) শ্রীচৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ বিলাপ করিতেছে,—“কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন । কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ কেহ বলে সে সুল্লর কেশে আরবার । আমলকী দিয়া কিবা করিব সংস্কার ॥” (চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড) “গলায় রামের সৈন্ত নাহি বাধে কেশ ।” (বৃত্তিবাস) “পরম সুল্লয় লখাইর দাঁঘ মাথার চুল । জাতিগণ ধরি' নিল গাঙ্গুড়ির কুল ॥” (বিষ্ণুসংগত) ।

শুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকট সঙ্কল্প প্রতীয়মান হইবে । ভারতচন্দ্র মহা-আহারে ব্যবহারে একা । সঙ্কল্প প্রতীয়মান হইবে । ভারতচন্দ্র মহা-দেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,—“হুখ কুসুস্তাঃ আজি হয়েছে বাসনা ।” বঙ্গবাসীর সংস্কারের বিস্তৃত টীকায় এই ‘কুসুস্তার’ অর্থ লেখা হইয়াছে, ‘একরূপ সামগ্রী’ । এখন বাঙ্গালীর ‘কুসুস্তা’ অর্থ জাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতনা এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এই ‘কুসুস্তা’ ভক্ষণ এখনও একটি বিশেষ আমোদজনক ব্যাপার ; উহা অহিংসের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং কুসুস্তাভক্ষণের জন্ত নিমন্ত্রণ একটি উৎসবরূপে গণ্য হয় । এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা দিক্ হইতে উত্তরপশ্চিমাবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট সঙ্কল্পের সাক্ষ্য পাওয়া যায় । খোষ্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী—এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে ; ভাষা ও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রমদূরবৃদ্ধিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদ্রূপে লুপ্তপ্রায় সঙ্কল্পের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং মনে অপূর্ব আনন্দ বোধ হয় ।

বঙ্গদেশে সমাগত আৰ্য্যজাতির শাখা আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রিয়াপদ । হইল । পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্তী, পূর্বে ততদূর ছিল না । পূর্বের এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ‘করিমু’ ও ‘করিবু’ এই দুইকপ ক্রিয়াব ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় ; ডাকের বচনে ‘করিবু’ ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে ; মাণিক চাঁদের গানেও সেরূপ ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়, — “ফুল গোঠকে দেখিয়া ফুল না পাড়িব । পাখী গোঠক দেখিয়া ডিমা না মারিব । পরের স্ত্রী দেখিয়া হাস্ত না করিব ॥” ( ৫৬৩ শ্লোক ) “তুমি হবু বটগঙ্গ আমি তোমার লতা । রাজা চরণ বেড়িয়া লবু পলায়ে যাবু কোথা ॥ ( ১৭৩ শ্লোক ) । পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে ‘করিমু’ প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়,—

“যুগধর্ম্ম শ্রবণমিহু নাম সংকীৰ্ত্তন । ভক্তি দিয়া নাচামিহু ভুবন ॥ আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গীকার । আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবার ॥ ” ১, ৮, আদি, ৩য় পরিচ্ছেদ ।

চণ্ডীদাস এবং গুণরাজ যাঁও এইকপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । এই দুইকপ ক্রিয়াই পূর্বকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বোধ হয়, কালে ‘করিমু’ হইতে ‘করিবু’ ক্রিয়ার সাপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কচি অধিকতর অনুকূল হইল, ‘করিব’ ( কর ), ‘খাব’ ‘মাব’, ইত্যাদি প্রচলন হইল । পূর্ববঙ্গে ‘করিমু,’ ‘ককম’ ইত্যাদি কপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল, কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিত্যন্ত মফস্বলে ‘করিবাম,’ ‘খাইবাম’ ইত্যাদিকপও লক্ষিত হয় । নাবাষণদেবের পদ্মাপুবাণের উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ ক্রিয়াব প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে । পশ্চিমবঙ্গেও যে এককালে সেইকপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, তাহার আভাস আছে । ‘করিবাঙ,’ ‘মাইবাঙ,’ ‘বলিবাঙ’ প্রভৃতি শব্দ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয় । কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ পশ্চিম বঙ্গের লেখক বলিষাই নির্দিষ্ট হইয়াছেন, উক্ত দুই গ্রন্থকারকৃত ‘মনসার ভাসান’ হইতে দুইটি ছত্র উঠাইতেছি, —

“মনসা বলেন আমি দিবাম এই বর । সাত ডিঙ্গা বন হবে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর ॥”

—কতকা দাস ও ফেমানন্দের ভাসান, আপুর চিংপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক বিদ্যারত্নবন্ধে মুদ্রিত; পৃঃ ৪৫ ।

পূর্ববঙ্গ-প্রচলিত ‘আছিল’ শব্দ পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায় ; সুতরাং এইসব ক্রিয়াপদগুলি পূর্বকালে বঙ্গের দুই অংশেই কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল ; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্দগুলি এক এক আকারে এক এক দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে ।

করসি, করেস্ত, বোলেস্ত ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় ; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও সেরূপ ক্রিয়া একবারে হুস্তাপ্য নহে ; আমবা ত্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে ‘পিবস্তি,’ চৈতন্ত-চরিতামৃত হইতে ‘যা স্ত’ ও ডাকের বচন হইতে ‘থায়সি,’ ‘পূজসি’ প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি । ( ২৮, ৬৯ পৃষ্ঠা ) অস্ত্রান্ত শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের বহুসংখ্যক শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীন-রূপ রক্ষা করিয়াছে ; প্রাকৃতের ‘ও’—( হো ) প্রিয়তা পূর্ববঙ্গেব প্রাচীন পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয় ; যথা :—

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| শব্দ ... পূর্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্তরূপ । | শব্দ ... পূর্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ । |
| মা .. ( মাতা ) ... মাও ।                  | গাঁ .. ( গ্রাম ) ... গাঁও ।                |
| পা ... ( পদ ) ... পাও ।                   | ছা .. ছানা ... ছাও ।                       |
| ঘা ... ( ঘাত ) ... ঘাও ।                  | দা .. ... দাও ।                            |
| না ... ( নৌকা ) ... নাও ।                 | ভাব .. ... ভাও ।                           |
| রা ... ( রব ) ... রাও ।                   | বা .. ( বাত ) ... বাও ।                    |
| গা ... ( গাত্র ) ... গাও ।                | তা .. ( তাপ ) ... তাও ।                    |

এই সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যায়, যথা—‘নাটি গীত হুখে যায়, রূপার দোলায় ফেলায় পাও ।’ ( খনা । )

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে বঙ্গবাসী আর্য্যাগণের সঙ্গে উত্তরপশ্চিমের শাখা-

কালে পৃথক আওতে  
পারগতির সম্ভাবনা ।

গুলির এবং পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের—এই  
দুই উপশাখার বর্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর  
নিকট সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এই



ক্রমক দূরবর্তিতা যদি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতির হইয়া দাঁড়াইতে পারি। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহবন্ধনাদি দ্বারা একজাতীয়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু অত্যাশ্রিত দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। এই বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাত্র আশা—সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন, সেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া উড়িয়া, খোঁটা, মৈথিল,—পঞ্চগোড় ছাড়িয়া—পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গে ও আমরা একতা-স্থ্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব-পুরুষদিগের প্রসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জাগরিত হয়,—বহু এক হইয়া যায়।

‘বৌদ্ধ যুগ’—অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের প্রভাবাচ্ছন্ন নাই। এই

অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জিত ও  
বৌদ্ধ যুগান্তে ক্রমে  
সংস্কৃত-প্রভাবের বিস্তৃতি। সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধতা লাভে প্রয়াসী।

মাণিকচাঁদেরগানে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সংশ্রব-রহিত, যথা—অন্ননা, পদ্মনা, খেতুরি, নেঙ্গা, মনামতি। চণ্ডীদাস—শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা ও অবলা, শ্রীরাধার প্রতিবেশিনী বালরা বর্ণন করিয়াছেন, এসকল নাম সংস্কৃতের মত। কিন্তু বিজয়শৃঙ্গের পদ্মাপুরাণে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া যায়,—লখীন্দরের বিবাহবাসরে এরোগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত ভাবাপন্ন, যথা—কমলা, বিমলা, ভানুমতি, রোহিণী, রমণী, তারাবতী, হনুমা, হুদ্দ্রা, রতি তিলোত্তমা, সরস্বতা, চল্লরেখা, কৌশল্যা, কুমারী, বামা, চল্লপ্রভা, চল্লরেখা, দুলাভা, অনুপমা, রত্নমালা, জাহ্নবী, চল্লকলা, রঙ্গিণী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরলা। কিন্তু তখনও অসংস্কৃত প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, অত্যাশ্রিত এরোগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই হাশ্বোদীপক—উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মধ্যে দুই একটা সংস্কৃত নাম আছে,—একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন

পোষা গাধা । আর এক এয়ো আইল তার নাম রুই । মস্তকে আছেয়ে তার চুল গাছ  
 দুই । আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু । গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দিতে ধোঁয়া খাইল  
 গরু । আর এয়ো আইল তার নাম কুই । দুই গালে ধরে তার ক্ষুদ্র মণ দুই । আর  
 এক এয়ো আইল তার নাম শলী । মুখে নাই দন্ত গোটা ওঠে দিছে মিশি । আর এক  
 এয়ো আইল তার নাম আই । দুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই । আর এক  
 এয়ো আইল তার নাম চুয়া । ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া” । (বিজয়গুপ্ত) ।  
 বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাইওঝা, সায়বেণে, ফুলরা, থুলনা—এসব নামও সংস্কৃতের  
 মত নহে । ‘বেহুলা’ বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন  
 হস্তলিখিত পুঁথিতে বেহুলার স্থলে ‘বিপুলা’ পাওয়া যায় ; কিন্তু অত্র নাম-  
 গুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না । পণ্ডিত রামগতি ত্রায়রত্ন  
 মহাশয় ফুলরা, থুলনা প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃতের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে  
 চেষ্টা করিয়াছেন ;\* পাণ্ডিত্য বলে অপরাজিতাকেও পারিজাত ব্যাখ্যা  
 করা যাউতে পারে—এই ভাবের ব্যাখ্যায় কল্পনাসুন্দরীকে একটু কষ্ট  
 স্বীকার করিতে হয়, সন্দেহ নাই । কুলজিগ্রন্থগুলি অনুসন্ধান কারলে দৃষ্ট  
 হইবে ১৯২০ পুরুষ পূর্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কৃত ছিল ; এখনও  
 বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অনুমাত্রও  
 সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না । সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা  
 স্মরণ করাইয়া দেয় ; এই অব্যাবহিক সাহিত্যে সংস্কৃতের  
 দিকে ক্রমশঃ রুচির অনুকূলতা লক্ষিত হয় ; অনুবাদগ্রন্থ ও সংস্কৃতের  
 অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবর্জনা মার্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ  
 হইল ; কিন্তু তখনও বঙ্গগ্রন্থের মনোমোহিনীগণের নাম ‘হুই’, ‘রুই’,  
 ‘কুই’, ‘আই’, প্রদত্ত হইত । এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের  
 কালে কোনও ললনার এবস্থি নামকরণ করিলে, তাহার বিবাহ হওয়া  
 ও বিবাহান্তে সুরচিসম্পন্ন স্বামীর তাহার নিকট পত্র লেখা উভয়ই

অনুবিধাজনক হইবে । কবিকঙ্কণের সময় ভাষায় অনেক পরিমাণে মার্জিত হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই সংস্কৃতাত্মক—এবং বৈষ্ণবাবাদিকারের প্রভাববাজক । যথা,—বিমলা, চাপা, কমলা, ভারতী, পার্শ্বতী, স্বর্ণরেখা, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী, বদ্রভা, দুর্লভা, রত্না, স্তম্ভা, যমুনা, চরিত্রা, তুলসী, শচী, রাণী, শ্রোচনা, হীরা, তারা, সরস্বতী, মদন-মুগ্ধরী, চিত্ররেখা, স্বধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, কোশলা, বিজয়া, গৌরী, স্মিত্রা, যশোদা, রোহিণী, কাদম্বরী ।

এই অধ্যায়েন আলোচিত পুস্তকগুলিতে আগবা নানারূপ শব্দ  
প্রচলিত শব্দার্থ ।

কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে ; ৪র্থ  
অধ্যায়োক্ত শব্দগুলিরও কতক এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে,  
সেগুলি বাদ দিয়া অপরাপর দুইই শব্দার্থের তালিকা দেওয়া যাইতেছে ।\*

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুবাণে—ভোল—বিভোর (অতিক্রমে হৈয়া ভোল । শ্রীকল  
গাছে দিল কোল ।) আসোয়াস্ত—অস্তস্ত ; আগল—দক্ষ, অগ্রসর ; শাসিয়াল—ভেজবা  
( শাসিয়াল ঘর তুমি বিবাদে আগল ) চোপা—মুখ ; উদাসিনী—অনাধা ( শিবের কুমারী  
আমি উদাসিনী নহি ) ; নবগুণ—নগুণ, উপবীত ; ( দস্ত-ক্রকুটী করে, নবগুণ তুলি ধরে )  
সম্বধান,—অবধান, মনোযোগ ; খিটে—পুঁটিয়া তোলা ; ছামনিতে—সম্মুখে ;  
বড়ি—বড়, ধাই—মাতা, মাই—মাতা, অথান্তর—চেষ্ঠা, শ্রম, বিপদ ( বহু অথান্তর  
সেই পুষ্পের কারণ ), মেলানি—বিদায়, গোহারি—কাতব প্রার্থনা ; বাছড়িয়া—  
ফিরিয়া ; পাকনা—পক : পোঁচে—চিন্তা করে, আচাভুয়া—নির্বোধ, ঠান—ভাব ;  
সহিলা ও সহীলা—সখীত্ব ; † তাণ্ডালে—ভাঁড়ালে, পরিপাটী—কারিগরী ( কার সাধা  
বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী ) টনক—শক্ত ( টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ )  
সোসর—তুলা ; তেলেঙ্গ—জটপুষ্ট ; অবস্তা—কষ্ট, সম্ভাবনা—সম্পত্তি ( সম্ভাবনা কেবল  
বলদ ) । স্ত্রীত—শ্রীযুত, সানে—ইঙ্গিতে ( হাত সানে বলে সবে মিনিটেক রও ),

\* আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষষ্ঠ অধ্যায়-বর্ণিত অনেক কাব্যেই  
পাইয়াছি, একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিম্নয়োক্তন বিধায় কেবল এক কবির নাম নির্দেশ  
করিলাম ।

† বোধ হয় এই সহিলা ও সহীলা হইতে ‘সন্না’ ( পরামর্শ ) শব্দ আসিয়াছে ।

তিতা—আর্দ্র \* কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে,—সন্তোষ—খৌতুক, নিবড়ে—অতীতে, ভোকে—ক্ষুধায়, লোহ—অশ্রু, ওর—সীমা, রড়—দোড়, কোঙর—পুত্র। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—আক্ষি—আমি, তুক্ষি—তুমি, মোহর—আমার, সমাইরে—সকলকে, আশুয়ান—অগ্রসর, সুসারিত—শ্রেষ্ঠ, যুয়ায়—যোগা হয়, কেনি—কেন, পুনি—পুন, বিনি—বিনে, খেরি—খেলা, হনে—হইতে, আশু—আপন। অনন্ত রামায়ণে—তরু—তোমার, খেলা—রাখিল, আবর ( হিন্দী—আওর )—আর, আবে—এখন, জাঁঞ—যাব, পুতাই—পুত্র, পোরে—পুত্রে ( “গলাগলি করি কাদে তিন বাপে পোরে” ) অশস্ত—দুষ্ট, এতিক্ষণে—এতক্ষণে; বুঢ়া—প্রাচীন ( হুবাদি বোধক যথা, “বুঢ়া ধনু ভান্সিলেক” ) তেবে—তখন, উতো—তার পর, তেতিক্ষণে—তখন, করিলো ঠৌ—করিলাম, পুহু—পুনঃ, কাটিবো ঠৌ—কাটিব, কাটয়োক—কাট, মিলি—হয়ে ( “বড় দুঃখ মিলি গেল” ), তাইক—তাহাকে, সোমাইল—প্রবেশ করিল, বিহডাইল—বিগডাইল, ওকাইদা—হাকাইল, লগতে—সঙ্গে, উলটাইল—ফিরাইল ( “রাজাক গৃহে লাগে উলটাইল” ) কন্দিয়োক লৈলা—কাদিতে লাগিল, তেহু—তখন ( “তঞি হাক আশাকর মঞি তেহু নোঠো” )। ছুকর—শুকর, আই—নারী, গেড়ি পারস্ত—ডাকিতে লাগিল, হই নুই—হয় নয়, এতিখন—এখন, নাহা—নাথ। ( “হাহা রাম রমণ মোহর নিজ নাহা” )। নবগু—নবীন, স্ত্রিঞো—স্ত্রী, মকমকি—উচ্চস্বরে, ( এহি বুলি মকমকি কাদে রঘুরাই ), রাই—রায়, পিম্পরা—পিপালিকা, পিকুই—পরিধান করে। ভবহিল—জানাইল। কবোন্দ ৩ শ্রীকর নন্দীর অনুবাদে,—সম্মম—ভয়, এটৈ সম্মম ৩ সম্মাস্ত শব্দ মর্যাদা বাঞ্ছক হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে ইহাদের অর্থ “ভয়” ছিল (যথা—“সম্মম না করে ভীষ্ম হাতে ধনু শর”)—সংস্কৃত রামায়ণে ৩ সম্মাস্ত শব্দ ভীত অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, যথা ( “সম্মাস্ত স্ফদয়ো রামঃ” ইত্যাদি বঙ্গবাসীর সংস্করণ, আরণ্য কাণ্ড ৯৫ পৃঃ ) সম্বিধান—মনোযোগ, সমে—সহিত, ( “গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড”—

\* চৈতন্য ভাগবতেও তিতা শব্দ আর্দ্র অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা ভ্রানান্তে “তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীচাঁদনন্দন।” ( মধ্যম পণ্ড )। আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই “তিতা”র ক্রিয়া—‘তিতিল’ ( সিক্ত হইল ) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। স্তত্রাং ‘তিতা’ শব্দের সঙ্গে ‘তিক্ত’ শব্দের সংশ্রব লক্ষিত হয় না, উহা ‘সিক্ত’ শব্দের অপভ্রংশের স্বাক্ষর বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের “তিতা কৈল দেহ মোর ননদীবচনে”—পদে তিতা শব্দ তিক্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

শাকর নন্দী), পাড়িম্বু—ফেলাইব ( “ভীষ্ম দ্বোণ কাটিয়া পাড়িম্বু রথ হৈতে,” কবীন্দ্র ), উপালন্ত—উপর । নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে,—খাখার—অপবন, একেশ্বর—একাকী, কথা—কোথায়, এড়িয়া—তাগ করিয়া । চণ্ডীদাসের পদাবলীতে,—১ চোটোনেটো—অল্প বয়স্ক বউগণ, টাট +—খুঁত, অথলা—সরলা, উত্তরোল—টংকঠিত, ভালে—ভাগো, ( “ভালে সে নাগরী, হযেছে পাগলী” ) আরত্র—হরিদ্রা, বড়,—ব্রাহ্মণপুত্র, ( কিন্তু বটু শব্দের অপভ্রংশ হইলে ছাত্র ), দে—দেহ, টাগ—জজ্বা, আকুতে—আগ্রহে. নেহ—স্নেহ, ওদন—অন্ন, গতগতি—যাতায়াত । পরিবাদ—নিন্দা । “চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে” প্রভৃতি শব্দের “ফুরিছে” ( ফুরিছে হইতে উদ্ভূত ) শব্দ হইতে ফুলিছে শব্দ আসিয়াছে । বাচদেশপ্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রেড়ো শব্দ বহুল ; ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—( সাহিত্য : ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ), তাহাতে সচ ( বোধ হয় আরোগ্য ), রাকাদে—শব্দ, আউদর—এলোথেলো, পোকান—পুত্র,—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পুঁথিতে ঐসব শব্দ নাই ; পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ববঙ্গের লোকগণ নিজ দেব স্তবধার জন্ত কতকটা বাঙ্গাল করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু মিথিলাব বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্তিত হইয়াছেন, উঁহা বা ততদূর হন নাই ।

পুনোক্ত শব্দগুলি ছাড়া,—কাঠিগা—খড়ি, সমাধান—সেবা, বুলে—অনুসন্ধান করে, সাবহিতে—সাবধানে, সারি—নিন্দাবাদ—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় । বিজয়-

\* এস্থলে হিন্দী ভাষাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না ।

+ এই “টাট” শব্দ গোবিন্দ দাসের পদে ( প, ক, ত,—৬২৫ নং ) বিজয়শঙ্করের পদ্মপুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে ( জগদ্বন্ধু বাবুর সংস্করণ ৭৭ পৃঃ ) কবি আলোয়ালকৃত পদ্মাবলীতে ( “কোথাতে নাহিক দেখি হেন যোগী টিট” ২৬ পৃঃ ) অন্তান্ত পুস্তকে পাইয়াছি ; বোধ হয় এই শব্দ হইতে “টাটকারি” “টাটপনা” ও “টেটন” প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বটতলার পদকল্পতকতে কোন কোন স্থলে ‘ট’ এর টান ভুলক্রমে পড়িয়া বাওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন নূতন সংস্করণে ‘টাট’ শব্দ স্থলে ‘টাট’ প্রদত্ত হইয়াছে ।

শুশ্রূষার পদ্মাপুর্ণাণে ‘বাপু’ শব্দ সর্বত্রই সম্ভান কর্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা ( শিবের প্রতি পদ্মা )—“পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের সার । কির অপমান বাপু না দেখ একবার ॥” যম্বন্তরীর প্রতি শিষাগণ,—“শিষ্যব বলে বাপু একোন বিধান । কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান ॥” বেহুলা পিতার প্রতি—“বেহুলা বলেন বাপু শুন নিবেদন । স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন ॥” এখনকার রাজনৈতিক উপহাসের লক্ষ্য ‘বাবু’ বোধ হয় এই ‘বাপু’ শব্দেরই অপভ্রংশ হইবেক । ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে ‘মা’ কে ‘মাইঞা’ বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে ‘মাই’ শব্দ পাঠিয়াছি ; এই ‘মাই’ ও ‘মাইঞা’ হইতে বোধ হয় কত্কা-সোধক ‘মেয়ে’ শব্দ আগত হইয়াছে । ‘বাপু’ ও ‘মেয়ে’ শব্দ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে ; পূর্বে উহারা পিতৃমাতৃবোধক ছিল । ‘লোকগুটি’ ‘বানগোটা’ প্রভৃতি ভাবে ‘গুটি’ ও ‘গোটা’ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—‘লোকটি’, ‘বানটা’ বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

বিভক্তিসম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের অরণ্য হইতে সাধারণ নিয়মের

মত কোন পরিষ্কার সূত্র উদ্ধার করা বড়ই  
বিভক্তি ।

দ্রুত । এখনও বঙ্গদেশে? নানা প্রদেশে  
নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনার জন্ত একমাত্র  
নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে । কিন্তু আলোচ্য সময়ে প্রাদেশিক বিভিন্নতা  
লোপ ও ভাষার একীকরণ জন্ত কোন সাধারণ সূত্র নির্দিষ্ট হয় নাই ;  
নানারূপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ সূত্র সংকলন করা ব্যাকরণের  
কাজ,—বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ উৎরেজাধিকারে সংকলিত হইয়াছে ; সুতরাং  
এই সময়ের বহুপরেও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল ।  
আমরা এই অধ্যায়ে,—

“আমি” হলে,—আমি; মূঞি, মূই, আমিহ, মো ; “তুমি” হলে,—তুমি, তুহ,  
তঞি ; “আমার” হলে,—আম্কা, আম্কার, মোহোর, মোহর, মোর ; “তোমার” হলে,—তোম্কা,

তোক্ষার, তয়, তোহার, তৌহর, তোর ; “আমাকে” স্থলে,—আক্ষাতে, মোত, আমাক, আক্ষারে, মোহারে, মোরে ;—“তোমাকে” স্থলে,—তোমাক, তোক্ষারে, তোক্ষা, তোত, তৌহারে, তোরে ; “সে” বা “তিনি” স্থলে—তঁহ ; “তাহাকে” স্থলে,—তাক, তাত্তে, তায়, তাইক ; “তাহার” স্থলে—‘তাক্’ ‘তান’ তাহান, তার, “তাহা” স্থলে—তেহ, “কাহাকেও” স্থলে—কাকহো, প্রভৃতি রূপ সর্বনামের প্রয়োগ পাইয়াছি—এই সমস্ত জটিল ব্যপের মধ্যে মধ্যে আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়োগ না আছে, এমন নহে, কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে আধুনিক ভাবের ব্যবহারও সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিভক্তি সম্বন্ধে সর্বনামের পূর্বোক্ত রূপান্তর ভিন্ন, পুঙ্করিণী হনে (ও হংস্তু) পুঙ্করিণী হইতে, বিষ্ণুক উদ্দেশে—বিষ্ণুর উদ্দেশে, ভক্তিএ, ভক্তি সহ, তীরক পাইলা,—তার পাইলা, প্রাণত (প্রাণাৎ) প্রাণাপেক্ষা, পিতৃত ম তৃত্তা—পিতামাতা হইতে (“পিতৃত্তো মাতৃত্তো করি তোত অনুরাগ”—অনন্ত রামায়ণ), কালিকারে—কালিকার জন্ত, বর্ধাকে—বর্ধার জন্ত, দোণক চাহিয়া—দোণদিকে চাহিয়া, বিধিএ নিখিল—বিধি নির্মাণ কবিল, প্রণাম করিল মেনকাতে—মনকাতে প্রণাম করিল, ভূমিএ—ভূমিতে, বাণিজ্যে চলে—বাণিজ্যে চলে, এই ভাবের প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে পাইয়াছি ; ‘কে’ স্থলে ‘ক’ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, যথা—“সর্প যেন খাইয়া যাঘ মারিতে গকডক। সেই মত চাহ ভূমি মারিতে অর্জুনক ॥”

বহুবচন ‘সব’ ‘গণ’ ও ‘আদি’ শব্দ দ্বারা গঠিত হইত—ভূমি সব, আমি সব, রাক্ষসেরগণ, মৃগাদি প্রভৃতি বহুবচন বোধক শব্দ ও তাহাদের পরবর্তী রূপান্তরের বিষয় পূর্ব এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম বঙ্গের পুস্তকগুলিতে,—ঘরকে গমন, পানিকে খায়, জলকে গেলু, কাঁধকে কমাল, শুনে গোড়েশ্বরে—( শুনে গোড়েশ্বর ), প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া সম্বন্ধে উত্তম পুরুষে দেহো, কঁরো, তেজিম নোহৌ ( নই ), দেথএ, লভিলো, বন্দম, করম, করিবু, পাইলু, ক্রিয়া।  
দিমু, করিনু,—মধ্যম পুরুষে, কহাসি, দিয়ৌক, করিয়ৌক, আসিয়ৌক, কারহ,—এবং প্রথম পুরুষের পবে—হব (“নিদের শপনে রাজা হব ( হবে ) দরশন,” বা, গা ),। পইতায়, আইবন্ত, ভৈলুন্ত, করেন্ত, ইত্যাদি রূপ অনেকে প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় ; ক্রিয়ার কর্তা নির্ধারণ

করিতে শুধু অর্থক পথপ্রদর্শক ; এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন ; কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকৃত-ক্রিয়াও দৃষ্ট হয় ; যথা,—মনে হয় চাঁদের ছয় পুত্র খাম । (বিজয়গুপ্ত) তৎপর করাস, খায়ন্তি, পিবন্তি ও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে । বঙ্গভাষায় ‘হের’ ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু পূর্বকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল—‘এখানে’, ‘হের দেখ’ এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয় । ত্রিপুরার নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে “এার” অর্থ “এই-খানে” শুনিয়াছি ; এই দুই শব্দ ‘অত্র’ শব্দের সঙ্গে কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে । বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করা গুরুতব ব্যাপার, ক্ষুদ্রশক্তি অমুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ ঈঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেই নিজকে কৃতার্ণ জ্ঞান করিব ।

এই অব্যয় বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত ; মনসাব ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী

প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ ব্যাপক গান হইত ।

কাব্য গীত হইত ।

অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ শেষপালায় প্রহকার আত্ম

বিবরণ প্রদান করিতেন ; এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় । প্রসিদ্ধ ঈংরেজী সাহিত্যবেত্তা, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও উমাচরণদাস মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীবৃক্কজগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সর্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত দুই কবির গানগুলির রাগ রাগিণী, উৎকৃষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে ; তাঁহাদের মতে “উভয়ের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) রাগ রাগিণীর সংখ্যা (সাধারণ-গুলি একবার মাত্র ধরিয়া) মোট ৪০টি দৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে ৩১টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র ।” (৮৩ পঃ) শ্রীবৃক্ক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—“পদাবলীর স্বরতাল সম্বন্ধে নানা মূনির নানামত । একজন যে পদ ‘ধানশ্রী’ ভে গের লিখিয়াছেন আর একজন সেই পদই বসন্ত রাগে গের স্থির করিয়াছেন । আবার অল্প পুঁথিতে



সেই পদেই কলাগী রাগ নির্দেশ করা হইয়াছে ।\* এই সকল গান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, পূর্বকালে ‘ধানত্ৰী’ ‘শ্রীরাগ’ ‘নটনারায়ণ’ ‘গুজ্জরী’ প্রভৃতি ওস্তাদি ধরণের রাগরাগিনীতে সঙ্গীতের অনুলীলন হইত, এখন জাতীয় ভাবের মূহূর্ত্তর অনুকূলে রুচি—ভৈরবী, ঝাঁঝীট প্রভৃতি মধুর রাগিনীর দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে । এই বিষয়েও পূর্বে উত্তর—পশ্চিমের লোকের সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল ।

চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলাবর্ণনাব কয়েক পত্র আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহির স্তূপ হইতে পায়ারের ব্যতিক্রম ।  
পাইয়াছিলাম ; দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই দিন পরেই তাহা হারাইয়া যায় । চণ্ডীদাসের ‘কৃষ্ণকীর্তন’ নামক পুস্তকের কথা শুনিয়াছি, তাহা পাঠ নাহি । এই অব্যায়ের রচনা পরাবের নিয়ম দ্বাৰা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । আমরা—‘কোণা কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ । ( কবীন্দ্র ) এবং “তথাপিহ বেদনা না জানিয়া । সহরে গিয়া পার্থে ধরিল দুই করে সাপটিয়া” শ্রীকর নন্দীর অশ্রমেধ ) । এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি ।

চণ্ডীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ব্রজবুলির মিশ্রণ দৃষ্ট হয় ; এই ‘ব্রজবুলি’ পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে । এ ব্রজবুলি ।  
সম্বন্ধে এখনও অনেকেব ভুল ধারণা আছে । ‘ব্রজবুলি’ মৈথিল ভাষার অনুকরণ । চণ্ডীদাসের রচনায় ‘ব্রজবুলির’ অনুকরণে শব্দসম্প্রসারণক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা—ধরম, করম, পর-কার, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর, সরবস ।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না । শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, রমণীগণের পরিচ্ছদাদি ।  
কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয়,

কঙ্কণ, কটিতে ক্ষুদ্রঘণ্টা, পদে মঞ্জীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস মল্লতাড়ল ( খোঁট্টা রমণীরা এখনও পদে পরিয়া থাকেন ) নামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে সুবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ষাগরা ও শিল-মণি কাচ, কর্ণে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কর্ণি, পদে পিতলের খাড়ু ও লোটন থোঁপা নামক একরূপ থোঁপার উল্লেখ করিয়াছেন। সদয় অভিভাবকগণ বালবিধবাদিগকে পটুবন্ধ ও ( শঙ্খস্থলে ) সুবর্ণের চুড়ি পরিতে দিতেন, কোন কোন বালবিধবা সিন্দুরের পরিবর্তে আবিরের ফোটা কপালে পরিতেন।

ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় না ; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি সামাজিক আদিম অবস্থার নিদর্শন। সঙ্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রকৃতি

হইতে এই গুপ্ততর খুঁজিয়া বাহির করা যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই সুলভ ; পাহাড়ের পাশাণ-বক্ষস্ত ক্ষীণ বজ্রস্ত্রের ছায় স্বচ্ছ জলরেখা ও শ্রামল তটান্তবাহী ক্ষীত গঙ্গাবারা, উভয় দৃশ্যই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদি, উদ্যম, বিকাশ প্রকৃতি দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফঃস্বলে পল্লীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া আসুন। মদন কর্ণি, মল্লতাড়ল প্রভৃতি যে সকল গহনা আমরা নামে মাত্র অবগত আছি, যে সকল ছুরুহ অপ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা নানামত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কৃষকবধূ হয়ত এখনও সেই গহনা গুলি পরিয়া, সেই সকল ছুরুহ শব্দ পরম্পরায় মনের অভিপ্রায় বাক্য করিতেছে ; আমরা আঁধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাই-তেছি মাত্র।

পূর্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত ;

বান্ধালীর সমুদ্র যাত্রা ।

কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে জীবর সন্তান হও-  
য়ার নুচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানি  
মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাঁতত । সমুদ্রে গমনাগমনের জন্ত বোধ হয়, পূর্ববঙ্গের  
নাবিকগণ সমুদ্র পথে বিশেষ দক্ষ ছিল ; কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কেতকা-  
দাস ইঁহাবা সকলেই সমুদ্রের পথে ‘বান্ধাল মাঝি’ দিগকে লক্ষ্য করিয়া  
পরিহাস করিয়াছেন । এখনও এদেশের জাহাজের সারেং ০ খালাসীগণের  
অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক, মাঝিদিগের তত্ত্বাবধায়ক ‘গাবুব’ নিযুক্ত  
থাকিত ; ইঁহারা ‘সারি’ গাটয়া মাঝিদিগকে কার্যে অক্লিষ্ট রাখিত ও  
মাঝিরা কার্যে স্লথ হইলে তাহাদিগকে “ডাঙ্গা” দিয়া প্রহার করিত ।  
ডাঙ্গা গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন  
কোন থানিতে হাট মিলিত । ( “তার পিছে চলে ডাঙ্গা নাম চন্দ্রপাট । বাহার  
উপরে চাঁদ মিলায়েছ হাট ।” বিজয় গুপ্ত ) । এই বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ  
ছিল ;—‘মুলার বদলে দিল গজদন্ত ।’ ( বিজয় গুপ্ত ) কি “শুভার বদলে মুক্তা দিল,  
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ।” ( ক, ক, চ ) । প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতি-  
বজ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাঁততে  
পারিলে বিলক্ষণ উপার্জন হইত । আশঙ্কা,—নৌকা জগমগ্ন হওয়ার ।  
নাবিকগণ সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ  
করিত ; ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক উঠিয়া ডাঙ্গা আক্রমণ করিলে, তাহারা  
“ক্ষারচুন” ছড়াইয়া ফেলিত ; শঙ্খ উঠিয়া ডাঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে  
মৎস্য মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্খগুলি পলাইয়া যাঁতত । এই সব  
বর্ণনায় কতদূর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি । তবে বোধ  
হয়, গল্প শুনিয়া, কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন,—যে ইংলণ্ড  
বাণিজ্যের জন্ত এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ শত বৎসর পূর্বে সেই ইংলণ্ডের  
অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের অপরপারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও  
এথ্রিয়োপারগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইঁংরেজ-  
দিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন ।

বার্ণিজাজাত দ্রব্য লইয়া কাবগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনাব অবতারণা করিয়াছেন ; সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতে-  
ছেন, ও সেবককে তাহা প্রথম থাইতে আদেশ করায় সে চক্ষের জলে  
বঙ্গ ভাসাইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে । তাম্বুলরঞ্জিত অধর দৃষ্টে  
সিংহলীগণ অনুমান করিতেছে,—“কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব লোকে ।  
অন্ত ঠাঁই এড়ি তোমার মুখ ধরে জোঁকে । (বিজয় গুপ্ত) ।

সরিষাতে যাহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, সেই সব  
কাবগণের কল্পনার অনুবীক্ষণে প্রতীতিবিস্তৃত চিত্রপট হইতে আমরা  
সমুদ্রবাহী ডিম্বাণ্ডলির অবয়ব ও অত্যাভ্যুত তথ্য উদ্ধার করিতে  
পারিলাম না ।

এই সময়ে বঙ্গে শিল্প-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া  
বোধ হয় না ; উৎকৃষ্ট ‘চাকাঠি’—এই সময়ের  
শিল্প-জাত জবাটি ।  
আরও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী । ‘পাটের  
পাছড়া’ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; পূর্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে  
পাটের ‘খনি’ বলিত, গায়েন একখানা পাটের ‘খনি’ পাইলেই কৃতার্থ হই-  
তেন,—“বিজয় গুপ্ত বলে গায়েন গুণগণি । মনসা জন্মিলরে গায়েণ দেও খনি ।”  
এই খনির মপ্যে বিশেষ নিপুণতা কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র গৌরব,  
খুব শক্ত হইত । সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের ‘খনি’ হস্তে লইয়া প্রশংসা  
করিতেছেন, “মোর দেশে একজাতি, জন কত আছে তাঁতি,—বুনিতে অনেক দিন  
নাগে । কেবল ধীরের কাম, বস্ত্র বড় অনুপাম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে । “বিজয় গুপ্ত ।

স্ত্রীলোকগণের কাঁচুলী নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য  
প্রদর্শিত হইত ; কাঁচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি স্ত্রীয়ায় আঁকিয়া উঠান  
হইত ; এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্তী সময়ে কবিকঙ্কণ  
চণ্ডীতে আমরা কাঁচুলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িয়াছি ।

ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই,

ভাস্কর ও মূৰ্ত্তি বিদ্যার  
অবনতি ।

বাহা কিছু সুন্দররূপে গঠিত ও সুচারুরূপে  
অঙ্কিত তাহাতেই বিশ্বকর্মা কৰ্ত্তৃক কল্পিত  
হইত, সুতরাং মনুষ্য সমাজে তাহার অনু-  
শীলন হইতেনি, বলিয়া বোধ হয় না । লক্ষীন্দরের লোহের বাসর,  
ধনপতির নৌকা ইত্যাদি সমস্তই বিশ্বকর্মা দ্বারা গঠিত ।

এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্বাহ হওয়ার প্রথা  
বিনিময় ও মূল্য ।

দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি,  
কাহণ প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বারা দ্রব্যাদি  
ক্রয় বিক্রয় হইত । শাট কাটা ও কোম দ্রব্য প্রজন জন্য ‘পুরুষ’ \* এক  
রূপ মাপ ছিল, উহা এখনকার গজ কাটির ঠায় হইবে । বাহা সেকালে  
কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রজত ভিন্ন পাওয়া যায় না ।  
রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণা দিয়া  
কিনিব ; আমরা যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবিত, তাহাতে সন্দেহ  
নাই ।

আমরা এখন বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্তী হইতেছি ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চাঁদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত  
বাহালীর বীরত্বের অভাৱ ।

দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মুছ  
আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুসুমলতার উৎপত্তি  
না হইলেই সৌভাগ্য ! এই চাঁদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন  
লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্তী কবিগণ তাহা  
রক্ষা করিতে পারেন নাই ; তাহাদের হস্তে চাঁদবেণে একটা হাস্ত-  
রসের সামগ্ৰী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । তাহার দৃঢ়তার মহত্ব কবিগণ  
অনুভব করেন নাই, কষ্টে ফেলিয়া বালকের ঠায় হাতে তালি দিয়া

\* “মাটি ধানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ”—বিজয় গুপ্ত ।

“পুরুষ সাতক মোর হারালো কাসন্দ ।” ক, ক, চ ।

তামাসা দেখিয়াছেন । কালকেতুকে বন্ধের শ্রেষ্ঠ করি মুকুন্দরাম ভীমের  
 ত্রায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি  
 মোমের পুতুলের ত্রায় অকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন । বীরত্বের উপ-  
 করণ এই ক্ষেত্রে আশারূপে সুফল উৎপত্তি করে না । বাঙ্গালী উত্তর-  
 পশ্চিম হইতে আর্ধ্যতেজ অবশ্যই আনিয়াছিল, পঞ্চগোড়েশ্বরগণের  
 মহিমান্বিত রাজশ্রী ও সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে ;  
 কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সূকুমারভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মাল  
 কোঁচা, ফুলকোঁচা এবং শূল, ফুল হইয়া গিয়াছিল ; ইহা এদেশের গুণ ,  
 ফোর্ট উইলিয়মের এদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটীরত  
 প্রাপ্ত হইতে পারে । বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে নীতা-বিলাপ, তরঙ্গী  
 ও সুন্দর্য ভক্তিকাহিনী অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ  
 পাঞ্চজন্ত ও অর্জুনের গাণ্ডীব ফুলমালায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে ।

মাণিকচাঁদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয়

নাহি ; চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং  
 বাঙ্গালী প্রেমিক ।

নির্ভীক উক্তি ; যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও উত্তর-  
 বর্ণের অধিকাংশ স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দেশিত, সেই  
 সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ—“গুন রজকিনী আমি । ও ছটি চরণ, শীতল  
 দেখিয়া শরণ লইলাম আমি ॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ ।  
 ত্রিসন্ধা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী ।” এইরূপ বন্দনাদ্বারা  
 আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন, একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয়  
 পান নাহি ; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে  
 পারে । এ কথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাহি,—কারণ এ প্রেমে  
 ‘কামগন্ধ নাহি’—ইহা তাঁহার “উপাসনারস”,—ইন্দ্রিয় লিপ্সার উর্দ্ধে ;  
 ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন । তিনি লজ্জায় ত্রিয়-  
 মাণ হইয়া পড়েন নাহি ।

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে, চণ্ডীদাস পূর্ববর্তী কবিগণের উপমাগুলির গিণ্টী দেখিয়া তুলেন নাই,—“তাহু কমলে বলি সেহ হেন নহে । হিমে কমল মরে তামু হুখে রহে । চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা । সময় নহিলে সে না দেয় এক কথা । কুহমে মধুগে কহি সেহ নহে তুল । না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল । কি ছার চকোর চাঁদ চুহঁ সম নহে । জিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ।” উপমায ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহার তুল্য আছে, স্বীকার করিতে হয় ।

এই প্রেমের পটখানি উজ্জ্বল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল ; তাহা চণ্ডীদাসের ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর হইগেন । প্রাতিঃশিশির-সিক্ত প্রকৃতির সজল পট ভালুকরে যেরূপ শুষ্ক হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে ; যাহার জীবন্ত লীলায় এই সব গীতি সার্থক হইয়াছে,—তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার ফুল পল্লবযুক্ত স্বর্ণ ফ্রেমে বাঁধা একখানি দেবমুষ্টির আয় আমা-দের নিকট উদয় হইয়াছেন ; উৎকৃষ্ট তুলিকর-অঙ্কিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানি উদ্ধে স্থাপন করিয়াছি । বঙ্গভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অনুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষা গ্রন্থ-লেখকগণ নিজেরাও ইহাকে অগ্রাহ করিতেন,—‘সহজে পাঁচালী গীত নানা পোষময়’—বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন । কবীন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তাহার অনুবাদ-পুস্তকে দেন নাই, কারণ—“পাঁচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ ।”

কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ের সাহিত্য ঐতিহ্যদেবের প্রভায় মহিমাস্বিত ; পাঁচালী-গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বাপের ১ম যুগ ।

১ । শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য ।

২ । শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ।

৩ । পদাবলী-শাখা ।

৪ । চরিত-শাখা ।

( ১ )

চণ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;—

(ক) আজু কেগো মুরলী বাজায় ।  
এত কভু নহে শ্রাম রায় ॥  
ইহার গৌর বরণে করে আলো ।  
চুড়াটি বাধিয়া কেবা দিল ॥  
\* \* \*  
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে ।  
এরূপ হইবে কোন্ দেশে ॥

(খ) কাল কুহুম করে, পরশ না করি ডরে,  
এবড় মনের মনোবাধা ।  
যেখানে সেখানে বাই, সকল লোকের ঠাই,  
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥  
\* \* \*  
সই লোকে বলে কাল পন্নিবাদ,  
কালার ভরমে হান, জলদে না হেরি গো,  
তজ্জিয়াছি কাজলের সাধ ।



চণ্ডীদাস ইথে কহে,

সদাই অনন্ত দহে,

পাশরিলে না যায় পাশরা ।

দেখিতে দেখিতে হরে,

তমু মন চুরি করে,

না চিনিযে কালা কিষা গোরা ॥

প্রথম পদ্যটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে ; রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিয়া বাঁশী হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাস বাধিকার গৌরবরণের কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু প্রথম গীতির—“একপ হইবে কোন্ দেশে ?” ও দ্বিতীয় গীতির—“না চিনি যে কাল কিষা গোরা” দুইটি ছত্র পড়িয়া স্বপ্নের কথার ঠাণ্ডা একটা অলীক ভাব মনে হইয়াছিল,—যেন ভাবী ঘটনা যেকপ সম্মুখে ছায়া পাত করে, পরম সুন্দর চৈতন্য-দেব ও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্বে প্রেমিককবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন ; সেই রূপের পুরূষাভাব পাইয়া আফ্লাদে চণ্ডীদাস উষার প্রাকালে পক্ষীর ছায় অস্পষ্ট কাকলি দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়াছিলেন ।

“একপ হইবে কোন্ দেশে ?”—প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে ; তখন প্রেমের অবতার চৈতন্য ।

চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না । চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্য-প্রভু আর রামানন্দরায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্যপ্রভুর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষা অপূর্ণ হইত । গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ—গোলাপের সুঘ্রাণ ও পদ্মের সুঘ্রাণ মিশিয়া যাইত । চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন ; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার—“জলদ নেহারি নয়নে ঝর লোর ।” কৃষ্ণঅঙ্গভমে কুসুমলতা আলিঙ্গন, এক দৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা

হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্মৃতি স্বাক্ষর  
শুষ্কযুগে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরী শ্রীমদ্ভাগবত  
ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,—দেখাইয়াছেন,  
এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অঞ্চেতে, চিহ্নের প্রীতিতে  
দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভাস্বরূপ পূর্বরাগ, বিরহ, সন্তোষ, মিলন  
ইত্যাদি যে সব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আত্মদ-  
যোগ্য ও আত্মাদিত হইয়াছে; প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্তিতে শ্রীগৌরের দেহ  
কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্র-টেউ যমুনা-লহরী হইয়াছে, চটক পর্বত,  
গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে; এই অপূর্ব ভক্তি ও  
প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাদিকানন্দরী সৃষ্ট; তিনি আয়েসা কি  
কুন্দনন্দিনী নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে,  
তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, একরূপ নারীচরিত্র পৃথিবীর  
কাব্যোদ্যানে নাই।

এই অধ্যায়ের চরিতশাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী  
চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে এবং উভয়ই  
পদাবলীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক। গৌরহরীর লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে;  
তাহা কিরূপ, দেখাইতে চেষ্টা করিব;—চণ্ডীদাস প্রেমের অজ্ঞান  
অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;—“তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে  
বুঝিল শোয়াস আছে ॥” সার্কভোমের গৃহে যখন চৈতন্যপ্রভু অজ্ঞান তখন,  
“সুন্দর তুলা আনি নাসা অঞ্চেতে ধরিল। ঈষৎ চলেয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল ॥” (চৈ, চ,  
মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ);—শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া—“বিজ্ঞানে আলিঙ্গই তরুণ  
তমাল,” (প, ক, ত ৩৯ শ্লোক) ও মেঘ দেখিয়া—“চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের  
তারা,” (চণ্ডীদাস) কৃষ্ণলমে উন্মাদিনা হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের  
জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়;—“চটক পর্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে  
অর্ধনাদ করিয়া ক্রলনে ॥” “বাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে

নাচে প্রভু পড়ে কাঁদি ॥” (চৈ, চ, মধ্যম খণ্ড ১৭ পরচ্ছেদ) ।—তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া । কৃষ্ণ বলি ধেরে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥—(গোবিন্দদাসের করচা) । “বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন ॥” (চৈ, চ, ১৭ পঃ) । একপ অসংখ্য স্থল আছে । শ্রীরাধিকাকে চেতন করিতে বলা হইত ;—“উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ দেখ কৃষ্ণ গুণমণি ॥”—(দিব্যোদাদ) । চৈতন্তদেবের প্রতিও সেই বাবস্থা, “যখন বা হয় প্রভু আনন্দে মগ্নিত । কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত ॥” (চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড) । রাধিকা কৃষ্ণ-নাম শুনিতে বক্তার পদে ক্রীত হইতেন, “অকথন বেয়াধি এ কথা নাহি যায় । যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥ পায় ধরি কাদে সে চিকর গড়ি যায় । সোণার পুতলী যেন ভুল লোটার ॥”—(চণ্ডীদাস) । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পদে ধরিয়াছেন, “আলিঙ্গন করিয়াছেন, “কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আবুল হৃদয় । শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥ যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে । অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর করে ॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে । ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥”—(গোবিন্দদাসের করচা) । শ্রীরাধিকা—“পুছয়ে কানুর কথা চল চল আঁখি । কোথায় দেখিলা শ্রাম বহ দেখি সখি ॥”—(চণ্ডীদাস) । চৈতন্ত দেবও “গদাধরে দেখি প্রভু করয় জিজ্ঞাস । কোথা হরি আছেন শ্রামল পীতবাস ॥ সে আঁর্তি দেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে । কি বলিব প্রভুর বচন নাহি ক্ষুরে ॥ সম্মুখে বলিল গদাধর মহাশয় । নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয় ॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া । আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥”—(চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড) ; কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নথাকন করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সুখী হইতেন,—“ভরমে তোমার নাম ক্ষিত-তলে লিখি ॥”—(চণ্ডীদাস) । চৈতন্তদেবও—“ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আবৃতি । চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥”—(চৈ, ভা, মধ্য) । রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিভোর,—“হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চলমুখি । এ বোল বলিতে পিয়ার চল চল আঁখি ॥” চৈতন্তদেব রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,—“বোল বোল বলে বিশ্বস্তর । গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর ॥ বোল বোল বলে পভু, পড়ে দ্বিজবর । উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-হৃৎ মনোহর ॥ লোচনের জলে হ’ল পৃথিবী সিক্তিত । অশ্রু কম্প পলকাদি ভাবের উদ্ভিত ॥”—(চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড) । গোরার সন্ন্যাস নবদ্বীপের এক

মহা শোক-ঘটনা—শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া'র সাক্ষর ক্রন্দন রাশি পদকর্তাগণের মাথুর কীৰ্ত্তিত যশোদা ও রাধিকার শোকোচ্ছ্বাসে জীবন্ত হৃৎখাশ্র ও মৰ্ম্ম-বেদনার স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে ।

প্রক্ষুট কদম্ব পুষ্পের আয় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুল পদ্মদলের আয় প্রেমাত্মপূর্ণ চক্ষু এই ছবিখানি ত্রিচৈতন্যদেবের । ইহার প্রেমের অনন্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়, অগরাপর কবিগণ তটস্থ দর্শকের আয় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন ; পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেমের আভাষ দিতে চেষ্টিত ; তাঁহার লীলা-কাহিনী যাহারা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা, এণ্ড্রোমেকি, জুলিয়েট, ডিডোর সঙ্গে বৈষ্ণব-কবি-অঙ্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করাইবেন ; এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি । বৈষ্ণব পদাবলী, উপাখ্যাস বা ইন্দ্রজালের আয় অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা খাঁটি সত্য ; ভক্তের বৈষ্ণব পদবালীর সত্যতা ।

চক্ষু মেঘে ক্লম্ভিত হইয়াছে, তাহার পর “কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি ।” প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে । কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাহাদের কথা স্বপ্নের আয় অলীক বোধ হয় ; “মাথবেল্লপুরীর কথা অকথা কখন । মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন ।” (চৈ, ভা, ) ।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি যাহার নিম্নলিখিত অশ্রু বিন্দু-নিঃসৃত ধৰ্ম্ম-দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনায় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীন বঙ্গভাষা যাহার পবিত্রম্পর্শে গঙ্গাধারার নিম্নলিখিত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম ; এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবন বর্ণনা করিব ।



গৌরান্দ্র প্রভু ও পারিষদবর্গ (কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর  
তৈলচিত্রের প্রতিলিপি । )



## শ্রীচৈতন্যদেব ।

যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানি মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, নবদ্বীপের তিনটি রহস্য। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক ক্রটি উৎকৃষ্ট ভাবে সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল ; ইহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্বর্গ রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্যদেব । প্রথম দুই জন শাস্ত্র-চর্চাকারীদিগের মধ্যে ‘রাজা’ উপাধি পাইবার যোগ্য ; শেষোক্ত জনও অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গুরুপত্রের জ্ঞায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্য-বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্য হইয়া দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন । প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে ; কিন্তু তৃতীয় জন তুলনারহিত, মানবজাতির তপস্তার ফল স্বরূপ ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় পরিণত হইয়াছিল ; মল্লযুদ্ধের দিনগতে ১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ । তথায় তর্কযুদ্ধই প্রশংসা অর্জনের পন্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল । এই সময়ে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল । আতোপুৰ, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপৌখেরা, হাটডাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুৰ, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপৈখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল ; নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টকোশব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে । \* উক্ত পল্লী সমূহ ব্যতীত গন্ধবণিক্যপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাঁখারিপাড়া, মালাকাবপাড়া প্রভৃতি চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই ।

নবদ্বীপে ঝায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয় ; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। এসব সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসী স্বল্প সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা। অপূর্ণ থাকিয়া যাইত ; মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি ও ষষ্ঠীর পূজা, যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপালের গীত, এবং পশুরক্ত ও মদা দ্বারা আর্দ্র বস্ত্রস্থলী দেখিয়া তাহারা আশ্বেপ করিতেন ; হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি তাহাদের নিকট সিন্দূরহীন রমণীললাটের ঝায় বুখা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন ; এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, অগ্রগণ্য ; প্রবাদ আছে, ইহাদের অভাব পূরণ করিতে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলন। হন,—ইহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ণ কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও চৈতন্যবল্লভ দত্ত। বাড়নে—হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রাগ্রামে শ্রীনিতানন্দ। ইহারা দীপশলাকা ; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ ; চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না, কে বলিবে ?

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে ; এক দিনে আশ্রমীজীবন ও তাগ হইতে বৃক্ষ ও অলৌকিক লীলা। ফলোদগম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য-লাভ, সুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাশ হইতে উক্ত চক্রের আবির্ভাব, ষড়্ভুজপ্রকাশ ইত্যাদি। এ সব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সব প্রকৃত হইলেই বা



ঈহাদের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারি না ; তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নয়নাশ্রয় ত্রায় কোনটিই অলৌকিক নহে ; বে প্রেমে তাঁহার শরীর কদম্ব-কোরকের ত্রায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্দ্ধনির্মীলিত চক্ষুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের ন্যায় তাঁহার জীবনে ! কিছুই অপূর্ব কি মনোহর হয় নাই । চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

### জন্ম ও শৈশব ।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে ( ১৪৮৫ খৃঃ ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন ।

তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে জন্ম ও বংশ-পরিচয় । সুপণ্ডিত ছিলেন । তাঁহার বাড়ী শ্রীহট্ট ;—

নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন । নবদ্বীপে পাঠ সমাপনান্তে তিনি নীলাধর চক্রবর্তীর গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন । গোবিন্দদাসের করচায় শচীদেবী সম্পর্কে এই ছত্রটি পাওয়া যায়—“শান্ত মতি শচীদেবী অতি ধর্মকার্য ।” শচীর গর্ভে ৮ কন্যা ও ২ পুত্র জন্মে । সবকয়টি কন্যারই অল্পবয়সে মৃত্যু হয় । ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্ত্রচর্চায় বিব্রত যুবক বিশ্বরূপ বিবাহরূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা নতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপণ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইএর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন । তাঁহার যুক্তি এইরূপ,—“এই যদি সর্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্ । ছাড়িয়া সংসার স্থখ করিবে পয়ান্ । অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাই । দুর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাক্রিঃ ।”—( চৈ, ভা, আদি ) ।

শৈশবে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটী নবমীপে বড় শাস্ত  
শিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি  
শৈশবে উচ্ছৃঙ্খলতা।

গঙ্গা-স্নানকারী ভক্তিমানে ব্রাহ্মণগণের উপর  
বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন, অভিযোগগুলি এইরূপ,—একজন  
বলিতেছে,—“সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া। ডুব দিয়া লৈয়া বাম চরণ; ধরিয়া ॥”—  
(চৈ, ভা, আদি)। “কেহ বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে  
পলায় উত্তরী ॥”—(চৈ, ভা, আদি)।

গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন,  
দীর্ঘ ক্রম্ব কেশজালেব হৃৎদ্য বাহু ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমনকালে  
অনেক গাছি নষ্ট না হইয়া বাইত না। শিশু চৈতন্তপ্রভু তামাসা  
দেখিতেন; এইসব অভিযোগকারী বালিকাদের মধ্যে কাহারও বিষয়  
গুরুতব ছিল। “কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥”—(চৈ, ভা, আদি)।  
প্রভুর বয়স তখন তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা স্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব  
অনেকটা হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জিত  
হাঁড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকটিত করিলেন;  
মাতা কর্তৃক ভর্ষিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,—“প্রভু বলে মোরে  
তোরা না দিস পড়িতে। ভদ্রভদ্র মূর্থ বিপ্র জানিব কি মতে ॥ মূর্থ আমি না জানি  
যে ভাল মন্দ স্থান। সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান ॥”—(চৈ, ভা, আদি)।  
এই উত্তরের সবটুকু খাঁটি সত্য কিম্বা ইহাব মধ্যে লেখকগণের কিছু  
মুস্মীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে পারি না, যেরূপ ভাবেই হউক শিশুর  
সুখকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসিদিগকে মুক্তি দেওয়া একসময়ে নিতাস্ত

\* এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজন্য  
ইহাদের ঐতিহাসিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরাণ হইতে পারি নাই; বালিকাগণ  
নানারূপ অভিযোগ করিয়া শেবে বলিতেছে,—

“পূর্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার ॥”—চৈ, ভা, আদি।

আবশ্যক হইয়া উঠিল । তখন মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গা-  
দাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন ।

নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক ।

“কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে ।” বৃন্দাবনদাস লিখিয়া-  
ছেন ; নিমাইএব পড়া শুনার ইতিহাস  
পাঠে একাগ্রতা ।

প্রকৃতই বড় মধুর । যে একাগ্রতায় শরীর  
পাগল ছেলে পাগলামী করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শরীর হ্রস্ব ছেলে  
পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল ।

“কিবা মানে কি ভোজনে কিবা পর্যটনে । নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শান্ত্র বিনে ॥”  
“আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্সনী । ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব দেবমণি ॥” “না ছাডেন  
ত্রিহস্তে পুস্তক একক্ষণে ।” “পুঁথি ছাড়িয়া নিমাইএ না জানে কোন কৰ্ম । বিদ্যারস  
ইহার হয়েছে সর্ব ধর্ম ॥” “একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায় । আরবার উলটিয়া  
সবারে ঠেকায় ॥”—(চৈ, ভা, আদি) ।

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয়  
হইয়া উঠিলেন । কিন্তু নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে, সে পাগ-  
লামীর লীলারস বড় মধুর—উহা তাহার উন্মাদ ও স্ফূর্তিপূর্ণ প্রকৃতির  
সহজ খেলা—উহা নিশ্চল জলস্রোতেব স্থায় আনন্দদায়ী, তাহাতে  
সরলতা বিদ্যিত । নব যুবক তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া

পাণ্ডিত্য ও টোলের  
অধ্যাপকতা ।

বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে  
তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; মুরারিগুপ্ত  
বয়সে বড়, তাঁহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই

বলিতেছেন ;—

“প্রভু কহে বৈদ্য ভূমি ইহা কেন পড় । লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর ॥  
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি । কক পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইধি ॥”—(চৈ, ভা, আদি) ।

গদাধর পাণ্ডিত্যকে পথে পাইয়া,—

“হাসি ছুই হাত প্রভু রাখিলা ধরিয়া । স্থায় পড় ভূমি আমা বাও প্রবোধিয়া ॥

জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন । প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ ॥”-( ১৫, ভা, আদি । )

এইরূপে পথিকদিগকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া পরাভববাজক হাশু ও শ্লেষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত এই তৰুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন । নিমাই যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল । তাঁহার অপূৰ্ণ সুন্দর মূৰ্ত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গোবদ অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল । কিন্তু তখন তাঁহার বয়ঃ-ক্রম অনতিক্রান্ত বিংশ বর্ষ মাত্র ।

কেশবকাশ্মীর নানক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে

দিগ্বিজয়ী-জয় ।

তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান কবিলেন ; তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি গৌরবে নবদ্বীপবাসিগণ ভীত হইলেন ; কিন্তু তৰুণ নিমাই হাশুমুখে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার সেই সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া একটি শ্লোক রচনা কবিলেন ; শ্লোক-গুলিব সুন্দর উপমা, সহজ ভাব, শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিল ; কিন্তু নিমাই সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিগ্বিজয়ীর অথও-অভিমান-ক্ষোভ মুগমগুল খর্ব ও মলিন করিয়া দিলেন ; তাঁহার প্রথম ছত্রের ‘ভবানী ভর্তৃ’ শব্দে ‘বিরুদ্ধমতি দোষ’, ‘বিভবতি’ শব্দের পরে ‘ক্রমভঙ্গদোষ’, শ্রীলক্ষ্মী শব্দে ‘পুনরুক্তবদাভাস’, ইত্যাদি । যিনি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কৃতী, তিনি ‘অলঙ্কারশাস্ত্রের হৃদয়তত্ত্ব ও অবগত ছিলােন, একথা দিগ্বিজয়ী কখনও মনে ভাবেন নাই । তাই, দস্ত-ভরে বলিয়াছিলেন ;—

“ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার । তুমি কি জানিবে এই কবিষের সার ॥”-( ১৫, চ, আদি ) ।

কিন্তু এবার তাঁহার আটোপ বুঝা হইল ; প্রভু যখন তাঁহার রত্নমুষ্টির

ভায় কবিতাটিকে ছাইমুষ্টির ভায় শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতীপন্ন করিলেন, তখন দিগ্বিজয়ী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুণ্ঠিত করিয়া কোন পথে পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিল না ।

এই তরুণবয়সে প্রবীণাশঙ্কাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির দুরন্তপনার কিছুমাত্র হাস্য হয় নাই । শ্রীহট্টীয়গণ দেখিলে নিমাই ব্যঙ্গ-প্রিয়তা ।

ব্যঙ্গ করিতেন ; তিনি খাটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না । ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিগেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টবাসীগণের এইজন্ত একটু ভ্রাত্য কষ্ট হইত ;—

“শ্রীহট্টীয়গণ বলে হয় হয় হয় । তুমি কোন দেশী তাহা কহ মহাশয় ॥ পিতা মাতা আদি করি তাবৎ তোমার । বল দেখি শ্রীহট্টজন্ম না হয় কাহাব ॥”—(চৈ, ভা, আদি) ।

কিন্তু রহস্তাপ্রিয় পণ্ডিতমহাশয় এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন । “তাবৎ শ্রীহট্টীয়ারে চালেন ঠাকুর । বাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদারিয়া । লাগালি না পায় যায় তর্জিয়া গর্জিয়া ॥”—(চৈ, ভা, আদি) ।

কিন্তু যে স্থানে এই যুবাবয়সে তাঁহার চাঞ্চল্য না থাকা শ্রেয়ঃ ছিল, সে স্থলে তিনি সংগত ছিলেন ,—

সাবধানতা ।

‘এই মত চাপলা করেন সব সনে । সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি কোনে ॥ সবে পরস্ত্রী মাত্র নাহি উপহাস । স্ত্রী দোষ দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ ॥’—(চৈ, ভা, আদি) ।

ধর্ম না থাকিলে হিন্দুস্তানে রূপ বৃথা,—বিদ্যা বৃথা । সকলেই

নিমাইকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে বাইত ;

ধর্মহীনতা শুধু ভাণ ।

রহস্যের শ্রোতে ধর্মকথা ভাসাইয়া দিয়া

নিমাই হাসিতেন ; ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব, তাঁহাকে ধর্মে মতি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাঁহার শ্লোক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন । “প্রভু কহে এ ধাতু আশ্রনে-পদী নয় ॥”—ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্মের কথাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি হইত ।

কিন্তু তাঁহার বাহিরের এই রহস্য-প্রিয়তা প্রকৃত ধর্মহীনতার পরিচায়ক ছিল না । তিনি বাঙ্গ করিয়াও শ্রীধর এবং গদাধরকে দেখিলে মনে মনে আত্মাদিত হইতেন এবং ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হইতেন ।

এই যুবকের হৃদয় শরদভ্রের ত্রায় নির্মল ও শরৎ সেফালিকার ত্রায় পবিত্র ছিল ; ঈহার চাপলা—স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময়—রসপূর্ণ খেলা,—তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত ; এই নির্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদানে সরস ভক্তি কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি ।

### শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ।

নিমাইপণ্ডিত পূর্ববঙ্গ পর্য্যটন করিতে গেলেন । ইতিপূর্বেই তিনি

বঙ্গের সর্বত্র একজন শ্রেষ্ঠপণ্ডিত বলিয়া  
পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ ।

নামে পরিচিত ছিলেন ; পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চনা করিয়া বলিলেন,—“উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্তনী । লই,পড়ি,পড়াই শুনহ বিজমণি ॥”—(চৈ, ভা, আদি) । ঈহা দ্বারা জানা যায় নিমাইপণ্ডিতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল ।\* তিনি পূর্ববঙ্গের কোন্ কোন্ স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই ; চৈতন্য ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ।

নবদ্বীপে ফিবিয়া আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গীগণের নিকট পূর্ববঙ্গের

ভাষার অনুকরণ করিয়া হাস্য পরিহাস করিতে  
দ্বীবিয়োগ ও পুনঃ পরিণয় ।

লাগিলেন, কিন্তু একটি প্রফুল্ল পুতুলের ত্রায়

\* চৈতন্যপ্রভুর ব্যাকরণের টীকার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, যথা—“দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া মমৎকর । ব্যাকরণে করয় টিপ্তনী আপনার ॥”—(ভক্তিরত্নাকর, ১২ তরঙ্গ) । “বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত । ‘বিদ্যাসাগর’ নামে টীকা বাহার রচিত ॥”—(অষ্টম প্রকাশ, ১৩৪ পৃঃ) ।

যখন জননীদেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া শচী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন । নিমাই জানিতে পারিলেন, সর্পদংশনে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হই-  
গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছ্বাস । যাচ্ছে । নবীনপণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন,

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন ; কিন্তু নিজের বোধ হয় প্রবোধ পান নাই । পিতৃপিণ্ডপ্রদানার্থ গয়াযাত্রা করিলেন ; এবার তাঁহার চিত্ত শোকে আকুল হইয়াছিল, তীর্থস্থানে যাওয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর মূর্তি তাঁহার চক্ষে একখানি দেবছবির স্থায় অপূৰ্ণ বোধ হইল ; ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া বোধ হইল ;—“প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার । শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতীর । \* \* \* ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান । এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥”—(চৈ, ভা, আদি) । বলিয়া নিমাই অশ্রুনেত্রে কুমারহট্টের ধূলি-রেণু দুর্লভ সামগ্রীর ন্যায় উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন ।

ইহার পর আর এক দৃশ্য ; সে দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত ; স্ত্রীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমাত্রী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন ; যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গা নিঃসৃত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণেণু ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোরত—সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । সঙ্গীগণের যত্নে মুচ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজস্র নয়নাশ্রু ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পথ দেখিতে পান নাট, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিলেন,—“তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাইব না ; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম ।”

এই অপূৰ্ণ ভক্তি-উচ্ছসিত পূর্বরাগের আবশ্যময় যুবককে সঙ্গীগণ

নানা উপায়ে প্রত্যাখ্যস্ত করিলেন ; গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাদ-  
পদ্মের কথা বলিতে পারেন নাই,—বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কথা বন্ধ  
হইয়াছে ; ‘কি দেখিয়াছি’ বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমান্ পণ্ডিত,  
আবার গদাধরের কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া-  
ছেন । তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই—  
তাঁহার মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল ।

এই প্রেমোন্মত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূব রূপ দ্বারা গৃহে বাধিয়া  
রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—“লক্ষ্মীয়ে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায় । দৃষ্টিপাত  
করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ কোথা বৃক্ষ কোথা বৃক্ষ বলে অনুক্ষণ । দিবানিশি লোক  
পড়ি করয় ক্রন্দন ॥”—চৈ, ভা, আদি ।

ইহার পর কাঁটোয়ার কেশব ভাদতীর নিকট মস্ত গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

মস্তগ্রহণ, সন্ন্যাস  
ও ভক্তি-মাধুর্য্য ।

নাম গ্রহণ ০ সন্ন্যাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন  
হইল ; তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র ।

( ১৫০৯ খৃঃ ) ।

গয়া গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপ । একপা অনির্বচনীয়  
সৌন্দর্য্যজড়িত ছবি ইতিহাস যুগ যুগান্তর পরে একবার প্রকটিত করেন ।  
বক্তৃতার গুণে নহে,—রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত করিলেন ;  
শিরিশিখরকুসুমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না ; চৈতন্য-  
দেব স্বীয় ভাক্তময় অশ্রুগিক্ত মূর্ত্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে  
দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে ; সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই,—বেশাদ্বয় তাঁহাকে  
প্রতারিত করিতে বাইয়া কাঁদিয়া পদে শরণ লইয়াছে ; ভীলপঙ্খ, নরোজী  
প্রভৃতি দম্মাগণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কাঁদিয়া পায় ধরিয়াছে ।  
হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়াছে,  
তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে ; তমালকে  
জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন ; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন ; বিষুর



উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোগের অন্ত খাইতে চক্ষু, জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক একটি অন্ত অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন ; বেঙ্গট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের মত হরি হরি বলিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুপ্তিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আহা, নিদ্রা, বাহুজ্ঞান কিছুই ছিল না । যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ভাব লইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ব গৌরবর্ণ কাস্তিতে বহুৎলহরী, অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে আশ্চর্য্য ভক্তির প্রভা দেখিয়া কাঁদিয়া ‘হরি বোল’ বলিয়াছে । সত্যই যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন ; পুণানগরে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল—“তোমার হরি ঐ পুষ্কারগীতে আছেন ।” তখন চৈতন্য জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন । এই মুক্তি ধ্রুব, প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া ।

এই অপূর্ব মনুষ্যটিকে দেখিয়া জাতীয় জীবনে যে বিশ্বাস ও প্রেম জন্মিয়াছিল, —তাহা অগৌরব উচ্ছ্বাসময় । শ্রীবাস-অঙ্গনে সারারাত্রি চৈতন্যদেব সঙ্গীগণ সহ হরিনাম কীর্তনে তাঁহার প্রতি লোকানুরাগ ।

উন্নত ছিলেন, নিশি কিঙ্কর ভোর হইল তাহা তাঁহারা জানেন নাই । এই অপূর্ব সন্মিলনের স্থখ উপভোগের বস্তু, ভাষায় বাক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,—“চমকিত হৈয়া সবে চারিদিকে চায় । নিশি পোহাইল বলি কাদে উত্তরায় ॥ কোটী পুত্রশোকেও এত দুঃখ নহে । যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অকণ্ঠে চাহে ॥”—চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড । অদ্বৈত গোঁসাই বলিয়া-ছিলেন,—“শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায় । তবুও প্রভুর নিলা সহন না যায় ॥” লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল,—“বাঁহা বাঁহা প্রভুর চরণ পড়য় চলিতে । সে মুক্তিকা লয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে ॥”—চৈ, চ, মধ্য, ১ম পঃ । চিরসঙ্গী গোবিন্দ-ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া শান্তিপুত্র যাঁহাতে আদিষ্ট হইবে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল । “এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে । প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে ॥”—(করুণা) । হরি-

দর্শনেচ্ছু অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় দ্বারা যেনিকে চাহিয়াছেন, সেইদিকে কুসুমগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—“বিশাল নয়নে যেইদিকে যবে চায়। সেইদিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়।”—(গোবিন্দ দাসের করচা)। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস—“যঁহি বঁহি তরল বিলোচন পড়ই। তঁহি তঁহি নীল উৎপল ভরই।”—পদে এই মূর্ত্তির আবেশময় প্রতীবিশ্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ববর্ত্তী বর্ণনা-শৃঙ্গলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির ক্ষুরণ দেখি নাই, যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্ম্মকাব্যগুলি রূপকথার ত্রায় বোধ হয়।

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখনও মোহিত রহিয়াছে, এখনও সেই স্মৃতিতে সদাজাত প্রিয় বালকের মুখচূষন করিয়া তাহাকে ‘নবদ্বীপচন্দ্র’, ‘নগরবাসী’, ‘নদেবাসী’, প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনে ধর্ম্মনীতি।

ফুলের মৃদুতা মেয়েলী গুণ; “মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল কঠিনবজ্রময়।”—\* কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি।—পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ

হয় না, ফুলতারানত ব্রতভীজড়িত দেবদারু

পৌরুষ ও বিনয়।

ত্রায় মহাপুরুষগণ নানা কোমল গুণ বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্তদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক্ হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল পুষ্পের ত্রায় মনোহর দেখায়, অত্ৰ্যদিক্ হইতে সে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব বিশ্বয় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের ত্রায় ঋজু বিরাট, অত্ৰ্যদিকে অলিগুঞ্জরিত ফুলময়। কিন্তু তাঁহার বিনয় ও প্রকৃত বীররসে পুষ্ট—ইহার মৃদুত্ব ও দৃঢ়তা আছে; গঙ্গার ঘাটে তিনি

\* “বজ্রাদপি কঠোরাপি মৃদুনী কুহ্মাদপি।” উত্তরচরিত।

লোক-পরিচর্যায় নিযুক্ত ;—“তোমাসব সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। এত বলি কার পায় ধরে সেই ঠাকুরি । নিষাড়িয়ে বস্ত্র কাক করিয়া যতনে । ধুতি বস্ত্র তুলি কার দেন ত আপনে ॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে । গাজি বহি কোন দিন চলে কার ধরে ॥”—(চৈ, ভা, মধ্য) । তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রজাতির উপর পারচর্য্যার ভার দিয়া অনেক দিন হস্তের পুণ্য তুলিয়া গিয়াছিলেন,— তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য ।

কিন্তু এই মৃদু ফুল-সম ব্যক্তি কোনও সময় বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন ; তাহার নিশ্চল প্রীততে যদি কেহ বিলাসের পক্ষ মিশাইতে যাইত, তখন এহ মধুর প্রেমাবগলিত ছবি তাহার কঠোর বৈরাগ্য । একটি উজ্জ্বল বজ্রময় মূর্তিতে পারিণত হইত ।

জগদানন্দ একটি তুগার বালিশ তাহার জন্ত রাখিয়াছল, তজ্জন্ত “জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে” বালয়া তিনি তাহাকে অশেষরূপ ভৎসনা করিয়াছিলেন । এক ব্যক্তি এক হাঁড়ি সুগন্ধি তৈল তাহাকে উপচোকন দিয়াছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাঁড়ি আঙ্গনায় ভগ্ন করিতে হইল । অগ্রদ্বীপবাসী গোবিন্দঘোষ প্রভুর মুখওদ্ধর জন্ত একাধিক হরিতকী দিয়া অপরাধি পরদিবসে জন্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঞ্চর-বুদ্ধি আছে, এই বলিয়া তিনি তাহাকে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন । তাহার শত অনুনয় বিনয় বিফল হইল । ছোট হরিদাস শিখি-মাহিতির ভগ্নী মাধবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, “প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সত্ত্বাধার । দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥”—(চৈ, চ, অষ্টম) । চৈতন্য তাহার মুখ আর দেখেন নাই । সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের একখানা ভোটকঞ্চল গায় দিয়া আসিয়াছিল, কোপিনসার চৈতন্যদেব নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু “ভোট কঞ্চলের পানে প্রভু চাহে বারে বার” স্মরণে তাহার ভোটকঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল । সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প যে দিন মুখ হইতে বহির্গত

হইল, সে দিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্মত্ত ভাবে স্নেহের বাহুদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল, তাঁহার শোকাক্ষিপ্ত মাতা দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, “দ্বাদশ উপাসে আশ করিলা ভোজন ( চৈ, ভা, মধ্য )। নিশ্চয় সেদিকে জ্রঞ্জেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে পাগল-প্রায়, কাহারও অশ্রুজল লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র ভূতাসঙ্গে চৈতন্ত চলিয়া গেলেন। রামানন্দরায়ের বাড়ীতে বিষ্ণু-মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবধ লোক নিযুক্ত একান্ত শেষে দেখা গেল উপবাস-ক্ষীণ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণদেহ চৈতন্তের আকৃতি বোঝাই সর্বাপেক্ষা বড়। এই কষ্টসহিষ্ণু কোপনধারী সত্যবাক্য বিষয়ানন্দ্রূপ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন ঋষিগণেরই বংশধর, যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাপূর্ণ ঋষিবংশোদ্ভব মহাজনগণ প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান শিখাইবার জন্ত এই ভাবে হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এরূপ সময় হয়, যখন আরাধ্য ও আরাধকে প্রভেদ থাকে না ; ভাগবতে তদবস্থায় গোপীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন ; গোপী-গণ,—“সকলেই বৃষ্ণাস্ত্রিকা হইয়া পরস্পর ‘আমিই সোহং।

এই বৃষ্ণ’ এই প্রকার কহিতে লাগিলেন” ( ভাগবত

১১শ স্কন্ধ, ৩০ অঃ, ৩ শ্লোক )। জয়দেবও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, “মহরবলোকিতমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনলীলা।” বিদ্যাপতির গীতেও সেই কথার পুনরুক্তি আছে “অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, মুল্লরী ভেল মাধাই।” ইহাই যোগীর “সোহং”, ব্রীষ্টের “আমি এবং আমার পিতা এক।” এইরূপ। মুহূর্ত্ত চৈতন্তদেবের জীবনেও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুল্পপদ্মে ভ্রমর পতিত হইলে হর্ব-উচ্ছ্বসিত পদ্ম স্বীয় দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে সম্ভোগ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরূপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, চৈতন্তপ্রভুও সেইরূপ ষাঁহাকে খুঁজিতেন, তাঁহাকে সময়ে সময়ে ছুদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাঁহার ছবি অমায়ুষ্য

প্রকুলভাব ধারণ করিয়াছে—বাহুতেব আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তখন “মুক্তি সেই মুক্তি সেই কহি কহি হাসে ।”—( চৈ, ভা, মধ্য ) । সেই সময় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাঁহার শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বুদ্ধ অধৈতাচার্য্য ও তুলসী চন্দন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন !

কিন্তু ঐ ভাব অল্পকালব্যাপক, তদবসানে চৈতন্যদেবের বাহুজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যে ঈশ্বর সন্মোদন করিয়াছে, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন । দাক্ষিণাত্য হইতে ঈশ্বর আরাধে বিরক্তি ও উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্বভৌম বিনয় ।

গললগ্নীকৃতবাস ও কৃতাজলি হইয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “প্রভু কহে সার্বভৌম আর কথা কহ । আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ ॥”—( গোবিন্দের করচা ) । রামানন্দ রায় তাঁহাকে ‘ঈশ্বর’ বলাতে চৈতন্যদেব সবিনয়ে উত্তর করিলেন, “প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী । কায় মন বাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ শুক্লবস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না জুয়ায় । সন্ন্যাসীর অঙ্গ ছিহ্ন সর্বলোকে গায় ॥ \* \* \* পূর্ণ হৈছে দুহ্মের কলস । সুরাবিন্দুপাতে পাতে কেহ তারে না করে পরশ ॥”—( চৈ, চ, অন্তঃখণ্ড ) । এক গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল । চণ্ডীপুরে ঈশ্বর ভারতী তাঁহাকে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বলিয়া সন্মোদন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন । শ্রীবাস-অঙ্গনে হরির নামে সংকীৰ্ত্তন না করিয়া ‘চৈতন্যজয়’ বলিয়া সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা নিবারণ করিয়া দিলেন । বাহুল্য ভয়ে অরে উদাহরণ দিব না, এরূপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে । তাঁহার মত বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে বিনয় দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন ; বাসুদেব সার্বভৌমের

সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বৃদ্ধ অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন এ বয়সে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাট; তত্ক্ষণে—“প্রভু কহে শুন সার্কভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমরা নাহি জানিও নিশ্চয়। বৃষ্ণের বিরহে মুক্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইলু শিখা স্ত্রে মুড়াইয়া। সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।”—(চৈ, ভা, মধ্য)। তুঙ্গভদ্রাবাসী চুণ্ডিরাম-তীর্থ তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব—“মুদ্রখ সন্ন্যাসী কহ নাহি জমুহি গিনি” বলিয়া তাঁহাকে ‘জয়পত্র’ লিখিয়া দিতে চাহিলেন। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বরতীর্থে এক যোগী পণ্ডিতকেও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু এই সব পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার স্নানার্থে হরির নাম শুনিয়া, তাঁহার ব্যাকুল উন্মত্ততা দেখিয়া করজোড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সেখানে অবলম্বিতক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্বশেষ উন্মত্তবৎ হরিনামেব কথা কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন; বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবল মুখে যখন তুণের ন্যায় ভাসিয়া গাইতে উদ্যত, তখন সহসা বিস্ময়বিষ্কারিতনেত্রে তাঁহারা অভিনব সৌন্দর্য্যজড়িত ভক্তিময় এই দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া ক্লতার্থ হইতেন, লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে (উড়িষ্যা) বাস করেন, ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গোড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খৃঃ আষাঢ়ের লীলাবসান। শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে, রবিবার দিনে) তাঁহার অপূর্ব লীলার অবসান হয়।

অদ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্দ্ধা সহকারে  
অগ্রসর নব্যবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন  
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ।  
স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ ও হীনবল  
মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় সমাজের মস্তকে  
ও চরণে—ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনামূচক প্রীতি জাগাইয়া  
দিয়াছিলেন । প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া “চণ্ডালোহপি  
বিজ্ঞশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তপরাযণঃ” বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; ইতরজাতিব  
অন্ন গ্রহণ কাবলে সামাজিক খর্ব্বতা হউক কিন্তু হরিভক্তির হানি  
হয় না,—“প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়’। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বধায় ॥”—  
( চৈ, ভা, অন্তঃখণ্ড ) । “মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে । কোটী নমস্কার করি তাহার  
চরণে ॥”—( গোবিন্দের করচা ) । দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্যজাতির সম্মান বুঝিয়া-  
ছিলেন এবং শ্রেণীবিণেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রাপ্য মর্যাদা সীমাবদ্ধ  
নহে, একথা বিনয় সহকারে কিন্তু অটল বীৰত্বের সহিত প্রচার করিয়া-  
ছিলেন ।

রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত ইদানীং  
কালের মনুষ্যাগণেরও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ  
জীবনী-লেখার শূত্রপাত ও  
বিকাশ ।  
হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের  
বিশ্বাসের কথা ছিল না ; পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর  
আয় লোকবৃন্দ ব্রাহ্মণ-মুখ-নিঃসৃত শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল  
কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল । চৈতন্যদেবের প্রভাবে  
শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যজ্ঞবৎ মনুষ্য-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির  
সঞ্চার হয় ; পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে মনুষ্যচরিত্র পুনরায়  
গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নূতন  
অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয় । নরহরির আয় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রাণ-  
পাত সহকারে নরোত্তমের আয় শূদ্রের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য

হইয়াছেন ;—ইহা বঙ্গসমাজের নব সামগ্রী । সাহিত্য-মুকুরে প্রতি-  
 বিম্বিত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয়  
 সৌন্দর্য্যের রক্ষিপাত দৃষ্ট হয় । সাহিত্য এবং সমাজের উন্নতির কথা  
 ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধর্ম্মজগতে চিরকালের জন্ত এক  
 অপূর্ব্ব দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহার অক্ষুরন্ত স্নেহ যুগ যুগান্তরের  
 জন্য হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহা তাঁহার চিরস্মারক নাম-  
 মাহাত্ম্য প্রচার, কণিযুগের নব গায়ত্রী—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

উৎকলকবি সদানন্দ চৈতন্যপ্রভুকে “হরিনামমুক্তি” আখ্যা প্রদান  
 কবিয়াছেন, কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর নাম !

### পদাবলী সাহিত্য ।

আমরা পুনর্ব্বার পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা  
 করিতেছি ; বলা নিম্নযোজন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল  
 পদকর্ত্তাই চৈতন্যপ্রভুর সমকালিক অথবা পরবর্ত্তী । আমরা পদকল্পতরু,  
 রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক অবলম্বন  
 করিয়া পদকর্ত্তাদিগের একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদান  
 করিতেছি,—

| নাম ।              |     |     |     | পদসংখ্যা । |
|--------------------|-----|-----|-----|------------|
| ১ । অনন্ত দাস      | ..  | ... | ... | ৪৭         |
| ২ । অনন্ত আচার্য্য | .   | ... | ... | ২          |
| ৩ । আকবর আলি       | ..  | ... | ... | ১          |
| ৪ । আজ্ঞারাম দাস   | ... | ... | ... | ২          |
| ৫ । আনন্দ দাস      | ... | ... | ... | ৩          |
| ৬ । উদ্ধব দাস      | ... | ... | ... | ১১০        |



| নাম ।               | পদসংখ্যা : |
|---------------------|------------|
| ৭ । কবির            | ১          |
| ৮ । কবিরঞ্জন        | ৯          |
| ৯ । কমরালী          | ১          |
| ১০ । কানাই দাস      | ৪          |
| ১১ । কানু দাস*      | ১৪         |
| ১২ । কামদেব         | ১          |
| ১৩ । কালীকিশোর      | ১৭৯        |
| ১৪ । কৃষ্ণকান্ত দাস | ২৯         |
| ১৫ । কৃষ্ণদাস       | ২২         |
| ১৬ । কৃষ্ণপ্রমোদ    | ২          |
| ১৭ । কৃষ্ণপ্রসাদ    | ৫          |
| ১৮ । গতিগোবিন্দ     | ১          |
| ১৯ । গদাধর          | ৩          |
| ২০ । গিরিধর         | ১          |
| ২১ । গুপ্ত দাস      | ১          |
| ২২ । গোকুলানন্দ     | ১          |
| ২৩ । গোকুল দাস      | ১          |
| ২৪ । গোপাল দাস      | ৬          |
| ২৫ । গোপাল ভট্ট     | ২          |
| ২৬ । গোপীকান্ত      | ১          |
| ২৭ । গোপীরমণ        | ১          |
| ২৮ । গোবর্দ্ধন দাস  | ১৭         |
| ২৯ । গোবিন্দ দাস    | ৪৫৮        |
| ৩০ । গোবিন্দ ঘোষ    | ১২         |
| ৩১ । গৌরমোহন        | ২          |
| ৩২ । গৌরদাস         | ২          |
| ৩৩ । গৌরমুন্দর দাস  | ৩          |

| নাম ।                      | পদসংখ্যা । |
|----------------------------|------------|
| ৩৪ । গৌরীদাস ... ..        | ২          |
| ৩৫ । ঘনরাম দাস ... ..      | ১৪         |
| ৩৬ । ঘনশ্যাম দাস ... ..    | ৩৫         |
| ৩৭ । চণ্ডীদাস ... ..       | ১১৯        |
| ৩৮ । চল্লশেখর ... ..       | ৩          |
| ৩৯ । চম্পতি ঠাকুর ... ..   | ১৩         |
| ৪০ । চুড়ামণি দাস ... ..   | ১          |
| ৪১ । চৈতন্ত্য দাস ... ..   | ১৫         |
| ৪২ । জগদানন্দ দাস ... ..   | ৫          |
| ৪৩ । জগন্নাথ দাস ... ..    | ৯          |
| ৪৪ । জগমোহন দাস ... ..     | ২          |
| ৪৫ । জয়কৃষ্ণ দাস ... ..   | ১          |
| ৪৬ । জ্ঞানদাস ... ..       | ১৯৪        |
| ৪৭ । জ্ঞানহরি দাস ... ..   | ২          |
| ৪৮ । পুরুষোত্তম ... ..     | ৯          |
| ৪৯ । প্রতাপনারায়ণ ... ..  | ১          |
| ৫০ । প্রমোদ দাস ... ..     | ৫          |
| ৫১ । প্রসাদ দাস ... ..     | ১          |
| ৫২ । প্রেমদাস ... ..       | ৩১         |
| ৫৩ । প্রেমানন্দ দাস ... .. | ৫          |
| ৫৪ । বলদেব * ... ..        | ১          |
| ৫৫ । বলরাম দাস * ... ..    | ১৩১        |
| ৫৬ । বলাই দাস * ... ..     | ৩          |
| ৫৭ । বল্লভ দাস ... ..      | ২৬         |
| ৫৮ । বংশীবদন ... ..        | ৩৮         |

\* চিহ্নিত নামগুলি বর্ণীয় 'ব', অবশিষ্ট অন্তঃস্থ 'ব' এর অন্তর্গত ।

| নাম ।               |     |     |     | পদসংখ্যা । |
|---------------------|-----|-----|-----|------------|
| ৫৯ । বসন্ত রায়     | ... | ... | ... | ৩৩         |
| ৬০ । বাহুদেব ঘোষ    | ... | ... | ... | ১৩৪        |
| ৬১ । বিজয়ানন্দ দাস | ... | ... | ... | ১          |
| ৬২ । বিদ্যাপতি      | ... | ... | ... |            |
| ৬৩ । বিন্দুদাস      | ... | ... | ... | ৪          |
| ৬৪ । বিপ্রদাস       | ... | ... | ... | ৬          |
| ৬৫ । বিপ্রদাস ঘোষ   | ... | ... | ... | ১৬১        |
| ৬৬ । বিশ্বম্ভর দাস  | ... | ... | ... | ২          |
| ৬৭ । বীরচন্দ্র কর   | ... | ... | ... | ১          |
| ৬৮ । বীরনারায়ণ     | ... | ... | ... | ২          |
| ৬৯ । বীরবল্লভদাস    | ... | ... | ... | ১          |
| ৭০ । বীর হাধীর      | ... | ... | ... | ২          |
| ৭১ । বৈষ্ণবদাস      | ... | ... | ... | ২৭         |
| ৭২ । বৃন্দাবনদাস    | ... | ... | ... | ৩০         |
| ৭৩ । ব্রজানন্দ      | ... | ... | ... | ১          |
| ৭৪ । তুলসীদাস       | ... | ... | ... | ১          |
| ৭৫ । দলপতি          | ... | ... | ... | ১          |
| ৭৬ । দীনঘোষ         | ... | ... | ... | ১          |
| ৭৭ । দীনহীন দাস     | ... | ... | ... | ৩          |
| ৭৮ । দুঃখীকৃষ্ণ দাস | ... | ... | ... | ৪          |
| ৭৯ । দুঃখিনী        | ... | ... | ... | ২          |
| ৮০ । দৈবকীনন্দন দাস | ... | ... | ... | ৪          |
| ৮১ । ধরুর্গাদাস     | ... | ... | ... | ৩          |
| ৮২ । নটবর           | ... | ... | ... | ১          |
| ৮৩ । নন্দন দাস      | ... | ... | ... | ১          |
| ৮৪ । নন্দ ( দ্বিজ ) | ... | ... | ... | ১          |
| ৮৫ । নন্দানন্দদাস   | ... | ... | ... | ২২         |

| নাম ।                | পদসংখ্যা । |
|----------------------|------------|
| ৮৬ । নরসিংহ দাস      | ১          |
| ৮৭ । নরহরি দাস       | ২২         |
| ৮৮ । নরোত্তম দাস     | ৬১         |
| ৮৯ । নবকান্ত দাস     | ১          |
| ৯০ । নবচন্দ্র দাস    | ২          |
| ৯১ । নবনারায়ণ ভূপতি | ১          |
| ৯২ । নসির মামুদ      | ১          |
| ৯৩ । নৃপতিসিংহ       | ১          |
| ৯৪ । নৃসিংহ দেব      | ৪          |
| ৯৫ । পরমেশ্বর দাস    | ১          |
| ৯৬ । পরমানন্দ দাস    | ১২         |
| ৯৭ । পীতাম্বর দাস    | ১          |
| ৯৮ । ফকির হবির       | ১          |
| ৯৯ । ফতন             | ১          |
| ১০০ । ভূপতিনাথ       | ৭          |
| ১০১ । ভুবন দাস       | ২          |
| ১০২ । মধুরদাস        | ১          |
| ১০৩ । মধুসূদন        | ৫          |
| ১০৪ । মহেশ বসু       | ১          |
| ১০৫ । মনোহর দাস      | ৬          |
| ১০৬ । মাধব ঘোষ       | ৯          |
| ১০৭ । মাধব দাস       | ৬৫         |
| ১০৮ । মাধবাচার্য্য   | ৫          |
| ১০৯ । মাধবী দাস      | ১৭         |
| ১১০ । মাধো           | ৩          |
| ১১১ । মুরারি গুপ্ত   | ৫          |
| ১১২ । মুরারি দাস     | ১          |

| নাম ।                  | পদসংখ্যা । |
|------------------------|------------|
| ১১৩ । মোহন দাস         | ২৭         |
| ১১৪ । মোহনী দাস        | ৪          |
| ১১৫ । যদুনন্দন         | ৯৫         |
| ১১৬ । যদুনাথ দাস       | ১৭         |
| ১১৭ । যদুপতি           | ১          |
| ১১৮ । যশোব্রজখান       | ১          |
| ১১৯ । যাদবেন্দ্র       | ৩          |
| ১২০ । রঘুনাথ           | ৩          |
| ১২১ । রসময় দাস        | ২          |
| ১২২ । রসময়ী দাসী      | ১          |
| ১২৩ । রসিক দাস         | ৩          |
| ১২৪ । রামকান্ত         | ১          |
| ১২৫ । রামচন্দ্র দাস    | ২          |
| ১২৬ । রামদাস           | ২          |
| ১২৭ । রামচন্দ্র দাস    | ৪          |
| ১২৮ । রাম রায়         | ১          |
| ১২৯ । রামা             | ২          |
| ১৩০ । রাধাসিংহ ভূপতি   | ৪          |
| ১৩১ । রাধামোহন         | ১৭৫        |
| ১৩২ । রাধাবল্লভ        | ২৯         |
| ১৩৩ । রাধামাধব         | ১          |
| ১৩৪ । রামানন্দ         | ১৫         |
| ১৩৫ । রামানন্দ দাস     | ১          |
| ১৩৬ । রামানন্দ বসু     | ৯          |
| ১৩৭ । রূপনারায়ণ       | ৩          |
| ১৩৮ । লক্ষ্মীকান্ত দাস | ১          |
| ১৩৯ । লোচনদাস          | ৩০         |

| নাম ।                 |     |     |     | পদসংখ্যা । |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------|
| ১৪০ । শঙ্কর দাস       | ... | ... | ... | ৪          |
| ১৪১ । শচীনন্দন দাস    | ... | ... | ... | ৩          |
| ১৪২ । শশিশেখর         | ... | ... | ... | ৩          |
| ১৪৩ । শ্যামচাঁদ দাস   | ... | ... | ... | ১          |
| ১৪৪ । শ্যাম দাস       | ... | ... | ... | ৩          |
| ১৪৫ । শ্যামিনন্দ      | ... | ... | ... | ৭          |
| ১৪৬ । শিবরায়         | ... | ... | ... | ১          |
| ১৪৭ । শিবরাম দাস      | ... | ... | ... | ২৫         |
| ১৪৮ । শিবানন্দ        | ... | ... | ... | ৪          |
| ১৪৯ । শিবাসহচরী       | ... | ... | ... | ১          |
| ১৫০ । শিবাই দাস       | ... | ... | ... | ৭          |
| ১৫১ । জীনিবাস         | ... | ... | ... | ৩          |
| ১৫২ । জীনিবাসাচার্য্য | ... | ... | ... | ২          |
| ১৫৩ । শেখর রায়       | ... | ... | ... | ১৭৬        |
| ১৫৪ । সদানন্দ         | ... | ... | ... | ১          |
| ১৫৫ । সালবেগ          | ... | ... | ... | ১          |
| ১৫৬ । সিংহভূপতি       | ... | ... | ... | ৭          |
| ১৫৭ । সুল্লর দাস      | ... | ... | ... | ২          |
| ১৫৮ । সুবল            | ... | ... | ... | ১          |
| ১৫৯ । সেখ জালাল       | ... | ... | ... | ১          |
| ১৬০ । সেখ ভিক         | ... | ... | ... | ১          |
| ১৬১ । সেখলাল          | ... | ... | ... | ১          |
| ১৬২ । সৈয়দমর্জু জা   | ... | ... | ... | ১          |
| ১৬৩ । হরিদাস          | ... | ... | ... | ৭          |
| ১৬৪ । হরিবল্লভ        | ... | ... | ... | ৪          |
| ১৬৫ । হরেকৃষ্ণ দাস    | ... | ... | ... | ২          |
| ১৬৬ । হুদেয়াম দাস    | ... | ... | ... | ২          |

এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কাষ্ঠ-মলাটে আবদ্ধ আরও বিস্তর কবিতা অজ্ঞাত অবস্থায় আছে ; তাহাদের একটা সদগতি হইলে অনেক লুপ্ত কবির পদ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায় । ইহা ছাড়া প্রদত্ত তালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ পরিচিত হইয়াছে,—নিম্নলিখিত ‘গোবিন্দগণ’ বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ-

বিভিন্ন গোবিন্দ দাস ।

দাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন \* ; দাসশব্দের সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য-সূচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা তাহাদের পরিচয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে,—

(১) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী—ইনি চৈতন্যের অনূচর ও নবদ্বীপবাসী । (২) শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র মালিহাটী নিবাসী গোবিন্দ আচার্য । ইনি “গতিগোবিন্দ” নামে পরিচিত ; ( “জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্দ রসময় । জয় তছু ভকত সমাজ ॥” পদকল্পতরু ) । (৩) গিরীধর-দত্তের পুত্র গোবিন্দদত্ত । (৪) কুলীনগ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষ ; ইনি মধ্যে মধ্যে ‘দাস’ উপাধি গ্রহণ না করিয়া ‘ঘোষ’ সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা দিয়াছেন ; ( “গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই । যা সবার কীৰ্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥”—( চৈ, চ ) ) । (৫) কাশীধর ব্রহ্ম-চারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ । (৬) প্রসিদ্ধ করচা-লেখক গোবিন্দ কর্ণকার । (৭) গোবিন্দ চক্রবর্তী, নিবাস বোরাগুলি—মুরশিদাবাদ, শ্রীনিবাস শিষ্য ।

বলরামদাস ০ ৪।৫টী স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম

বিভিন্ন বলরাম দাস  
এবং অপরাপর কবি ।

বলিয়া বোধ হয় ।

(১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন সময় পুরীতে এক বলরামদাসকে শিক্ষা বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা যায় । ( “রামশিক্ষা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত । বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত ॥”—গোবিন্দের করচা ) । বৈষ্ণব বন্দনায় ৩ জন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে । (২) “সংগীতকারক বন্দো বলরামদাস । নিত্যানন্দধর্ম্মে যার হৃদে

\* পূর্বকালে পায় প্রত্যেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন ; সুতরাং ইঁহারা সকলেই পদকর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্তা ছিলেন । বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ।

বিবাস ।” (৩) কানাইখুটিয়া বন্দো বিষের প্রচার । জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার ।”\* বৈষ্ণব বন্দনা (৪) “বন্দো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয় । জগন্নাথ, বলরাম বস যার হয় ।” (৫) প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসও “বলরাম” নামে পরিচিত । (৬) নরোত্তমবিলাসে ‘পূজারি বলরাম’ নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায় । (৭) উক্ত পুস্তকে ‘বলরাম কবিরাজ’ নামক অপর একটী ‘বিজ্ঞ ব্যক্তি’র উল্লেখ আছে । (৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায়—“কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিত বশ জয় ঘনশ্রাম বলরাম” পাওয়া যায় । (৯) অদ্বৈতআচায্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল । (১০) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য “কবিপতি বলরাম” নামে আর একজন বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উক্ত পুস্তকেই (১১) শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে । এই বলরাম সম্প্রদায়ের ১২ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না । সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীকৃত স্মরণ স্মরণ পদে ‘বলরাম দাস’ ভণিতা দেওয়াতে এই বলরাম সমস্তা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয় ।

(১) যদুনন্দন চক্রবর্তী + ও (২) যদুনন্দন দাস উভয়েই পদকর্তা মূললেখক । চক্রবর্তী অনেক স্থলে ‘দাস’ সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার বাড়া কাটোয়া, ইনি গদাধরের শিষ্য ও চৈতন্য প্রভুর চরিতলেখক, ‘যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য ।—দীনপ্রতি চেষ্টা বৈছে না কহিলে নয় । বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসার্তিশয় ॥ যে রচিত গৌরঙ্গের অদ্ভুত চরিত । দ্রবে দাক পাষণাদি শুনি যার গীত ॥’—ভক্তিরত্নাকর ।

(১) শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্য প্রভুর পাণ্ডুর ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্তা । (২) জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, ইনিও এক জন পদকর্তা—ইহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্রাম ।

এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই পদকর্তা নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; এ বিষয়ে যাহারা তত্ত্বানুসন্ধান

\* কেহ কেহ বলেন, এই বলরাম মামুষ নহেন ; “জগন্নাথ বলরাম” তাহার জীবিকা সংস্থান করিয়াছিলেন ও তিনি তাহাদিগকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন বলিয়া “দুই পুত্র” কথা হইয়াছে ।

+ যদুনন্দন চক্রবর্তীর স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মী ; ইহার দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণী-দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন ।



নিযুক্ত, তাঁহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্ তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল । সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা বিশুদ্ধ নহে ; উহা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই ; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধারকার্য্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে ।

শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার তালিকায় বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা ১৫০, ও চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দেশ করিয়াছেন ; কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে বিদ্যাপতির ১৮৬টি পদ, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়েৎ সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১১৬টি পদ প্রদত্ত হইয়াছে ।

বৈষ্ণবযুগের চরিত-শাখা-সাহিত্য অতি সুবিস্তার ; বড় বড় মহাজন-গণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে ; এই ঐতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিষা প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্য্য ; শুধু ‘দাস’ শব্দের বাহ্য দ্বারা কাণ্ডিত বুদ্ধি হইয়াছে, এমত নহে, কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে “বিদ্যাবল্লভ” লিখিয়াছেন, \*

তালিকায় ভ্রম সম্ভাবনা ।  
নিজকে “দুঃখিনী” ও শিবানন্দ আপনাকে  
“শিবাসহচরী” নামে ভণিতা দিয়াছেন । †

সুতরাং জীলোকের নাম পাহলেই আমবা জীলোকশ্রেণীভুক্ত করিষা

পদকর্ত্তার পরিচয় দিতে সাহসী নহি । রসময়ী  
জীকবি ও মুসলমান  
কবিগণ । দাসী, মাধবী দাসী ও রামীর ভণিতায়ুক্ত পদ-

গুলি জীলোকের পদ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ  
করা গেল । আমরা তালিকাটিতে ১১ জন মুসলমান কবির নাম ও  
পদের উল্লেখ করিয়াছি ।‡

\* গীতিচিন্তামণি দেখুন ।

† পদকল্পলতিকা দেখুন ।

‡ প্রদত্ত তালিকায় ৩, ৭, ৯, ২২, ২৮, ২৯, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, সংখ্যক  
নাম দেখুন ।

পদকর্তাগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই ; বড় বড় কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই লুপ্ত জীবনী । পাওয়া যায় ; কবিগণের সুন্দর পদগুলি আছে, প্রকৃতির বাগানে কুসুমরাশির ত্রায় তাহারা অসংখ্য ; মানুষের হাতের সুন্দর রচনা ও তরুর ফুল ফুল একই নিয়মে উৎপাদিত । বৃক্ষ ও মানুষ উপলক্ষ মাত্র ;—আমরা প্রকৃত কর্তাকে না পাইয়া উপলক্ষে কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকি ; আপাততঃ এইরূপ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কবিগণের জীবনী না পাওয়ার ক্ষোভজনিত হঃখ হইতে সাহসনা লাভ করা বাউক ।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি । এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ । চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিত্র । চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাহার বাড়ী কুমারনগর ছিল ; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন । উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় পুনরায় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদেবী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বাড়ী করেন ।

গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃদ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকবি ছিলেন । রামচন্দ্রের বাঙ্গালা পদ পদ-কল্পলতিকায় আছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রসিদ্ধি লাভের উপযোগী কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই নাই, তাঁহার অন্তর্গদর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে ; শুনিয়াছি ‘বঙ্গজয়’ নামক মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার একখানি বড় ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ

আছে, আমরা তাহা পাই নাই । যাহা হউক, রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার সাময়িক বৈষ্ণব-সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করাতে তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্তমান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে । তিনি স্থায়ী কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরস্মৃদ্রুপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গালা লেখার চেষ্টা না করাতে তাঁহার স্মৃতি এখন প্রাচীন ইতিহাসেব অর্চিহিত পত্রে বিলীনপ্রায় ।

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, সারাবলী, অম্বরাগবলী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে ; দুঃখের বিষয়, ঐ সব বিবরণে তাঁহার জীবনের কতিপয় স্থল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায় । তাঁহার কবিতা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের স্নকুমারত্ব, ভাব-প্রবণতা ও অন্তঃজীবনের চিত্র ধারণা করিয়া লইতে হইবে । পূর্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিষা-বুধরীতে, ও বৃন্দাবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা পাচকের তত্ত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে অদৃশ হইয়া যাইতেছেন ; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো-প্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্বাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক চরিত জানি না ।

একুপ কথিত আছে, তিনি ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, তৎপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন ; তদনুসারে অনুমান ১১৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন । ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন । তিনি ঐষ্ট অবশিষ্ট জীবন, বৈষ্ণবসমাজের প্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ; উভয় ভ্রাতাই 'কবিরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাসের পদসমূহ কাঁচাগড়িয়ানিবাসী চৈতন্ত-সহচর

দ্বিজহরিদাসের পুত্র স্নায়ক ও পদকর্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদাস দ্বারা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সৰ্ব্বদা গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্র-প্রভু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় দিতেন । শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্থায় পদসংগ্রহকার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়, “নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে । করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ।”— (ভক্তিরত্নাকর ১৪ তরঙ্গ) ।

১৫৩৭ খৃঃ \* অন্ধে শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃঃ অন্ধে তাঁহার মৃত্যু হয় । তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ । ভাষায় রচিত পদ ছাড়া তিনি সংস্কৃতে “সঙ্গীতমাধব” নামক নাটক ও ‘কর্ণামৃত’ নামক কাব্য রচনা করেন । ভক্তিরত্নাকরে “সঙ্গীতমাধবের” অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায় । এস্থলে আর একটা কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটা পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় । শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের স্বকৃত টীকায় ইহার একটা সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

“বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লক্ষ্য শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কুহা পূর্ণং কৃতং ।”†

পূৰ্ব্ব এক পত্রে ৯ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি ; ইঁহার

প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন । পদ-  
বলরাম দাস ।

কর্তা বলরাম দাস উক্ত ৯ স্থলের অন্ততঃ ৪টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয় । প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস । ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি । পদকল্পতরুর কবি-বন্দনায় পদকর্তা বলরাম দাসকে “কবি-

\* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ (সাহিত্য ১২৯৯, আখ্যায়িক) ।

† এক কবির পদের সঙ্গে অল্প কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—“গোবিন্দদাস কহয় মতিমত্ত । ভুলল বাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ।” “রামদাসের পহঁ হৃদয় রসবর গৌরীদাস নাহি জানে । অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস গুণগানে ।”—(পদকল্পলতিকা) ।

নৃপবংশজ” (কবিরাজ) বলা হইয়াছে ; এই “বলরাম কবিরাজ” নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় “সঙ্গীতকারক” ও “নিত্যানন্দশাখাভূক্ত” বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন । প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাসও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দশাখাভূক্ত । সুতরাং পদকর্তা বলরামদাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে । \* বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী ; পদকল্পতক প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আত্মারাম দাস কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায় ।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায় ; বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে ( মাল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট ) জ্ঞানদাস । নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃগৃহ ছিল ; তাহার দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম ; তথায় ‘মঙ্গল ঠাকুরের’ বংশ বলিয়া একটি গোসাইবংশ আছে । এই বংশেই ১৫৩০ খৃঃ অব্দে জ্ঞানদাস জন্ম গ্রহণ করেন ; ইনি নিত্যানন্দশাখাভূক্ত ; শ্রীখেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন, দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতির সমকালিক কবি । কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব এবং সেই

\* “গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, ইঁহারা দুইজন এক ব্যক্তি নহেন । কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেমবিলাসের রচনা কুটিল । নরহরির নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের ভাষা সাদা সিধা গদ্যের স্থায়, কিন্তু তৎকৃত পদগুলি কবিত্বময় ; বৃন্দাবনদাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় না । আমরা এসম্বন্ধে প্রাচ্যেয় গৌরভূষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না ।” এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পাদটীকায় আমরা ইহা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি অচ্যুতবাবু আমাদেরিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ হইবার পূর্বেই আমার এই মত পরিবর্তন হয় । তৎপূর্বেই আমি নবভারত ১৪শ খণ্ড ৮ম সংখ্যায় (তোমার মতামুযায়ী) পদকর্তা বলরামকেই প্রেমবিলাস-প্রণেতা বলিয়াই জানি ।”

সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয় । গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; ইনি সুকবি ছিলেন । ইঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কদম্ব পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৬০০০ । কিন্তু মালিহাটির বৈদ্যবংশজ কবি যদুনন্দনদাস ( জন্ম ১৫৩৭ খৃঃ ) তাঁহা অপেক্ষা বেশী বশস্বী ।

যদুনন্দন দাস ও যদুনন্দন  
চক্রবর্তী ।

পদকল্পতরুর বন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—“অভুতচরণসরোরুহ-মধুকর জয় যদুনন্দন দাস ।” প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য ;

যদুনন্দন, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অক্কে ঐতিহাসিক ‘কর্ণানন্দ’ গ্রন্থ রচনা করেন ; গোবিন্দলীলামৃতের অনেক স্থলেও ইনি “শ্রীল হেমলতার” গুণ বর্ণনা করিয়াছেন । ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, যদুনন্দন ‘কর্ণানন্দ’ নামক ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘গোবিন্দলীলামৃত’ ও রূপগোস্বামীব ‘বিদগ্ধমাধব’ নাটকের পরারানুবাদ সঙ্কলিত করেন । কিন্তু পদকর্তা বলি-রাইট ইঁহার বংশ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম

‘প্রেমদাস’ ; ইনি নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে জন্ম  
প্রেমদাস ।

গ্রহণ করেন ; ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস ; ইনি গোবিন্দদেবের মন্দিরের (বৃন্দাবনে) পূজারি ছিলেন । ১৭১২ খৃঃ অক্কে ইনি বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন, তৎপর কর্ণপুরের ‘চৈতন্তচন্দ্রোদয়’ নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন । পদকর্তা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রসিদ্ধ

সূর্য্যদাস সরথেলের \* ভ্রাতা ; গৌরীদাসের  
গৌরীদাস ।

বাড়ী শান্তিপুুরের নিকট অম্বিকাগ্রামে ; ইনি চৈতন্তদেবের অনুচর ছিলেন, কথিত আছে, চৈতন্তদেবের স্বহস্ত-লিখিত গীতাগ্রন্থখানি ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল ।

\* ইঁহার দুই কন্যা বহুধা ও জাহ্নবীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন ।

ঈনি নিম্বকাঠে চৈতন্যবিগ্রহ গঠন করিয়া অম্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ ভক্ত সঙ্গোপকুলভূষণ শ্রামা-  
নন্দ নবদ্বীপভ্রমণকালে ইঁহাকে উক্ত বিগ্রহপূজায় নিযুক্ত  
দেখিয়াছিলেন । রায় বসন্ত নরোত্তমঠাকুর  
রায় বসন্ত ।

মহাশয়ের শিষ্য । ঈনি শেষ বয়সে বৃন্দাবন-  
বাসী হইয়াছিলেন । জীবগোস্বামীর পত্র লঠিয়া গোড়ে একবার শ্রীনি-  
বাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন ; ভক্তিরস্নাকরে উল্লিখিত আছে,  
“হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায় । পত্নী লৈয়া আইল তেঠো আচার্য্যসভায় ॥”—(১৪ তরঙ্গ) ।

এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্বার নরোত্তম-বিলাসে বন্দনা  
করিয়া লিখিয়াছেন, “জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায় । সদা মগ্ন রাখা কৃষ্ণ চৈতন্ত  
লীলায় ॥”—১২ বিলাস । সুতরাং ইঁহাকেই পদকর্তা ‘দ্বিজবসন্তরায়’ বলিয়া  
বোধ হয় । যশোহরনিবাসী কায়স্থ “রায় বসন্তের” নাম ইদানীং প্রব-  
ন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্তা সম্বন্ধে  
প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই । একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়, গোবিন্দ-  
দাসকবি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্তন করিতেছেন,  
কিন্তু রায়বসন্তের পদে প্রতাপাদিত্য কিম্বা যশোহরের কোন  
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ( ১৪৭৮—১৫৪০ খৃঃ অব্দ )  
মহাপ্রভুর একজন অনুচর ছিলেন ; ইনি নীলাচলে চৈতন্য-  
দেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন ; কথিত  
নরহরি সরকার ।

আছে, নরহরি চির-কৌমারব্রত পালন করেন ।  
নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন দাসের গুরু ও ‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচনার  
উপদেষ্টা ছিলেন । একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিগুহ  
গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল । নরহরি গৌরলীলার পদ-  
রচনার প্রবর্তক বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে আদৃত ; ইঁহার পথ অনুসরণ  
করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন । নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃঃ অব্দে

বহু রামানন্দ ।

শুণ্ড হন । বহু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ  
মালাধর বহুর পৌত্র ; ইনি দ্বারকা নগরী  
হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন । কথিত  
আছে, মহাপ্রভু ইঁহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন । সুপ্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ  
উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন উদ্ধতন  
রায় রামানন্দ ।

কৰ্ম্মচারী ছিলেন ; ইনি বিখ্যাত ‘জগন্নাথবল্লভ’  
নামক নাটক রচনা করেন ; চৈতন্যদেব ইঁহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যা-  
নগর গিয়াছিলেন । ইনি রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে  
প্রসিদ্ধ । ১৫৩৪ খৃঃ অব্দের মাঘমাসে রায় রামানন্দের তিরোধান হয় ।  
নরহরি চক্রবর্তীই পদকর্তা ঘনশ্যাম বলিয়া পরিচিত, কিন্তু “কবিশংসজ  
ভুবন-বিদিতবশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম ।” পদকল্পতরুর  
ঘনশ্যাম ।

এই শ্লোক দ্বারা জানা যায়, ঘনশ্যাম নামে অপর  
একজন পদকর্তা কবিরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি গোবিন্দ  
কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র ।

পীতাম্বর দাস যে রসমঞ্জরী সঙ্কলন করেন, তন্মধ্যে তাঁহার  
কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে । শ্রীচৈতন্যপ্রভু যে সময় নীলাচলে  
ছিলেন, তখন চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তাঁহার নিকট রথু-  
নন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন । চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ,  
তৎপুত্র গঙ্গারাম এবং তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীলামৃত-অনু-  
বাদকারক মদনরায়চৌধুরী ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রাম-  
গোপাল । রামগোপালের রসকল্পবল্লী পাওয়া গিয়াছে, উহা ১৬৪৩  
খৃঃ অব্দে বিরচিত হয়, এবং ইহার কিছু পরে রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর-  
দাস “রসমঞ্জরী” সঙ্কলন করেন । রসমঞ্জরীতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস  
প্রভৃতি পদকর্তাগণের পদই অধিকাংশ । সঙ্কলিত পদাবলী দৃষ্টে  
বোধ হয়, পীতাম্বরের রসবোধ ও পদ মনোনীত করিবার বিলক্ষণ শক্তি



କାଳିଦାସପଦ୍ମପୁଷ୍ପପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମ  
 ପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମ  
 ପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମ  
 ପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମ  
 ପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମପଦ୍ମ



ছিল। তাঁহার স্বকৃত পদগুলিও বৈশিষ্ট্যময়। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার পিতা গোপাল দাসের (রামগোপাল দাসের) পদ কিছু বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; ইহা পিতৃভক্তির পরিচায়ক, কিন্তু সাহিত্য-সেবীর পক্ষে সঙ্গত কার্য্য নহে। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে চণ্ডীদাসের দুইটি পদ (যথা, “ভাল হৈলা আরে বঁধু আইলা সকালে” ইত্যাদি ও “চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে” ইত্যাদি) তিনি পিতার ভণিতা দিয়া প্রচারিত করিয়াছেন \* ।

জগদানন্দ,—জাতিতে বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্ত খণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম পরমানন্দ, এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের সর্দানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক তিন সহোদর ছিলেন। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন, এবং জগদানন্দও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত ছবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অপরাপর বৈষ্ণবভক্তের ছায়া ইঁহার জীবন সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে। জগদানন্দ-পদাবলী-প্রকাশক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় তাহা বিস্তৃত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৭০৪ (১৭৮২ খৃঃ) শকে জগদানন্দ স্বগত হন। এতদুপলক্ষে তাঁহার নিবাসস্থান জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে জগদানন্দের অল্পসংখ্যক কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে।

যাঁহার শুধু ললিতশব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেকস্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবি-সম্প্র-

দায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন সন্দেহ নাই । হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে কবিতার নিভৃত স্থান এ কবিতা সে শ্রেণীর নহে ;—শুধু ললিত শব্দ-প্রাহেলিকায় শ্রুতিক্রমে অব্যক্ত সুখদান করাই, এ ভাবের কবিতার চরম লক্ষ্য ; কিন্তু যমক অলঙ্কার ও ‘ম’ কার, ‘ল’ কারের নিবিড় সমাবেশেই যে সর্বদা শ্রুতিসুখকর পদ হইতে পারে, জগদানন্দের পদ পড়িয়া আমরা তাহা বুঝি নাই । বহুতন্ত্রীতে অনভ্যন্ত স্পর্শজনিত উচ্ছৃঙ্খল ধ্বনির ত্রায় জগদানন্দের পদরাশি শ্রুতিক্রমে সুখদান না করিয়া অনেকস্থলে পীড়ন করে । কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই কবি স্থানে স্থানে জগদেবের মত সুন্দর শব্দ গ্রন্থনে সক্ষম হইয়াছেন ।

আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি, এই কবি ভাবী কবিগণের সাহায্যার্থ একটি যমক-অলঙ্কারের ধারা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তদ্বারা অনুমান হয় যে, জগদানন্দ আকাশের তারা কি বনের ফুল দেখিয়া অতি অনায়াসে কবিত্ব-মগ্নে দীক্ষিত হন নাই । তিনি এমি গলদবর্ষ হইয়া কবিতা রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ক একটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কবিগণের জ্ঞাত পন্থা নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন । “জগদানন্দের খসড়া” বলিত শব্দের বিপণি বলিয়া উল্লেখ করা যায়, পাঠক খসড়াখানি পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইবেন । ইহা প্রাচীন রীতি অনুসারে বঙ্গীয় ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র সঙ্কলনের প্রথম ও শেষ চেষ্টা । আমরা জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত খসড়া হইতে কিছু প্রতিনিধি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি ।

বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলীনিবাসী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন । ১৪০৬ শকে ( ১৪১৩ খৃঃ অব্দ ) চৈত্র মাসে পূর্ণিমা-দিনে বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন । তিনি বিশ্বগ্রামে শ্রীগোরাঙ্গ মূর্তি ও নবদ্বীপে ‘প্রাণবল্লভ’ নামে এক বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠিত করেন । তাঁহার দুই পুত্র, চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ । পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন ‘দীপাঙ্ঘিতা’ নামক ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন ।

বংশীবদনের পৌত্র ( চৈতন্ত দাসের পুত্র ) রামচন্দ্র একজন বিখ্যাত পদকর্তা । ইনি ১৪৫৬ শকে ( ১৫৩৪ খৃঃ ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে ( ১৫৮৩ খৃঃ ) মাঘ মাসের কৃষ্ণতৃতীয়াতিথিতে অপ্রকট হন । রামচন্দ্র জাহ্নবীদেবীর শিষ্য ছিলেন ; ইনি বুধুরীর সন্নিকটস্থ রাধানগরে বাস করেন । রাধানগরের নিকট বাঘাপাড়ায়ও ইঁহার আর এক বাটা ছিল । রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন দাস একজন পদকর্তা । তিনি ‘গৌরান্ধবিজয়’ নামক কাব্য প্রণয়ন করেন ।

পরমেশ্বরী দাস—ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন । ইঁহার বাড়ী কাউগ্রাম, ইনি জাতিতে বৈদ্য । ইনি জাহ্নবী ঠাকুরাণীর মঙ্গলশিষ্য ছিলেন ; এবং তাঁহার আদেশে ‘তড়া আটপুর’ যাইয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন, সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম ‘শ্রামশূন্দর’ হইয়াছে । ইনি কিছুদিন ‘গরলগাছা’ গ্রামে বাস করিয়া-ছিলেন । ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে ।

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে যদুনাথ আচার্য্যের পূর্বনিবাস ছিল শ্রীহট্ট বুরুঙ্গা গ্রামে ; ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র । ইঁহার উপাধি ছিল ‘কবিচন্দ্র’ । ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত । বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :—

“যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময় । নিরবধি নিত্যানন্দ খাঁহাকে সদয় ॥”

প্রসাদ দাস—বিষ্ণুপুরস্থ কঙ্কণাময় দাসের ( মজুমদার ) পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য ; ইঁহার উপাধি ছিল ‘কবিপতি’ ।

উদ্ধব দাস—অপর নাম কৃষ্ণকান্ত ; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন ; বাড়ী টেঞা ( বৈদ্যপুর ) ।

রাধাবল্লভ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, ‘কাঞ্চনগড়িয়া

গ্রামবাসী স্মৃধাকর মণ্ডল ও তৎপত্নী শ্রামাপ্রিয়ার পুত্র । রাধাবল্লভ, রঘুনাথ গোস্বামী কৃত বিলাপকুসুমাজলির বাঙ্গালা অনুবাদ করেন ।

রায়শেখর—প্রকৃত নাম শশিশেখর, অপর নাম চন্দ্রশেখর ; বর্দ্ধমান পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন-গোস্বামীর শিষ্য ও নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত । ইনি গোবিন্দদাসের পরবর্তী ।

পরমানন্দ সেন—বাড়ী কাঞ্চনপল্লী গ্রাম জাতিতে বৈদ্য । ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর শিবানন্দ সেনের পুত্র । ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পরমানন্দের জন্ম হয় । মহাপ্রভু ইঁহাকে ‘কবিকর্ণপূর’ উপাধি দিয়াছিলেন । ইনি ১৪৯৪ শকে ( ১৫৭২ খৃঃ ) সুরবিখ্যাত ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটক ও তাহার চারি বৎসর পরে ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’ প্রণয়ন করেন ; ইহা ছাড়া ‘আনন্দবৃন্দাবনচম্পু’, ‘কেশবাষ্টক,’ ‘চৈতন্যচরিত কাব্য’ প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন ।

বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দানন্দ—ইঁহারা তিন সহোদর, পূর্ব নিবাস কুমারহট্ট । কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে বাসুঘোষ জন্মগ্রহণ করেন । এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপ আসিয়া বাস করেন । গৌরানন্দ সম্বন্ধীয় পদাবলী রচকগণের মধ্যে বাসুঘোষ শীর্ষস্থানীয় । তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত ‘কীর্তনিনা’ ও মহাপ্রভুর অনু-রক্ত অনুচর ছিলেন ।

ধনঞ্জয় দাস—বর্দ্ধমান ছাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে বাড়ী । চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যানন্দপ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

গোকুল দাস—৪ জন । (১) জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্তনিনা । (২) কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীদাসঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য । (৩) বীরহাষিরের সমসাময়িক,

বনবিষ্ণুপুরবাসী গোকুলদাস মহাস্ত । (৪) ‘কবীন্দ্র’ উপাধিধারী ‘পঞ্চ-  
কোট সেরগড়বাসী গোকুল । ( ভঃ রঃ )।

**আনন্দ দাস**—জগদীশপণ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের  
নাম পাওয়া যায়, ইনি “জগদীশচরিত্রবিজয়” গ্রন্থ প্রণেতা । **কানুরাম**—  
ইনি শ্রামানন্দের শাখাশিষ্য ; ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত ।

**কৃষ্ণদাস**—পদকর্তাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাসের সংখ্যা অনেক ।  
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় পরে প্রদান করিব । অধিকা নিবাসী  
গৌরীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও একজন পদকর্তা ছিলেন ।

**কৃষ্ণপ্রসাদ**—“ত্রিগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয় । ত্রিকৃষ্ণ প্রসাদে ঠাকুর  
গর্ভার হৃদয় ।” ত্রিকৃষ্ণপ্রসাদ ত্রিনিবাস আচার্য্যের পৌত্র ছিলেন । গতি-  
গোবিন্দ—ত্রিনিবাস আচার্য্যের পুত্র, ইঁহার রচিত ‘বীররত্নাবলী’ নামক  
একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে । **গোকুলানন্দ সেন**—জাতি বৈদ্য,  
নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর ইঁহার নামান্তর বৈষ্ণব দাস । ইনিই প্রসিদ্ধ  
পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে  
জীবিত ছিলেন । **গোপাল দাস**—ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ।  
কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে যে ইনি একজন উৎকৃষ্ট কীর্তনিয়া  
ছিলেন । বাড়ী বুঁদইপাড়া । **গোপাল ভট্ট** গোস্বামী ( ১৫০০ হইতে  
১৫৮৭ খৃঃ ) ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শদ ছিলেন, বাড়ী কাবেরীতীরস্থ  
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ( দাক্ষিণাত্য ), ইনি পরিশেষে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন ।

**গোপীরমণ চক্রবর্তী**—ত্রিনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, বাড়ী বুধুরী ।  
গোবর্দ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য । রসিকমঞ্জল নামক গ্রন্থে ইঁহার কথা  
উল্লেখ আছে । **চম্পতি রায়**—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমু-  
দ্রের টাকায় লিখিয়াছেন “চম্পতিনাম দাক্ষিণাত্য-ত্রিকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজ  
কশিৎ আসীং স এব গীতকর্তা” **দৈবকীনন্দন**—ইনি শ্রীগোরাঙ্গদেবের সময়ে  
বর্তমান ছিলেন । বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতি ইঁহার কার্য্য ছিল । দৈবকী-

নন্দন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ‘বৈষ্ণববন্দনা’ রচনা করিতে আদিষ্ট হন । ইনিও ‘বৈষ্ণববন্দনা’ গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন ।

**নরসিং দেব**—“নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয় । দূরদেশ পকপল্লী বার রাজ্য হয় ॥” প্রেমবিলাসে—“কমলললিত চরণ কমল মধু পাওয়ে সেই হুজান, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অহুমান ॥” **নয়নানন্দ**—গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র, চরিতামৃতে ইঁহার উল্লেখ আছে । **প্রসাদ দাস**—বিষ্ণুপুরবাসী কক্কাণাময় দাসের পুত্র, ইঁহাদের কোলিক উপাধি মজুমদার । আচার্য্য প্রভুর সমকালিক উপাধি—কবিপতি । **মাধো**—নীলাচলের লোক, শ্রামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য । (রসিকমঙ্গল গ্রন্থ ১৪৩ পৃষ্ঠা) **রসিকানন্দ**—নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র, শ্রামানন্দের শিষ্য । জন্ম ১৫৯০ খৃঃ । **রাধাবল্লভ**—সুধাকরমণ্ডলের পুত্র, আচার্য্য প্রভুর শিষ্য । **হরিবল্লভ**—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নামান্তর । কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার গুরু কৃষ্ণচরণের নামান্তর, হরিবল্লভ তাঁহার গুরুর নামেই পদের ভণিতা দেন । যাহা হউক ঐ ভণিতাব্যুক্ত পদ যে চক্রবর্তীমহাশয় কৃত, তাহা সর্বসম্মত । তিনি ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’ নামে একখানি পদ গ্রন্থ সংকলন করেন । চক্রবর্তী-কৃত ২৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে । ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তিনি ‘সারার্থ-দর্শিনী’ নামে ভাগবতের টীকা রচনা করেন, ইহাই তাঁহার শেষ ও সর্ব-প্রধান কীর্ত্তি । এই সকল পদকর্ত্তা ছাড়া বনবিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা বীরহাম্বির \* ও নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগ্নী প্রসিদ্ধ ৩২ রসিক ভক্তের ২ জন—মাধবীর—পদও পাওয়া গিয়াছে ।

---

\* ভক্তিরসাকরে ইঁহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।



এস্থলে বলা উচিত, ষাঁহার বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথবা ষাঁহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী স্মরভিময়, যথা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন-দাস ও নরহরিচক্রবর্তী প্রভৃতি গ্রন্থকার ও শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,—ঐহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে ।

এই যুগের পদকর্তাগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন ; এই দলে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বসন্ত, বহনন্দন, বংশীবদন এবং বাসুঘোষ শ্রেষ্ঠ । বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন অস্ত্রভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে ; ভক্তির সঙ্গে নিশ্চলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গাঢ়তার হ্রাস হয় ; প্রেমেতে অঙ্কিত মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত মূর্ত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, স্মৃতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্ভিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয় । ভক্ত ঐহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, প্রেম-কের মত ঐহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই—কিন্তু আত্মসমর্পণের ইচ্ছা আছে । নিম্নোক্ত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্তার কথা বেশী আছে :—

“ষাঁহা পঁহ অঙ্গ চরণে চলি যাত । ঐহা ঐহা ধরণী হইএ মঝু গাত ॥ যো সরোবঃের পঁহ নিতি নিতি নাহ । হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ যো দরপণে পঁহ নিজ মুখ চাহ । মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ যো বীজনে পঁহ বীজই গাত । মঝু অঙ্গ তাহি হোই যুহুবাৎ ॥ ষাঁহা পঁহ ভরমই জলধর শ্যাম । মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥ গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি । সো মরকত তম্বু তোহে কিএ ছোড়ি ॥”

বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণাদ্রব্য নহে । দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম, দানেই

বৈষ্ণব কবির প্রেম ।

এ প্রেমের স্বথ ; প্রতিদান চাহিয়া এ বিপ-  
গিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না, ফুলের  
সুরভি বিনা মূল্যে বিতরিত হয় ; টাদের জ্যোৎস্না, মলয় সমীর ক্রয়  
বিক্রয়ের সামগ্রী নহে ; প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্তু  
শাল বনাতে মত তাহার মূল্য নাই ; বনের কুন্দ, যুথি, জাতি, গৃহ-  
সুন্দরীগণ হইতে কম সুন্দর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না ;  
এ প্রেমও তেমনই অমূল্য । স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ভরে  
উন্মত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,—

“মো যদি সিনান লাগিল। ঘাটে, আর ঘাটে পিয়া নায় । মোর অঙ্গের জল, পরশ  
লাগিয়া, বাহ পশারিয়া রয় ॥ বসনে বসন লাগিবে বলিয়া, একই রজকে দেয় । আমার  
নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয় ॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, কিরয় কতই  
পাকে । আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে ॥ মনের কাকুতি  
বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে । পায়ের সেবক রাঘশেখর কিছু জানে অনুমানে ॥”

এই অপূর্ব ব্রতের এই অপূর্ব কথা । পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভালবাসার  
সাহিত্য ।

প্রেম ও সৌন্দর্য্যপূজার পূর্ণপ্রভাব দেখা  
দিয়াছিল ; বিরল-দ্রুম নগর-রাজিতে বসন্তের  
সৌষ্ঠব এখন বিকাশ পায় না ; এখন বসন্ত

বনে আসে—কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশল্যের জন্য, বনকুরঙ্গ ও কুরঙ্গীর  
জন্য ; মনুষ্য-সমাজে এখন বিজ্ঞানের নীরস শীত-বায়ু কবিত্বের ফল-পল্লব  
সংহার করিয়া সত্যের অস্থিপঙ্কর দেখাইতেছে ; এখনকার প্রেমের  
কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর স্মৃতিমাে পর্য্যবসিত ; সেরূপ মধুর কথা  
এখন আর লিখিত হইবে না ; সেই স্বপ্নময় চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শীতল  
নীহারিকাজড়িত হইয়া এখন চির অম্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই ফুলতর-  
পল্লবগুচ্ছমণ্ডিত পৃথিবী পূর্বেও যেরূপ এখনও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর  
আছে—কিন্তু আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি ।

পদকর্তাগণের মধ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন,  
 তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছা-  
 বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ।

সের অপ্রস্তুট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে ; মৈথিল  
 কবির পদে অনুভবের তীব্রত্ব ও উদ্দীপনশক্তি বেশী, কিন্তু গোবিন্দের  
 পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিত্ত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি  
 হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন, কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব গোবিন্দ-  
 দাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদর্শ ; জ্ঞানদাসের কতক-  
 জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস ।

গুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গা ; তাহা মিষ্টত্বে  
 মনোহর ও ভাবসম্বন্ধে মূলের দ্বিগুণ কৌণ  
 প্রতিচ্ছায়া বলিয়া গ্রহণ করা যায় ; জ্ঞানদাসবার্ণত নায়কের প্রেম-  
 বিকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই  
 নিখিল অশ্রুজলে উজ্জল হইয়াছে। বলরামদাস কাহাকেও আদর্শ  
 করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, চণ্ডীদাসের  
 বলরাম দাস ও চণ্ডীদাস ।

তাহার ইহার কবিতা যেন স্বভাবের সংস্করণ,  
 চণ্ডীদাসের তায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্তু ততদূর গভীর নহেন। তাঁহার  
 পদ সরল প্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞান-  
 দাস ও বলরাম দাসে শক্তির পার্থক্য আছে ; সে ক্রমে এই সমালো-  
 চনা লিখিত হইল—এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা কেশপ্রমাণ ।

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ কবেন, বাবা আউল মনোহর-  
 দাস ; হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি  
 পদাবলী সংগ্রহ ।

আছে ; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু  
 ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন ; ইঁহার রচিত  
 সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র । \* খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ

\* পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল ; কলি-  
 কাতার কোন দোকানদার ২০০০, টাকা হুগলী এই গ্রন্থস্বয়ং খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন,

সঙ্কলিত হয় । ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০ ; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যব-  
হিত পরেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র  
সঙ্কলন করেন । ইহার যে “মহাভাবানুসারিণী” নামক সংস্কৃত টিপ্পনী  
তিনি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয়  
আছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণব-  
দাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন । পদকল্প-লতিকা গোবিন্দমোহনদাসকৃত ;  
গীতচিন্তামণি হরিবল্লভকৃত ; গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবর্তিকৃত ; পদচিন্তা-  
মণিমালা প্রসাদদাসকৃত ; রসমঞ্জরী পীতাম্বরদাসকৃত ; ইহা ছাড়া লীলা-  
সমুদ্র, পদার্থবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহ-  
গ্রন্থ আছে ।

পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ,—রিচার্ডসনের সিলেক্সনের ত্রায় । ছাপা

হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে  
পদ-সমুদ্র, পদামৃত, পদকল্প-  
লতিকা, ও পদকল্পতরু ।  
পারে । রাধামোহনঠাকুরের সংগ্রহপুস্তকের

অনেকাংশ তিনি স্বকৃত পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া-  
ছেন, কতকগুলি বাঙ্গালা পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে  
প্রদত্ত হইয়াছে । গোবিন্দমোহন দাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল  
পদ মনোনীত করিবার শক্তি ইহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশও বড়  
সুন্দর হইয়াছে । কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা সুললিত  
শব্দবিশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্র ; মাত্র ৩৫১  
পদে সম্পূর্ণ । মোটের উপর বৈষ্ণবদাসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার  
পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । ইহার পদসংখ্যা ৩১০১ ; পদামৃতসমুদ্র ইহা হইতে

কিন্তু ভক্তিবিধি মহাশয় তাহা দেন নাই ; বৃদ্ধবয়সে তিনি এই পুস্তক নিজের তত্ত্বাবধানে  
ছাপাইয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয়  
তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন নাই । এ সম্বন্ধে আরও একটু  
বক্তব্য আছে, আমার অজ্ঞানপদ কয়েকজন সাহিত্যিক বরু এই পুস্তকের অন্তিভে  
সন্নিহান হইয়াছেন—সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করা নিম্পয়োজন ।

অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০টিরও অধিক স্বকৃত পদ, দিয়াছেন, বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বকৃত পদ দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদও বন্দনাত্মক, সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য। বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫; চতুর্থ শাখায় ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন্ পল্লবে কত পদ তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নির্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; বৈষ্ণবদাস তৎকৃত সূচিপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখার ২৬ পল্লবে বিদ্যাপতি ৩ চণ্ডীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বর্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও কয়েক স্থল স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। সূচীনির্দিষ্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ঐতিহাসিক, হিন্দুস্থানবাসিগণের তাহা গুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর আদ্যস্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমারের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তজ্জালসতা দৃষ্ট হয়—এটি একটি প্রবাদ বাক্য; বৈষ্ণবকবিগণের পদগুলিও সর্বত্রই প্রতিভাপ্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ ছুট; কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতিপত্রেই এমন ছু একটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্‌দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন, পাঠক সেই সকল পদে প্রেমের নানাকূপ লীলা-সরস চিত্রলেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাট, দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্বে লিখিয়াছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার

বিজ্ঞান । ভালবাসারহস্তের একরূপ গূঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই । লতা যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে । প্রেমের নানা লীলা হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সূত্র রচনা করিয়াছেন ; অলঙ্কারগ্রন্থে ৩৬০ রূপ নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে ; এই ভেদপ্রকাশকসূত্রে এক একটি চিত্র নির্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন ; এই সূত্রগুলি অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের স্থায় কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই ; যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছেন, এই চিত্রখানি প্রাগল্ভ্যের : তমালকুঞ্জে অধীর নায়িকা প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকম্পনে আশ্রিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে এই চিত্রের নাম বাসকসজ্জা ; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হইতেছে, তখন বিশ্রলক্কা ; মানিনী—খাণ্ডাত্য বিষাদ ও রোষ-ক্ষোভা ; প্রোষিত ভর্তৃকাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রু-জলে মগ্ন ; এখানে নায়িকার মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, কারণ—“বা কাষ্ঠায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী।”—এইরূপ আরও অসংখ্য সূত্র আছে ।

বঙ্গীয় পদসমূহে এই সব লীলাময় ভাব ভক্তি-বিধূত হইয়া স্বর্গীয় ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখনুখ গতি ও নিষ্কাম আবেগ বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্র ।

বলা নিম্প্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুলি পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সঙ্গবিন্ধ হইয়াছে । আমরা এস্থলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহনৈপুণ্যের কিছু

নমুনা দিতেছি ; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক  
সংগ্রহ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত ।

নানা কবির পদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া  
কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন,—বিশ্বাস কৌশলে একখানি

সম্যক্ভাবে চিত্র কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, নানা কবির তুলি দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে ;—

### মুরলী শিক্ষা ।

কামোদ । বহুদিনের সাধ আছে হরি । বাজাইব মোহন মুরলী । তুমি লহ মোর নীল সাড়ী । তব পীত ধড়া দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি । মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ ঝাঁপা গোঁপা লহ থসাইয়া । মোরে দেহ চুড়াটি বাঁধিয়া ॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে । তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ করুণ কেউড়ি । তোড় তাড় বালা দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর আভরণ । মোরে দেহ তোমারি ভূষণ ॥ শুন মোর এই নিবেদন । শুনি হরষিত বৃন্দাবন ॥ ১ ॥

কানোড়া । মুরলী করাও উপদেশ । যে রঞ্জে, যে ধ্বনি উঠে জ্ঞানহ বিশেষ ॥ কোন্ রঞ্জে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম । কোন্ রঞ্জে রাধা বলি লয় আমার নাম ॥ কোন্ রঞ্জে, বাজে বাঁশী স্তললিত ধ্বনি । কোন্ রঞ্জে কেঁকা শব্দে নাচে ময়ূরিনী ॥ কোন্ রঞ্জে, রসালে ফুটয় পারিজাত । কোন্ রঞ্জে, কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥ কোন্ রঞ্জে, বড়ঞ্চতু হয় এক কালে । কোন্ রঞ্জে, নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥ কোন্ রঞ্জে, কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় । একে একে শিখাইয়া দেহ শ্রাম রায় ॥ জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি । ‘রাধা মোর’ বলি বাজিবেক বাঁশী । ২ ॥

কামোদ । কোঁতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা । মদনমোহন মনোমোহিনীর সাধা ॥ প্রেমরঞ্জে শ্রাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া । মুরলী পূরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ বিনা ভঞ্জে, বিনা মস্ত্রে কত ফুক দেই । বাজে বা না বাজে বাঁশী পিয়া মুখ চাই ॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী । পাণি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি ॥ কান্ত কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে । দুহকরুণ দেখি শিবানন্দ ভায়ে ॥ ৩ ॥

বেহাগ । আজু কে গো মুরলী বাজায় । এত কভু নহে শ্রাম রায় ॥ ইহার গৌরবরণে করে আলো । চুড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল ॥ তাঁহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু । এত নহে নন্দ-সুত কান্ত ॥ ইহার রূপ দেখি নবীন আরতী । নটবর বেশ পাইল কতি ॥ বনমালা গলে দোলে ভাল । এনা দেশ কোন্ দেশে ছিল ॥ কে বানাইল হেনরূপ থানি । ইহার বাসে দেখি চিকণ বরণী ॥ নীল উয়লী নীলমণি । হবে বুঝি ইহার স্মরণী ॥ সখীগণ করে ঠারঠারি ॥ কুঞ্জে ছিল কান্ত কমলিনী । কোথা গেল কিছুই না জানি ॥ আজু কেনে দেখি

বিপরীত । হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে । একপ হইবে কোন্ দেশে ॥ ৪ ॥ \*

পদের অতল রত্নাকর হইতে নানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত এই চারিটি রত্নের উদ্ধার করিয়া একরূপ সুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি উৎকৃষ্ট মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য ।

পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি ; বঙ্গদেশের  
 বঙ্গীয় গীতি-কবিতার  
 শ্রেষ্ঠত্ব ।

ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন এ-টি গীতির আয় ; এদেশের গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা ; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতি পথে ধাবিত, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত ; সে দেশে নরনারী জীবন নাটকীয় চরিত্রেব গৃঢ় সৌন্দর্য্য ও মহত্ব বাক্ত হয় , রামায়ণে ও মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইকপ চরিত্র প্রতিবিস্তিত হইয়াছিল । কিন্তু অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রুই সম্বল ; সেই অশ্রু কখনও দুঃখজাপক হইয়া মনুষ্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গীতি-কবিতার মূহ উপাদানের মধ্যেও একরূপ মহত্ব ও সৌন্দর্য্য ছায়া দেখাইতে পারে, বাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার হয় না,—সে দুঃখ ধনাঢ্য-দুঃখ নামে বাচ্য হইবার যোগ্য হয় ।

এই গীতিকবিতাগুলি আমরা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য-প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি ;—আন্তঃগরিমার রাজ্যের অধিবাসী-বৃন্দকে আন্তঃবিসর্জনের কথা শুনাঠয়া মুগ্ধ কবিতা পারি ।

\* প্রথম পদে ( বৃন্দাবন-বৃত্ত ) রাধিকা হরির নিকট বেশ পরিবর্তন ও বংশীবাদনের অনুমতি চাহিয়াছেন, দ্বিতীয় পদে ( জ্ঞানদাস বৃত্ত ) বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ, কিন্তু রাধিকা বাঁশী বাজাইতে পারেন নাই এতদ্বারা তদুপদেশ চাহিয়াছেন, তৃতীয় পদে ( শিবানন্দবৃত্ত ) কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী বাজাইতে শিক্ষা দিতেছেন । ৪র্থ পদে ( চণ্ডীদাসবৃত্ত ) রাই কান্দু ও কান্দু রাই সাজিয়াছেন, তখন বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ ও রাধা স্থললিত স্বরে বাঁশীতে স্বস্তার দিতেছেন এবং ঋষীগণ চিনিতে না পারিয়া “আজু কি গো মুরলী বাজায়” প্রতৃতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।



## চরিত-শাখা ।

(ক) গোবিন্দদাসের করচা ।

(খ) জ্ঞানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ।

(গ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত ।

(ঘ) ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি ।

( ক ) গোবিন্দদাসের করচা ।

মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার  
প্রথা প্রবর্তিত হয় । মনুষ্য নৈসর্গিক চরিত্র  
চরিত-রচনাপ্রবর্তন ।

এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে পড়িয়া  
উপেক্ষিত ছিল । তাই চৈতন্যদেবের পূর্বে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত  
বর্ণনা ভিন্ন অল্প কিছুই অবতারণা হয় নাই । মহাপ্রভু নিজের জীবন দেখা-  
ইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্য-লীলার সৌন্দর্য্যপাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মনুষ্য  
শাস্ত্র হইতে মহত্তর । পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত  
হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে ।

চরিত-সাহিত্যের হ্রস্বপাত হইল ; বঙ্গদেশীয়গণ পৌরাণিক  
চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষী শক্তির বিষয়  
মনুষ্যত্বের প্রতি উপেক্ষা ।  
অবগত হইয়া মনুষ্য-স্বভাবগুণের প্রতি অবহেলা  
করিতে শিখিয়াছিল ; দয়া, ভক্তি এবং সরলতা, প্রভৃতি গুণই প্রকৃত  
পুঞ্জীয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাটত্ব বা বহুলত্ব প্রকৃত শোভা কিংবা  
মহত্ত্ব দান করিতে পারে না—একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল  
করিয়া বুঝে নাই ; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাঁহার  
চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ-  
শিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ চৈতন্যদেবের জীবনের অতি-

মানুষিক প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই।\* সে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের  
জন্ত সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার

সঙ্গীগণের কেহ কেহ করচা বা নোট রাখিয়া  
চৈতন্যজীবনী।

গিয়াছিলেন, সেই নোট ও জনশ্রুতি অবলম্বনে  
এবং তাঁহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃন্দাবনদাস  
চৈতন্যভাগবতের আয় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতা-  
মৃতের আয় অপূর্ণ ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন।  
নোট গুলিকে সাবেকী বাঙ্গালায় “করচা” বলিত; ইহাদের মধ্যে মুরারি-  
গুপ্তের করচাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহা সংস্কৃতে লিখিত, স্মৃতরাং  
এ পুস্তকে উল্লেখযোগ্য নহে।

করচা-লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দদাস একজন। তিনি উচ্চ-শিক্ষিত  
গোবিন্দের করচার  
প্রামাণিকতা।  
ছিলেন না; সে ছই বৎসরের বৃত্তান্ত লইয়া  
তিনি পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সে ছই বৎসর  
তিনি দিবারাত্রি মহাপ্রভুর পরিচর্যা করিয়া-  
ছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার লেখায় এমন একটু  
সারল্যমাখা সত্য-প্রিয়তা আছে, বাহাতে করচাখানা ফটোগ্রাফের আয়  
সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য বর্ণিত ঐতিহাস কখনও

\* ১০০ বৎসর হইল কবি প্রেমানন্দদাস চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে গাঙ্গুলী যে সব  
প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইসব প্রমাণসহ কবির সহস্রলিখিত কাগজ  
খানি আমি পাইয়াছি; তাহার কতকংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—বামনপুরাণে বাসু প্রাতি  
শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—“অহমেব কচিৎপ্রক্কা সন্ন্যাসাশ্রমমাপ্রতিঃ। হরিতত্ত্বিঃ গ্রাহয়িষে’ কলৌ  
পাপহতান্নরান্।”—বায়ুপুরাণে “দিবিজাভূষিজায়কং জায়কং ভক্তিরূপিণঃ। কলৌ  
সংকীর্ণনারস্তে ভবিষ্যামি শতীহতঃ।” মৎস্যপুরাণে,—“শুকগৌরঃ স্তদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীর-  
সমুদ্রবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিযুগে।” এইরূপে গরুড়পুরাণ, কুর্ম্মপুরাণ,  
বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্বল্পপুরাণ, বায়্যাকিপুুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহৎসামল প্রভৃতি অনেক  
পুরাণের নাম করিয়া লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এসব প্রেমানন্দদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত  
পুরাণগুলির নবসংস্করণে সেগুলি খুঁজিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায়ী করিবেন না।

পূর্ণ ও অবিসম্বাদিতভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের করচা অনেকাংশে প্রামাণিক ঐতিহাসিক-গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ।

এই পুস্তকের রচনা নানাবিধ গুণায়িত ; যাহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাস উজ্জ্বলিত অশ্রুসিক্ত করচায় চৈতন্যের চরিত্র । অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার একপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আব কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই । বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই ; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও করচা-গুলির সাহায্যে তাঁহার মহিমায়িত চরিত উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাধুবী অনুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন ; তাঁহার করচা স্বভাব হইতে এক পর্যায় অন্তরে, কিন্তু উপরোক্ত চরিতগুলি স্বভাব হইতে দুই বা বহুপর্যায় দূরে ; জয়ানন্দ মহাপ্রভুকে দেখিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত চরিতাখ্যান ও গোবিন্দের করচার ত্রায় চাক্ষুষ ঘটনার ইতিহাস নহে । গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, তাহা পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কৃত্রিম বা রূপান্তরিত হয় নাই । অশিক্ষিত সৰল ভূত প্ৰভব খড়ম দুইখানা স্বন্ধে করিয়া কিছু প্রসাদ ভক্ষণের লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন ; তিনি বাগ্‌দেবীর বরে চির-যশস্বী হইয়া বাস ও বাম্বীকির লেখনীর উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কারের ভাব তাঁহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য পরাভূত করিতে পারে নাই ; আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি ।

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্রামদাসকৰ্ম্মকারেব পুত্র

গোবিন্দকৰ্ম্মকার জীবিতকালে ‘মুখ্য’ ‘নিগুণ’

প্রভৃতি ছদ্মনামে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে

গৃহতাগী হন । পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্ধে চৈতন্তদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, স্তত্রাং সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদধিক একবৎসর পূর্বে গোবিন্দ চৈতন্তপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভু স্নানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইল ।

“কটিতে গামছা বাধা অপূর্ব দর্শন । সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন ॥ \* \* \* অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোসাই । এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই ॥ পক কেশ পক লাড়ী বড় মোহনিয়া । দাড়ী পড়িয়াছে তার জদয় ছাড়িয়া ॥ \* \* \* আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিলু । রূপের ছটায় মুগ্ধি মোহিত হইলু ॥ \* \* \* ঘাটে বসি এই লীলা হেরিছু নয়নে । কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥ কদম্বকুম্ভ সম অঙ্গে কাটা দিল । ধরধরি সব অঙ্গ কাপিতে লাগিল ॥ ঘামিয়া উঠিল দেহ, তিতিল বসন । ইচ্ছা অঞ্জনলে মুগ্ধি পাপালি চরণ ॥”

প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন । গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথায় নূতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয় ;—চৈতন্ত-প্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে :—

“গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর । পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর ॥ \* \* \* শাস্তবুদ্ভি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায় । নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায় ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর বরণী । প্রভুর সেবায় বাস্ত দিবস রজনী ॥ লজ্জাবতী বিনয়িনী মুছ মুছ ভাষ । মুই হইলান গিয়া চরণের দাস ॥”

গোবিন্দের করচা হইতে আমরা চৈতন্তদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংকলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম । পাদটাকায় আমরা স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া ষাইতেছি ।

কন্টকনগর ( কাঁটোয়া ) হইতে বর্দ্ধমান ; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের

চৈতন্তের ভ্রমণ ।

জৌ তাহাকে কিরাইয়া লইতে আসে ; দামো-

দর নদ পার হইয়া কাশীমিত্রের বাটীতে

অবস্থান ; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে ; এস্থলে :

কেশবসামন্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কট্টক করে ; মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, স্রবর্ণরেখা পার হইয়া হরিশ্রপুর্ন হইতে বালেশ্বরে, সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন, নিংরাঞ্জের ( লিঙ্গরাজের ) অন্তর দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের স্বজা দর্শনে চৈতন্তপ্রভুর উন্নতাবস্থা, পুরীগমন । ৩ মাস কাল পুরীতে অবস্থানের পর, ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ চৈতন্তপ্রভু দক্ষিণাত্য-ক্রমণে বহির্গত হন ।\* পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন ।† তথা হইতে ত্রিমন্দনগর † গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রাবাসী চুণ্ডি-রামতীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্তিত করেন । ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে গমন করেন, ‡ এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সতাবাই ও দক্ষীবাই নামক বেঙ্গোদয় দ্বারা চৈতন্তপ্রভুকে প্রণয় করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাঁহার প্রভাবে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপরে মুন্নানগরে § গমন,

\* চৈতন্যচরিতামৃতও লিখিত আছে, চৈতন্যদেব গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে ; রাজকাষোপলক্ষে রামানন্দের গোদাবরীতীরে থাকা সম্ভব । পুরী হইতে গোদাবরী অনেক দক্ষিণে । এই দুইএর মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ চৈতন্যদেব অতিক্রম করেন, করচাম তাহা নির্দিষ্ট নাই । গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জানা যায় না ।

- † ‘ত্রিমন্দ’ শিলির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে ‘ত্রিমদ’ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে উহা ‘ত্রিমন্’ বলিয়া অভিহিত ; বেকট-ভট্ট ও ত্রিমন্ভট্ট দুই সহোদরের নাম অনেক বৈক্য গ্রন্থই পাওয়া যায়, বেকট ও ত্রিমন্ দুইটি নিকটবর্তী স্থানের নামানুসারেই ত্রাতৃদয় উক্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকিবেন ; ‘‘ত্রিমন্’’ প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয় ; উহা হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক ‘‘ত্রিমন্ঘেরী’’ বলিয়া বোধ হয় ।

‡ সিদ্ধবটেশ্বর ( ‘সিদ্ধবটেশ্বরম্’ ) কডল্লানগরের নিকটবর্তী ও পান্নার মদীর তীরস্থ ।

§ মুন্নানগরের নাম পোষ্টালগাইডে পাইলাম না ; বড় ও ভাল মানচিত্রে মূর্ণা নামক

মুন্না হইতে বেস্কটনগরে \* শেষোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বঙ্কলাবনে পঞ্চভিল নামক দম্মাকে ভক্তিদান করেন, তৎপর এক বৃক্ষতলে ৩ দিবস হরিনাম করিতে করিতে উন্নতাবস্থায় কর্তন, তৎপর গিরীশ্বরে দুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে, † তথা হইতে পানানরসিংহদর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে‡ গমন এবং তথা হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ,— তৎপর § চাইপল্লীনগরে, সেস্থান হইতে নাগরনগরে ¶ ও নাগর হইতে তাঞ্জোরে†† গমন করেন, তথা হইতে চণ্ডালু পৰ্বত পার হইয়া পদ্ম-

নদী মাদ্রাজের নিকটে দৃষ্ট হয়; এই নদীর তীরে মুন্নাগ্রাম অবস্থিত ছিল ( হয়তঃ এখনও আছে ) বলিয়া বোধ হয় ।

বেস্কট নগর পাওয়া গেল না; বোধের নিকটে এক বেস্কট নগর আছে, কিন্তু ইহা সে “বেস্কট” কখনই হওয়া সম্ভব নহে : এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্বত্রই পাওয়া যায় : এই করচানিদ্ধিষ্ট ত্রিপাত্র নগর ও নাগরনগর আমরা দুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি; বেস্কটনগর ও মুন্না নগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকি সম্ভব : এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল । গিরীশ্বর ও ত্রিপদীনগরের নিকটবর্তী বলিয়া বর্ণিত আছে ।

+ ত্রিপদী নগর হইতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়; পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না, এবং অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্যদেবের পরবর্তী পর্য্যটনের সঙ্গে বর্তমান মানচিত্রের রেখায় রেখায় মিল পড়িয়া যাইতেছে । ত্রিপদী নগর মাদ্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে ।

‡ পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য “বিষ্ণুকাঞ্চীপুরে” গমন করেন, ইহা আধুনিক “কাল্পিত্রম” ( কাঞ্চীপুরম্ ); কাল্পিত্রম ত্রিপদী হইতে . প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে ।

§ কাল্পিত্রম হইতে চাইপল্লী ( আধুনিক ত্রিচিনপল্লী অথবা ত্রিচাইপল্লী ) প্রায় ১২৫ মাইল দক্ষিণে ।

¶ ত্রিচাইপল্লী হইতে নাগরনগর ১৪৫ মাইল পূর্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত । বোধের উল্লকুল তুঙ্গনদীর তীরবর্তী এক নাগরনগর ( বেদমুরের সমীপবর্তী ) আছে, ইহা সেই স্থান নহে ।

†† তাঞ্জোর,—নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে :

কোটে,\* তার পর ত্রিপাত্র নগরে,† সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন । ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়, জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধাম ‡ নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করেন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথ নগরে ¶ ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন । তথা হইতে মাধবীক-বনে প্রবেশ করেন ও তাত্রপর্ণী পার হইয়া কত্মাকুমারীতে উপস্থিত হন । কত্মাকুমারী হইতে “ত্রিবন্ধু”§ দেশে প্রবেশ করেন ; এই দেশ পর্বতবেষ্টিত ও ইহার সেই সময়ে রাজা রুদ্রপতি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ বালয়া বর্ণিত হইয়াছেন । ত্রিবন্ধু হইতে পয়োক্ষী \*\* নগরে, তথা হইতে মৎস্ততীর্থ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে ++ গমন করেন । চিতোল হইতে চণ্ডপুর, গুর্জরীনগর, †† ও পরে পূর্ণনগরে §§ প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন ‘দাক্ষিণাত্যের নবদ্বীপ’ অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থান ছিল । পূর্ণনগর হইতে পাটন নগরে, তথা হইতে জেজুরীনগরে গমন করেন ; এই স্থলে ষাণ্ডবা-দেবের পরিচারিকা অভাগিনী মুরলীদিগের বিবরণ দেওয়া আছে । তৎপরে

\* পদ্মকোট—তাঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ ।

† ত্রিপাত্র—পদ্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ ; পদ্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক ‘ত্রিপাত্র’ নগর আছে ; ইহা সেটি নহে ।

‡ রঙ্গধাম,—ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম্, ত্রিপাত্রের দক্ষিণপশ্চিমে ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গ-পট্টম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ( ৭৬ পৃষ্ঠা ) কিন্তু, শ্রীরঙ্গপট্টম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে ; পরবর্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রীরঙ্গম্কেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয় ।

¶ রামনাথ—সমুদ্রের উপকূলে, রামেশ্বরের অতি নিকটে ।

§ ত্রিবন্ধু—ত্রিবাঙ্কুর ।

\*\* পয়োক্ষী—আধুনিক পনানি ।

++ চিতোল বেধ হয় আধুনিক চিত্রলদুর্গ, ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে ।

†† গুর্জরী—গুজরাত নঃ, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিকটে ।

§§ পূর্ণ—পূর্ণা ; এখনও তন্নিকটবর্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে ।

চোরানন্দী বনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণদম্পত্যকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্রবর্তিত করেন ; মুলানদী পার হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিষক ও দমন-নগর এবং তাপ্তীনদী অতিক্রম কবিয়া ভঁরোচ নগরে \* প্রবেশ ; ভঁরোচ হইতে বরদা, তথায় নারোজীর মৃত্যু, আহমদাবাদের ঐশ্বর্য্য-বর্ণন ; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন, † এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামা-নন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা চৈতন্তদেবের সঙ্গী হন । ঘোণা নামক গ্রামে গমন, ‡ বারমুখী বেষ্ণার উদ্ধার ; জাফরা-বাদ পবে সোমনাথ গমন । § সোমনাথের পরে জুনাগড়ে, গৃনার পাহাড় অতিক্রম, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্ম্মদাতীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুয়া, দেওঘর ( বৈদানাথ নহে ), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর, দাসপাল নগর ও আলালনাথ আগমন—এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন ।§

\* নাসিক—নাসিক, ত্রিষক ( বোধ হয় আধুনিক ত্রিষক ) ও দমননগর পরস্পরের নিকটবর্তী ।

এই দুই স্থানের মধ্যে কালতীর্থ, সক্তিীর্থ, পক্ষতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না ।

† ভঁরোচ—তাপ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ভ্রোচ নগর ।

‡ আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রামতী নদী—মানচিত্রে দেখুন ।

§ ঘোণা—পোষ্টালগাইড দেখুন ।

§ সোমনাথ হইতে সমস্তস্থানই মানচিত্রের সঙ্গে নিলিয়া যায় ; রামানন্দ রায়ের বাড়ী বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব । রায়পুর ও রত্নপুর ভারত-বর্ষের যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে ; উহারা সেণ্ট্রাল এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ; স্বর্ণগড়র এখনকার নাম রায়গড় । গোবিন্দের স্থান নির্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বতঃই সাধুধাম দিতে প্রবৃত্তি হয় ; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে, চৈতন্তদেব পুরী হইতে পূর্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পর্য্যন্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্ম্মদা ও বিষ্ণুগিরির সমন্বয়পথে শ্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৫১০ খৃষ্টা-



এই করচাব মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানা তত্ত্ব  
পাইবেন ; ইহাকে ‘নোট’ সংজ্ঞা দেওয়া  
করচায় বর্ণিত চৈতন্তচরিত্র । উচিত নহে ; করচা, কাব্য বা ইতিহাসের  
রেখাপাত মাত্র ; ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান । উৎকৃষ্ট শিল্পী  
কৰ্ম্মকার বহুমূল্যমণিখচিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নিৰ্ম্মাণ করিলে যতদূর  
সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকৰ্ম্মকারের লেখনী-নিৰ্ম্মিত চৈতন্তমূৰ্ত্তি তাহা  
হইতেও সুন্দর হইয়াছে । সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি  
চৈতন্তদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন,  
সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“হেনকালে আইল দেখা তীর্থ ধনবান । দুইজন বেণ্ডা সঙ্গে আইলা দেখিতে ।  
সন্ন্যাসীর ভারিভূরি পরীক্ষা করিতে ॥ সত্যবাট লক্ষ্মীবাই নামে বেণ্ডাধ্ব । প্রভুর নিকট  
আসি কত কথা কয় ॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেণ্ডা দুইজন । প্রভুরে বুঝিতে বহু  
করে আয়োজন ॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে । সন্ন্যাসীর তেজ্ঞ এবে হরে লব  
হলে ॥ কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে । সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে ॥  
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন । সত্যারে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন ॥ ধরধরি কাঁপে  
সত্য প্রভুর বচনে । ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে ॥ কিছুই বিকার নাই প্রভুর  
মনেতে । ধৈর্যে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী ।  
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী ॥ খসিল জটার ভার খুলায় খুসর । অনুরাগে ধরধর  
কাঁপে কলেবর ॥ সব এলোথেলো হলো প্রভুব আমার । কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য  
নাহি দেখি আর ॥ নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি । লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু  
দরদরি ॥ গিয়াছে কোপীন খুলি কোথা বহির্বাস । উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে হাস ॥  
আছারিয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা গোচা । ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা ॥ না  
খাইয়া অস্থিচৰ্ম্ম হইয়াছে সার । ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার ॥ হরিনামে মত্ত

স্বের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ  
পুরীতে প্রভাগমন করেন ; স্মরণ্য এই ভ্রমণকার্য্য ১ বৎসর ৮ মাস, ২৬ দিনে নির্বাহিত  
হইয়াছিল ।

হয়ে নাচে গোরারায় । অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায় ॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল । চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহুজ্ঞান । হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান ॥ সত্যের বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি । হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ সুরারি ॥ কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ সুরারি । অজ্ঞান হইল সব এইভাবে হেরি ॥ হরিনামে মত্ত প্রভু নাহি বাহুজ্ঞান । ঘাড়িভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥ মুখে লাল্য অঙ্গে ধূল্য নাহিক বসন । কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন ॥ ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি । শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল । ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল ॥ বড়ই পাষাণ মুই বলে তীর্থরাম । কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম ॥ তীর্থরাম পাষাণেরে করি আলিঙ্গন । প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥ পবিত্র হৈতু আমি পরশে তোমার । তুমিত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার ॥”

এই মন্ত্রে নরোজা, ভীলপন্থ দম্ভাস্বয় ও বারমুখী বেথো পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল ; যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই,—গুজরীনগরে তাঁহার প্রেমময় মূর্তির এই রূপ একটি প্রতিচ্ছায়া প্রদত্ত হইয়াছে,—

“এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল । সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল ॥ অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল । দলে দলে গ্রামালোক আসি দেখা দিল ॥ ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি । অজ্ঞান হইয়া নাম করে গোরহরি ॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন । ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে । শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে ॥ পশ্চাৎভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া । শত শত কুলধনু আছে দাঁড়াইয়া ॥ নারীগণ অশ্রুজল মুড়িছে আঁচলে । ভক্তিভরে হরি নাম শুনিছে সকলে ॥ অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া । হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদ্রিয়া ॥”

ভক্তির পূর্ণআবেগের সময় এই মনুষ্য-দেবটির শরীরে আশ্চর্য্য এক-রূপ প্রতিভা প্রকাশ পাইত ; অনুচর গোবিন্দও সেই রূপ ভীত হইয়া দর্শন করিত,—

“কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই । এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই ॥ কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায় । পাগলের স্থায় কভু ইতি উতি চায় ॥ কি জানি কাহারে

ডাকে আকাশে চাহিয়া । কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥ উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন । অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥ একদিন শুভ্রা মথো পঞ্চবটী বনে । ভিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ নিখর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন । মাঝে মাঝে বাস করে, দুই চারি জন ॥ কিম্ব কিম্ব করিতেছে বনের ভিতর । চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাজ-সুন্দর ॥ অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি । ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী ॥ এই ভাব হেরি মোর ধাবিল নয়ন ।”

বঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্যশ্রামল প্রদেশে থড়ের ঘরে কোনও রূপে

দীর্ঘজীবনটি কাটাওয়া দেখ ; উত্তরে হিমাদ্রি, প্রকৃতিবর্ণনা ।

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিষ্ণা,—নিকট-

বর্ত্তি-প্রকৃতির এই মহান্ আলেখ্য বঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে বড় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাট । এদেশের উর্বর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শস্য দান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পূর্ণ করিয়া বঙ্গবীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত করিতেন । রণক্ষেত্রে গাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ,—পাঠশালা, গোশালা কিম্বা তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী অথবা কোন কৰ্ম্মশালা হইতে বঙ্গালীর স্বর্গন্দরে প্রত্যাবর্ত্তনের তদ্রূপই আগ্রহ,—ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক ছূর্নাম । এই দোষে বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে স্বভাবের মহিমাম্বিত পট চিত্রিত হয় নাট । বাইরণ, স্কট কি ওয়ার্ডসোয়ার্থের রচনায়, কোথাও ক্রিটামনাসের উজ্জল ও ভীতিকর চিত্র, বজ্রনাদি-ঝরণার শব্দে প্রতিশব্দিত জাগ্রফ্রে ও আপিনাইনের তুষার-ধবল উদাসকাস্তি, কোথাও লকলেমন, লককেট্রিন প্রভৃতি পাহাড়-বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কাস্তি, কোথাও টিনটারগ সন্নিহিত মুহূ নীলোজ্জল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্বমিশ্রসৌন্দর্য্যের আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেশের ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে ণতশৃণ শোভা ও মহিমাম্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তি ; কিন্তু গৃহস্থ বঙ্গালী ভ্রমণ কার্য্যে নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেড়াগার খাম ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট

হয় না ; কিন্তু গোবিন্দের প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীন-সাহিত্য-দুর্লভ রূপের প্রভা পড়িয়াছে ; ঘরের নিরুজ্জ-বায়ু-সেবনাভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তাঁহার লেখায় এক প্রফুল্ল নব সৌন্দর্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি ক্ষুদ্রিশালী ও জীবন্ত করিয়াছে :—নীলগিরি বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ত্রায় সরল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত ।

“কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে । ধানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে ॥ কত শত গুহা তার নিয়ে শোভা পায় । আশ্রয় তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায় ॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া । চামর বাজন করে বাতাসে ছলিয়া ॥ ঝর ঝর শব্দে গড়ে ঝরণার জল । তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল ॥ পর্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই । নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই ॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেটন । আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন ॥ মগ্ন বসিয়া ডালে কেঁকারব করে । নানাজাতি পক্ষী গায় স্তম্ভর স্বরে ॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা । প্রকৃতির গলে যেন ছলিতেছে মালা ॥ রজনীতে কত লতা খগ্ধগি জ্বলে । গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে ॥ ক্ষুদ্র এক নদী বহে বুক বুক স্বরে । তার ধারে বসি শ্রুত সন্ধ্যা পূজা করে ॥”

কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতরভাবের ছায়া আছে, কল্যাণকুমারীর বর্ণনায়,—

“তাত্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে । শুভ্র—কল্যাণকুমারী চলিল দেখিবারে ॥ কেবল সিংহুর শব্দ শুনিবার পাই । পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই ॥ হাঁ হাঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর । কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥ দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন । সেখানে সৌন্দর্য দেখে শুদ্ধ বার মন ॥”

সেখানে দেখিবার কিছুই নাই,—কিন্তু জাগতিক সমস্ত দ্রব্যের সমাধির স্রায় সেই বিশাল অনন্ত ক্ষেত্রের অনুভবনীয় শোভা ধারণা করিতে জ্ঞানচিন্তের প্রয়োজন ।

কবির চিত্রে প্রকৃতি অলঙ্কিতভাবে একটি অম্পষ্ট, নিগূঢ় উচ্চভাব বিদ্যিত করিয়া দিয়াছিল ।

গোবিন্দের করচার আর এক গুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতার

মালিগ্র নাই, এই অনাবিল রচনা সর্বত্র

চৈতন্যপ্রভুর  
অসাম্প্রদায়িক ভাব ।

স্মৃতিসঙ্গত ও সুস্বাদু ; পরবর্তী লেখকগণের

বৈষ্ণবীয় বিনয়ও, স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার

মিশ্রণে হৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু বাঁহার নাম করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন ; তাঁহার প্রিয় অনুচরের লেখায়ও অসাম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিফুল্লভাব শ্রেণীনির্ধারকসেব সর্বত্র মনোরঞ্জন করিবে । চৈতন্যপ্রভু যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে সঙ্কেতমাত্রে চিররাখা ভগবানের স্মৃতি উদ্ভেক করিয়া দিয়াছে । পরবর্তী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই জগৎপূজ্য পবিত্র-চরিত্রকে একদর্শি-সংকীর্ণতায় সংক্ষুব্ধ করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের কোলাহল-ময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিবেচ্যপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িকধর্মে তাঁহার অণুমাত্রও অনুমোদন ছিল না ; নারায়ণগড়ে তিনি “ধলেশ্বর” শিব দর্শনে—“হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি । আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥” জলেশ্বরের “বিবেশ্বর” শিব দর্শনেও তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, বেকট-নগরের নিকট “গিরীশ্বর” শিব দর্শন করিতে অনুরাগী হইয়া তিনি দীর্ঘ-পথ পর্যটন করিয়াছিলেন, পাটম গ্রামের নিকট “ভোলেশ্বর” শিব দর্শনে “প্রভুর প্রেম উপজিল । জোড় হস্তে নুব স্তুতি বহত করিল ॥ অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায় । উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায় ॥” এবং সোমনাথদর্শনে “তাঁহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না । ত্রিষকের নিকট রামের চরণচিহ্ন বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে, “চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ । গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ । অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া । কোথা মোর রাম বলি উঠিলা কান্দিয়া ॥” পঞ্চাবটা বনে বাইয়া তিনি ‘গণেশ’ বিগ্রহ দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন । পদ্মকোট তীর্থে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবার জন্ত গমন করেন এবং—“সেখানেই

প্রভু গিয়া করিল প্রণতি !” দমননগরের নিকট সুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভূজা শক্তিমূর্তি “দেখি প্রভু ধরণী নুটায়” ও সেই মূর্তি “দেখিয়া নয়নে। তিন দিন বাস করে প্রভু সেই স্থানে।” এইরূপ বহুবিধ স্থলেই তাঁহার উদার ভক্তিমূলক ধর্ম দৃষ্ট হইবে। “না করিব অস্ত্র দেব নিন্দন বন্দন” এই কথায় চৈতন্যদেবের স্বাক্ষর কোথায় ? তিনি ত শ্রীকৃষ্ণসেবক, শিবসেবক, রামসেবক, অষ্টভূজাসেবক, গণেশসেবক, কিম্বা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন ;—এ সমস্ত বিগ্রহ, চিহ্নস্বরূপ ঐহার কথা আভাষে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি তাঁহারই প্রকৃত সেবক ; যে কথা তাঁহার বিরহমথিত—হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, সেই অন্তঃপ্রবাহিত চিরনিশ্চল ঈশ্বরকথা—যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান,—তীর্থভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্বত্রই উদ্ভিক্ত হইয়াছে। এবং একথা নিশ্চয় যে, শ্রেণী-বিশেষকে বিশেষরূপে আপায়িত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা করচার সর্বত্রই বিশেষরূপ

দ্রষ্টব্য, সামান্ত ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট

গোবিন্দের চরিত্র।

ও সংবত বর্ণনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার নিজ সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এতদূর অকৃত্রিম ও অভিমানশূন্য, যে সময় সময় তাঁহার চরিত্রকে তিনি অনাহুত ভাবে নিজেই উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন ; কোথাও একটা ‘পরেটা ফল’ একটা ‘লাডু’ ও গুড়-সংযুক্ত ‘চুক্রায়’ দেখিয়া ষাটবার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবশ্য স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও সুমার্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র না হউন, এই বিষম-সংসার-করাগহের শৃঙ্খল তাঁহার পক্ষেও বলবৎ প্রকৃতিশালী ছিল সন্দেহ নাই। “সোণার শৃঙ্খল মায়া,—লৌহের শৃঙ্খল। স্বর্ণমত

মনোরম, লৌহ মত দৃঢ় ।” ইহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে সহজ কার্য্য ছিল না ; কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে একটা কথাও বলা আবশ্যকীয় মনে করেন নাই ; অনেক কবিই এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্ম-বিজ্ঞপ্তি করিতে ছাড়িতেন না । গোবিন্দের মুখে এই সন্ন্যাসের কথা বহুদিন পরে অন্ধর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,— কাঞ্চননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, “প্রভুর সন্ন্যাস কালে ধরেছি কোপীন । অহঙ্কার তাজিয়া হয়েছি অতি দীন ॥ আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে ।” তাঁহার জী বখন মন্থভেদী দ্বঃখের কথা বলিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে চাহিয়াছিল, তখন সংসার আবার সুন্দর ও করুণ আস্থানে তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ দাউয়াছিলেন,—“শুনিয়া তাহার কথা মাথা ঠেট করি । মনে মনে বলিতে লাগিষু হরি হরি ॥ হরি শরণেতে কাট যতেক বন্ধন । তে- কারণে মনে করি হরির চরণ ॥”

মিষ্টান্নব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য

লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না,  
তাঁহার প্রভুভক্তি ।

উহা তাহার জীবন ; চৈতন্য-

দেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস, নাহা দেখিয়া সমস্ত লোক অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, সে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছিলেন,—“ইচ্ছা অশ্রু-  
জলে মুক্তি পাখালি চরণ ॥” সর্বদা সাহচর্য্যহেতু সেই ভক্তিবিস্কলভায় গোবিন্দ একান্তরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাঁহার সম্মুখে এক  
• প্রবল ভক্তি বন্যায় ধরিত্রী টলমল হইতোছিল, কিন্তু তিনি সর্বদা সে  
দৃশ্যে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছেন, এক কথা বলেন নাই । কিন্তু কোন কোন মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া না পড়িয়াছে এমন  
নহে । অগস্ত্যকুণ্ডতীরে একদিন চৈতন্যপ্রভুর উদ্যমভক্তি দর্শনে গোবিন্দ এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন—“প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত । আজি  
কিন্তু সেহ মোর হৈল প্লবিত ॥” নিত্য দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি

লীলারসের নিত্য নূতন আনন্দ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্ত তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ভাস্কর্য হ্রাস হয় নাট, যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃ-  
স্বলের লোকের ছায়া গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ  
গঙ্গাতীর ছাড়িয়া অত্ৰাথ থাকিতেও পারে না । ছুইদিনের জন্ত প্রভুসঙ্গ-  
বিচ্যুত হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ—“মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল ।” এই  
রূপ কাতরতা দেখাইয়াছেন ।

গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নিম্নল ও বিগুহ ছিল, তাহা বাক্য-  
পল্লব পরম্পরায় তিনি নিজের কীৰ্ত্তন করেন  
তাঁহার নৈতিক বিগুহতা!!  
নাট, কিন্তু সহসা ছুই একটি বাক্য তাঁহার সমগ্র  
চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত করিয়া দিয়াছে । চৈতন্ত-  
দেব দম্ভা, তদ্বর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে  
তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন । চৈতন্ত প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি  
ইঙ্গিতেও বাধা দেন নাট, কিন্তু সেদিন প্রভু মুরলী বেঞ্জাদিগের নিকট  
বাইতে উদ্যত, সেদিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন :—  
“মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই । না শুনিল মোর বাণী চৈতন্ত গোসাই ॥”  
এই একমাত্র আপত্তি তাঁহার নৈতিক সাবধানতার বিশেষরূপ অভিব্যক্তি  
বলিয়া গ্রহণ করা যায় ।

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্তদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সে  
স্থলে তাঁহার হৃদয়ের গাঢ়ভক্তিপ্রণোদিত-  
তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ।  
কবিত্ব উদ্ভিক্ত হইয়াছে :—“যদ্যপি দাঁড়ায় শুভ্র  
অঙ্গকার ঘরে । শরীরের প্রভায় আঁধার নাশ করে ॥” এ সব কথায় একটু কল্পনা  
না আছে এমন নহে, ইহা স্বাভাবিক ; কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছু-  
মাত্র অতিরঞ্জিত করেন নাট, সেরূপ অতিরঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিষ্পৃহ  
ভক্তির অবতার চৈতন্তদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত । মহারাষ্ট্র ও  
তৎসংলগ্ন অপর্যাপ্ত দেশীয় লোকের কথা গোবিন্দ বুঝিতে পারেন



নাট। বগুলাবনে—“একজন লোক আসি কাঁইমাই করি। কি বলিল আমি সব বুঝিতে না পারি। তার বাক্য বলি সব প্রভু সম্মিল্য। কাঁইমাই বলি তারে দিলেন বুঝায়ে।” এস্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে চৈতন্য প্রভু স্বর্গীয় শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সেরূপ অলৌকিক কল্পনা করিবার আদৌ সুবিধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়াছেন :—“এই দেশে জন্ম দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছলল।”

চৈতন্য প্রভুর স্বর্গীয় ভক্তিপ্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তিতে দম্ভ, তঙ্কর, বেঙ্গা উদ্ধার পাইয়াছে ; যেখানে সে ভক্তির বগ্না প্রবাহিত হই-  
য়াছে, সে স্থান তীর্থযাত্রার তুল্য পবিত্র হইয়াছে ; পাষাণ নাস্তিকের  
মন ফিরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু দুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিহীন, অর্থযৌবন-  
স্পর্ধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে ধরা পড়ে নাই, নরসমাজে এমন দুই একজন  
আছে, সম্যক্ অভিব্যক্ত সাধু-জীবনের সৌন্দর্য্য ও সুরভি যাহাদের উদ্ভ্রম-  
গ্রাহ্য নহে, ভগবান্ পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ করিতে শক্তি  
দেন নাই ; হাজিপুরে কেশবসামন্ত চৈতন্যপ্রভুকে কটুক্তি করিয়াছিল,  
কিন্তু চৈতন্যপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই, তাহার চেষ্টা সেস্থলে  
বিকল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, কেশবসামন্তের  
ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যপ্রভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন :—“নারায়ণগড়  
পানে চল মোরা যাই। সেই থানে গেলে যদি কোন মুখ পাই।” এইরূপ ভাবের  
কথা চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অত্র কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমরা জানি  
না, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা পুনরায় বলিতেছি এই সত্যভাষী সেবকের  
লেখনীতে চৈতন্যদেবের প্রকৃতসৌন্দর্য্য সেরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে,  
অতএব তাহা বিরল।

বহুদিনের কুচ্ছ-সাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে, উপ-  
পুরীতে প্রতাবর্জন। বাসে ও ভক্তিবিস্ময়তায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের  
পরিমূদিত কমলনিভ স্নানার্থে অথচ মনোহর  
দেহযষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল এবং

তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভালবাসার পরিক্রিষ্ট লাবণ্যতে হেমসুন্দর পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল,—“ছিল এক বহির্বাস পাগলের বেশ । সদা উনমত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ ॥ সব অঙ্গে ধূলি মাখা মুদিত নয়ন ।” এই শ্রীমূর্তির দর্শনলোলুপ সমস্ত বঙ্গদেশ—নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত ভক্তমণ্ডলী—চিরবিরহক্ষিপ্ত হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই, তাহারা প্রভুদর্শন ভিন্ন অত্ৰ কোন উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে নাই । এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য একদিন মাত্র প্রলাপে নরহরির নাম করিয়াছিলেন,—“কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি । কৃষ্ণনাম শুনে তোরে আলিঙ্গন করি ॥” তাহারা তা দবারাত্র গৌরনাম লইয়া কাঁদিতেছিল, সঙ্গে যাইতে অনুমতি পায় নাই, কিন্তু সেই স্বর্গীয়সঙ্গের স্মৃতিস্মৃথে তাহারা পাখিব-কষ্ট ভুলিয়াছিলা ; তিনি দু বৎসব পরে আসিতেছেন এই সংবাদ চকিতে বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই অসম্ভব সুখাস্বাদন প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল ; চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণমিলনের পূর্বাভাব-মুগ্ধা রাধিকার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—“চিকুর ফুরিছে, বসন পসিছে, পুলক যৌবন ভার । বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, হলিছে হিয়ার হার ॥” এই শুভলক্ষণাক্রান্ত মুহূর্ত দীর্ঘ দিন রজনীর পবে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়া আসিল । প্রভুকে তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সঙ্গে অভ্যর্থনা কারিল, তাহা এক অশ্রুতপূর্ব স্মৃতির চিত্রপটের স্থায় গোবিন্দ দাস আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম :—

“আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে । গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে ॥  
 শঙ্কর আচার্য আসে গাঢ় অমুরাগে । ধোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে । সাক্ষ-  
 ভোম আসে দুই ডকা বাজাইয়া । নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া ॥ হরিদাস রামদাস  
 আর কৃষ্ণদাস । ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে শ্বাস ॥ জগন্নাথ দাস আর দেবকীনন্দন ।  
 ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষণ । বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর । নারায়ণতীথ  
 আর দাস গিরিধর । গিরি পুৰী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ । প্রভুরে দেখিতে সবে করে  
 আগমন ॥ রামশিখা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত । বলরামদাস আসে হয়ে পুলকিত ॥

শত শত পণ্ডিত গোসাই দেখা দিল । অনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল ॥ কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায় । এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায় ॥ হাজার হাজার লোক প্রভুকে বেরিয়া । নাম আরস্তিলা সব আনন্দে মাতিয়া ॥ মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেল । ঠাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িল ॥ সিদ্ধ বৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল । হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল ॥ একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে । প্রভুকে লইতে সবে কঁরে আগমনে ॥ মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল । আনন্দ করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল ॥ কীৰ্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া । মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া ॥ খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল । দুই বাহু পশারিয়া দিলা তারে কোল ॥ নাচিতে লাগিল গোরা বাহু পশারিয়া । সার্কভোম পদতলে পড়িল লুটিয়া ॥ জাত জোড়ি সার্কভোম কহিতে লাগিল । তোমার বিরহ-বাণ জদয়ে বিঞ্চিল ॥ বড় মুচ বলি তব বিরহ সহিয়া । এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া ॥ খেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত । গুড়ু গুড়ু শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত ॥ কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া । একদৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া ॥ হেলিতে ছলিতে যায় শটার ছলল । মধুর বৃন্দস বাজে শুনিতে রসাল ॥ হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর । রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর ॥ প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া । বড়ই আনন্দ পাই তোমাংরে দেখিয়া ॥ রঘুনাথে কোল দিত বান গোরা রায় । রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া পুটায় ॥ মাঘের তৃতীয় দিনে যের গোরা রায় । সান্নোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায় ॥ অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌঁছিল । কোটি কোটি লোক তথা আসি বাঁকি দিলা ॥ ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ । হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ ॥ এক দৃষ্টে মহাবিশ্ব দেখিতে দেখিতে । দর দর প্রেম-অঞ্জু লাগিল বহিতে ॥ একবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায় । অমনি আছাড় পেয়ে পড়িল ধরায় ॥ \* \* \* থন্ত হইলাম আজি এই কথা বলি । আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি ॥ \* \* \* বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে । এই জন্ত নিত্য আসে কীৰ্ত্তনের ভিতে ॥ বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে । ভেরী বাজাইয়া চলে কীৰ্ত্তনের আগে ॥ আনন্দে প্রতাপ বহু ছাড়ি রাজাপাট । মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট ॥”

গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যদেবের উপদেশগুণীর মনোহারিত্ব নষ্ট

করচার দোষ ।

হইয়াছে ; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না । যে উপদেশশ্রবণে

শত শত লোক মস্তমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দ্রায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি সেই সব স্থলে উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাউত।

গোবিন্দদাসের করচা পড়িয়া মনে হয় সেকালেও “অস্ত্রহাতা বেড়ি-গড়া” অপেক্ষা কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও কেহ নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা-বিস্তার। কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্ত যোগ্যতা দেখাইতেন ; সমাজের অস্থায়ি-সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব-প্রকৃতির প্রকৃতসীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই + ।

\* জয়ানন্দ্রকৃত চৈতন্যমঙ্গলের কয়েকপানি প্রাচীন পুঁথি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে গোবিন্দ কর্ম্মকারের মহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য যাওয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে। স্ততরাং মাহারা বলিয়াছিলেন গোবিন্দ কর্ম্মকারজাতীয় ছিলেন না, তিনি কায়স্থ ছিলেন এবং এই মত প্রচার করিয়া প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার ৫০ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের যুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের করচাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গোপালমোহাম্মদী মহাশয় আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে করচার আদ্যস্ত খাঁটি জিনিশ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী মহোদয়গণ উক্ত ৫০ পৃষ্ঠা জাল প্রতিপন্ন করিতে বাইয়া যে সকল যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টীকায় ( ১৯২ পৃঃ ) তাহা বিস্তারিত ভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জয়ানন্দের পুঁথিতে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে কর্ম্মকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,—ইহা আবিস্কৃত হওয়ার পর আমাদের বিশ্বাস নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, স্ততরাং সেই সকল যুক্তি তর্কের পুনশ্চ অবতারণা করা প্রয়োজনীয় মনে করি না। তবে করচার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, দু'এক স্থলে শব্দ-দির সংশোধন হইয়া থাকিবে,—কিন্তু নিখুঁত প্রাচীনরচনা এখন কোন পুস্তকেরই নাই ;—নকলকারিগণ এক আধটু সংশোধন সকল পুঁথিরই করিয়াছেন, তজ্জন্ত এই প্রাচীন তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট প্রামাণিক পুস্তকখানিকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয় লিখিয়াছেন “গোবিন্দদাসের করচা নামক যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।” ( পরিষৎ-পত্রিকায়, ১৩০৪ তৃতীয় সংখ্যা ) এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট চিঠিতে

## (খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ।

কবি জয়ানন্দ বর্দ্ধমানস্থ আমাইপুরা গ্রাম ( বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে  
অম্বিকা ) নিবাসী স্মৃদ্ধিমিশ্রেব পুত্র । চৈতন্য-  
কবির পরিচয় ।

চরিতামৃত, বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে  
চৈতন্যশাখায় স্মৃদ্ধিমিশ্রের নাম উল্লিখিত আছে । কবি যে বংশে  
জন্মগ্রহণ কবেন, সেই বংশের নাম স্মার্ত রঘুনন্দনের দ্বারা ঐতিহাসে  
উজ্জল রহিয়াছে। কবি—“খুড়া ঞ্ঠা পাবণ চৈতন্য অন্ন ভক্তি”—বলিয়া আক্ষেপ  
করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ-  
বিদ্যাভূষণ, ঈশ্রবানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণবমিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ-  
মিশ্রের কথা গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । ইঁহারা সকলেই সঙ্ঘি-  
দ্বান ও ধান্মিক ছিলেন । সেকালে যান যত বেশী উপবাস করিতে  
পারিতেন, তিনি সমাজে ততদূর আদরণীয় হইতেন । কুন্তিবাস—“শ্রীকর  
ভাই মোর নিতা উপবাসী”—বলিয়া ভ্রাতার উপবাসেব বড়াই করিয়াছেন,  
জয় নন্দও—“বাণীনাথ মিশ্র বট্ রাত্রি উপবাসী”—সগর্বে প্রচার করিতে  
ক্রটি কবেন নাই । জয়ানন্দ মাতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করেন । কবির  
মাতার নাম ছিল রোদনৌ ; তাঁহার ছেলে হইয়া বাঁচিত না, এজন্য জয়া-  
নন্দের নাম রাখা হইয়াছিল “গুইঞা” । চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বর্দ্ধ-  
মান ফিরিয়া গাইতে আমাইপুরা গ্রামে শিষ্য স্মৃদ্ধিমিশ্রের বাড়ীতে  
উপস্থিত হন, এবং আমাদের কবির ‘গুইঞা’ নাম গুচাইয়া জয়ানন্দ  
নাম রাখিয়া যান । জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আবিষ্কর্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-  
নাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জয়া-  
নন্দ জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার মস্তগুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী ।

লিখিয়াছেন । “গোবিন্দলাসের করচায় ৫০ পৃষ্ঠা বাপক জাল বলিয়া আমিও বোধ  
করি না । কেননা কবি জয়ানন্দও গোবিন্দকে কায়স্থ বলেন নাই, কর্ণকায়ই বলিয়া-  
ছেন ।”

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধরপণ্ডিতের আজ্ঞায় তিনি চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেন ।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । কতকগুলি বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচ-  
 চৈতন্য-মঙ্গলের ঐতিহাসিক লিখিত মত হইতে স্বতন্ত্র । প্রচলিত মত, জগ-  
 গুরুত্ব ।

নাথ মিশ্রের পূর্বনিবাসস্থান শ্রীহট্টস্থ ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম, কিন্তু জয়ানন্দের মতে উহা শ্রীহট্টস্থ জয়পুর গ্রাম । প্রচলিত মত, হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম ( “বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস”— চৈ, ভা, আদি । ) কিন্তু জয়ানন্দের মতে, স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগাছি গ্রাম । এতদ্বিন্ন জয়ানন্দ অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব ঐতিহাসিকতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন । তাঁহার গ্রন্থে আমরা জানিতে পাই, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন । মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের ( হুঁহার উপাধি ছিল রাজা ভ্রমর ) ভয়ে তিনি পলাইয়া শ্রীহটে আগমনপূর্বক বাস করেন । চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন । আষাঢ় মাসে একদা কীর্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পদ ইষ্টকবিক্ত হয় ; দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, গুরুপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন । চৈতন্যদেবের তিরোধানসংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে সত্য কাহিনী কুহকাচ্ছন্ন হইয়াছিল,—জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অন্ত-হিত হইবে । চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, সে সব বৃত্তান্ত এই পুস্তক ভিন্ন অথ কোন প্রাচীন-পুস্তকে পাওয়া যায় নাই ; নিম্নে সেই প্রসঙ্গের কতক অংশ উদ্ধৃত হইল :—

“আর এক পুত্র হৈল বিষ্ণুরূপ নাম । দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম ॥ নিরবধি

ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা । নানাদেশে সর্বলোক গেল পলাইঞা ॥ তবে জগন্নাথমিশ্র দেখিঞা কোতুকে । বিশ্বকপ দশকর্ম করি একে একে ॥ আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল বাজভয় । ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥ নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে । ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে ॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞহুত্র কান্ধে । ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে ॥ দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলনী । প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥ গঙ্গানান বিরোধিল হাট ঘাট যত । অখণ্ড পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন । উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে । বিবম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥ গোড়েশ্বর বিদ্যামানে দিল মিথ্যাবাদ । নবদ্বীপ বিগ্ন তোমার করিল প্রমাদ ॥ গোড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে । নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে ॥ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা । গন্ধর্ব্ব লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা ॥ এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল । নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥ বিশারদহৃত সার্কভোম ভট্টাচার্য্য । স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গোড়রাজ্য ॥ উৎকলে প্রতাপকল্প ধনুর্ময় রাজা । রত্ন সিংহাসনে সার্কভোমে কেল পূজা ॥ তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গোড়ে বসি । বিশারদ নিবাস করিল বারাগসী ॥”

কিন্তু ইহার পর গোড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রসাদে ভগ্ন প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃ সংস্কার হইল ; কিন্তু পিরল্যা গ্রামে বসিয়া মুসলমানগণ যে সব ব্রাহ্মণেব ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন তাঁহারা জাতিচ্যুত অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন । “পানি পিয়ে শেষে জাতি বিচার” আর বৃথা । নবদ্বীপেব গত বৈভব ফিরিয়া আসিলে চৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন ।

পদকল্পতরুর ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতায়ুক্ত বিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর বে বারমাস্তা দৃষ্ট হয়, তাহা জয়ানন্দের চৈতন্ত-মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে উহা বলাতে তিনি পার্ষণ্য-পত্রিকায় \* নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া উক্ত কবিতাটি জয়ানন্দের খাতায়ই লেখা সাব্যস্ত কারয়াছেন ।

আমরা কিন্তু উক্ত পদটির মধ্যে যেন লোচনদাসের রচনার স্ফুটন খাঁজ পাইয়াছিলাম ; যাহা হউক উহা জয়ানন্দের রচিত বলিয়া পাঠ করিলে সাহিত্যসেবীর পক্ষে রসাস্বাদের কোন বৈষম্য ঘটিবে না ।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীনলেখকগণ কোনরূপ আভাস দিতে এতই কুপণতা করিয়া গিয়াছেন যে, দৈবক্রমে কোন লেখক যদি এসম্বন্ধে আমাদেরকে মুষ্টিমেয় তত্ত্বও ভিক্ষা দিয়া গিয়া থাকেন, আমরা

তাহাতেই নিরতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া  
বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের  
এক পৃষ্ঠা ।

তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি  
না । জয়ানন্দ নিম্নলিখিত সামান্য বিবরণটি

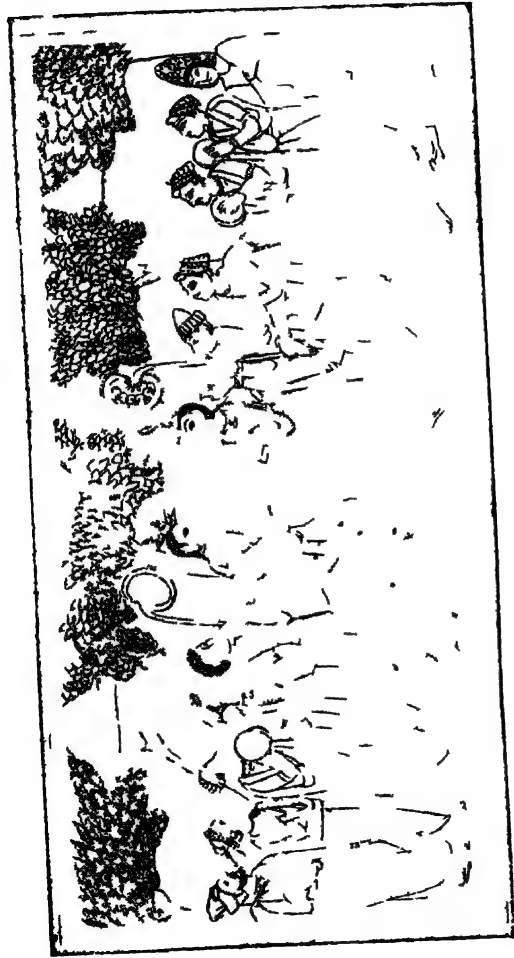
প্রদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন ;—

“চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার । অনন্ত কবীন্দ্র গাএ মহিমা জাহার ॥ শ্রীভাগবত  
কৈল ব্যাস মহাশয় । গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥ জয়দেব বিদ্যাগতি আর  
চণ্ডীদাস । শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ ॥ সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য বাস অবতার ।  
চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার ॥ চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে । সার্কভৌম রচিল  
কেবল প্রেমানন্দে ॥ শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে । সংক্ষেপ করিল তিহি  
গোবিন্দবিজয়ে ॥ আদিত্য মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি । শ্রীবল্লভবনদাস রচিল সর্বোপরি ॥  
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্ত্রোত্র ॥ সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ সংক্ষেপে  
করিলেন তিহি পরমানন্দ গুপ্ত । গৌরান্দ-বিজয় গীত স্তোত্রে অদ্ভুত ॥ গোপালবহু  
করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে । চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে ॥ ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত  
বাদ্যরসে । জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে ॥”

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নানারূপ ঐতিহাসিকতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনায় কবিত্বশক্তির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত চরিতাখ্যানগুলিকে কাব্যর মানদণ্ডে পরিমাণ করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না ।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে কড়চা-লেখক গোবিন্দদাস যে কন্ঠকার ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে ।





ବ। ୧୦୬୮ ମାଲେବ ନିଷିତ ଚିତ୍ରତାତ୍ପର୍ୟ ପୂର୍ବ ମାଲେବ ଚିତ୍ରତାତ୍ପର୍ୟ ।



চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া জয়ানন্দ-বিরচিত “ঐব চরিত্র” ও “প্রহ্লাদ চরিত্র” নামক দুইখানি ছোট কাব্যোপাখ্যান পাওয়া কবির অন্ত্যস্ত রচনা।  
গিয়াছে ।

### (গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ।

পরবর্তী চরিত-সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত, তখন বৈষ্ণব সমাজের স্বাতন্ত্র্য। নিম্বকার্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্যবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ শ্লোক রচনায় নিবৃত্ত হইয়াছেন ; ভক্তির যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্মিত হইয়া উহার ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছে ; এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদান-বিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষভরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল ; আত্মরক্ষণশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির! সুন্দর বিনয়ধর্ম্য অবিরত লবণাধুস্পর্শে ক্রমে ক্রমে একটু কলুষিত হইল ।

বৈষ্ণবগণ নির্দেশ করেন, ১৪২৯ শকে ( ১৫০৭ খৃঃ অব্দে ) শ্রীনি-  
বাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন-  
দাস নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাহা হইলে  
চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দুই বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব  
হয় ; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ  
প্রকাশ করিয়াছেন,—“হইল পাগিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন”—( চৈ, ভা, আদি ১০ অঃ  
ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ ) । তাঁহার দুই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রভু নবদ্বীপেই  
ছিলেন, স্মৃতিরাং একথাটির ভাল সম্ভব হয় না ; তবে এরূপ হইতে পারে,  
তিনি নিতান্ত শিশু বলিয়া এ আক্ষেপ করিয়াছেন ; ১৫০৭ খৃঃ অব্দে

তঁাহার জন্ম হইয়া থাকিলে মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় তঁাহার বয়স ২৬ বৎসর ছিল ; তিনি চৈতন্যপ্রভুর পরম ভক্ত চরিতলেখক, নীলাচলে গাইয়া তঁাহাকে দেখেন নাই কেন বলা যায় না । বৃন্দাবনদাস ৮২ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে তঁাহার অদর্শন হয় ; এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, গেতুরির উৎসব উপলক্ষে “বিজ্ঞবর” বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন ; ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে অর্গাং মহাপ্রভুর তিরোধানের ২ বৎসর পরে তিনি ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে ‘নিত্যানন্দবংশমালা’ রচনা করেন । \* তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তঁাহার রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্যেশীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবন্দনা পাওয়া যায় । বর্ধমান জেলায় দেবুড়গ্রামে ( মল্লেশ্বর থানা ) বৃন্দাবনদাস একটি মন্দির ও সিংহ স্থাপন করেন, উহা ‘দেবুড় শ্রীপাঠ’ নামে এখনও পরিচিত ।

চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে । শিশু চৈতন্যপ্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,—তঁাহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ কহিতেছেন, কখনও শচীমাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন—তঁাহার

পদাঙ্কে ধ্বজবজ্রাকুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে—  
চৈতন্য ভাগবতে, এই সব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাাত্র ।  
শ্রীমদ্ভাগবত-অনুসরণ ।

অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যামুগ্ধ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতারণা,— সূত্রাং উভয় চরিত্রে ঐক্য অতি অল্প ; তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই

\* এই সকল তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই । ৮ রামগতি স্মারক মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হয় । শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ-ব্রহ্মচারী তৎপর্ণিত বঙ্গরত্নে ( দ্বিতীয় ভাগ ) লিখিয়াছেন, চৈতন্যভাগবত ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয় ।

চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চৈতন্যলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে—“সনকাদি শিষ্যগণ-বেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন”—নারায়ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষে “হৈহয়, বাণ, নহষ, নবক, রাবণ” প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐকোর কেশ-প্রমাণ স্ত্র বথাসম্ভব হৃদয়ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় রেখায় মিল বাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দর্শনের ছাঁচে ঢালা ; শুইজো, বাকল্, ফ্রিজ ওয়েল ইতিহাস হইতে হুত্ৰ সঙ্কলন ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী । করার চেষ্টা কবিতা ; ঘটনার তালিকা

দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড়-জগতের নিয়মগুলির ভ্রায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবন হইতেও নিয়ম সঙ্কলন করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে । এই প্রথা সর্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ কি না, বলা যায় না ; এই ভাবে অনেক লেখক স্বীয় মনঃকল্পিত সূত্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন ; বড় বড় লেখকের সম্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের ঐক্যজালিক লেখাব গুণে মিথ্যাসুন্দরীও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায় । বৃন্দাবনদাস গীতার—“যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত”—আদি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধে অপর একটা শ্লোককে স্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্যপ্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন । সাক্ষোপাঙ্গের আবির্ভাব ও যুগ-প্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । চৈতন্যভাগবতের সুন্দর প্রারম্ভটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে । কেহ রাঢ়ে উদ্ভূতশেখী হটে পশ্চিমে ॥ নানা-  
স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ । নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন ॥ নবদ্বীপে হইল প্রভুর  
অবতার । অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি । বাহী  
অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গৌসঞি ॥ সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে । কোনো মহাপ্রিয়-  
বসে জন্ম অন্তস্থানে ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত । শ্রীচন্দ্রশেখরদেব ত্রৈলোক্য  
পুঞ্জিত ॥ ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার । শ্রীহটে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ পুণ্ড-  
রীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান । চৈতন্যবল্লভদত্ত বাহুদেব নাম ॥ চাটিগ্রামে হৈল ইহা  
সবার পরকাশ । বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ রাঢ়মাঝে একচাকার নামে  
আছে গ্রাম । যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ \* \* \* নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল  
ভক্তগণ । নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি ।  
যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গৌসঞি ॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা । সকল  
সম্পূর্ণ করি খুইলেন তথা ॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে । এক গজাঘাটে  
লক্ষ লোক স্নান করে ॥ ত্রিবিধ বেসে একজাতি লক্ষ লক্ষ । সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে  
মহাদক্ষ ॥ সন্তে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে । বালকে হো ভট্টাচার্য্য সনে কল্যাণ করে ॥  
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় । নবদ্বীপ পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥ অতএব  
পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয় । লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক  
স্থখে বসে । বার্থকাল যায় মাত্র বাবহার রসে ॥ বৃষ্ণনাম ভক্তিশ্রুত সকল সংসার ।  
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে । নঙ্গলচণ্ডীর  
গীত করে জাগরণে ॥ দস্ত করি বিষহবি পুঞ্জ কোনজন । পুত্তলি করয় কেহ দিয়া  
বহন ॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে । এইমত জগতের বার্থকাল যায় ॥ যে বা  
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সব । তাহারিও না জানয়ে গ্রন্থ অমৃতব ॥ শাস্ত্র পচাইয়া সবে  
এই কর্ম্ম করে । শ্রোতার সহিত যমপাশে বন্ধি মরে ॥ না বাণানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্তন ।  
দোষ বহি কারো গুণ না করে কখন ॥ যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী । তা সভার  
মুখেহ নাহিক হরিশ্রবণি ॥ অতি বড় স্রুতি যে মানের সময় । গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ  
নাম উচ্চারণ ॥ গীতা ভাগবত যে জানাতে পঢ়ায় । ভক্তির বাঞ্ছন নাই তাহার জিহ্বায় ॥  
বলিলেও কেহো নাহি লয় বৃষ্ণনাম । নিরবধি বিদ্যা, কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ \* \* \*  
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে । বৃষ্ণপূজা বৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে ॥ বাগুদী  
পূজয়ে কেহো নানা উপহারে । মদ্য মাংস দিয়া কেহ বজ্র পূজা করে ॥ নিরবধি নৃত্য-

গীত বাণ্য কোলাহলে । না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে ॥ কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি স্থখ । বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ \* \* \* সর্ব নবদ্বীপে এসে ভাগবতগণ । কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন ॥ কেহ দুঃখে চায় নিজ শরীর এড়িতে । কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়িয়ে কাঁদিতে ॥ অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে । জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ । অবতারিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ ॥” \*

উদ্ধৃত স্থলটি সূত্রাংশে ও ঐতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই । কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সূত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্বদা নিরাপদ নহে । বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সূত্রে এত বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই ।

চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবনদাসের উদ্ভাবনী শক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া অলৌকিকত্বে বিশ্বাস । উচিত নহে । তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সন্ত-বতঃ সেই ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার নিজের জন্ম এক অলৌকিক গল্পে জড়িত, সূতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল । ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমরা লেখককে কল্পনাশীল অথবা কপট বলিতে অধিকারী নহি ।

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটুক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্ত সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে ক্রোধের কারণ । দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন । রুচি সকল সময় একরূপ থাকে না ; সে কালের কটুক্তি পল্লীগ্রামে কৃষকের নাতিস্বস্ত্র হলের ত্রায় অমার্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত । সভ্যতার

---

\* চৈতন্যভাগবত, শ্রীমুক্ত অতুলকৃষ্ণগোবামী মহাশয়-সম্পাদিত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬—১৯ পৃঃ ।

দোকানে অশ্রুত অস্ত্রের শ্রায় বিদ্যেযুচক কথাগুলিও মার্জিত এবং  
 তীক্ষ্ণ করা হইয়াছে ; কটুক্তি করিবার জ্ঞান এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবন-  
 দাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্ হৃদাস্ত  
 একটি শিশুর শ্রায় অকৃত্রিম ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু বৃন্দা-  
 বনদাসের ভর্ৎসনাপূর্ণ বচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখি-  
 তেছি মাত্র ; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাৎভাগে,  
 তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাঁহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয়  
 না পাওয়া যায়, এমন নহে ; চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের  
 কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে । ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই,  
 সংকীৰ্ত্তনকারিগণ এক রাত্রেই মরিয়া যায়, এজ্ঞ বৈষ্ণবদেবী সম্প্রদায়  
 কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্তমদাসের শবের পশ্চাৎ  
 পশ্চাৎ যাইবা করতালি দিয়া বাজ করিতেছে ; ইহার চৈতন্যদাসের  
 দারিদ্র্য ও পুত্রহীনতা বিস্মৃভক্তির ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং  
 “ইক্ষনমালা বলযিত বাহ । পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহ ॥ \* \* ভগ্ননে বীর ।  
 কীৰ্ত্তনে পতনে মগ্নশরীর ॥” প্রভৃতি তীব্র নিন্দায়ুক্ত শ্লোক রচনা  
 করিয়াছিল । ইহা ছাড়াও বৃন্দাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ  
 বর্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়, সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম লইয়া ইতরভাবে  
 পরিহাস চলিতেছিল, চৈতন্যভাগবতে এক স্থলে তাহার আভাষ আছে,—  
 “চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥ যারে সেই আঞ্জা করে ঠাকুর চৈতন্য । সেই  
 আসি অবিলম্বে হয় উপপন্ন ॥ এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত । সদা অধঃপাত তার  
 জানিহ নিশ্চিত ॥”—চৈ, ভা, মধ্য । বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ ; “মুদুনি কুসুমা-  
 দপি” তাঁহাদেরই জীবনে প্রমাণিত । সমুচিত উত্তেজনার কারণ না  
 থাকিলে তাঁহাদের বিনয় ভঙ্গ হয় নাই । পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়  
 প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জ্ঞান  
 অঙ্গীকৃত প্রীতির ফুল ভাঙ্গিয়া শূল প্রস্তুত করিয়াছেন ; মানুষ-রক্তে পৃথিবী



রঞ্জিত হইয়াছে । বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখনীমুখে মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জনীয় নহে ।

বৃন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে ( ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে ) ভাগবত রচনা করেন । এই বয়সে তাঁহার বিরাট ঘটনা রাশি চৈতন্যভাগবতের ঐতি-  
হাসিক মূল্য ।

আয়ত্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করাব ক্ষমতা জন্মিয়া-  
ছিল ; তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্য-ভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি ; বঙ্গদেশের যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাদিক পরিমাণে তজ্জ্ঞ উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে । চৈতন্যভাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা বেশী আবশ্যকীয় । প্রসঙ্গক্রমে ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদ্বৈতী সমাজ সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মুদ্রাবান্ পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে । ভক্তিমাত্র পাঠক বিনয় সহকারে চৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নবনাশ্রম মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন ; কঠোর ক্রোধপূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্যপ্রভুর যে মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত,—তাৎ প্রস্তরমূর্তির স্থাব স্থায়ী ও ছবির স্থায় উজ্জ্বল ; দৃষ্টান্তস্থলে চৈতন্যপ্রভুর গয়াগমন ও প্রত্যর্গমনের বৃত্তান্তটি বারংবার পাঠ করুন ।

চৈতন্য-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত । আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়াগমন পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । মধ্যমখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত ও অন্ত্যখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে । আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখণ্ড ষড়্বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ড মাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত ।

শেষখণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অত্র একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্ত-জীবন-বর্ণনায় প্রবর্তিত করে ; চৈতন্তপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিপুণ লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমরা যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব । চৈতন্তভাগবত বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেদধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্বদা বৃন্দাবন-দাসকে ‘চৈতন্তলীলার বাস’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ‘চৈতন্ত-ভাগবত’ ও ‘নিত্যানন্দবংশমালা’ ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায় ।

### ( ঘ ) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ।

লোচনদাস ১৪৪৫ শকে ( ১৫২৩ খৃঃ অব্দে ) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ

করেন ; ইহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস ;  
কবির পরিচয় ।

তাহার বাড়ী কোগ্রাম বর্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,—গুপ্তারা ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে । চুলভসার ও চৈতন্ত-মঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

“বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস । মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম । \* যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম ॥ কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা । শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা ॥ মাতৃকুল, পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে ॥ ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে । মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তমগুপ্ত । সর্ব্ব তীর্থ পূত তিহ, তপস্তায় তৃপ্ত ॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে জন্মি একমাত্র । সহোদর নাই মোর, মাতামহের পুত্র ॥ যথা বাই

\* একখানি প্রাচীন চৈতন্তমঙ্গলের পুঁথিতে ( ১১০৬ সনের হস্তলিপি, পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৪ সন ৪র্থ সংখ্যা, ৩১৩ পৃঃ ) দ্বিতীয় ছত্রটি এইরূপ পাওয়া যাইতেছে “মাতাসতী সুরপতি অরুন্ধতী নাম ।” এই দ্বিতীয় ছত্রটির যে দুইটি পাঠ পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোনটি বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয় না । “সদানন্দী” ও “সুরপতি অরুন্ধতী” দুইই বিবৃত পাঠের স্থায় শুনায় ; এই দুইটি পাঠ ভাঙ্গিয়া এইরূপ একটি ছত্র গড়া যায়, “মাতাসতী শুদ্ধমতি অরুন্ধতী নাম ।”

তখাই ছলিল করে মোরে । দুর্ল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে । মারিয়া ধরিয়া মোরে  
শিখাল আখর । ধন্ত সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার ।”

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত লোচনদাস ‘দুর্ল্লভ সার’ এবং ‘আনন্দলতিকা’

নামক আর দুই খানি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন  
করেন । চৈতন্যমঙ্গলই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ

কর্ত্তি । কথিত আছে তিনি ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সর-  
কারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৪  
বৎসর । যিনি “অহ্লাদে ছেলে” বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য  
করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে  
চৈতন্যমঙ্গলের আয় এত বড় ও সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণ-  
কথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না । বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তক-  
খানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের আয়  
প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে ।

কথিত আছে, কোন ঘটনা বশতঃ লোচনদাস তাঁহার জীবন সহিত  
চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী  
মহাশয় বলেন,—“গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই । ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দস্তোৎ-  
পাটিত সর্পের আয় খেলার বস্তু । দেখিতে সুন্দর কিন্তু দংশনের ক্ষমতা রহিত ।”

চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামেই অভিহিত ছিল,

কৃষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্যভাগবতকে ‘চৈতন্য-  
ভাগবত ও মঙ্গল নাম  
লইয়া বিরোধ ।

মঙ্গল’ নামেই উল্লেখ করিয়াছেন । কথিত  
আছে, লোচন দাসের গ্রন্থের নাম ‘চৈতন্য-

মঙ্গল’ রাখাতে বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে ; বৃন্দাবনদাসের  
মাতা নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনের পুস্তকের নামের ‘মঙ্গল’ শব্দ উঠাইয়া  
তৎস্থলে ‘ভাগবত’ করেন ; এইভাবে দুই কবির বিবাদে দুই মীমাংসা  
হয় । চৈতন্যমঙ্গলের প্রায় তাবৎ হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতেই

“বৃন্দাবনদাস বলিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে”—এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত প্রবাদ কতদূর সত্য, বলিতে পারি না।

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল; বৃন্দাবনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক গল্পের উপলব্ধি বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্তরূপ, চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্বর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তিনি ঘটনা প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই; তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ চাঁকিয়া ফেলিয়া নিশ্চল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলোকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেবলীলা; মাহুষী মহিমার শ্রেষ্ঠ-স্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিং চৈতন্যদেবের নিশ্চল দেব-হাস্তটুকু বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা পরক্ষণে দৈব ঘটনার আঁধারে লীন হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন পথহারী পথের স্রায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্ত অবকাশ চায়।

চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করি

না এবং বৈষ্ণবসমাজও সন্নিবেচনার সহিতই  
প্রামাণ্য নহে ।

ঐহার স্থান চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নে নির্দেশ করিয়াছেন । চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক বহু সংখ্যক-বার শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের সেরূপ উল্লেখ করেন নাই । ভক্তিরত্নাকরে নরহরিচক্রবর্তী চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহু সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই ।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা

একবারে নিপুণ নহে ; ৩০০ বৎসর কাল  
কবিত্ব ।

সাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশিষ্ট  
আয়ু বল আছে । চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর । লোচনদাসের  
লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের  
ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করণ  
ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ; বৃন্দাবনদাসের  
সাদাসিধা রচনায় কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানাভাষামিশ্রিত জটিল  
লেখায় কবিত্বের ঘ্রাণ নাই ; এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্ন-  
তত্ত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্য্যসহ এই ঘোর অরণ্য-পর্যটনশ্রম  
স্বীকার করিবেন না, কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের  
'সৌন্দর্য্য আছে ; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের নিষ্ফল খোঁজে  
পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দ-  
কুমুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে ।  
চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে  
অঙ্কিত হইয়াছে ;—

“চরণ কমল পাশে, নিখাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়নে । হিয়ার উপরে

খুইয়া, বাক্কে ভুজ লতা দিয়া, শ্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুক বাহিয়া পড়ে ধার । চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুশ্রিয়া পুছে আরবার ॥ মোর প্রাণশ্রিয়া তুমি, কাদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর । খুইয়া হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ কর, পুছে বাণী মধুর অক্ষর ॥ কাদে দেবী বিষ্ণুশ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া, পুচ্ছিতে না কহে কিছু বাণী । অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্বিধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানি ॥ পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবু, কাদে মাত্র চরণ ধরিয়া । প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, কহে বিষ্ণুশ্রিয়া স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া ॥ নানাক্রমে কথা-ভাব, কহিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষণ মুঞ্জরে । প্রভুর বাগ্মতা দেখি, বিষ্ণুশ্রিয়া চাদমুখী, কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্মাস করিবে নাকি তুমি । লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আশ্বনেতে অবেশিব আমি ॥ তো লাগি জীবন ধন, একপ যৌবন, বেশ লীল' রসকলা । তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীনে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা ॥ আমি হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ । বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে ॥ ষিক র'হ মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে । গহন কণ্টক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা তব যাবে সাথে সাথে ॥ শিরীষকুহুম যেন, স্বকোমল চরণ তেন, পরশিতে মনে লাগে ভয় । ভূমেতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া পড়এ পাছে গাএ ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, কেমনে হাঁটিবে রাজ্য পায় । স্বধময় মুখ ইন্দু, তাহে বর্ষ বিন্দু বিন্দু, অঙ্গ আয়াসে মাত্র দেখি । বরিষা বাদল ঠারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সন্মাস করণ বড় দুঃখী ॥ তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাই ॥ \* \* \* কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্মাস করিবে মোর তরে, তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, স্থখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে ॥”—চৈ, ম, হস্তলিখিত পুঁথি ।

কোণ্ঠামের নিকটবর্ত্তী কাঁকড়া গ্রামের (গুস্তরা ষ্টেসনের নিকট) বিখ্যাত

চৈতন্তমঙ্গলগায়ক শ্রীবৃদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর  
লোচনের হস্তলিপি ।

বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তলিখিত চৈতন্তমঙ্গল  
আছে । প্রাণকৃষ্ণ বলেন, “লোচনের আখর উঠানঘোড়া কএর মত ।” লোচন  
যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্তমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে ।

চৈতন্যমঙ্গল ও ৩ খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক ছোট, চৈতন্যভাগবতের অর্দ্ধাংশের তুল্য হইবে ।  
 অষ্টাশ্চ রচনা ।  
 লোচনদাস ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে ৬৬ বৎসর বয়স তিরোহিত হন, চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইহার ‘দুর্লভসার’ নামক অপর একখানি পুস্তক আছে ; এতদ্ব্যতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক স্মৃতিপদ রচনা করেন ।

এস্থলে বলা আবশ্যক বটতলার ছাপা চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ ;  
 উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই এবং তন্নিম্ন অষ্টাশ্চ  
 মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল  
 অসম্পূর্ণ ।  
 কতকগুলি স্থানও বর্জিত হইয়াছে । মহা-  
 প্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে হস্ত-লিখিত পুস্তকে  
 এই বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই ।

“বৃন্দাবন কথা কহে বাখিত অগুরে । সম্মুখে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বাবে ॥ সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল । সহরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে ॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না পায় । সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায় ॥ তখনে দুয়ারে নিজ লাগিলা কপাট । সহরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । নিবেদন করে প্রভু চাড়িয়া নিখাসে ॥ সত্য জ্ঞেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর । বিশেষতঃ কলিযুগ সংকর্ত্তন সার ॥ বৃণা কর জগন্নাথ পতিতপাবন । কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায় । বাহুভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥ তৃতীয় প্রহর বেল রবিবার দিনে । জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥ গুপ্তা বাড়ীতে ছিল পণ্ডা যে ব্রাহ্মণ । দেখিয়া সে কি কি বলি আইলা তখন । বিপ্রে দেখি প্রভু কহে শুনহ পড়িছা । ঘূচাহ কুপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥ ভক্তআর্তি দেখি পড়িছা কহয় কখন । গুপ্তা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল আদর্শন ॥ সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন । নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥ এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার । শ্রীমুখ চলিমা প্রভুর না দেখিব আর ॥”

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণের ঐক্য নাই ।

## কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত ।

চৈতন্য-চরিতামৃতরচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ খৃঃ অব্দে

বর্তমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য-  
কৃষ্ণদাসের পরিচয় ।

বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । \* তাঁহার পিতা  
ভগীরথ সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন ;  
কৃষ্ণদাসের বখন ৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতার কাল হয়, কৃষ্ণ-  
দাসের কনিষ্ঠ শ্রামদাস তখন ৪ বৎসরের শিশু ; এই দুই শিশুপুর লইয়া  
মাতা সুনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন  
পরেই কালগ্রাসে পতিত হন । কৃষ্ণদাস ও শ্রামদাস পিতৃদ্বসার গৃহে  
পালিত হন ।

সুতরাং কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত ; কিন্তু একদিন ব্যতীত  
কষ্ট তাঁহাকে কখনই অভিজ্ঞত করিতে পারে নাই, সে দিন—জীবনের  
শেষ দিন ; সে বড় গোচনীয় কথা, পরে বলিব । বালক কৃষ্ণদাস  
লিখিতে পড়িতে শিখিলেন, কিছু সংস্কৃত পড়িলেন ; জীবনে ভাগ্যের  
হাসিমুখ দেখেন নাই ; প্রকৃতি তাঁহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন ;  
ধাত্রীকোড়ে পালিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপে-  
ক্ষিত ছিলেন ; কিন্তু সংযত-চিত্ত কৃষ্ণদাস সংসারের ভোগ-সুখ ত্যাগী  
সহিত উপেক্ষা করিলেন ; তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই ।

একদিন নিত্যানন্দপ্রভুর সুবিখ্যাত ভৃত্য ‘মীনকেতন’ রামদাস  
ঝামটপুরে আগমন করেন ; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবপ্রভাবে  
মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উৎকৃষ্ট সংসারের চিত্র

\* মুকুন্দদেব গোস্বামী নামক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত “আনন্দ-  
রত্নাবলী” নামক পুস্তকে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে নানারূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন ।  
বিবর্তবিলাসগ্রণেতা চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিক্য প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত আখ্যান  
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম ।



তাহার চক্ষে পড়িল ; শ্রামদাসের চপল বাঁখিতওয়া যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন বাইতে স্বপ্নাদেশ করিলেন ; নিঃসম্বল কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা পাথৈয় নির্বাহ করিয়া তথায় উপনীত হন । যমুনার মূহ তরঙ্গ-নাদিত নীপিতকমুল, শ্রামতয়ালাবৃতকুঞ্জ বৈষ্ণবেব চিত্তে নানা উৎসে ভক্তির কথা সঞ্চারিত করে ; কৃষ্ণদাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাহার চিত্ত নিশ্চল,—শুভ্রপুষ্পসম ; স্মৃতরাং যখন সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, গোপালভট্ট ও কবিকর্ণপুর এই ছয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বাগিলেন, তখন সেই নিশ্চল চিত্তে ভক্তির কথা অতি সরস ভাবে চিরদিনের তরে অঙ্কিত হইয়া গেল ; এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে “গোবিন্দলীলামৃত” ও “কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী” প্রণয়ন করেন । তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় ও কবিশ্ব-শক্তি গোবিন্দলীলামৃতে বৈষ্ণবসমাজে বিদিত হয় । ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় “অদ্বৈতমূত্রকড়চা,” “স্বরূপবর্ণন,” “রাগময়ীকণা” প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন ।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ “চৈতন্যভাগবত” রীতিমত প্রতাহ সায়ংকালে

একত্র হইয়া পাঠ কবিতেন ; কিন্তু উহাতে

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচনা

আরম্ভ ।

চৈতন্য প্রভুর অন্তলীলা বিশেষরূপে বর্ণিত না

থাকায় বৃন্দাবনবাসী কালীশ্বর গোসাঁঞির শিষ্য

গোবিন্দ গোসাঁঞি, যাদবাচার্য্য গোসাঁঞি, ভূগর্ভ গোসাঁঞি, চৈতন্যদাস,

কুমুদানন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-

দাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের শেষ জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে

অনুরোধ করেন,—তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত অশীতিপর

বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সোপানাবলি, অতিক্রম

করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন ; এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া

তিনি একটু গোলে পড়িলেন ; পুস্তক আসিয়া গোবিন্দজীর আদেশমালা হস্তে আনিয়া দিয়া গেল, তখন সেই অনুরোধ আদেশের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না ।

কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয় ; বুদ্ধ ব্যাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিবেন,—এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির থাকে না । বন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা এক কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, রঘুনাথ-দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক রচনা শেষ ।

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমাব্যুধী অধ্যবসায় ১৬১৫ খৃঃ অব্দে (নয় বৎসরের চেষ্টায়) কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন ।\*

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলস্বলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই ; বন্দাবনের শীতল বায়ু ও নির্মল আকাশের তলে ভক্তির অবতার চৈতন্য-মুর্তি কৃষ্ণদাসের চিত্রে যেরূপ নির্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে ; গোড়দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন ; সুদূর বন্দাবনতীরে এই দলাদলির কলুষিত বায়ু বহে নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেই প্রসঙ্গ অবগত থাকিলেও সেই সব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই । বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় সূক্ষ-

\* “শাকে সিদ্ধাগ্রিবাণেন্দ্রো শ্রীমদ্বন্দ্বাবনাস্তরে ।

সুখ্যে হসিতপঙ্কম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥”

এই লোকটি চরিতামৃতে অনেকগুলি প্রাচীন ও অসামান্য পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে ।

মার ও বিনয়মাখা ; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পূর্ব-বর্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণদাস পত্রে পত্রে নারায়ণীমৃত বৃন্দাবনের প্রশংসা কবিয়াছেন, সেই প্রশংসোক্তি পড়িয় আমরা তাঁহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা করিয়াছি । চৈতন্যপ্রভব জীবন সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চার পরে চৈতন্যচরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ ; কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবোধতাগুণে এই পুস্তক পূর্ববর্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ । চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই ; বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে,—কিন্তু সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠানক্ষেত্রের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট কবে । বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য,—এই বহুগুণসম্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নতপ্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতাগুল্মপুষ্প হইতে বৃহৎ বনম্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে ।

কেবল অন্ত্যলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার বে যে স্থান বৃন্দাবনদাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সব স্থল বিচক্ষণ ভাবে পূরণ করিয়াছেন । দিগ্বিজয়ী ও বাহমানন্দ রায়ের সঙ্গে রিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে । পুস্তকখানি বহু সংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, ইহাব অনেক শ্লোক তাঁহার নিজের রচিত আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত ।\*

\* চৈতন্যচরিতামৃতে কোন কোন সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত

এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে, ১৭ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ২৫০০ ; মধ্য ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬০৫১ ;

ও অন্তে ২০ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬৫০০ ।

মহাপ্রভুর অন্তালীলা ।

অন্তখণ্ডে মহাপ্রভুর যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিগূঢ় ভক্তিরসাত্মক ; আমরা গোবিন্দদাসের কড়চায় চৈতন্যপ্রভুব উদ্দাম পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাঁহার ভাবের পূর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, পরক্ষণে তিনি স্তম্ভ হইয়াছেন ; তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পারিষ্কার একটা ব্যবচ্ছেদ-রেখা অনুভব করা যায়, কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাঁহার ভাবোন্ন-ত্ততা কচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহার জীবনে পূর্ব্বে যে ভাব মেঘাস্তরিত আলোক বেথার স্থায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেইভাব শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে ; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে । এই

করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, ( অনুসন্ধান ; ১৩০২ সাল ৫ম-সংখ্যা । ) তাহা এই ;—

(১) অভিজ্ঞান শব্দস্তলা, (২) অমরকোষ, (৩) আদিপুরাণ, (৪) উত্তরচরিত, (৫) উজ্জল-নীলমণি, (৬) একাদশী তত্ত্ব, (৭) কাব্য প্রকাশ, (৮) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (৯) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (১০) কৃষ্ণ-পুরাণ, (১১) ক্রমসন্দর্ভ, (১২) গড়পুপুরাণ, (১৩) গীতগোবিন্দ, (১৪) গোবিন্দলীলামৃত, (১৫) গৌতমীযতন্ত্র, (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (১৭) জগন্নাথবন্দন নাটক, (১৮) দানকলি-কৌমুদী, (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র, (২০) নাটকচলিতিকা, (২১) নৃসিংহপুরাণ, (২২) পদ্মাবলী, (২৩) পঞ্চদশী, (২৪) পদ্মপুরাণ, (২৫) পাণিনিমুক্ত, (২৬) বরাহপুরাণ, (২৭) বিষ্ণুপুরাণ, (২৮) বিদ্যাসুন্দর, (২৯) বিশ্বপ্রকাশ, (৩০) বারচরিত, (৩১) বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, (৩২) বৃহদ্রাধদীয়পুরাণ, (৩৩) ব্রহ্মসংহিতা, (৩৪) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (৩৫) বৈষ্ণবতোষিণী, (৩৬) বেদান্তদর্শন, (৩৭) ভগবদ্গীতা, (৩৮) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ, (৪০) ভক্তিলহরী, (৪১) ভাবার্থ-দীপিকা, (৪২) ভারতী, (৪৩) ভাগবতপুরাণ, (৪৪) ভাগবতসন্দর্ভ, (৪৫) মলমাসতত্ত্ব, (৪৬) মহাভারত, (৪৭) মনুসংহিতা, (৪৮) যামুনার্চাবৃত্তালকমন্ডারস্তোত্র, (৪৯) রামায়ণ, (৫০) রঘুবংশ, (৫১) রূপগোবিন্দীর কড়চা, (৫২) লঘুভাগবতামৃত, (৫৩) ললিতমাধব, (৫৪) স্তবমালা, (৫৫) শব্দতত্ত্ব, (৫৬) স্বরূপ গোবিন্দীর কড়চা, (৫৭) সাহিত্যদর্পণ, (৫৮) সংক্ষেপভাগবতামৃত, (৫৯) হরিভক্তিবিলাস, (৬০) হরিশক্তিসুখোদয় ।

ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অন্তর্থেও আঁকিয়াছেন । চৈতন্ত-প্রভু কখনও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গান্ধীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন, কখনও সলিল হইতে তাঁহার শিখিল অস্থি-বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার আকৃতিটি উঠাইয়া লোকবৃন্দ কর্ণমূলে, হরিনাম বলিয়া চৈতন্ত সঞ্চার করিতেছে ; কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকারমণীকে আলিঙ্গন করিতে কণ্টকবিন্দু পদে ছুটিতেছেন,—স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়াছে ; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাঁহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের জীবৎ তস্দ্ৰাবেশ হইলে পাগলের ত্রায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন ; শরীর বিশোণ, চন্দ্রসার,—“চন্দ্রমাত্র উপরে সন্নি আছে দীপ্ত হৈয়া । দ্বঃখিত হইলা সব প্রভুরে দেখিয়া ॥”—( চৈ, চ, অষ্ট ) । তাহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, “একটিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন । কৃষ্ণরাসলীলা হয় দেখিলা স্বপন ॥”—( চৈ, চ, অষ্ট ) । জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন ।

যদিও চৈতন্তচরিতামৃতের মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাষ্ট, কিন্তু এই ভক্তিবিহ্বলতার ক্রমবৃদ্ধজনিত দেহতাচ্ছল্যে পরিণামের ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাষ্ট ।

শেষ সময়েও ‘মা’ বলিয়া মধ্যো মনে হইত ; আশ্রমাদগের ধর্ম্মের কথা যেমন কোনও অতি শুভক্ষণে ছায়ার ইহ সংসারের স্মৃতি ।

ত্রায় মনে হইয়া লয় হয়, চৈতন্তপ্রভুরও সেট-রূপ ইহ সংসারের কথা কাচৎ ছায়ার ত্রায় মনে হইয়া বয় হইত ; জগদানন্দকে বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মায়ের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—“তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস । বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥”—( চৈ, চ, অষ্ট ) ।

চৈতন্তচরিতামৃতের দোষ ইহার ভাষা ; কবিরাজঠাকুর সংস্কৃত

রচনার দোষ ।

সুদক্ষ থাকিলেও বাঙ্গালার বড় নিপুণ ছিলেন না । বিশেষ, বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকাতে তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় বৃন্দাবনী-এরূপ মিশিবা গিয়াছিল যে, একজন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক কয়েকবর্ষ বাঙ্গালামূলকে থাকিলে যেরূপ বাঙ্গালা কহে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাটিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে । এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই তিনরূপ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত । কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষা এরূপ নহে, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গালাও পাওয়া যায় । ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব । চরিতামৃত পরিপক্ব লেখনীর রচনা, উহা সর্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্টরূপ উপযোগী ।

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই

কয়েকটি কথা লিখেন,—“আমি লিখি ইহ মিথ্যা  
রচনায় বিনয় ।

করি অনুমান । আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান ।  
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির । হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে আর হির । নানা রোগগ্রস্ত  
চলিতে বসিতে না পারি । পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি ॥”

কৃষ্ণিবাস, কালীরামদাস, প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিদ্ধি পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, “কালীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান” ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠান্ত্র বাঙ্গালীপাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাসের ভণিতায় বিনয়ের নূতন আদর্শ পাইবেন সন্দেহ নাই,—

“চৈতন্যচরিতামৃত বেইজ্ঞান শুনে ।

তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুঞি পানে ॥”—(চৈ, চ, অন্ত) ।

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম বুঝিয়াছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে

মাথায় বহিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল সে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে উপভোগ করেন ; পণ্ডিত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—“যে দিন এই পুস্তক পাঠ না হয় সেই দিনই বিফল ।”\*

এই পুস্তক লেখার পর তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধিত হইল—

এ কথা মনে উদয় হইয়াছিল ; এখন তিনি  
পুস্তক লুণ্ঠন ও কবিরাজের  
মৃত্যু । নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত  
ছিলেন । জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ

এই পুস্তক অমুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি গোঁড়ে প্রেরিত হয় ; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাষিরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে ; এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল । অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না । জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন,—“রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিলা দুজন । আছাড় খাইয়া কাদে লোটাইয়া ভূমে । বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে । অন্তর্দীন করিলেন হৃৎকের সহিতে ।”—প্রেমবিলাস । এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন “কবিরাজের অন্তর্দীনের কথা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুক কাটে ।” †

চরিতামৃতের ভাবী দেশব্যাপী যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে

\* নবভারত, ভাদ্র ১৩০০ ; ২৬৫ পৃঃ ।

† নবভারত, ভাদ্র ১৩০০, ২৬২ পৃঃ । ভক্তিব্রতাকরের সঙ্গে এই বৃহত্তর অনৈক্য ।

পারেন নাট—শেবে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথচক্রবর্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে ; কবিরাজ ঠহার একটু পূর্বাভাষ জানিয়া মরিলে আমাদের দুঃখ হইত না ;—তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়া-  
 ছিলেন । কবিরাজ প্রেমধর্ম এবং আরাধ্য ও  
 রচনার নমুন ।

আরাধকের সম্বন্ধবিষয়ে যে সুন্দর ব্যাখ্যা  
 দিয়াছেন,—তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল ;—

(১) “কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । লোহ আর হেম বৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ।  
 আশ্বেল্লিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম । কৃষ্ণল্লিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম ।  
 কামের তাৎপর্য নিজ সম্বোগ কেবল । কৃষ্ণস্থ তাৎপর্য মাত্র প্রেম ত প্রবল । লোকধর্ম  
 দেহধর্ম বেদধর্ম কর্ম । লজ্জা ধৈর্য দেহ স্থ অস্থস্থ মর্ম । সুভাজ আর্থাগম নিজ  
 পরিজন । স্বজন করিব বত তাড়ন ভৎসন । সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন ।  
 কৃষ্ণস্থহেতু করে প্রেম সেবন । ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দূত অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে  
 বেন নাহি কোন দাগ । অতএব কাম প্রেমে বহত অন্তর । কাম অঙ্গ তমঃ প্রেম নির্মল  
 ভাস্কর ॥”—(চৈ, চ, আদি) ।

(খ) “মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন । রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ।  
 মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন । রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ । যদ্যপি  
 আমার গঞ্জে জগৎ সুগন্ধ । মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্গগন্ধ । যদ্যপি আমার রসে  
 জগত সরস । রাধার অধররসে আমা করে বশ । যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিলু নীতল ।  
 রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল । এইমত জগতের স্থ আমা হেতু । রাধিকার  
 রূপ গুণ আমার জীবাঁতু । এইমত অনুভব আমার প্রতীত । বিচারি দেখিলে যদি সব  
 বিপরীত । রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন । আমার দর্শনে রাধা হুখে অগেহান ।  
 পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন । মোর ভ্রমে তমালে করে আলিঙ্গন । কৃষ্ণআলিঙ্গন  
 পাইলু জনম সকলে । এই হুখে মগ্ন রহে বৃদ্ধ করি কোলে । অনুকূল বাতে যদি পায়  
 মোর গন্ধ । উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ । তাবুল চর্কিত যবে করে আশ্বাসনে ।  
 আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে । আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ । শতমুখে  
 বলি তবু না পাই তার অন্ত ॥”—চৈ, চ, আদি ।



চৈতন্যপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির ক্ষুধা দেখাইয়াছেন ; তাঁহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটী অতি সুন্দরভাবে বিধিত হইয়াছে ; দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল,—“প্রভু দেখি বৃন্দাবনের রক্ষ লতাগণ । অকুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ । ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায় । বন্ধু দেখি বন্ধু ঘেন ভেট লৈয়া যায় ।” উন্নত ভক্তির আবেশে,—“প্রতি রক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন । পুষ্পাদি ধানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ।” তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু তরু-ফুলপল্লবের শিশিরবিন্দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল ; তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুল “কৃষ্ণ”-ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল ;—“শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে । প্রভুকে শুনারে কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে ।”

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র সমাবেশের সুযোগ ছিল । রামানন্দরায়ের প্রসঙ্গে চৈতন্যমুখোচ্চারিত—“পহিলি নয়ন রাগ ভঙ্গি গেল । সো নহ রমণ হম নহ রমণী ।” প্রভৃতি মধুর কথা এমন সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে যে তাহাদের মিষ্টত্বে শ্রুতি মুগ্ধ হইয়া যায়, এবং পবিত্রতায় চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয় ।

পূর্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি চাড়া কৃষ্ণদাসকবিরাজ “রসভক্তিলহরী” নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন ; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে ।

নরহরিচক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস ও

নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাস প্রভৃতি ।

পরবর্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্য প্রভুর পারিষদগণ ও অত্যাশ্রয় বৈষ্ণবা-

চার্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । চৈতন্ত-

নিজ্যানন্দ ।

প্রভুর সমস্ত জীবনচরিতগুলিতেই প্রসঙ্গক্রমে

\* এই পুস্তকের হস্ত-লিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না ।

নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা বৃন্দাবন-দাসের “নিত্যানন্দ-বংশাবলী”র কথা উল্লেখ করিয়াছি। নিত্যানন্দ-প্রভুর পিতামহের নাম স্বন্দরামলব্ধবীড়ুরী, পিতার নাম হরহাইওয়া ও মাতার নাম পদ্মাবতী—বাসস্থান বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অম্বিকাগ্রামের নিকট শালি-গ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরথেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত। জাহ্নবী-দেবীদ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পার্ণিগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ, \* পিতার

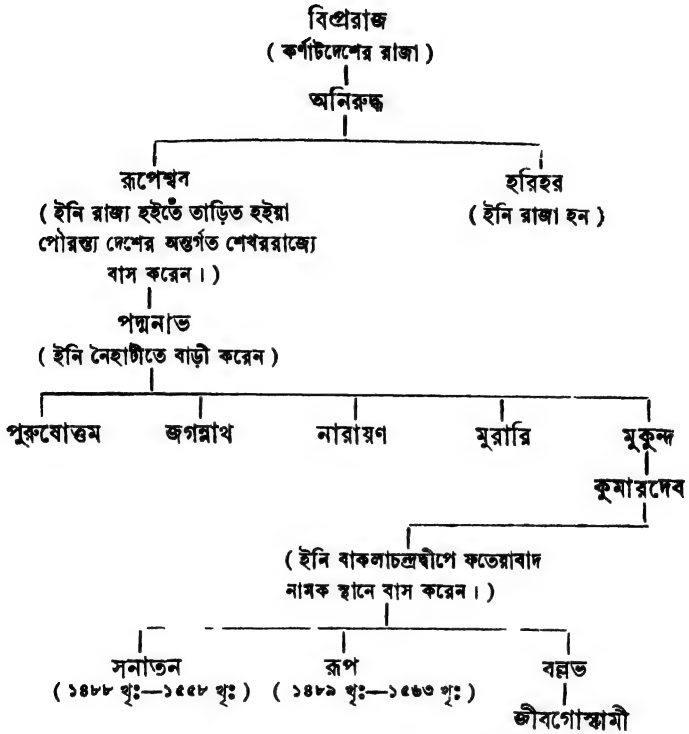
অদ্বৈতাচার্য্য।

নাম কুবেরপাণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্নীর নাম সীতাদেবী;—আদিম বাসস্থান ত্রিহটাস্তগর্ত নবগ্রাম, পরে শান্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; শ্রামদাসপ্রণীত “অদ্বৈতমঙ্গলে,” ঈশাননাগর-প্রণীত “অদ্বৈতপ্রকাশে” ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত “অদ্বৈতের বালালালা-মৃত” প্রভৃতি পুস্তকে ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের সম্বন্ধে

প্রাসঙ্গিক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপ-রূপসনাতন।

সনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত পার্শ্বচর। ইহার কণ্ঠাট্যধপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত। নিম্নে বংশাবলী প্রদান করিতেছি;—

\* “নৃসিংহ সম্ভতি বলি লোকে যারে গায়। সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধশ্রেষ্ঠদ্বিরাধ্য আর ওয়ার সম্ভতি। যাহার মন্ত্রণাবলে ত্রিগণেশরাজ। সৌভীষ্য বাদসাহ যারি গোড়ে হ’ল রাজ।”—ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশ। এই “নাড়িয়াল” বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে কখনও “নাড়াবুড়া” কিম্বা শুধু “নাড়া” বলিয়া আহ্বান করিতেন।



রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ;  
ঈঁহার একদিকে গুচ্ছাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রাতিভাপন্ন কবি বলিয়া  
প্রসিদ্ধ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা ক্রমেতে ঈঁহার  
আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হইয়াছেন । \*

\* সনাতন গোস্বামী ‘দিক্‌প্রদর্শিনী’ নামক ‘হরিভক্তিবিলাসের’ টীকা, শ্রীমদ্ভাগবতের  
দশম স্কন্ধের ‘বৈকবতে’-বিগী নামক টীকা, ‘লীলাসুত’ ও ‘টীকাসহ দুইখণ্ড ভাগবতাস্ত’  
প্রণয়ন করেন । রূপগোস্বামী ‘হংসদূত’, ‘উদ্ধবসংলেশ’, ‘কৃষ্ণকথ্যভিধি’, ‘গণোদ্দেশ-  
লীপিকা’, ‘সুবমালা’, ‘বিদম্বাধব’, ‘ললিতমাধব’, ‘দানকলি-কৌমুদী’, ‘অমলমহোদধি’,  
‘ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি’, ‘উদ্ধল নীলমণি’, ‘প্রবক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা’, ‘মধুরামহিমা’, ‘পদ্যাবলী’,

পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বাতীত বেকটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট,

মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর ( ১৪৮৬ খৃঃ—১৫১৪-  
ভক্তান্ত ভক্তগণ।

খৃঃ ), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র  
রঘুনাথদাস, ( ১৪৯৮ খৃঃ জন্ম ), শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর  
( চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক-প্রণেতা ) প্রভৃতি মহাপুত্র পান্ধুর পার্শ্বচরগণের  
বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়।

ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের বৃত্তান্ত অনেক প্রাচীন পুঁথি-  
তেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয় ; পদসমুদ্রের একটি পদে তাঁহার এইরূপ পরিচয়  
আছে ;—“শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভক্তাবতী গর্ভজাত। ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর  
দাস, শ্রীগোরাঙ্গপদাশ্রিত। শান্তিলাপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ধীর, স্তবর্ণবদিক্ খ্যাতি।  
রাধাকৃষ্ণপদ, ধায় নিরন্তর, বৈষ্ণুকুলেতে উৎপত্তি। বিষয় বাঞ্ছা, সাংসারিক কার্য,  
মলপ্রায় তাগ করি। পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে হইলা বিবেকাচারী। নীলাচলপুরে  
প্রভু মিলিবারে, সদা ইতি উতি ধায়। আশাখুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া  
ধায়। প্রভুভক্তগণ, পাই নিজ জন, রাখিয়া বচন করি। এ দাসমুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ  
দত্তের দৈন্ত্যতা হেরি।” স্বর্গীয় হারাধনদত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় আপনাকে  
উদ্ধারণ দত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। \*

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অষ্টেতাচার্য্য ও গদাধরদাস একসময়ে

যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে  
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও  
শ্রামানন্দ ;

শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রামা-  
নন্দও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন

‘নাটক-চন্দ্রিকা’, ‘লঘুভাগবতামৃত’, ‘গোবিন্দবিরূদাবলী’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।  
জীব গোবিন্দীর ‘হরিনামানুতবাকরণ’, ‘সুত্রমালিকা’, ‘কৃষ্ণার্চনলীপিকা’, ‘গোপাল  
বিরূদাবলী’, ‘মাধবমহোৎসব’, ‘সকলকল্পরুক’, ‘ভাবার্থচূচকম্পু’ প্রভৃতি ২৫ খানা  
সংস্কৃতগ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ ভক্তিরত্নাকর, প্রথম  
তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

\* হারাধনদত্তের মতে উদ্ধারণদত্ত ১৪৮১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা  
লক্ষ্মণসেনের ঐশ্বর্য্যতম অমাত্য উদ্যোগতিথর ভবেশদত্তের শ্যালক ছিলেন। ভক্তিনিধি  
মহাশয় বলেন, এই ভবেশদত্তই উদ্ধারণ দত্তের আদিপুরুষ।



উদ্ধারণদত্তের প্রতিমূর্তি ।



কি বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত । ইঁহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্তির প্রাপ্তে দাঁড়াইয়া আমরাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় ; বটতলার কৰ্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশমাত্র এপর্যন্ত মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছে । কীট, অগ্নি ও তাচ্ছিল্যের হস্তে বৎসব বৎসর এই প্রাচীন কীর্তিবাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । তাহা-দিগকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখন পর্য্যন্ত হয় নাই ।

শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধরচক্রবর্তী নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাপন্দ্রগ্রামে ; গঙ্গাধর শেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রহণ কবেন ; শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজিগ্রামে । নবোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুত্রের কায়স্থ বাজা কৃষ্ণানন্দদত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথগোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন । নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও রঘুনাথদাসের শ্রায় সংসারতাগী হন ; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষদত্ত ( পুরুষোত্তমদত্তের পুত্র ) তৎস্থলে রাজা হন ; এই সন্তোষদত্তই শ্রীখেতুরীর ষড়্‌বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে একত্রিত করেন ।

শ্রামানন্দ দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্ণমণ্ডল নামক এক সন্ধ্যোপের পুত্র, মাতার নাম হুরিকা । বাল্যকালে ইঁহাকে সকলে ‘হুংখী’ বলিয়া ডাকিত, তৎপর ‘কৃষ্ণদাস’ ও বৃন্দাবনে বাস-কালে ‘শ্রামানন্দ’ আখ্যা প্রাপ্ত হন । ইঁহার দীক্ষাগুরু নাম হৃদয়চৈতন্য ।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভমধ্যে এই তিন জন গেমবীর বৈষ্ণবসমাজে প্রোত্ভূত হন । ইঁহাদের মধ্যে কেবল মাত্র শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস শূদ্র হইলেও বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে কবি বসন্ত-

রায় ও গঙ্গানারায়ণচক্রবর্তী সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছন্দবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী পঞ্চপন্নীর রাজা নৃসিংহের সমস্ত সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্মে প্রবর্তিত করেন। সেই সব পণ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্বন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বারা তাঁহার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সক্ষম হন নাট; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণটি যে শূদ্রপ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পঞ্চপন্নীরাজকেও তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর

হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার,—

ভক্তিরত্নাকর।

প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথচক্রবর্তীর শিষ্য, জগন্নাথচক্র-

বর্তীব পুত্র,—গঙ্গাতীরবাসী নরহরিচক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ। নরহরিচক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর—রত্নাকর সদৃশই বিরাট এবং বঙ্গাকরের গর্ভে যে রূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ঠিতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেই-রূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহা হইতে সার উদ্ধার করা বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার কার্য্য, সন্দেহ নাট। সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় নিয়ম জানার উপায় নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠ্যরস ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একটরূপ ব্যাপার।

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে, প্রাসঙ্গিক একটি কথা।

বলা আবশ্যক। ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে

ইউরোপের ইতিহাস।

হইলে, স্বাধীনতার জন্ত বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ,

লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। বক্তৃতামালা উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টার শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, কিম্বা নবদেশ আবিষ্কারচিন্তায় প্রণাস্তসাগরের শান্তি ভাঙ্গিয়া বর্ষরের পত্রাচ্ছন্ন কুটারে লণ্ডাঘাত পূর্বক



তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানাহেঁচড়া করা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্টি, মুষ্টির শব্দ ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধূমপটলে গ্রন্থপত্র যেন বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ব্যাপারেরই যেন এক নব সংস্করণ। উহাতেও অকথ্য অত্যাচার ও নর শোণিতলিপ্সার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বৈষ্ণবোক্তিহাসের লক্ষ্য অনুরূপ; মুণ্ডিতমস্তক, ভুল্লুপ্তিত,  
বৈষ্ণবের লক্ষ্য। তুলসীমালাবিরাজিত বৈরাগীই এই সব গ্রন্থের

নায়ক; খোলবাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখক-  
গণ যেরূপ আগ্রহে বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় ইউরোপীয় লেখকগণ  
ব্রূচ্য কি করটেজের যুদ্ধনীতিরও ততদূর প্রাণসা করিবেন না; কীর্ত্ত-  
নের কথা বলিতে গদগদ ভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা  
করিয়াছেন—তাহা পাঠকের ধৈর্য্যের একরূপ অগ্নিপরীক্ষা। বর্ণিতগ্রন্থ  
সকলের নায়কগণ “অশ্রুকম্পস্বেদাদিভূষিত” (ভক্তিরত্নাকর ৩য় অধ্যায়ে)  
হইলেই তাঁহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাঁড়ান। পাঠক অমু-  
মান করিবেন না, আমি বিক্রপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহি-  
রের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি—“অরসিকে তু রসস্যা নিবেদনঃ  
শিরসি মা লিখ মা-লিখ।” আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবগণের নিকট  
এই সব পুস্তক এবং তদ্বর্ণিত প্রাণসাপূর্ণ বিষয়গুলি—অমূল্য,  
বাহিরের লোক অনধিকারী ও ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতি-  
হাস-লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই সব গ্রন্থের কীট কাড়িয়া, ম্যাগ্নিফাইং  
গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়া—লুপ্ত কথা কল্পনার দ্বারা গাঁথিয়া  
অগ্রসর হইলে অনেক লাভজনক মাল মসলা পাইতে পারিবেন, নানাধিকৃ  
হইতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্র পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া  
দাঁড়াইবে।

ভক্তিরত্নাকরে মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর

ভক্তিরত্নাকরের  
নৃত্য ।

পূৰ্ব্বপুরুষগণের বিষয়, গোস্বামিগণের গ্রন্থ  
বর্ণন, ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত ; দ্বিতীয়  
তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা ;  
তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে গোঁড়ে ও বৃন্দাবনে গমন-  
বৃত্তান্ত ; পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রঘুবপাণ্ডিতের ব্রজ-  
বিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদবর্ণন ও শ্রীনিবাস, শ্রামানন্দ প্রভৃতি  
গোস্বামিগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গোঁড়াভিমুখে যাত্রা ; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণু-  
পুরের রাজা বীরহাষির কর্তৃক গ্রন্থ চুরি ও পরিণেমে বীরহাষিরের দৈব-  
ধর্মগ্রহণ ; অষ্টমে শ্রীনিবাসের রামচন্দ্রকে শিষ্য করা ; নবমে কাঁচাগাঞী  
ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা ; দশমে ও একাদশে জাহ্নবীদেবীর  
তীর্থাদি-দর্শন-বৃত্তান্ত ; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও ঈশানকর্তৃক  
নবদ্বীপ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ; ত্রয়োদশে আচার্য্যমহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও  
চতুর্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীৰ্ত্তন ; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্রামানন্দকর্তৃক  
উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে : ৫ম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্তা  
রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং  
প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি  
চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পূজা পাইবেন । বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের তিনি  
যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায়  
এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অক্ষিত থাকিবে । ম্যাণ্ডিভাই-  
লের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউনসঙ্গের অঙ্কিত কুশীনগর হইতেও  
নরহরির হস্তে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে ।

ভক্তিরত্নাকরে—বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ,

ভাষাগ্রন্থের আদ্য ।

ঋন্দপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, লঘু-

তোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশ-

দীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপদ্য, গোপালচম্পু, লঘুভাগবত, চৈতন্য-

চন্দ্রোদয়নাটক ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচাবত, উজ্জলনীলমণি, গোবর্দ্ধনাশ্রয়, হরিশক্তিবিলাস, স্তবমালা, সংগীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্রামানন্দশতক, নথুবাথগু প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ; সংস্কৃতশ্লোক প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তবে উহা এদেশের চিরাগত প্রথানু-যায়ী ; নবহবি শুধু প্রথানুগামী নহেন, একটি নূতন প্রথার প্রবর্তক । ভক্তিরস্নাকবে চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা দ্বারা নরহরিশি সর্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মানিত করিয়াছেন । ভক্তিরস্নাকবে গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস, রায়বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদকর্তার পদ সাময়িকপ্রসঙ্গ সৌষ্ঠবার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে—তিনি নিজেও অনেকগুলি স্থায়ী পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভাণ্ডার স্থায়ী অপর নাম ‘ঘনশ্রাম’ ব্যবহার করিয়াছেন । এই পুস্তক বাতীত নরহরি, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস-

চরিত, ও নরোত্তম-বিলাস রচনা করেন ।  
নরহরির অপরায়ণ রচনা ।

এই অপরিসীম কণ্ঠঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীর্তি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাটরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রেমের জয়-চিহ্নাক্তিকেতু দ্বারা স্থায়ী যশের স্বর্গ স্পর্শ করিতেছে ; নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পাষণে কুসুম সৌরভ প্রদান করিয়াছেন । নরোত্তম-

বিলাস বোধ হয় তাঁহার শেষ গ্রন্থ,  
নরোত্তম-বিলাস ।

এই পুস্তকে ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে ; ভক্তিরস্নাকর হইতে ইহা অনেক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণতশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ; ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্তু

উপকরণরাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ করার শক্তি ভক্তিরত্নাকর হইতেও অধিক লক্ষিত হয় ।

সম্ভাষণদত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহা-  
সমারোহজনক উৎসব করেন তাহাতে  
খেতুরীর উৎসব ।  
তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহৃত  
হন । এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিত-  
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; এই উৎসব, অতীত ইতিহাসের ছনিরীক্ষ্য  
ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ ; ইহার  
প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক  
জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি ; ইঁহারা ছায়ার 'ত্বার  
ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই ক্ষণিক  
সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪  
শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি ; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-  
লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে ।

নরহরির ইতিহাস রচনা সাদাসিধা,—গদ্যের ত্বায় ; গদ্য লেখার  
প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয়  
রচনার নমুনা ।

পদ্যচ্ছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না ।

রচনার নমুনা এইরূপ,—

“আচার্য্য অধৈর্য্য বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া । নরোত্তমে কৈলা স্থির বক্ষে প্রবোধিয়া ॥  
প্রসাদী পাকান্ন ৭ব লৈয়া ধরে ধরে । অতি লীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে ॥ সকল  
মহান্ত অতি কহে বারে বার । কালি এ খেতুরি গ্রাম হবে অন্ধকার ॥ পদ্মাবতী পার  
হৈয়া পদ্মাবতী ভীরে । করিবেন নান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥ তথা ভুল্লিবেন এই প্রসাদী  
পাকান্ন । বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন । আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন ।  
সেই সঙ্গে পাককর্ত্তী করিবে গমন ॥ রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইবেন তথা । বুধরি হইতে  
উঁরা আসিবেন এথা ॥”—নরোত্তমবিলাস ।

এই আড়ম্বরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন তখন গৌরচরিত চিন্তামণি । তাঁহার লেখনী মুখ হইতে এক অতি মুগ্ধ-কর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে ; তাঁহার পদ সমূহ সর্বত্র সুপরিচিত । “গৌরচরিতচিন্তামণি” খানি নানামধুরালাপ-সম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ত্রায় ; নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল ;—

“নিশি গত শশিদরপ দূরে । অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে ॥ পতিবিড়ম্বনলজ্জিত মনে । লুকাইল তারা গগনবনে ॥ নদীয়ার লোক জাগিল স্বরা । তেঁই বলি শেজ তেজহ গোরা ॥ মোরে না প্রভায় করহ যদি । তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥ \* \* \* ময়ূর ময়ূরী পৃথক আছে ॥ কেহো না আইসে কাহারো কাছে । বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে ॥ তুমি না দেখিলে না নাচে তারা । ভ্রমর ভ্রমরী কচির কুঞ্জে । তুলি না বৈসয়ে কুহুম পুঞ্জে ॥ কারে শুনাইব বলি না শুঞ্জে । ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা ॥”—২য় কিরণ ।

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা ২৭৭ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করিয়াছি ; ইঁহার অপর নাম বলরাম-দাস,—ইনি ত্রীখণ্ডনিবাসী আত্মবামদাসের পুত্র, বৈদ্যবংশসম্ভূত ও ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী । ইনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ।

প্রেমবিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত । ইহাতে ত্রীনিবাস ও শ্রামানন্দের কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে ; প্রায় ৩৫০ বৎসর হয়, নিত্যানন্দ-দাস প্রেমবিলাস রচনা করেন ; ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহার রচনা জটিল ; একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

### প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন ।

“ছুই মহাশয়ের ৭৭ যে লিখিত আছে । পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে ॥ এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা । দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা ॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার । তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার ॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ

তুমি মহাশয়। তোমারে বাকুল দেখি কার বাহু হয়। নানাযত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল। সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাজবিরহ-বাধি দ্বিগুণ বাড়িল। চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন বন্দাবন। সখিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে বান গৌরব করিয়া। দুই ভাই দুই জ্বা যত্ন করি বৃকে। ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় হুখে। দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পত্রের মাধুরী। পত্রের গৌরব শুনি হুচ্ছিত হইলা। আসন বৃকে করি ভট্ট কাদিতে লাগিলা। যত্ন করি শ্রীরূপ করেন কিছু স্থির। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন খীর। সনাতন কহে ভট্ট শুন গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি। প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব। প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কাদিতে লাগিলা।”

২৭৬ পৃষ্ঠায় যদুনন্দনদাসের ‘কর্ণামৃত’ নামক গ্রন্থের উল্লেখ কনিয়াছি,—ইহা আকারে চৈতন্যচরিতামৃতের অর্দ্ধেক হইবে; কর্ণামৃত ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত; এই পুস্তকে শ্রীনিবাসআচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন;—

“বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতি \* নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে। পঞ্চদশশত আর বৎসর উনত্রিশে। † বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে। নিজপ্রভুপাদ-পদ্ম মন্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া।”

শ্রেমদাসের (অপর নাম পুরুষোত্তম) “বংশী-শিক্ষার” নামও ২৭৬ পৃষ্ঠায় আমরা একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি; “বংশীশিক্ষা”—আকারে যদুনন্দনদাসের ‘কর্ণামৃতের’ তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাজপার্শ্বদ বংশীদাসঠাকুরের জন্মাদি ও তাঁহার শিক্ষাপ্রসঙ্গবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। শ্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন।

\* শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী।

† ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রষ্টাব্দ।

তাঁহার উপাধি “সিদ্ধান্তবাগীশ” ছিল। ইনি “বংশী-শিক্ষা” ও স্বকৃত “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ” সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,—

“শকাব্দিতা বোলশত চৌত্রিংশ শকেতে । \* খ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রুখেতে ।  
লৌকিক ভাষাতে মুদ্রি করিহু লিখনে । বোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে । † খ্রীশ্রীবংশী-  
শিক্ষা গ্রন্থ করিহু বর্ণন । নিজ পরিচয় তবে শুন ভক্তগণ ॥” বংশীশিক্ষা ।

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ আমরা ঐতিহাসিক ভাবে বিশেষ  
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি  
অদ্বৈত প্রকাশ ।

না, ইহাতে ঈশাননাগর নিতান্ত অতি-প্রাকৃত  
কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে একটি কল্পনার সূত্রে  
জড়াইয়া ফেলিয়াছেন । অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মহাদেবভাবে ক্ষীরসমুদ্রতীরে  
তপশ্চায় মগ্ন, শ্রীহরি গৌরাবতারের কথা অঙ্গীকার করিয়া শূলপাণিকে  
অদ্বৈতরূপে পূর্ব্বেই মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন, মুখবন্ধটি  
এইরূপ । তৎপর গৌরান্ন জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অদ্বৈতরূপী  
মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন । সেই সদ্যঃজাত শিশু স্বর্গ মর্ত্যের  
নানা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর সেই কথাবার্তার  
সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ।

এই সমস্ত অমামুখীতত্ত্ব প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের সর্ব্বত্রই স্থলভ ; কিন্তু  
পুঁথির অধিকাংশ পৃষ্ঠাই যদি তদ্বারা পূর্ণ করা যায়, তবে পাঠ করিবার  
দৈর্ঘ্য রাখা কঠিন হয় ; ঈশাননাগর নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই  
অংশের যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন, তবে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইতে  
পারিত,—তাঁহার বর্ণনাশক্তি বেশ ছিল,—লেখা সহজ, সুন্দর ও তন্মধ্যে  
কবিত্বের একেবারে ক্ষুরণ না ছিল এমন নহে । তিনি শ্রুত কথার উপর  
এবম্বিধ প্রাণচালা আস্থা স্থাপন না করিলে ভাল হইত,—যেটুকু নিজে

\* ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ ।

† ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ ।

দেখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গগুলি বেশ সরস হইয়াছে । প্রস্থশেষে নিজের কথা, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অবস্থা, শান্তিপুরে গৌরান্ধ্রমিলন, এ সকল আখ্যান উপাদেয় হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণ রসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াছে । এখানে এ কথাও বলা আবশ্যিক,—প্রাচীন পুঁথি কোন খানিই একবারে মূল্যহীন নহে,—অদ্বৈতপ্রকাশেও কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে । মহাপ্রভুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্বে অদ্বৈত আবির্ভূত হন, —(“অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল । তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ॥”) তাঁহার জীবন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫ বৎসর এই ঘোর কলিযুগে কাল্মনিক আয়ু বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু আমরা ঈশাননাগরকে এ বিষয়ে অবিশ্বাস করি নাই ।—“সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে । অনন্ত অর্কদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥”—অবশ্য “অনন্ত অর্কদ লীলা” সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে,—কিন্তু প্রভুবর্গের খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, এ সমস্তই যখন ভক্তগণ লীলা সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপত্তির কোন কারণ নাই । অদ্বৈত ১৪৩৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল । আরও জানা যাইতেছে অদ্বৈতপ্রভুর পূর্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গোড়ের হিন্দু সম্রাট রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন ।—“সেই নারসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি । সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি ॥ বাহার মন্ত্রণা বলে শীগণেশ রাজা । গোড়ীয় বাদসাহ মারি গোড়ে হৈল রাজা ॥” এই নাড়িয়াল বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতকে “নাড়া বুড়া” কিম্বা শুধু “নাড়া” বলিয়া আহ্বান করিতেন এ সকল কথা আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । ইতিপূর্বে বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবি বিদ্যাপতির দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা অদ্বৈতপ্রকাশ ভিন্ন অথ কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই । অদ্বৈত প্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ-আচার্য্য, ও তাঁহার উপাধি ছিল “বেদ-পঞ্চানন ।” মহাপ্রভু অদ্বৈতের নিকট



কতকদিন পড়িয়াছিলেন ও ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে চৈতন্যদেবের পূর্ণনাম এইরূপ পাওয়া গেল,—“ত্রিবিম্বস্তর মিশ্র বিদ্যাসাগর”—এই উপাধি-বিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ । অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পবে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক চিত্রপট । সেই চিত্র শোকে স করুণ, ব্রত উদ্‌বাপনে পবিত্র ও কঠোর পাতিব্রত্যে মহিমাম্বিত,—এই চিত্রের বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি সর্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত,—ঈশাননাগর চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দিখিয়া এস্থলে করুণার প্রসবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন ।

এস্থলে ঈশাননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক । ঈশান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৪৯২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন,—তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিধবামাতা অদ্বৈতপ্রভুর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদবধি ঈশান সেইখানে । ঈশান ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অদ্বৈতরমণী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন । ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, পবিত্র কৌমারব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নৈতিক জীবনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইবে । শাস্তিপুরে একদিন তিনি মহাপ্রভুর পা গোয়াইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া ধারণ করেন । তখন ঈশান উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—ঈশান ধর্ম্ম-জগতে সত্যই একটি বলবান্ পুরুষ ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে ।

কেহ কেহ বলেন, ঈশান পদ্মাতীবস্থ তেওথা গ্রামে বিবাহ করেন,—ইহাতে পারে । অদ্বৈতপ্রকাশে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয় । তিনি বৃদ্ধকালে ত্রিহট্টস্থ লাউড় বাইয়া ধর্ম্ম প্রচাৰ করিতে আদিষ্ট হন,—লাউড় রাজ্য নষ্ট হইবার পরে তাঁহার বংশধরগণ গোয়ালন্দ্রের নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ।

অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুত-শিষ্য হরিচরণদাস একখানি অদ্বৈতজীবনী  
 প্রণয়ন করেন ; শ্রীহট্টস্থ নবগ্রামবাসী বিজয়-  
 হরিচরণদাসের অদ্বৈত-  
 মঙ্গল ।

দেবীব মাতুল ছিলেন । হরিচরণদাস অনেক  
 কথাই তাঁহার নিকট শুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন । এই  
 পুস্তক ২৩ “সংখ্যায়” (অধ্যায়ে) বিভক্ত । ঠিকাতে জানা যায় অদ্বৈতপ্রভুর  
 ৬ জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন ; তাঁহাদের নাম,—১ । লক্ষ্মীকান্ত, ২ ।  
 শ্রীকান্ত, ৩ । শ্রীহবিহরানন্দ, ৪ । সদাশিব, ৫ । কুশল, ৬ । কীর্ত্তিচন্দ্র ।  
 আরও জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভু মাঘমাসেব সপ্তমীতিথিতে জন্মগ্রহণ  
 করেন, উহা অবশ্য ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে হইবে । শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু  
 মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায়  
 একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ।

নরহরিদাস শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নবহরিসবকার নহেন, বন্দনাসূচক একটি  
 পদে লিখিয়াছেন, “জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী ।  
 নরহরিদাসের অদ্বৈত-  
 বিলাস ।

যার প্রাণ সর্বস্ব শ্রীগৌর গুণরাশি ।” নিজের পরিচয়-  
 স্থলে শুধু “স্বাত আকঞ্চন”, “মহামুখ” প্রভৃতি  
 সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় দেখাইয়াছেন । বন্দনার পদগুলির  
 একটি কৃষ্ণদাস কবিরাজেব উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকার  
 কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্তী এইমাত্র জানা যাইতেছে ।

এই পুস্তকে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই নাই;  
 অদ্বৈতের জন্ম, তাঁহার শৈশবের হামাগুড় ও কথা বলিতে শিক্ষা সম্বন্ধে  
 দীর্ঘ বর্ণনা আছে, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা সকল শিশু সম্বন্ধেই বর্ণিত  
 হইতে পারিত, অদ্বৈতসম্বন্ধেও সেই প্রসঙ্গগুলি আড়ম্বরের সহিত  
 লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এতদ্বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের  
 কোন নূতন পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই । আমরা যে পুস্তকখানি পাই-

রাছি, তাহা খণ্ডিত,—মাত্র ১৫ পত্র । রচনা বেশ প্রাজ্ঞ ও মধুর ; একটুকু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি :—“নদীয়া বেষ্টিত গঙ্গা বহে হনির্দল । অপূৰ্ণ তরঙ্গ ছক্ক জিনি খেত জল ॥ শ্রোতজল পরিপূর্ণ শোভার অবধি । বুঝি কুন্দমালা নবদীপে দিল বিধি ॥ বলমল করে গঙ্গাতট মনোরম । শত শত ঘাটশ্রেণী অতি অনুপম ॥ নানা জাতি বৃক্ষ শোভা করে সারি সারি । বিবিধ প্রকার লতা সৰ্ব্ব চিত্তহারী । স্থানে স্থানে নানা জাতি পুষ্পের কানন । তাহে মহামত্ত হৈয়া ভ্রমে ভৃঙ্গণ ॥ নানা পক্ষী শব্দ করে অতি মনোহর । মৃগ আদি পশু তথা ফিরে নিরন্তর ॥”—পরিষদের পৃথি ৫৬ পত্র ।

অষ্টমের দুই স্ত্রী—শ্রী ও সীতা ; সীতা যাকুরাণীর প্রভাব সেই সময়ের বৈষ্ণবসমাজের উপর বিশেষরূপে পরি-  
 লোকনাথদাসের লক্ষিত হয়, অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতাঠাকু-  
 সীতা চরিত্র । রামের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হন ।

লোকনাথ দাস ‘সীতা-চরিত্রে’ এই সুচারিত্রা রমণীর জীবন বর্ণনা করিয়া-  
 ছেন । সীতা-চরিত্র বিশেষ বড় পুস্তক নহে, ইহা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ।  
 রচনা সহজ ও সুন্দর, কিন্তু অগৌকি ঘটনাপূর্ণ, ঐতিহাসিকের নিকট  
 এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইবে কি না সন্দেহ । শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ  
 তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, ‘সীতাচরিত্র’ লেখক লোকনাথদাস আর  
 প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ অভিন্ন ব্যক্তি । বৈষ্ণব জগতের গুরু  
 স্থানে সমাসীন, মহাপ্রভুতে তল্লতপ্রাণ, যশোহর তালখড়ি গ্রামবাসী পদ্ম-  
 নাভ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিম্পৃহ  
 বৈষ্ণব, উদাসীন ও ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে  
 চৈতন্ত চরিতামৃতের তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন,—কোনও  
 রূপ খ্যাতি লাভে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে সীতাচরিত্র লিখিয়াছেন,  
 তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই । তাঁহার  
 ন্যায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্যের রচিত কোন পুস্তক থাকিলে বৈষ্ণবসমাজে  
 তাহার বহুল প্রচার থাকিত ; অস্তুতঃ পরবর্তী বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের

অনেকখানিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত । সীতা চরিত্রে চৈতন্য চরিতা-  
মূর্তের উল্লেখ পাওয়া যায় । শেষোক্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ  
গোস্বামী সীতা-চরিত্র লেখা আরম্ভ করিলে, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম  
অনুমান ৭তম বৎসর হইবার কথা \* নানা কারণে ভক্তপ্রবর লোকনাথ  
গোস্বামী ‘সীতাচরিত্র’ লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না ।  
‘সীতাচরিত্রে’ দুএকটি নূতন কথা পাওয়া গিয়াছে ; মহাপ্রভুর তিরোধানের  
পরেও শচীদেবী জীবিত ছিলেন, নান্দনী ও জঙ্গলী নামক সীতা ঠাকুরাণীর  
দুই শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের অনেক আশ্চর্য্য শক্তির কথা, জামুরায়ের  
প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে প্রাসঙ্গিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

টাইঘাটবাসী গোপীবল্লভদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় একাক পঞ্চদশ

রসিক মঙ্গল । ৭তমাব্দীর মধ্যভাগে “রসিক-মঙ্গল” নামক

পুস্তক প্রণয়ন করেন । প্রসিদ্ধ শ্রামানন্দের  
প্রধান শিষ্য রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই বর্ণনার  
বিষয় । গ্রন্থকার রসিক মুরারির শিষ্য ছিলেন । তিনি নিজ পিতামাতা  
প্রভৃতির কথা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা এই :—

“চরণে লোটায়া বন্দো রসময় পিতা । তবে ত বল্লভু মাতাজিউ পতিব্রতা । পতিপত্নী  
দৌহে আর পুত্র পাঁচ জন । রসিকচরণে সবে পশি'য়ো শরণ ॥ খুলতাত বল্লভু বংশী-  
মথুরা দাস । আদ্য শ্রামানন্দীতে যাহার প্রকাশ ॥ গোপকুলে মোসবার হইল উৎপত্তি ।  
শ্রামানন্দ পদবন্দ্য কুল শীল জাতি ॥ গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস । মাধব রসিকানন্দ  
কিশোরের দাস ॥ জাতি ধন প্রাণ যার অচ্যুতানন্দন । শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন ॥ বল্লভের  
স্তত রাধাবল্লভ, বিখ্যাতা । রসিকেন্দ্র চূড়ানি যার পিতা মাতা ॥ মগোষ্ঠী সহিত তার  
রসিক কঙ্করে । রসিক সঙ্গতে তার সতনু বিহরে ॥”

---

\* ১৪৩২ শকে বন্দাবনে তিনি আগমন করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে তথায় কঠোর ব্রত  
অবলম্বনে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কখনই ২৫ বৎসরের নূন হওয়া সম্ভাবিত  
নহে,—১৫০৩শকে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়, তাহার পরে সীতা-চরিত্র রচিত হইলে  
প্রায় একশত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে ।

গ্রন্থখানি ৪ ভাগে ১৬ লহরীতে পূর্ণ। আকারে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের তুল্য হইবে।

রসিকানন্দের জন্ম ( ১৫১২ শক ) ১৫৯০ খৃঃ অব্দে ; গ্রন্থকার স্বীয় গুরু রসিকের সমকালিক। গ্রন্থরচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। ‘রসিক মঙ্গল’ কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে কতক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব

মনঃসন্তোষিণী এবং  
অপরাগর পুস্তক।

জগজীবনমিশ্র “মনঃসন্তোষিণী” নামক এক-

খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; ইহাতে মহা-

প্রভুর শ্রীহট্টলমণিব্রহ্ম লিখিত হইয়াছে।

জগজীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণগ্রামে অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবনমিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ-মিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দমিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায় উৎপন্ন ; এই সকল পুস্তক ছাড়া “মহাপ্রসাদ বৈভব”, “চৈতন্যগোদেহ”, “বৈষ্ণবচারদর্পণ” প্রভৃতি পুস্তকও চরিত-শাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক বহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে বৈর্য্যহারা ও পথহারা হইতে হয় ; যদিও এই পুস্তক-সমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রাপ্তি বৎসর কীট ও অগ্নির মুখে উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের এক্ষেপে মৃদঙ্গ বাদ্যের শ্রাব্য বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না—তথাপি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে মহতী শক্তিতে এই সুপ্রসার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিদ্ধি হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরঙ্গ ও বুদ্ধদে উদ্ভিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট আন্দোলন ও কর্ম্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না,—বঙ্গদেশীয়গণ শবের শ্রাব্য

নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়াছিল, বিদেশী শাসনকর্তাগণের ভেদবিশিষ্ট নিতে এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে ।

## ৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

৭ম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদসংক্রান্ত পুস্তকের আলোচনা করা হয় নাই,—স্থলে স্থলে উল্লেখ অনুবাদ-গ্রন্থাবলী । মাত্র করিয়াছি ; অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিষয়ক পুস্তকও বিস্তর ; স্বতন্ত্র অধ্যায়ভাগ করিয়া ব্যাখ্যাশাখা ও অনুবাদ-শাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে ; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি ।

আগরদাসের শিষ্য নাভাজী রচিত হিন্দী “ভক্তমাল” শ্রীনিবাস আচা-

ভক্তমাল । র্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী অনুবাদ করেন ;

ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে । আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন ; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে আরও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী প্রদান করিয়া এবং প্রিয়দাসের টীকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন ; তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল ; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন ;—

“গ্রন্থ হয় একভাষা সব বুঝি নহি । যেহেতু গোড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি । রচনা পূর্বক কহিবারে নাহি জানি । যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি । উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে । বৈষ্ণবের গুণগান করি যে তেমতে । অতএব টীকার অর্থ বুঝি সাধ্যমতে । রচিয়া কহিবা মাত্র মন বুঝাইতে । যথা যথা প্রিয়দাস সংক্ষেপেতে

অতি । বর্ণিলা না প্রবেশয় সাধারণ মতি । সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু ।  
বিস্তার করিয়া কহি তার গাছ গাছ ।”—ভক্তমালগ্রন্থ ।

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদেব আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য ।

পূর্বের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খাঁ সঙ্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ

স্কন্ধের অনুবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হই-  
রত্নাবলীর অনুবাদ ।

রাছে । বিষ্ণুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয়  
করিয়া ‘রত্নাবলী’ নামক একখানি সংস্কৃতকাব্য প্রণয়ন করেন । অদ্বৈত-  
প্রভুর সমকালিক “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” এই রত্নাবলীর একখানি বাঙ্গালা  
অনুবাদ রচনা করেন । আমরা অনুবাদপুস্তকের মুখবন্ধ হইতে উদ্ধৃত  
করিতেছি ;—

“শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভক্ত সম্রাসী । জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণ ভক্তি প্রকাশি । বিচারি  
বিচারি ভাগবত পয়োনিধি । বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিবি । এতি অধ্যায় বিচা-  
রিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ । সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ । নানান প্রকার শ্লোক বাখ্যা  
করি সাধু । তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু । অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত ।  
তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত । বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিল রত্নাবলী । কৃষ্ণদাস  
গাইলেক অদ্বুত পাঁচালী ॥” \*

অনুবাদপুস্তকে কবিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলে মূলের ভাব  
বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্ববিহীন হইলেও অনুবাদ  
কিংবদন্তের ত্রায় পরিত্যজ্য হয়, সুতরাং ভাল একখানি অনুবাদ রচনা করা  
বড় বিষম ব্যাপার ; কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই,  
সেকালে ভাষায় সতদূর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জিত  
রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে ; যথা :—

“ভ্রমর রময়ে বেন কমলের মাঝে । মোর মন তেন রমোক তোমা পদানুজে । যেই

---

\* এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটারী বৈষ্ণব চূড়ামণি  
শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে  
দেখিতে দিয়াছিলেন ।

পুষ্প থাকয়ে কণ্টক অভাস্তরে । তাহাতে প্রবেশিয়া কি ভ্রমরা নাহি চরে ॥ সহস্র বিপদ মোর থাকুক সর্বক্ষণ । তোমা পদ কমল চিন্তয় যদি মন ॥ হৃবর্ণ মুকুট মাথে সেই যেন ভার ॥ যেই গিরে কৃষ্ণপদ না কৈল নমস্কার ॥ জগন্নাথ মূর্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ । ময়ূরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন ॥”

এখন “লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস” কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি । গ্রীহট্টে লাউড় নামে একটি স্থান আছে । ৪৫০ বৎসরের অধিক হইল সেখানে দিব্যসিংহ নামক একজন হিন্দু রাজা ছিলেন । অদ্বৈতপ্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত ইঁহারই মন্ত্রী ; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শাস্তিপুরে আগমন কবেন, ইহারও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বৃদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শাস্তিপুরে বাস করেন । তাঁহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস । পূর্বে উল্লেখ করিবাছি কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের ‘বাল্যলীলা’ বর্ণনা করেন, অদ্বৈতশিষ্য ঈশাননাগর স্বীয় “অদ্বৈতপ্রকাশে” উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—“লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র । যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র ॥”

মহাপ্রভুর শ্রীলোক মাধব মিশ্র কর্তৃক একখানি ভাগবতানুবাদ প্রণীত হয় । ইহা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের একটি সুরল বিজয়াধবের ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ ।  
ও সুন্দর বাঙ্গালানুবাদ । এই পুস্তকখানির নাম কৃষ্ণমঙ্গল ও ইহা মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা হয় ; মাধব মহাপ্রভুর টোলের ছাত্র ছিলেন । প্রেমবিলাস ইঁহার পরিচয় এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ;—

“দুর্গাদাসমিশ্র সর্ব গুণের আকর । বৈদিক ব্রাহ্মণ বাসনদীয়া নগর ॥ তাঁহার গভীর হয় শ্রীবিজয়া নাম । প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস । পরম পণ্ডিত সর্ব গুণের আবাস ॥ সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া । এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম ॥ শ্রীধারদ নাম তার হয় আখ্যান ॥ কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম । প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্বগুণধাম ॥  
\* \* \* \* \* শ্রীমৎভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ । গীতবর্ণনাতে তিহো করি নানা ছন্দ ॥



রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল । শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য  
তারে কৈল অনুগ্রহ । সর্ব ভক্তগণ তারে করিলেক স্নেহ ॥”—১৯ বিলাস ।

অন্যত্র প্রেমবিলাসে—

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ ।

রচিলা মাধব দ্বিজ করি নানা ছন্দ ॥”

মাধব মিশ্রের “শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল” ব্যতীত “প্রেমরত্নাকর” নামক আর একখানি  
( সংস্কৃত ) কাব্য আমরা দেখিয়াছি । পরবর্তী সময়ে ভাগবতের আরও  
কয়েক খানি অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহদের আমরা পরে লিপিবদ্ধ  
করিব ।

যত্ননন্দন দাস কৃত “গোবিন্দলীলামৃতের” বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে

উল্লেখ করা হইয়াছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয়

অপর কয়েকখানি অনুবাদ  
ও বাখ্যাপুস্তক ।

গোবিন্দলীলামৃতখানি পরিণত পাণ্ডিত্যে ও

কবিত্তে সাজাইয়াছেন—যত্ননন্দন দাসের অনু-

বাদটিতে আদ্যত সৌন্দর্য্য বেশ কুটিয়াছে ; এই পুস্তকে শ্রীমতী রাধা ও  
তাহার সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত  
হইয়াছে । অনুবাদপুস্তক আকারে চৈতন্যমঙ্গলের তুল্য হইবে । ইহা  
ছাড়া যত্ননন্দন দাস রূপগোস্বামীর ‘বিদগ্ধমাধব’ ও বিদ্যমঙ্গলঠাকুরের  
‘কৃষ্ণকর্ণামৃতের’ অনুবাদ করেন । প্রেমদাসকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের  
অনুবাদ, সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবতের অনুবাদ ও রসময় এবং গিরিধরের  
গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়  
সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব ।

বাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের ‘প্রেমভক্তিচঞ্জিকা’, ‘সাধন-  
ভক্তিচঞ্জিকা’, ‘হাটপন্থন’, ও ‘প্রার্থনা’ প্রভৃতি পুস্তকই সর্বাগ্রে উল্লেখ-  
যোগ্য । ‘বিবর্ত-বিলাসের’ গ্রন্থকার নিজেকে কৃষ্ণদাসকবিরাজের  
জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে

অনেক গুপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন শঠ বৈষ্ণবের লেখা ; বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, ‘কর্ত্তাভজ্ঞাদলের’ কোনও লেখক এই স্বর্ণিত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের স্বন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন । কৃষ্ণদাস-বিরচিত ‘পাষণ্ডদলন’ ও রামচন্দ্র কবিরাজপ্রণীত ‘স্মরণদর্পণ’ এই শাখার অন্তর্গত । এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের ‘গোপিকামোহন’ কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্যিক ; যে বৃন্দাবন ‘চৈতন্তভাগবত’ রচনা করিয়া চিরযশস্বী, তাহার লেখনী-প্রসূত ‘গোপিকামোহন’ কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে, ইহার বহু প্রাচীন, হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমাব নিকট আছে ।

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আবশ্যিক মনে করি না ; এখনও

এক্ষেত্রে প্রভুত্বের আলো প্রবেশ করে নাই ।  
একই ভাবের বিকাশ ।

ভাবিয়াতে আবণ্ড অনেক বড় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে । সে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি তদ্বারাষ্ট যথেষ্টরূপে সাহিত্যের কচি ও গতি নির্ণীত হইবে ; সমুদ্রে ভ্রমণকারা যেকপ প্রত্যহ লবণাষ্মুর একইরূপ নীলবৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইরূপ চৈতন্তভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি ; নরহরি সরকার এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণ যে গাথা গাতিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্রীণতর হইয়া কোন্ কীটভুক্ত পুঁথির শেষ পংক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে ?

এই যুগের সাহিত্য হিন্দীউপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট হইতে দেখিতে

পাঠ । এখন যেকপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব,  
‘হিন্দী-প্রভাব ।  
বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবকালে তখন ছিল—বৃন্দা-

বনীভাষার রাজত্ব। বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিতসমাজ তাঁহাকে ধরাতেলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন,—শ্রামকুণ্ড কি রাখাকুণ্ড দর্শনার্থ তাঁহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল, এখন বিলাত বাইতে শিক্ষিতগণের তেমন আতান্ত্রিক আগ্রহ নাই। এখন যেক্রপ আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া বিদ্যা দেখাইয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবগণের বাঙ্গালা-কথা চারি আনা বৃন্দাবনীর মিশ্রণে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রন্থকর্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যেস্থলে কথাবার্তার উল্লেখ, সেই খানেই বৃন্দাবনা-ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে; যথা—

“প্রয়াগ পয়াস্ত দুর্গে তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব।  
 ব্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥”—  
 চৈ, চ. মধ্য ১৮ পঃ।

“হইলুঁ উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিনি দেখিতে। তাঁহা না হইল, গেঁহুঁ অশ্রুত-গৃহেতে।  
 সবে মহাদুঃখী হৈলা আমার সন্ন্যাসে। সভা প্রবোধিলুঁ রহি অশ্রুতের বাসে।  
 সভা মনোরত্তি জানি নীলাচলে গেঁলু। তাঁহা কথোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ ॥”—নরোত্তম  
 বিলাস।

এরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে; বৃন্দাবনীবুলি বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত্ত করিয়া লইয়াছিল।

বিদ্যাপতির মৈথিল্যপদের অতুলকরণে যাহারা পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের বঙ্গ-মৈথিলের পূর্ণ বিকাশ। প্রথম স্ফূরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশকরাই উদ্দেশ্য হয়, প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়।

ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন ; ভাব-যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্তিত হয় ; তখন মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির নয় শোভা হইতে অপসারিত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম ফুলপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয় ; গোবিন্দদাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিলগীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাব-প্রধানপদও গোবিন্দের পদের ত্রায় মসৃণ নহে। গোবিন্দদাসের (১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে—কাম কলঙ্কিনী গোরী।” (২) “মুকুলিত মঞ্জী, মধুর মধু মাধুরী, মালতি মঞ্জুল মাল।” (৩) “ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ শিব বিজুরীতরঙ্গ। ও বর মরকতঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাণ। ও তরু তরুণতমাল। ইহ হেমযুথিরসাল। ও নব পদমুনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকররাজ। ও মুখ চাদ উজোর। ইহ দিগ্ধি লুবধ চকোর। অকণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ।” প্রভৃতি পদ পড়িযা প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়।

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলীর চরম

উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ; তৎপর গ্রিহট্ট

সত্যরাম কবি।

প্রভৃতি অঞ্চলেও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি

হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ক্ষীণতর ;—

“কাঁহেকো শোচ কর মন পামর। রাম ভজ, তুহঁ রহনা দিনা। ইষ্ট কুটম্বক ছোড়দে আশ, এসংসার অসার, এক উহ নাম বিনা। যো কীট পতঙ্গক, আহাংর বোণাওত, পালক হ্যার উহি একজন। কবি সত্য কহে, মন থির রহো, যিনি দিগ্ধি দন্ত, সো দে গা চনা।”—(সত্যরাম কবি)। একযুগব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিলসাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে।

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি

ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয়

হিন্দীপ্রভাবে ইতিহাসের  
ভাষায় দুর্গতি।

নাই। চৈতন্যভাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন

যাপন করিয়াছেন, ও তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনী

বাক্সালার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাঁহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গলার আদর্শ পাওয়া যায় ; তাঁহার রচনার মধ্যে মধ্যেও বৃন্দাবনীস্বরের আভাস একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে ; যথা :—  
“সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবার পাও । তবে মুক্তি সস্ত হই হাঁটিয়া বেডাও ॥”—  
চৈ, ভা, আদি ।

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গালা তখন বৃন্দাবনী ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতেও তাহা ব্যবহার করিয়াছেন । চৈতন্যচরিতামৃত এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয় । দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গালা বৃন্দাবনী দ্বারা এরূপ আবৃত হইয়াছিল, যে তাঁহার রচনায় খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার সংস্কৃত পাণ্ডিত্য ও সহজ বাঙ্গালা—রচনার অন্তরায় হইয়াছিল । একদিকে ‘গুহ্যতিগুহ্য’, ‘বাহ্যাবরণ’ ‘মহদমুভব’ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও অর্থদিকে ‘ববহু’, ‘কবহু’, ‘যৈছে’, ‘তৈছে’, ‘তিহ’ প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাঁহার বাক্যে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যূহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল শ্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে । বাঙ্গালা, হিন্দী সংস্কৃত, এমন কি উদ্ভব কথ্য পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষার এই সাধারণত্বের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা সুরঠিন । চৈতন্যচরিতামৃতকে ‘বাঙ্গালাগ্রন্থ’ উপাধি দিতে আমরাদিককে বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী—‘যৈছে’, ‘তৈছে’ ও উদ্ভব-‘নানা’, ‘মামু’, ‘চাচা’, পথ হইতে পরিষ্কার করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকষ্টে বাঙ্গালা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে পারা যায় । নিম্নে কবিরাজগোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি,—

(১) “বিবিধজ্ঞ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার । সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাংসার তার ॥  
গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন । সধর্ম্ম শিক্ষা পূজা সাধুসঙ্গাগমন । কৃষ্ণপ্রীতে

ভোগ তাগ কৃকতীর্থে বাস । যাবৎ নিকাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যাপবাস ॥ ধাত্রাখণ্ড গোবিন্দ বৈষ্ণব পূজন । সেবানামপরাদধি দূরে পূজন ॥”—চৈ, চ, মধ্য, ১২ পঃ ।

(২) কহে তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন । কৈচে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন ॥ কৈছে অষ্ট গ্রহর করেন শ্রীবৃক ভজন । তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ অনি-কেতন দু'হে রহে যত বৃক্ষগণ । একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাজ্য শয়ন ॥ কঁরোয়া মাত্র কাণা চিঁড়া বহিঁবাস । বৃক্ষ কথা বৃক্ষ নাম নর্তন উল্লাস ॥—মধ্য, ১২ পঃ ।

(৩) “ইবে তুমি শাস্ত হৈলে আসি মিলিলাম । ভাগা মোর তুমি হেন অতিথি পাই-লাম ॥ গ্রামসঙ্কে চক্রবর্তী হয় আমার চাচা । দেহ সঙ্কে হৈতে গ্রাম সঙ্কে সাঁচা ॥ নীলা-ধর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা । সে সঙ্কে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥”—আদি ৭ পঃ ।

বৃন্দাবনীভাষার প্রভাব কালে লুপ্ত হইল ; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কবি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়া-ছেন,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও তদনুচর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার অস্ত্রেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অত্র ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়া গেল, তাহা এই,—

(১) উর্দু,—আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও কতকগুলি উর্দু শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি । উর্দু নবাবী আম-বঙ্গভাষার ত্রিবিধ রূপ । লের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবশ্যই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সভাপীরোপাখ্যান এবং ভায়তচন্দ্র প্রভৃতি কবির কোন কোন রচনায় উর্দু প্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতানুবর্তিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই । এখনও ইংরেজের মূল্যে ছএকজন কবি—“বুট পরি, হুট করি, বাবে ভাই খাও । হোটলে কাটলেট হুখে খাবে যদি খাও । এলবার্ট কাসানে কেশ ফিরাবে ফিরাও ॥” (দীনেশচন্দ্র বসু রচিত কবিকাহিনী ।) প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতির স্বনিতে সেই সব ক্ষীণ স্নেহস্বর ডুবিয়া গিয়াছে ।

(২) খাঁটি বাঙ্গালা—ইহা কথিতভাষা, “মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা” কিংবা “ইন্দুবিন্দুভ্রুয়ারসঙ্কাশা” প্রভৃতি কথা ঠিক কথিতভাষা নহে । ইহাদিগকে বাঙ্গালা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু একরূপ রচনা পোষাকী বাঙ্গালা । কথিত বাঙ্গালার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় । যে চিত্রকর প্রকৃতি হইতে আলোকচিত্র উঠাইবেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাঁহাকে গুরু গুণ্য ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে । খাঁটি বাঙ্গালী-কবি এইজন্য কথিত অপভাষা খুঁটিয়া ফেলিয়া কেবল লালতলবঙ্গলতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না । মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই ন্যূনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পরে দেখাইব ।

(৩) সংস্কৃত । বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনার মধ্যেও “স্বানু-ভাবানন্দে”র ন্যায় দুই একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয় । ইতিপূর্বে বাঙ্গালী কবি মনের উক্তিস্থলিত গান রচনা করিতেন, ভাষাপ্রস্থগুণি সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনার্থে গানের পালারূপে রচিত হইত ; সংস্কৃতে ও পার্শীতে অশ্লীল ও কতর বিষয় সঙ্কীর্ণ রচনার কাজ চলিত । কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিলেন ; বৈষ্ণব লেখকগণ বিদ্বৎপাষাণীর গর্ব খর্ব করিতে শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গালায় দর্শন ও ত্রায়ের সমস্ত তত্ত্ব সুগম করিলেন ; বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের পাণ্টা উদাম চলিল, তাঁহারা নানাবিধ তত্ত্বাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতিপক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই উভয় পক্ষের শাস্ত্রচর্চাহেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃতির ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিনব নাট্যশালার ত্রায়, পাতঞ্জলদর্শনের উচ্চতত্ত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্দলালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল । কিন্তু বাঙ্গালা রচনায়

সংস্কৃত মিশ্রিত করিতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতকার্য হন নাই, চৈতন্যচরিতামৃতের “স্বধর্ম এলতাক পুমান প্রভু উত্তর দিল।”—অন্ত, ২য় পঃ।—“কর্ত্তুমকর্ত্তুমনাথা করিতে সমর্থ।”—অন্ত, ৯ পঃ। ও “দেহকান্তা হয় তিহ অক্লক বরণ।”—আদি, ১ পঃ। প্রভৃতি স্থল হ্রস্বোদ্য ও শ্রুতিকটু হইয়াছে, এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা যথাকালে লিখিব।

উদ্দ, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই ত্রিবিধ শক্তির প্রভাব দৃষ্ট হয় ; এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অতঃপর দৃষ্ট হইবে।

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বাঙ্গালা অপ্ৰচলিত শব্দগুলির অর্থসমেত তালিকা দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে ; নানা পুস্তকেই এই সব শব্দ পাওয়া যায়, আমরা অপ্ৰচলিত শব্দের তালিকা। পাঠকের আলোচনার সুবিধার্থ পূর্বের ভ্রায় গ্রন্থবিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম।

চৈতন্যভাগবতে,—দৃঢ়—প্রমাণ ( “আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়, সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়” আদি )। ঠাকুরাল—প্রভাব ; ছিণ্ডে—ছিঁড়ে ; সমুচ্চয়—সংখ্যা ; বহি—ব্যাতিত ; বিরক্ত—উদাসীন ; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও “তাক্ত” অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই নাই—ইহার অর্থ সংসার অনুরাগশূন্য ছিল। এখন ইহা অর্থদুষ্ট হইয়াছে। উপস্থান—উপস্থিতি : পরিহার—প্রার্থনা ; উপস্থার—মার্জন, পরিষ্কার ; সম্ভার—আয়োজন ; আর্ধ্য—রাগী ( “বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্ধ্য” )। কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ “পূজা” দেখা যায়। যথা—“বৈকবের গুর তিন জগতের আর্ধ্য।”—( চৈ, ম ) উপসন্ন—উপভোগ বা উৎপন্ন ; পরতেক—প্রত্যেক ; বাহ—বাহুজ্ঞান ; জুয়া—বোঁগা হয়, নিছনি—মূল অর্থ, বাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব্দ স্থলে “নির্মূল্য” শব্দও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা “যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ নিরমূল্য গোবিন্দদাস।”—( প, ক, ত ১০৭১ পদ। ) “বিশ্বস্তর নির্মূল্য করে আয়োগণ”—(লোচন-



দাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি)। চেষ্টা—এইশব্দ অনেক স্থলেই “ভক্তির আবেগ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কদর্থেন—ঠাটা করেন; দূঢ়—সুহ ( “লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দূঢ়কর।”—আদি); কৌন্ডিতে—কৌন্ডিকে; রায়—রবে; এনে—এখন; সাধস—সার্থক; ভাবক—ক্ষণস্থায়ী ভাবযুক্ত ( Emotional ) “বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম। তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম ॥”—চৈ, চ। কাকু—কাকুতি; ব্যবসায়—ব্যবহার—“এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়”—আদি। “প্রাকৃত” এই শব্দ সংস্কৃতের স্থায় অনেক স্থলেই ‘ইতর’ ও ‘সাধারণ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—“প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ॥”—আদি; অজ্ঞত চৈতন্যমঙ্গলে—“প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বস্তর।” চৈতন্যভাগবতে—“প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥”—( যথা )। প্রাকৃত শব্দের এইকণ অর্থ সংস্কৃতের অনুকপ, যথা,—রামায়ণে “কিং মামসদৃশং বাকামীদৃশং শ্রোত্রদাক্ষণ্যং। কক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাবৃতঃ প্রাবৃতামিব ॥”—লঙ্কা ১১৮ম সঃ। বিমরিষ—বিমর্ষ; উদার—চিন্তাযুক্ত। প্রচণ্ডশব্দ এখন ভীতিজনক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে কিন্তু চৈতন্যভাগবতে “প্রচণ্ড অনুগ্রহ” প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি—সমৃদ্ধি ( “নব-দ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে।”—আদি ); লঙ্ঘন—দংশন: চালেন—ঠেকাইয়া দেন; কতি—কোথা। ওঝা শব্দ গৌরবজনক অর্থেই সর্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়,—ইহা উপাধায় শব্দের অপভ্রংশ ও পূর্বে মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আশ্বনাং—এই শব্দ এখন অর্থদ্রুট হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত; যথা—“ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আশ্বনাং।” আখরিয়া—উৎকৃষ্ট হাতের লেখা বাহার। চৈতন্যচরিতামৃতে,—হাতসানি—হস্তসঙ্কেত, লঘু—ক্ষুদ্র ( যথা “লঘু পদচিহ্ন” ); পাতনা—তুণ; ওলাহন—ভৎসনা; ভদ্রকর—ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কর ( “ভদ্রকর ছাড এই মলিন বসন।” ); তরজা—কুটুমমস্তা: নরোত্তমবিনায়ে, —উমড়য়ে—কষ্ট পায; সঙ্কোপন—মৃত্যু; হাতসানে—হস্তসঙ্কেতে; সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া; সমুহিত—ইচ্ছা; পদকল্পতকতে,—রাতা—রক্তবর্ণ; “রাতা উৎপল, অধরবুগল”—২২ পদ) “নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা”—২৮২ পদ, “মেঘগণ দেখে রাতা”—১৮০৪ পদ, কবিকঙ্কণেও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, (যথা—“কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কলি রাতা”)। বাউল—উন্নত, বৈরাগী; পিছলিতে—ফিরাইতে ( “পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি”—চণ্ডীদাস)। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন “জলাঞ্জলি” যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে—ভ্রমণ করে, “সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে কানুর

পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর ॥”—২১৪ পদ)। চৈতন্যমঙ্গলে,—প্রেমা—প্রেম ; সিলেহ—স্নেহ ; মহ—মধু ; উচাট—উষ্ণ ; তোকানি মোকনি—জননব। পীরিতি শব্দ পূর্বে, ‘প্রীতি’ অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা—“পিতৃশৃঙ্গ পুত্রে মোর পীরিতি করিবে ।” উমতি—উন্মত্ত ; সানাসানি—ইঙ্গিত ; নিবড়িল—সমাণ্ড করিল ; বহয়ারী—বউ ( “মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোম দাসী কোণের বহয়ারী ॥” ) ; সায়—সঙ্গ ; বেদিনী—বাধিত (Sympathisor) ; আর্তি—কাতরতা , আউটিয়া—আলোড়ন করিয়া। ভক্তিরত্নাকরে,—তাড়ক—কর্ণভূষণ, দাহুর—ভেক ; টোটা—বাগান ; সম্বাহন—সেবা ; না ভায়—ভাল লাগে না ; ওট—ওষ্ঠ ( “বাধুলী জিনিয়া রাসা ওটখানি হাস” এই “ওট” শব্দের অর্থ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, “অট অট হাস”—ভক্তিরত্নাকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন )। ময়ক—সুগন্ধ।

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। পদকল্পতব

প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পত।

ছন্দঃ।

লতার শ্রায় নানাচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্য-

জাল বিস্তার করিতে দেখা যায় , স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই ; নিম্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন ;—  
 “খনি রঞ্জিণী রাই। বিলসহি হরি সঞ্চে রস অবগাই ॥ হরি হৃন্দের মুখে। তাধুল দেই চুষই নিজ মুখে ॥ খনি রঞ্জিণী ভোর। ভুলল গোরবে কানু করি কোড় ॥ ছহ’ গুণ গায়। একই মুরলীরকে, দুজনে বাজায় ॥ কেহ কেহ কহে মুহুভাব। নারীপরণে অবশ পীতবাস ॥ কেহ কাড়ি লয় বেণু। রাসে রসে আজ ভুলল কানু ॥”—(পঃ কঃ ১৩১১ পদ।)  
 ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দুচরণার্ধে মিল রাখা সর্বদা আবশ্যক ছিল না ; যথা,—  
 “আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্রাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম ॥ আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়। বাহ পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সে দিকে যায় ॥”—(জ্ঞানদাস।) পদগুলি সর্বদাই গীত হইত, সুতরাং কোন অক্ষর-নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথা ;—“জয় জয় দেব কবি-নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম ॥”—(পঃ কঃ, ১৫ পদ।) ছন্দস্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল ;

পূর্ববর্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে  
বিভক্তি ।

কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না । এই অধ্যায়ে ও

“কাশীরে গমন” “বৈকুণ্ঠকে গমন” “মাতাতে পাঠান” (মাতাকে পাঠান) “মোহর” (আমার)  
“তাত” (তাহাতে), “ইধি” (ইহাতে), প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি  
দেখা যায় । “চণ্ডালাদিক”, “পাককর্তাদিক”, প্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে  
“দিগ” ও “দিগের” প্রাগ্লক্ষণ বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে ।

সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট্ পরিবর্তন লক্ষিত

হয় ; ব্রাহ্মণের পদরক্তসেবী, জাতিভেদের দৃঢ়-  
সামাজিক অবস্থা, শাস্ত্র  
ও বৈষ্ণবের স্বন্দ ।  
দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্তনীয় নিত্যকর্মের

নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নূতনতাবের তীব্র

জ্বালাতে সেই শৃঙ্খল অপসৃত হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া  
গেল—নব সৃষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্ত প্রাচীন সৃষ্টি নিমজ্জিত হইল ;  
প্রাচীন সমাজ স্বীয় হৃদ্যন্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত  
হইয়াছিল ; কিন্তু ক্রমে স্থলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদম্য  
বালকটিকে শাসন করিবার জন্ত দণ্ডায়মান হইল । এই যুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি  
ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উথিত  
হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্রোহী দল বিক্রম করিয়া বেড়াই-  
তেছে ;—

“শুনিলেই কীৰ্ত্তন করয়ে পরিহাস । কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ । কেহ বলে  
জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার । পরম উদ্ধতপনা কোন বাবহার । কেহ বলে কতরূপ পড়িল  
ভাগবত । নাচিব, কাঁদিব হেন না দেখিল পথ । ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে ।  
নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥”—চৈ ভা, আদি ।

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাঁইয়া স্বীয়  
দৃষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে ;—“এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডীর গণ ।  
চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আক্ষালন । প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বায়েবার । অদ্যরাজ

এ গুলিরে করিবে সংহার ॥”—(ভক্তিরত্নাকর) বৈষ্ণবগণ ও ইহাদিগের ঋণ হ্রদ সহিত পরিশোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই,—“লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। অনল জ্বলিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে ॥” অত্ৰুত্ৰ “এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাগি মারি তার মাথার উপরে ॥”—চৈ, ভা। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ গোঁড়া, তাঁহারা দোয়াতের কালিকে ‘সেহাই’, হাঁড়ীর কালীকে ‘ভূষা’, ও জবা ফুলকে ‘ওড় ফুল’ বলিতেন। কালীপূজার মধ্যে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইহারা নিতান্ত পাপকর কার্য্য মনে করিতেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে বিজুপ করিয়া গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে,—“কলার পাত উপরে খুইল ওড়ফুল। হরিত্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তওল ॥”—চৈ, চ, ব। কালীপূজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাস মাংসগণ্য লোকদিগকে প্রাতে ডাকিয়া দেখাইলেন—“সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ নিতারায়ে করি আমি ভবানী-পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার। এছে কৰ্ম্ম হেথা কৈল কোন দুবাচার ॥”—(চৈ, চ, ম)। এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটিন কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

এই কলহব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি সাস্থ্যনার কথা এই দেখা যায় যে,—জাতীয় জীবনের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাধ ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে গ্রহণে উন্মুখতা দেখাইতেছিল।

অবতার-বাদ কেবল চৈতন্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক বিশ্বাসের সুবিধা পাইয়া চৈতন্যদেবের পশ্চাতে বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব দাঁড়াইয়া-ছিলেন। বৃন্দাবনদাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন, পূর্ববঙ্গে এক ছুরায়া আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল; ভক্তিরত্নাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী বলেন, এই ব্যক্তির নাম ‘ফবীত্ৰ’ ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস রাঢ়দেশস্থ অপর একজন অবতারের প্রশংসা বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে

প্রথম “ব্রহ্মদৈত্য” প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া উপ-  
সংহারে লিখিয়াছিলেন,—“সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল । অতএব  
তারে সবে বলেন শিয়াল ।” এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী উদ্দিষ্ট  
ব্যক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও “মল্লিক” খ্যাতিবিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন  
এবং বৃন্দাবনদাসের স্মরণ অমুকরণ করিয়া তাঁহার প্রতি “রাক্ষস”, “পাপিষ্ঠ”  
প্রভৃতি অসংযতভাষা বর্ষণ করিতেও ক্রটি করেন নাই । \*

চৈতন্যদেবের পরেও বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিময় বৈরাগ্যের স্বাভাবিক-

বিখ্যাত চক্রবর্তী মহাশয় গৌরগণ-চল্লিকানামক পুস্তকে ইহাদের বিবরণ  
বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন ; যথা,—

“চৈতন্যদেবে জগদীশবৃন্দীন  
কেচিজ্ঞান বীক্ষা চ রাঢ়বঙ্গে ॥  
স্বস্তেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো  
গৃহেশবেশং বাচয়ন্ বিমুঢ়াঃ ॥  
তেষাম্ কশিচ্ছিজবাস্তদেবো  
গোপালদেবঃ পশুপাদ্ভজোহহং ।  
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী  
শুগালসংস্কারং সমবাপ রাঢ়ে ॥  
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোহহং  
বৈকুণ্ঠধামঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ ॥  
ভক্তা মমেতি ছলনাপরাধা-  
ভ্যক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাখ্যায়ার্যোহহং  
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোহহং  
সংপ্রাপ্তোহস্মি ব্রজবনভূবো মূর্খি, চূড়াং নিধায় ।  
মল্লং হ্রদ্যান্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখা-  
শ্চুড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥  
বৃক্ষলীলাং প্রকুর্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ ।  
দেবলোহসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ ॥  
অভিত্যবাদয়োহপ্যস্মে পরিত্যক্তান্ত বৈষ্ণবৈঃ ।  
তেবাং সঙ্গো ন কর্তব্যঃ সঙ্গাঙ্গর্থে বিনশ্ততি ॥  
আলাপাং গাত্রসংস্পর্শান্নিষাসাং সহ ভোজনাং ।  
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাভ্যসি ॥”

কৌড়া কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ বৈষ্ণবসমাজের অধোগতি ।

মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে তাঁহাদের নানারূপ বিলাসবস্তির উদ্রেক হয় ; এস্থলে অবশ্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় শাকশব্দী দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রাশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন । ইঁহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা দুর্লভ ; পাঠক চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অন্ত্যখণ্ডের ১০ পরিচ্ছেদে এবং পদকল্প-তরুর ২৪৯ সংখ্যক পদে এবং জ্ঞানেন্দ্রের চৈতন্যমঙ্গলে প্রদত্ত খাদ্য-তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন । এই বিষয়ে আমাদের এই একটি অ'ক্ষেপ যে, একদিন রঘুনাথদাস ভূনিফিগু পাচা প্রসাদান্নকণার এক মুষ্টি খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং চৈতন্যপ্রভু তাহা “খাসাবস্তু” বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণবসমাজের সেই এক নিরন্তর দিন ছিল—ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক বৈরাগ্য সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়া-ছিল । বৈষ্ণবসমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণমুখ্য-স্বল্পভ দুর্বলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল ; সামাজিক আয়তন বৃদ্ধির ঠোঁট অবশ্যস্তাবো ফল বলিতে হইবে । কিন্তু চৈতন্যদেবের পরেও ইঁহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়াছিলেন ; নরোত্তমদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের আশ্রয় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবে হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাঁদরায় প্রভৃতি দম্মাগণ পর্যন্ত সাধুবৈষ্ণব হইয়াছিল । শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেমবিহ্বলতা, নৈসর্গিক-শক্তি ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জ্বল শ্রী প্রদান করিয়াছে । একদিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে ;—গোস্বামিগণ-কৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া

শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন ।

শ্রীনিবাস পাগলের আশ্রয় বীরহাম্বিরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল শ্রীনিবা-

সের অল্প জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ছায় তিনি নিম্পন্দ ; সভায় বাসাচাৰ্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন,—দেবরূপী দৰ্শকের অপূৰ্ণ অবয়ব দৰ্শনে, ভক্তিভরে বীৰহাস্থির প্রণত হইলেন—সভাস্থলীতে তড়িৎপ্রবাহের ছায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল ; তাঁহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন হইল—কিন্তু অসহ্য দুঃখ-কাতব শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন “ভাগবত পাঠ সাক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত অল্প কোন প্রশ্ন উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে ।” সেই দুঃখের সময়েও ভক্তি-পূবিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন । যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির শ্রোতবহিন্বেছিল, কিন্তু সহিষ্ণুতাব প্রতিমূর্তি ঋজু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না । কি সুন্দর ভাগবতে ভক্তি ! কি সুন্দর সভাসৌষ্ঠবকারী উজ্জল বিনয় ! শ্রীনিবাসআচাৰ্য্য অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন । শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকায়ে শ্রীনিবাস যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীর-হাস্থির, বাসাচাৰ্য্য প্রভূতি সকলে তাঁহার পদে লুপ্তিত হইয়া পড়িলেন । অশ্রুজলে সভামণ্ডপ প্লাবিত হইল, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অপূৰ্ণ উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুত্র স্বৰ্গপুর হইয়া উঠিল ।

কিন্তু নৈষ্কবসমাজের এই উচ্চতাব পরে দগ্ধিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই

কীর্ত্তি স্থায়ী উন্নত গৌরবচ্যুত হইয়া শ্রীলষ্ট

• শেষ-জীবন ।

হইল ; পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্তি

খানিও যেন বিলাসপঙ্কসংযোগে মলিন হইয়া পড়িল । তিনি বীর-হাস্থিরের প্রদত্ত বহুসংখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্তমানে শুধু অনুরোধরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার, পরিণয় করিলেন । নরহরিচক্রবর্তীর উৎসাহসূচক বর্ণনা সেই স্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে, তিনি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় পারিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন—“গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয় । আচাৰ্য্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয় । সৰ্ব্বলোকে ধনা ধনা কহে বারেবার ।”—(ভঃ রঃ) ।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখনও এরূপ ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার এই সকল ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যথা—প্রেমবিলাসে, গোপালভট্টের সঙ্গে মনোহরদাসের কথোপকথন,—

“বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ । রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ ।  
আচার্যের সেবক রাজা বীরহাথির । বাসাচাখাদি অমাতা পুরম স্বধীর ॥ সেই গ্রামে  
আচার্য প্রভু বাস করিয়াছে । গ্রাম ভূমি বৃত্তি আদি রাজ্য যা দিয়াছে ॥ এই ত কান্তন  
মাসে বিবাহ করিলা । অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলা ॥ মোন হয়ে ভট্ট কিছু না  
বলিলা আর । “শ্বলংপাদ শ্বলংপাদ” কহে বারেবার ॥”

তঁহার কিছু পূর্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ কৃষ্ণ-  
দাসকবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,  
তঁহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একেবাবেই ছিল না ।

যাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগের দেহেও যেন মৃদু  
সাংসারিক স্রুতের বায়ু বহিতে লাগিল ;  
সাংসারিক স্রুত তৃষ্ণা ও বৈষ্ণব-  
ধর্মের নানাকপ বিকৃতি । নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়, জাহ্নবীদেবী  
ভোজনান্তে “উষ্ণজলে” স্নান করিতেন, এক  
ব্রাহ্মণী পরিচারিকা “অতি স্নানবস্ত্রে” তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইয়া  
দিত, অপর এক পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত । (সপ্তম  
বিলাস ।) মূলকথা বৈষ্ণবসমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত  
পরে আর রক্ষিত হয় নাই । শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সাক্ষোপাঙ্গ-  
দিগকে ত্রীকৃষ্ণসঙ্গিনীগণের নূতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক  
লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ, সনাতন—রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গমঞ্জরী,  
এবং কবিকর্ণপুর গুণচূড়াসখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন ; এইরূপে  
অত্যাশ্রিত প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্বাভতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া  
পবিত্র করা হইল । মুরারিগুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার  
বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই



অঙ্গীকার করিয়াছেন যে “পুরস্কার পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম । সপরিবারে লাকুল  
বার দেখিল ব্রাহ্মণ ॥”—বৈষ্ণব-বন্দনা ।

বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হওয়াতে, জীবনের  
আদর্শ ক্রমে গুণ্ডিত হওয়াতে ভক্তগণ এইরূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়া  
পড়িলেন ও ধর্মটিকে সাংসারিক নানারূপ সূত্রে চরিতার্থ করিবার উপ-  
যোগী করিয়া অধ্যাপকবৃন্দ ‘সহজিয়া’ প্রভৃতি মতানুসারে ইহার ব্যাখ্যা  
আরম্ভ করিলেন । চৈতন্যপ্রভুর এত নিম্নল ও উন্নাদকর প্রেমধর্ম ধীরে  
ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইল ।

সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি বাস্তবচার চলিতেছিল,  
অপর এক চিত্র ।

নরোত্তমবিলাসের এই লোমহর্ষণ অংশটি  
দেখুন—“করয়ে কুক্ৰিয়া বত কে কহিতে পারে ।  
ছাগ মেষ মহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে ॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া । খড়্গ করে  
করয় নর্ভন মত্ত হৈয়া ॥ সে সময়ে যদি কেহ নেই পথে যায় । হইলেও বিপ্র তার হাত  
না এড়ায় ॥ সতে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত । মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে  
কদাচিত ॥” (সপ্তম বিলাস) পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা  
যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত ৷  
কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জাত জাতি-চ্যুত অবস্থায় ছিল ।

এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল ; গৃহজাত দ্রব্যেই  
দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ  
বাজারের ব্যয় ।  
হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই  
চলে । মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে একটা ফর্দ  
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা  
মোটামুটি ওজন পাওয়া যায় । ধর্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া ( আড়াই পয়সার  
কিছু বেশী ) লইয়া বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,—

“ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ ।

ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্বক্ষণ ॥”—চৈ, ভা, মধ্য, ১৩ অঃ ।

ছইখানি ধরা ( বোধ হয় নেংটা, ধরা বা ধটা হইতে ধুতি শব্দ  
আসিয়াছে )—

|                         |     |     |        |
|-------------------------|-----|-----|--------|
| ...                     | ... | ... | ৫      |
| পান ...                 | ... | ... | ১      |
| থয়ের ...               | ... | ... | ১      |
| চুণ ...                 | ... | ... | ॥ কড়া |
| মেটে সিন্দূর ...        | ... | ... | ১      |
| খুঁড়া ( একরূপ বস্ত্র ) | ... | ... | ৪॥     |
| মোট                     |     |     | ১৩     |

ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ হয় না । ভদ্রলোকের বিবাহের ব্যয়ের ও আর একখানি ফর্দ দেখাইতেছি ; চৈতন্তপ্রভুর প্রথম বিবাহ অতি সামান্যরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল,—তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি পঞ্চহরীতকী মাত্র উপঢোকন পাঠিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় বারের বিবাহকে বৃন্দাবনদাস একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কথিত আছে, এই এক বিবাহের ব্যয়ে পাঁচ বিবাহ স্ননির্বাহ হইতে পারিত, চৈতন্তভাগবতের বর্ণনা এইরূপ,—“বুদ্ধিমন্ত খান বলে গুন সর্ব ভাই । বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই ॥ এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন । রাজকুমারের মত লোক দেখে যেন ॥” বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা যায়, গৃহ “আলিপনা”, দ্বারা রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কতকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল ; এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আহার করার কথা ছিল না ;—এ নিমন্ত্রণ “গুয়াপান” গ্রহণের । গুয়াপান ও মালা চন্দন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু “ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে । একবার লৈয়া পুনঃ আর বেশ কাছে ॥ আরবার আসি মহা লোকের গহলে । চন্দন শুবাক মালা নিয়া যায় ছলে ॥ সব্বট আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে । প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে ॥ সব্বারে তাবুল মালা দেহ তিন বার । চিন্তা নাহি যায় কর যে ইচ্ছা বাহার ॥” এই

গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন যে, সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ যাহা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দূরে থাকুক, ভূমিতলে যে পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পাড়িয়াছিল,—“সেই যদি প্রাকৃতলোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ঝা হয়।” উপসংহারে “সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস। সব বলে ধন্ত ধন্ত ধন্ত অধিবাস। লক্ষ্মণের দেগিয়াছি এই নবদীপে। হেন অধিবাস নাহি কবে কার বাপে। এমত চন্দন মালা দিবা গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান।”—(চৈ, ভা, আদি)।

ভরসা করি, এখনকার কুপণ ধনিগণ এষ্ট প্রাচীন নজিরের বগে বাঘ সংক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবেন।

সে কালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন থাকিত, এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা অসঙ্গত উপাধি।  
না থাকে এমন নহে, কিন্তু সে কালে লেখক-গণ প্রকাশ্যভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, “খোলাবেচা শ্রীধর”, “কাঠকাটা জগন্নাথ”, প্রভৃতিব সঙ্গে সঙ্গে আমরা “খজ্জভগবান্”, “কাল কৃষ্ণদাস”, “ভুঁড়ে শ্রামদাস” “নির্লোম গঙ্গাদাস” প্রভৃতি সার্টিফিকেট-যুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই নীতি মুখস্থ করিয়া থাকে “কাণাকে কাণা বলিও না।” তখনকার গ্রন্থকার-গণ বোধ হয় এই নীতি মানিতেন না।

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, সাধারণ বিচারের ভায় কাজির উপর ছিল—  
কাজির নীচে ‘শিকদার’ ও শিকদারের অধীন শাসনপ্রণালী।  
‘দেওয়ান’ ছিল; কোর্টালের দায়িত্বই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিশ দারগার কার্য ছাড়া রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোর্টালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পুলিশ-দারগার কাজ “নিশাপতি”দিগের দ্বারা করাইতেন; এই “নিশাপতি” ও ‘কোর্টাল’ একই রূপ কর্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদির

সময় এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে লোক বাতায়ত করিতে পারিত না ; নিষিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুতিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত । রাজাদিগের আদেশ-সম্বলিত “ডুরি” লইয়া পথিকগণ বাতায়ত করিতে পারিতেন । এই “ডুরি” একরূপ পাসপোর্টের ভাষা ছিল । রাজগণ অনেক সময় দস্যুবৃত্তি করিতেন, বীরহাঙ্গির এইরূপ একজন দস্যুদলপতি ছিলেন ; আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহুসংখ্যক দস্যুপতির নাম পাইয়াছি । ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ; হরিশ্চন্দ্ররায়, চাঁদরায়, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন । প্রতি গ্রামে রাজা একজন “মণ্ডল” নিযুক্ত করিতেন, এই “মণ্ডল” গ্রামের একরূপ শাসনকর্তা ছিলেন ।

আমরা মৈথিলবঙ্গ-অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে নিম্নে দুৱহ শব্দার্থ-দ্ব্যহ শব্দের তালিকা । বোধক একটি তালিকা দিতেছি ;—

অতএ—অতএব, অধক—অস্থির, অবক—এইক্ষণ, অমুসঙ্গ—ইঙ্গিত, অলখিতে—অলক্ষ্যভাবে, অক—রক্তবর্ণ, আন—অন, আঁর—অস্তর, উরল—উদিত হইল, উকি—অগ্নি, উঘার—বাত্ত, উমড়ি—উথলিয়া, ওখদ—ওষধ, কতি—কোথা, কর্বক শিলা—কষ্টি-পাথর, কানড়—একরূপ ফুল, কাধার—কুল, কোর—ক্রোড়, খিণি—ক্ষীণ, খেরি—গেলা, গাগরি—ক্ষুদ্র কলস, গারি—গালি, গীম—গ্রীবা, গোয়ান—জ্ঞান, গোৱী—গৌরী, হুল্লরী, গোড়ার—লম্পট, চোর ; ( “হামি অবুখ নারী তুহঁত গোড়ার”, বিদ্যাপতি ) ।—“অমূল্য রতন সাধে, গোড়ারের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া ॥”—(প, ক) । চকেবা—চক্রবাক, চকুরী—চটক, চোরাবলি—চুরি করিলে, ছটাছটি—প্রকাশ্য, ছাতিয়া—বক্ষ । জম্ব—যেন, জয়তুর—জয়ঢাক, জীউ—জীবন, জীক—যাহার, তোড়ল—তাগ করিল, তোর—দ্রোমকে, দুগুলি—দুইঘোড়া, দিঠি—দৃষ্টি, দউ—দুই, ধড়ে—দেহে, দোতিক—দুতীর, ধম্মিল—খোঁপা, নিঙারিতে—ঝাড়িতে, নিয়ড়—নিকট, মুকি—লুকায়িত থাকা, গহ্মিনী—গম্বিনী, পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে, পুকথ—পুকষ, পবারেল—বিস্তৃত করিল, কুয়ল—উন্মুক্ত, ফুলায়ল—প্রক্ষুট করিল, বরিশস্তিয়া—বর্ষণ করে, বাউল—বাউল, বালি—বার্ণিকা, বিছুরি—বিশ্মৃত হওয়া, বিহি—বিধাতা, বেসালি—দ্রুত আল নেওয়ার পায়, গাঃ—ক, ভাব, ভাগি—ভাগা, ভাখী—ভাষা, ভিয়াইল—হইল, ভোবিল—ক্ষুধান্ত,

মক—আমার, শিকার—বেশ-ভূষা, শুতিয়া—শুইয়া, শেজ—শয্যা, সামাইল—প্রবেশ করিল, সঞ্চে—স্নেহ, সিহালা—শৈবাল, সিনান—স্নান ।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন

ভাষায় হিন্দী প্রভাবের রাখিয়া গিয়াছে কি না ; হিন্দী শব্দ সমূহে মৃচ্ছ-স্থায়ী চিহ্ন ।

কটিকাদি নাটকের প্রাকৃতের মত অনেকটা সং-প্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা,—হর্ষ—হরিষ, মগ্ন—মগন, নির্মাণ—নিরমাণ, গর্জন—গরজন, নির্মল—নিরমল, জন্ম—জনম, নির্দয়—নিরদয়, রত্ন—রতন, যত্ন—যতন, প্রকাশ—পরকাশ দর্শন—দরশন, বর্ষা—বরিষা, ইত্যাদি । এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্যরচনায় দৃষ্ট হয় । বৈষ্ণবযুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে ; বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্তনের অনুকূলে নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দীপ্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয় । দ্বিতীয়তঃ, হিন্দী ভাষার অনুনাসিক শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, যাহা, তাহা, কবছ, যবছ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়, ঐ সমুদয় শব্দ যে সকল সংস্কৃতশব্দের রূপান্তর, তাহাতে একপা কিস্তি নাই, যদ্বারা এই চন্দ্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে । চন্দ্রবিন্দু, ‘ঞ’ এবং ‘ঙ’ হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ণবযুগের রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । \* এখনও বঙ্গভাষায় আঁখি, কুঁড়ে, কুঁজ, কাঁক, পুঁখি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে, অখচ অক্ষি, কুটীর, কুজ, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু

\* “The same was the case in the Bengali, four hundred years ago and the Chaitanya Charitamrita affords innumerable instances of its use in words like বাইঞা, খাইঞা for the modern বাইয়া, খাইয়া &c.”

কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না । ইহাও হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয় ।

বৈষ্ণবগণ “শ্রী” শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে (ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) ‘শ্রীকেশ’, ‘শ্রীদর্শন’, ‘শ্রীহস্ত’, ‘শ্রীললিট’, ‘শ্রীপ্রসাদ’ প্রভৃতির অবধি নাই,—সেই সব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষর-গুলির মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পতাকাধারী সেনাপতির ছায়া “শ্রী”গুলি বড় সুন্দর দেখায় । বৈষ্ণবগণের দ্বারা “মহোৎসব”, “দশা”, “লুট” (হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে । “বাক্য” শব্দ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন “উৎকৃষ্ট” অর্থে ব্যবহৃত হয় ; শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গোববাস্বক হইয়াছে ।

এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আব-  
শ্যক । চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা  
শিরোমুণ্ডন ।

যায়, মহাপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ  
নানারূপ বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী  
আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে ।  
এ বিষয়টি আমবা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাইমাত্র বিচার করিতে  
পারি, সে সময় বঙ্গের বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগী হইতেন ;  
এখনকার শিক্ষা আমাদেরকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার  
শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত ; বহুসংখ্যক পিতা মাতার স্নেহের  
হৃদয় ভিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রফুল্লতার দীপটি চিরদিনের জন্ত নিবাইয়া  
যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে  
তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্তন করিতেন না । যুবকগণ সে সময় দীর্ঘ-  
কেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করি-  
তেন । ‘এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য,—পিতা, মাতা ও  
বন্ধু বান্ধবের আশাচ্ছেদ বুঝাইত,—এইজন্য চৈতন্যপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের

উপলক্ষে এত দীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয় । এই সন্ন্যাস-গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল,—এখনও বালকগণ পিতা মাতা বর্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না,—কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চিহ্ন,—বস্তুতঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই । রমণীগণ শিব বা হইলে তাঁহাদের স্কপালের সিন্দূর মোছা ও শাঁখা ভাঙ্গা যত কষ্টের কারণ হয়,—তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ ব্যাপার ছিল । আমরা বৌদ্ধযুগ-অধ্যায়ান্তর্গত গোবিন্দচন্দ্রের গানেও গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসোপলক্ষে তাঁহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত শোকা-কুলা রাণীবর্গের মুখে—“কার বোলে মহারাজা মুদাইলে কেশ”—প্রভৃতি কাতরোক্তি শুনিয়াছি ।

বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবযুগের ভাষায় পাওয়া যায় । হরি-দাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে “মায়া-বৌদ্ধযুগের নিদর্শন । মোহিত” শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; “গোফা” শব্দ বৌদ্ধদিগের, উহাও চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায় । আর একটি শব্দ “পাষণ্ডী” ইহা বৌদ্ধগণ অথবা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন,—হিন্দুর “শ্লেচ্ছ”, মুসলমানের “কাফের”, খ্রীষ্টানের “infidel” যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধগণও “পাষণ্ডী” শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন, যথা—অশোকের আদেশ-লিপিতে,—“দেবানম্ পিষো পিয়দশি রাজা সবত ইচ্ছতি, সবে পাষণ্ড বংসেযু সবে তে সম্মথঃ ভাব-সুজ্জিন্ চ ইচ্ছতি ।” ( দেবগণের প্রিয় প্রিয়দশী ( অশোকের নামান্তর ) রাজা এই ইচ্ছা করেন যে, পাষণ্ড ( বৌদ্ধধর্ম্মে অস্থায়ী ব্যক্তিগণও ) যেন সর্বত্র নিরাপদে বাস করেন । ) বৈষ্ণবগণ এই শব্দ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া অথবা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন ।

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা “সুবুদ্ধিরায়” সম্বন্ধে একটি

স্ববুদ্ধি রায় ।

কথা বলিব । “স্ববুদ্ধিরায়” “গৌড়ের অধিকারী” বলিয়া মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-

খণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য ঐতিহাসিক রাজ্যে এই অজ্ঞাত “গৌড়াধিপ” মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক-গণ ইহার কোনও খোঁজ পান নাই ; আমার হিকট দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত আছে, তাহাতে—“পূর্বে যবে স্ববুদ্ধিরায় গৌড়াধিকারী” স্থলে—“পূর্বে যবে স্ববুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী” এই পাঠ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু বীরহাষিরের সভাসদ ব্যাসাচার্য্যের হস্ত-লিখিত চৈতন্যচরিতামৃত এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতও রক্ষিত আছে বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তখন এবিষয়টির সহজেই মীমাংসা হইতে পারে ।

আমরা এখন “সংস্কারযুগের” সন্নিহিতবর্ষী হইতেছি । এই যুগের

সাহিত্যে নবযুগ ।

অমৃতময় গীতি বঙ্গসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরব

ও আদরের জিনিষ ; যে দেবরূপী মানুষ বর্ত্ত-

মানকে অতীতের কঠোব শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইতিহাসে উজ্জল করিয়াছেন, পশুমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্রু দ্বারা দেবার্চনা শিখাইয়া-ছেন—যাহার নির্মল অশ্রুবিন্দুতে প্রতিভাত হইয়া এক যুগের বঙ্গসাহিত্য মণির ন্যায় স্নন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রভুর পবিত্র নামাঙ্কিত যুগ আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই খানে সমাপন করিতেছি ।

কিন্তু গীতিকবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল—সেগুলি তিন-শত বৎসর পূর্ব্বের । এই ছবিগুলি বড় উজ্জল, বড় স্নন্দর—দেখিলে প্রাচীন পর্ণকুটারকেও স্নন্দর বলিতে হইবে এবং কুটারনিবাসিনিগণের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন । এখন আমরা কাব্যের নির্মল মুকুর বিধিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইব ।



# অষ্টম অধ্যায় ।

## সংস্কার-যুগ ।

১। লৌকিক ধর্ম-শাখা ।

২। অনুবাদ-শাখা ।

“সংস্কার-যুগ” কেন বলি ? সমাজের ইতিহাসে সর্বত্রই দুইরূপ  
শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভা-  
সংস্কার-যুগ ।

বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া  
নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ  
নহে ; প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয়  
আধিপত্য স্থির করে ; নূতন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্ব ভাবীসমাজ  
গঠিত হয়। নূতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের  
আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায় ; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের মণিমুক্তা  
ভাসিয়া না যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।  
স্বাধীনতার চিত্র সর্বত্রই বিষয় ও আনন্দোৎপাদক, স্বাধীনতার  
অগ্নিতে অতীতের মৃতদেহের সংস্কার হয়, এবং বর্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয় ;  
কিন্তু অতীতকে উহার একটা গৃহস্থালী-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে,  
যাহার সতেজ আবর্তে তাল মন্দ একসঙ্গে মিশিয়া লুপ্ত হইবার  
আশঙ্কা আছে ।

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল ; আমরা  
দেখাইয়াছি বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ-স্রোত, চৈতন্যপ্রভুর চরণস্পর্শে নব-

জীবনের আত্মদ সহকারে প্রবাহিত হয় । বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিতাখ্যানে আমরা স্বাধীনতার অপূৰ্ণ প্রভাব দেখিয়াছি ।

কিন্তু প্রাচীন পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত পুস্তক বাঙ্গালাসাহিত্যে অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখক রোমানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা দণ্ড হয় নাই । কুল্লরার চরিত্রে, খুল্লনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্যের আভাষ ছিল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে পারে নাই । যে টুকু ভাল,—জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক—তাহা দলিত হইয়াও লুপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ তাহার অঙ্কুরোদগম হয়,—তাহার সুন্দর মনুষ্যত্ব বারংবার ইতিহাসে দেখা দেয় ; যাহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাকে নবশক্তিতে করিতে সুবিধা দেন । এই যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । কিন্তু রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায়ও প্রাচীনকে কতকটা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রক্ষা করেন ; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈলসংযোগে প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয় । রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিবসংকীৰ্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জন উপযোগী হয় । রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসারভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় । এই নূতন সংস্করণময়-যুগকে আমরা—“সংস্কার-যুগ” আখ্যা প্রদান করিয়াছি ।

আমরা দেখাইব, কুন্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদ-

প্রাচীন ও পরবর্তী লেখক-  
গুণের সম্বন্ধ ।

লেখকগণ যশীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কালী-  
দাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী  
লেখকগণের হস্তে,—বিজ্ঞানার্জন, বলরাম-

কবিকল্প-প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের

হস্তে,—এবং কাণাহরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখকবর্গ, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দদাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান রচকের হস্তে এইযুগে নব জীবন লাভ করিলেন । কিন্তু প্রাচীন লেখকগণের কীৰ্ত্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার কুরিয়া লইলেন,—প্রাচীন কীটভুক্ত কাগজের নজিরে প্রকৃত মহাজনগণের ঋণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু কে তাহা খোঁজ করে !

এই ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক । মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট ভাণ্ড ফলতি সর্বত্র ।

মুকুন্দরাম নানাবিষয়ে ঋণী । মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,—সমস্তই এক কথা ; তাহা ছাড়া পংক্তিশূলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায় । ভারতচন্দ্র স্থায়ী নায়ক স্তম্ভরের মত সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়াছেন ; তাঁহার কণ্ঠে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তাছড়ার একটি মুক্তাও তাঁহার থাকিবে কি না সন্দেহ । বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্মাপুরাণ হইতে, সেক্ষপীরের হলিন্দিয়াড হইতে, মিল্টন ইলিয়াড প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাদে সংগ্রহ করিয়াছেন । এই সব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্যজগতে লক্ষ্যশা ও শ্রেষ্ঠ কেন ? ইহার এক উত্তর—ইঁহার প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহাদের অধিকার বর্জিত আছে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্যু । কবিবঙ্গল, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন ; পৃথিবী ক্ষমতার পূজক,—এজন্য ইঁহারা অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন । কিন্তু বাহার

চুরি করিয়া ঢাকিতে পারে না,—যাহাদের কুৎসিত সম্বন্ধে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই দুর্ভাগ্যগণের জন্যই লোকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা । শক্তিমান স্বৈচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের কৃত্রিমগণ্ঠী নির্দ্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাঁড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন ।

প্রতিভাবিত্ত কবি মন্ববণে প্রাচীন ও বর্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন ; ইহাকে অপহরণ না বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের দৃশ্যাবলী তুলারূপই ব্যবহার্য্য ও তিনিই এবিষয়ে একমাত্র স্বত্ববান ।

## ১। লৌকিক ধর্ম্মশাখা ।

মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য,  
কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম ।

চণ্ডীর উপাখ্যান দ্বিজ জনার্দন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট খাট ব্রতকথা । চণ্ডীর ভক্তগণ এই ব্রত-  
দ্বিজজনার্দনের চণ্ডী ।  
কথাটিকে ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন ;  
কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিতঠাকুর যে ব্রতকথা সমাধা করিয়া বাই-  
তেন, তাহা লইয়া ঘোল পালা গান রচিত হইল ।

মুকুন্দরামের পূর্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া  
করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না । বলরাম-  
বলরামের চণ্ডী ।  
কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত

ছিল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭১ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয় । এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন ।

সংশোধিত চিত্র সম্মুখে থাকিতে প্রথম উদামের নমুনা দেখিয়া কাব্যামোদীগণ কতদূর পরিতুষ্ট হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ ভাব-বিকাশের পর্যায়-লক্ষ্য করিতে যাহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব নমুনা-গুলি পাইলে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই ।

বলরাম-রাচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি । মাধবা-

মাধবাচার্য্য ।

চার্য্য আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন ;—

“পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার । একাক্ষর নামে রাজা অর্জুন অবতার ॥ অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি । কলিযুগে রামভূলা প্রজা পালে ক্ষতি ॥ সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল । ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল ॥ সেই মহানদী তটবাসী পরাশর । যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥ মধ্যাদাষ মহোদবি দানে কল্লতরু । আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুণ ॥ তাঁহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য । ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য ॥ আমার আসার যত অন্তর গায় গান । তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান ॥ ঐতিহাসভঙ্গ অস্ত্র দোষ না নিবা আমার । তোমার চরণে মাগি এই পরিহার ॥ ইন্দু বিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত । দ্বিজ মাধবে গায় সারদা রচিত ॥ সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে । দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে ॥”

“ইন্দু বিন্দু বাণধাতা” অর্থ ১৫০১ শক, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ । কথিত আছে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (তানপু) গ্রামে বাস স্থাপন করেন । এই স্থান এখন গোসাইপুর বলিয়া পরিচিত । মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরদীধরবিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী ।

\* মুকুন্দরাম তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন,—“গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ”—ইহা দ্বারা অনুমান হয় বলরামকবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি ঐক্য কাব্য রচনা করেন । “মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার এই বলরামকবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকবিকঙ্কণের শিক্কা-গুরু ।” পদ্বিৎ পত্রিকা, ১৩০২ শ্রাবণ, ১১০ পৃঃ ।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা একদরের নহে—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের

সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য কিন্তু উভয় মুকুন্দ ও মাধবাচার্য্য ।

কবির প্রতিভায় কতকটা একপরিবারের লক্ষণ

দৃষ্ট হয় ; যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন, দুইটীতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অশ্রুটি হইতে বেশী উজ্জ্বল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে । কিন্তু যেখানে গোলাপ নাষ্ট, সেইখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর ; কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ স্থলে রাখিয়া গুণের বিচার করা উচিত হইবে ; আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি স্তব্যাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি । মাধুকবি ফুলবা কবিকঙ্কণেব ফুল্লরার আয় লজ্জা-নতা সুন্দরী গৃহস্থবধূ নহে । এই ফুল্লরাব জিহ্বা অসংযত, তাহাব চরিত্রে অপরটির আয় সংযতশীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই । মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিস্কার ছবি নহে—উহার মুকুন্দের ‘হনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র । গল্পাংশে উভয় কবিরই বেণ ঐক্য আছে—মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মানুষ-চরিত্র-জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্বপ্রত গল্পের সরলবস্তুর পার্শ্বে একটু তির্ঘ্যগলীলা করিয়া লইয়াছেন । উষার সিন্দূরবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ-পাইবার পূর্বে, শেষতারার ক্ষণিকালোকে আধমুদিত জগত-দৃশ্যের আয়, মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্বে মাধুর চণ্ডী কাব্য-বিকাশেব পূর্বাভাস দেখাইতেছে । মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দেব বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহার সজীব সুন্দর চিত্র হইয়াছে ।

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প,

কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বিকাশ পায় ; কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণনা করিবেন, এখানে লেখনীর ছেঁড়াকাঁথা, মাংসের পসারা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির ‘নবনীত কোমল,’ ‘নুথরুচি কিংক জাল’ প্রভৃতি কেতাবতী উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিবার একবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহাব যোগ্য ক্ষমতা তাঁহার বেশ ছিল,—“হলি পেলি খেলী এযো আইল বাধ ঘরে। যুগ চন্দ্র পরিধান, দুর্গন্ধ শরীরে ॥” প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা

যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের  
ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে দেখিয়াছেন ;

সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ করিয়াও ভদ্রকবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তাহা মার্জিত করিয়া সুন্দর করিতে যান নাই ; বাঙ্গলা প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে যাহারা নায়ক নায়িকার নগ্ন নিরাভরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নৈসর্গিকশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন কোন সময় মাধুকবি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যের মর্যাদা ভুলিয়া বালকের ছায় একটি বিড়ালের গাত পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাহার এই অসংযত ক্রীড়ায় এমন একটু স্বাভাবিকত্ব আছে, যাহাতে শিশুর পোকা ধরিবার যত্ন মনে পড়ে,— নিম্নের অংশটি “আবপিজিয়ের” গল্পের মত,—

“গুন্নায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি ॥  
তোলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায় ॥  
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লৈয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে ॥  
অনেক বতন করি পুহিলু বিড়াল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল ॥

হাট হাট চিই চিই করিতে করিতে । এষাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী ঘাইতে । মুড়া গেল পড়ি কোথাকার পথেতে ॥”

কবির রূপ বর্ণনায়ও সর্বত্র সেই স্বভাবের খেলা—কালকেতুব্যাধের শৈশবের মুষ্টিটি এইরূপ—“তবে বাড়ে বীরবর । জিনি মত্ত করিবর, গজগুণ জিনি কর বাড়ে । যতক আখিট সূত, তারা সব পরাভূত খেলায় জিনিতে কেহ নারে ॥ বাটুল বাশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে, কাহার ঘরেতে নাহি যায় । কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায় ॥” মুকুন্দরাম এই আভাষ-দৃশ্যটিকে বড় এবং উজ্জ্বল করিয়া, পরিষ্কার বর্ণক্ষেপে আঁকিয়াছেন, যথা,—

“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু । বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সবার লোচন-স্তম্ভ হেতু ॥ নাক মুখ চক্ষু কাণ কুলে যেন নিরমাণ, দুই বাহ লোহার সাবল । কপণ্ড শীলবাড়া, বাড়ে যেন তাতী কড়া, যেন শ্যাম চামর কুন্তল ॥ বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটি, করঘোড়া লোহার শিকলি ॥ বুক শোভে বাত্মনখে, অঙ্গে রাস্তা ধুলি মাখে, কটিতে শোভয়ে ত্রিবলী ॥ দুই চক্ষু জিনি নাট্য, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা, কাণে শোভে ষটক কুন্তল ॥ পরিধান রাস্তা ধূতি মন্তকে জালের দড়ী, শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল ! সহিয়া শতক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয় । যে জন আকুড়ি, করে, আছাড়ি ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয় ॥ সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশাঙ্ক তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুঙ্করে । বিহঙ্গম বাটুলে বিস্কে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে, স্কে ভোর বীর আইসে ঘরে ॥”—ক, ক, চণ্ডী ।

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, বাহা ঠিক একরূপ ; হয়তঃ মুকুন্দরাম সেগুলি মাদবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন ।

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুব চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট ; উহাতে আখ্যান বস্তুর বর্ণনা, কাব্যার্থ, ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় । কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভারদত্ত, কবিকঙ্কণের ভারদত্ত



হইতে শঠতায় প্রবীণ । এই দুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমরা  
মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব । মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির  
আয় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনায় পটু—তঁাহার রাধাকৃষ্ণ

বিষয়ক ধূয়াগুলি বনফুলের সৌরভময়—  
ধূয়া ।

নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি ;—

( ক ) কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া । নবকোটি চাঁদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া ।  
বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাঁথ হার । গোপ ঘরে ননী খাও গরিমা তোমার ।  
মাঠে থাক খেতু রাখ, বাশীতে দেও শান । গোপালের ঘরের মণি, গোপালের পরাণ । ”

( খ ) কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি যাও । আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও ।  
সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে । সস্তির সম্মুখে কৈও লোকে শুনে পাছে ।  
চরণকমলে শত জানাইও পণাম । অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম ।

( গ ) আজু মোর মন্দিরে আওত কাল । কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিল ।

( ঘ ) শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধান । কানাই কালা, বলাই দাদা চাঁদের সমানে ।

কবিমাধু যুদ্ধবর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার  
১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অনন্দামঙ্গলে সেই  
যুদ্ধবর্ণনায় ছন্দ ।

চন্দ্র অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন ;  
কালকেতুর সঙ্গে কবিগাধিপের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে—“যুঝে প্রচণ্ড ভাইয়া,  
কোপে প্রজ্বলিত হৈয়া, মার কাঠ সঘনে ফুকারে । জনাৰ্দ্দনের যত সেনা, শঙ্কেতে  
কম্পমানী, নানা অস্ত্র বরিষণ করে । পদাতি পদাতি রণে, অস্ত্র মারে ঘন ঘনে, কুঞ্জরে  
কুঞ্জরে, চাপাচাপি । অস্ত্র বাহনি করি, তুরগ উপরে চড়ি, রাহুত রাহুতে কোপাকুপি ।  
কোপে বলে কালদণ্ড, শুনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটাহট । লুটিব আর পুরিব,  
কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধূলাপাট । ” প্রভৃতির পরে—“যুঝে প্রতাপ আদিত্য ।  
ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিত্য”—ইত্যাদি একটি প্রান্ত-  
ধ্বনির মত শুনায় ।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চট্টগ্রামের পার্শ্বত্যাছর্গ আশ্রয় করিয়া নিরাপদ  
ছিল, কিন্তু কবিকঙ্কণ এখন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভাবে নবর্ণাক্ত লাভ করিয়া তাঁহাকে  
সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন ।

## কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

হুসেনসাহের রাজত্ব বঙ্গ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক ; কিন্তু সাধারণতঃ মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্নসংস্থান হিন্দুর প্রতি অত্যাচার ।

ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ শুদ্ধ আতঙ্ক জন্মিয়াছিল ; মুসলমান আইনের একটি-ধারা এইরূপ ছিল, “যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকারে তাহা দিতে হইবে ; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাকরের মুখে থুখু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ বাদান করিয়া তাহা লইতে হইবে,—ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই ; এই থুখুপ্রদানের কয়েকটি নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাকরের সম্পূর্ণ বশতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলামধর্মের গৌরব ও মিথ্যাবাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে ।”\* আইনের ধারা পর্য্যন্ত এইরূপ মার্জিত ছিল ।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধো মধো মুসলমান অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায় । বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও থুখুর বিষয় উল্লিখিত দেখা যায় :—“ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে । কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে খু দেয় মুখে ॥” “বাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত । হাতে গলায় বাধি লয় কাজির সাক্ষাৎ ॥ কক্ষতলে মাথা খুইয়া বজ্র মারে কিল । পাখর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥ পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে বাধা । চড় চাপড় মারে আর বাড় গোতা ॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয় । ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জনের ভয় ॥ বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায়

\* When the Collector of the Dewān asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission : and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote if possible the glory of the Islam,—the true religion and to shew contempt to false religions.—(Von Neor's Akbor). আকবর এই আইন রদ করেন ।

পৈতা বার কাঁধে । পেরদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলার বাঁধে ॥” এবং—“পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন । উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ । কপালে তিলক দেখে বজ্রহুত্র কাঁধে । ঘর ঘর লোটে আর লোহপাশে বাঁধে ॥”—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল । মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায়ও এইরূপ অত্যাচারের আভাষ পাওয়া যায় । মুসলমানপ্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূব ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ স্বচ্ছন্দের তারা ডুবিয়া যাইতোঁছিল ; বঙ্গদেশে হিন্দুর হুঁচকা ও মুসলমানের সোঁতাগোর ভাষাট প্রমাণ দিতেছে ; হিন্দুর “কুঁড়ে” (কুটার)

—মুসলমানের “দালান”, “এমারত” ; হিন্দুর  
ভাষার সাক্ষা । গাঁ (গ্রাম), মুসলমানের “সহব” ; হিন্দুর “শত্ৰু”

কর্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা “ফসল” হিন্দুর “টাকা” (তকা) করগ্রাণী মুসলমানের হস্তে পৌঁছিলে “খাজানা” হয় ; ক্ষুদ্র মেটে তৈলের “প্রদীপটি” মাত্র হিন্দুর, “ঝাড়”, “ফানস” “দেওয়াল-গিবি”—সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের ; হিন্দু অপরাধ করিলে “কাজি” “মেয়াদ” দেয় ; ইহা ছাড়া “বাদসাহ”, “ওমরাহ” হইতে “উজির”, “নাজির”, সামান্য “কোটাল” “পেয়াদা”, “বরকন্দাজ” “নফর” পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানীশব্দ ; “জমি”, “তালুক”, “মুলুক” প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ ; “জমিদার”, “তালুকদার”ও তাই ; উপাধি-গুলিও সমস্তই মুসলমানী—“জুমলদার”, “মজুমদার”, “হাবিলদার” সম্মানসূচক “সাহেব”, প্রভূত্বসূচক “হুজুর” এই সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল । কিন্তু স্বভাবের ‘চন্দ্র’ ‘সূর্য্য’, ‘তরু’ ‘ফুল’ ‘পল্লব’ হিন্দুর অধিকার ‘ঘোচে নাই’ ; পল্লীবাসী হিন্দু, নিজের ধর্ম্মটি ও প্রকৃতির মূর্ত্তিটিতে যবনের ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাই । সংস্কৃত শব্দগুলি সেখানে পবিত্র মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে ।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর কৃষককবিকেও গৃহস্থে বঞ্চিত

করিল। মামুদ সরিফ্ নামক ডিহিদারকে  
ডিহিদার মামুদ সরিফ্।

কবি-মুকুন্দরাম ছরপনৈয় কালীর বর্ণে অঙ্কিত  
করিয়া তাঁহার অমর কাব্যের একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির  
অত্যাচারে প্রজাগণের হুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ  
খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাঁহারা খাজানা শোধ করিতে  
না পারিয়া ধান, গরু বিক্রয় করিল; বাজারে জিনিষের মূল্য হ্রাস হওয়াতে  
টাকার দ্রব্য দশ আনাষ বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদদারগণ প্রত্যেক  
টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক  
কুড়ার মাপ খর্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিধা ধরিতে লাগিল। এদিকে  
প্রজাগণ সর্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্ত  
কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

দরিদ্র মুকুন্দ সাতপুরুষ যাবৎ চাষাবাদ করিয়া দামুতায় বাস

কবির ছরবহা ও  
অদেশ-প্রেম।

করিতেছিলেন,—এই দামুতায় পল্লীতে\* তাঁহার

কবিতায় প্রথম নমুনা “শিবকীর্তন” প্রস্তুত

হয়, কিন্তু এবার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয়

গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনিব গোপীনাথ-

নন্দো ক্রমবর্দ্ধিস্থ খাজানার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন;

কবি গম্ভীরখাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে,

শিশু পুত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশত্যাগী হইলেন।

“তৈল বিনা করি স্নান”—এবং “শিশু কাদে ওদনের তরে” প্রভৃতি দুইএকটি

ইঙ্গিতবাক্যে সেই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় ছরবহা চিত্রিত

হইয়া রহিয়াছে। গভীর হৃৎখে কোনও সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে;

তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়। সংসারের অশ্রু

---

\* বর্ধমান সিলিমাবাদপরগণার অধীন। এই গ্রাম রত্নানুদীর ভীষ্মভর্তা।

অবলম্বন-রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাঁহারই পদে মানুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে। মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতে-ছিলেন, জলকুমুদ চয়ন করিয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন ; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস কুরিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর হইয়াছে ; দৈবশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহা কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গাঁ, গোড়াই নদী, তেউটা, দারুকেখর, আমোদরনদ, গোথরা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন ; রঘুনাথরায়ের পিতার নাম বাঁকুড়া রায়,—তাঁহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিশু-গণের শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন, এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অনঙ্গলে পুষ্ট হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। কিন্তু স্বদেশ-নির্বাসিত কবি দামুত্যা-গ্রামের চিত্রপট ভুলিতে পারেন নাই। রত্নানুদের নাম স্মরণ করিতে তাঁহার প্রাণে অব্যক্ত বেদনারাশি উথলিয়া উঠিয়াছে,—“গঙ্গাসম হনির্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হ’তে। সেই সে পুণ্যের কল কবি হই শিশুকালে”—বলিয়া শিবচরণ নিঃসৃত রত্নানুদের উল্লেখ করিয়া-ছেন। দামুত্যা গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাঁহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত ছিল, তাহা গ্রন্থসূচনায় বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। হরিনন্দী, যশোমন্ত অবি-কারী, উমাপতি নাগ, বুধদত্ত, লোকনাথ মিশ্র, ধনঞ্জয়, ঈশান পণ্ডিত-মহাশয় প্রভৃতি গ্রামিক সজ্জনগণের প্রসঙ্গে তাঁহার স্মৃতিমথিত ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশ ছাড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের প্রতি ঘাট, প্রতি উদ্যান কল্লনায় এক অপরূপ মাধুর্য্য ধারণ করে, কবি স্বীয় গ্রামের দেউলটীও সকাতে স্মরণ করিয়াছেন। “দামুত্যা লোক বত শিবের চরণে রত”—সেই পল্লীর সকল লোকই ধার্মিক, সকল দৃষ্টই সুন্দর।

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে ডিহিদার মামুদসরিফের অত্যাচারে বিভাড়িত কবি এই ভাবে সেই পবিত্র জন্মপল্লীর প্রতি অশ্রুসংবদ্ধ, সক্রন্দন, বেদনাপূর্ণ অতৃপ্তকামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দামুতার দ্বিবার্গটি প্রবাসী পাঠক ভাবিয়া পড়িবেন এবং কবির মর্ম্মস্পর্শী কাতরতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কবি, “সুপণ্ডিত ও সুকবির” আবাসভূমি বলিয়া দামুতাপল্লীর “সুধত্র দক্ষিণ পাড়া”রই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় দামুতার দক্ষিণপাড়াতেই ইঁহারা ৩৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বসবাস করিয়া থাকিবেন।

যখন কবি আরড়াতে \* আসিয়া চণ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখন মানসিংহ “গৌড়বঙ্গ উৎকলের” রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন দামুতা হইতে পলাইয়া আসেন, তখন “অধর্ম্মী রাজা”র (হুসেন কুলিখা অথবা মজফরখা) হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পিত ছিল। কবির স্বহস্ত-লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ,—“ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুদাস্বজ্ঞে ভূঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।” কবির ধন্যবাদপাত্র, প্রবল বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের “অধর্ম্মী রাজা” হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রবল বিষ্ণুভক্তি সস্বেও কবির তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে ; উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ “এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ,

\* এই আরড়া গ্রাম বর্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃ-পাতী। আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানের ২ ফ্রোশ দূরে “সেনাপড়ে” গ্রামে বাস করিতেছেন ; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্তমান রাজা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। রঘুনাথরায়ের বর্তমান বংশধর রামহরিদেবের অতি বংশসমাজ সম্পত্তি আছে।

( প্রজাদিগকে স্মৃতে রাখিয়াছেন ) । কিন্তু অধর্মী ( যবন ) রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদসন্নিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিল”, ইত্যাদি । “শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা । সেইকালে দিলা গীত হরেন বনিতা ।”—অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে, দামুত্ভা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তকরচনার আদেশ প্রদান করেন ; এই আদেশের ১১১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ ছিলেন । গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া লিখিতেন ; বটতনার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্বে রচিত হয় নাই,—“এই গীতি হইল যেমনে” কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয়, গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল । এখনও গ্রন্থরচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া থাকেন । ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে কবির দামুত্ভা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে, অনুমান ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।\*

কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র । এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল “গুণরাজ” । হৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মত ভেদ আছে ; কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দেব কথাও আমরা তাঁহার নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছি । “কবিচন্দ্র” উপাধি কি আদত নাম তৎসম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে । শিশুবোধকে যে “অযোধ্যা-রাম” কৃত “দাতাকর্ণ” পাওয়া যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন । আমাদের ধারণা,

\* চণ্ডীকাব্য আরম্ভের সময় কবির বয়স ৪০ বৎসরের নূন ছিল বলিয়া বাধা হয় না, এই কাব্যের আরম্ভে কবির পুত্রবধু, জামাতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ।

কবিচন্দ্রের নাম ছিল, “নিধিরাম”, চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একপাণি প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে “বন্দ মাতা সুরধুনী”-শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি “দ্বিজ নিধিরামের” ভণিতায়ুক্ত পাইয়াছি। সম্প্রতি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংগৃহীত একখানি গঙ্গাবন্দনার প্রাচীন পুঁথিতে “নিধিরাম” ভণিতা প্রকাশ পাইয়াছে।—( ৪৩ নং পুঁথি )। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যোজনা করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক, যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন নামে ‘রামের’ ঐক্য আছে। শিশুবোধকে ‘কবিচন্দ্র’ প্রণীত দাতাকর্ণ আমরা পড়িয়াছি। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে “কবিচন্দ্রের” ভণিতা দৃষ্ট হয়। সেই সকল পুস্তকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা যথাস্থানে প্রদান করিব। “কবিচন্দ্র” পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জড়িত করা আমাদের সাহসে কুলায় না। বরঞ্চ সেগুলি যে মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, পরে তাহা লিখিব।

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র “মীনমাংস” ত্যাগ করিয়া গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,—কবির মাতার নাম ‘দৈবকী’, পুত্রের নাম ‘শিবরাম’, পুত্রবধূর নাম ‘চিত্রলেখা’, কন্ঠার নাম ‘যশোদা’ ও জামাতার নাম ‘মহেশ’ ছিল। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না খানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন।\*

---

\* কবির হস্তলিখিত পুঁথি দামুস্তায় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—“কুলে শীলে নিরবন্ধ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুস্তায় সজ্জনের স্থান। অতিশয় গুণ বাড়ি, স্বধন্য দক্ষিণ পাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান। ধন্য ধন্য কলিকাসে, রত্নাম্বু প্রদেয় কুলে, অবতার করিলা শঙ্কর। ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুস্তা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর। বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউলা দিলা বৃষদত্ত, কত-বৃকাক তথায় বিহার। কে কে তোমার মায়ী, সুরকুল ভোগিয়া, বরদান করিলা



কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষে—“একজন সহিলে কোন্‌ল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্র-বর্তী ঠাকুর।” কবি এইভাবে একটি কুটিল ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়াছেন, তাঁহার ছই জ্বী ছিল। কবি তাঁহার ভ্রাতৃত্বসহ মাণিকদত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা আমরাদিগকে জানাইয়াছেন। “পাথরকুচা”-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় “চণ্ডীকাব্য” প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর—দ্বিতীয় শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত স্মৃতিস্মরণের আলয় বঙ্গীয় কুটার

সঞ্চর। গঙ্গা সম অনির্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে। সেইত পুণের কলে, কবি হই: শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে। হরিনন্দী ভাগবান্, শিবে দিল ভূমিদান, মাধব ওঝা \* \* \* \* \*। দামুস্তার লোক বত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী। \* \* কুলের আর, বশোমন্ত অবিকার, কল্পতপ নাগ উমাপতি। অশেষ পুণ্যকঙ্ক, নাগধ্বনি সর্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন বসতি। কাঁটাদিয়া বন্দ্যাবাটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশানপণ্ডিত মহাশয়। ধন্ত ধন্ত পুরোবাসী, বন্দ্য সে বান্দ্যলগাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়। কাজারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শঙ্ক-কোষ কাঁবোর নিদান। কয়ড়িকুলের রাজা, হুকৃতি তপন ওঝা, তন্ত হুত উমাপতি নাম। তনয় মাধব শর্মা, হুকৃতি হুকৃতকর্মা, তার নাম তনয় সোদর। উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ হরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর। সর্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, একভাবে পুজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণের ধাম, হুখন্ত হুদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশ-ধর। অমুজ মুকুন্দ শর্মা, হুকৃতি হুকৃতকর্মা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্। শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পোত্রে ত্রিনয়ান।”—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম পঞ্চানন এবং কবির বংশ এখন তিনি স্থানে বাস করিতেছেন, ১ম দামুস্তায়, ২য় বীরসিংহে, ৩য় হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবরভপুরে। বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, “কবিকঙ্কণের অধস্তন বর্ষ, শপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত।” পরিষৎ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, ১১২ পৃষ্ঠা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের এক্ষেপ্রে প্রদত্ত হইয়াছে—অনুসন্ধান, ১৮৮২ সাল মাঘ ৩১৫ পৃষ্ঠা ত্রুট্য।

একরূপ দৃশ্য নহে । কিন্তু আল্লাইনশীর্ষে দ্বিযামার শশি-রশ্মি এবং পল্লী-গ্রামের বর্ষাপ্রপাতসিক্ত তরুশৃঙ্গ, এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন । সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেই-রূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে । এইদেখে ইতিহাসের মধ্য-অধ্যায়ে রাম, ভীষ্ম, অর্জুন, নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে ।

স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ।

পর্যাস্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হস্তমুখে স্বামীর স্মরণে পতঙ্গের ত্রায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা সেই পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগ্নী এবং একবংশের লক্ষণাক্রান্ত । মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র বিরল নহে ।

কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অস্তদৃষ্টি নির্মল ও প্রতিভাবিত হই-

য়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া কাব্যে নাটকীয় কৌশল ।

দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্যপরিহাস ও কথাবার্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গ্রন্থস্বত্ব স্থির রাখিয়াছেন । এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে বাইয়া সঙ্কেতে কার্য্য করা কতকটা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ত্রায় । সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক-লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন ; মুরারিশীলের সঙ্গে কালকেতুর সাক্ষাৎকারের অংশটি দেখুন ।—

“বেশ বড় ছুট্টল, নামেতে মুরারিশীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি । পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু ।—কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছে কাল, আমি আইলাম সেই হেতু ॥ বীরের

বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণানী, আজি ঘরে নাহিক পোন্ধার । প্রভাতে তোমার খুড়া, সিয়াছে খাতক-পাড়া, কালি দিব মাংসের উদার ॥ আজি কালকেতু বাহ ঘর ।—কাঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর । শুনগো শুনগো খুড়ী, কিছু কার্য আছে দেবী, ভান্ধাইব একটি অঙ্গুরী ॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ বাকী কড়ি, অস্ত্র বণিকের যাই বাড়ী ॥—বাগা এক দণ্ড কর বিলম্বন । সহাস্ত বধনে বাগী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাগা অঙ্গুরী কেমন ॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে । মনে বড় কুতূহলী, কাঁধেতে কড়ির ধলী, হরপী তরাজু করি হাতে ॥ করে বীর বেণের জোহার । বেণে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো, এ তোমর কেমন ব্যবহার ॥ খুড়া—উঠিয়া প্রভাতকালে, কাননে এড়িয়া জ্বালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি । ফুলরা পশার করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখে তুমি ॥ খুড়া ভান্ধাইব একটি অঙ্গুরী ।—হয়ে মোর অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তারি ॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁধে রক্ত চড়ায়ে পড়ান । কুঁচ দিয়া করে মান, যোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥”

“সোণা রূপা নহে বাগা এ বেঙ্গা পিতল । ঘণিয়া মাজিয়া বাগা করেছ উজ্জল ॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগুণা দর । দুধানের কড়ি আর পাঁচ গুণা ধর ॥ অষ্টপণ পঞ্চগুণা অঙ্গুরীর কড়ী । মাংসের পিছিয়া বাকী ধরি দেড় বুড়ি ॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি । কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি ॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই । বেঙ্গন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাই ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট । আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট ॥ ধর্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা । তাহা হইতে দেখি বাগা বড়ই সেয়ানা ॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া । অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অস্ত্র পাড়া ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি । চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি ॥”

লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয় । কলহাকৃষ্ণা প্রতিবেশিনীগণ,—“চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে । চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে ॥ চাহিয়া রয়েছে কেন নাকে হাত দিয়া । উচিত কহনা কেনু ভাতার পুত খেয়ে ॥”—শেষ ছটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই । মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে

প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদগত হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে দেখিয়া লিখেন । ধনপতি চাঁদ বণিককে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিম্নস্থত বণিকগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে । তাহাদের বাকবিতণ্ডা ও কলহ কবি বেনে দুইখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,—

“এমন বিচার সাধু করি মনে মনে । আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে ॥ কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে । এমন সময়ে শব্দদন্ত কিছু বলে ॥ বণিক-সভায় আমি আগে পাই মান । সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান ॥ যেকালে বাপের কর্ম কৈল খুসদন্ত । তাহার সভায় বেণে হৈল বোলশত ॥ বোলশতের আগে শব্দদন্ত পাইল মান । খুসদন্ত জানে ইহা চল্ল মতিমান ॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর । সেইকালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর ॥ ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা । বাহির মহলে বার সাত ঘড়াই টাকা ॥ ইহা শুনি হাসি কহে নীলাধর দাস । ধন হেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ ॥ ছয়বধু বার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়ি । ধন হেতু চাঁদবেণে সভা মধ্যে বাঁড়ি ॥ চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাধর দাস । তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস ॥ হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা । যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা ॥ নিরন্তর হাতাহাতি বারবধুর সনে । নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে ॥ কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাই । সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই ॥ নীলাধর দাস কহে শুন রামরায় । পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায় ॥ কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির বাভার । আঁটো ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাখার ॥ নীলাধর দাস রামরায়ের শুন । ধনপতি গঞ্জি কিছু বলিল প্রচুর ॥ জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বন্ধ । বনে জায়া ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক ॥”

আর একটি গুণ, মকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরূপ ভিন্ন অস্ত্র কিছু কল্পনা করেন না ; তিনি মিথ্যা কল্পনার একান্ত পাটি সংসার-চিত্র ।

বিরোধী । যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃত রাজ্যের কথা দ্বারা তাহা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—স্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন । পণ্ডর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন । কবির স্পষ্ট অঙ্কুলীসঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার

নিকট একটি গূঢ় ও মহিমাম্বিত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার স্তায় বোধ হইয়াছে । পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাঁদিতেছে—তাহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ :—

চণ্ডী—সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাষণ্ডি বিনশে ।  
 স্ত্রীয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব গা, কি কারণে ভয় কর নরে ।

সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদ্ভুত, দ্বিতীয় যমের দূত, সমরে হানয়ে বীর রথ । দেখিয়া  
 বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ ।

চণ্ডী—আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে ।  
 তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার, কি কারণে ভয় কর নরে ।

বাঘ—যদি গো নিকটে পাই, বাড়ি ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দূরে ।  
 বার্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় শ্রাণ, দেখি বীরে শ্রাণ কাঁপে ডরে ।

চণ্ডী—পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে । তুমি  
 যদি মনে কর, শ্রম করিতে পার, নর ভয় কর কি কারণে ।

গণ্ডা—কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খড়্গে তার কি করিতে পারে ।  
 বীরের অস্ত্রের বেগে, বক্রিণ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে ।

চণ্ডী—তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, বজ্রসম তোমার দশন । তব কোপে  
 বেই পড়ে, বমপথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন ।

হস্তী—দুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়া শুণ্ডে মোরে বেঁচে ।  
 মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মূল্যে লয়ে বেচে । ইত্যাদি ।

মনে হয় যেন, পশুযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া কবি মানুষীন্দ্রের কথারই  
 আভাষ দিয়াছেন, যেন মুসলমান প্রতাপের সমীপে হীনবল হিন্দুশক্তির  
 বিড়ম্বনাই কবির ইচ্ছিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে । উদ্ধৃত অংশ  
 হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্টতর আভাষ আছে ; ভালুক কাঁদিয়া বলিতেছে  
 —“বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক । নেউগী, চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক ।”  
 হস্তী বলিতেছে,—“বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর । লুকাইতে স্থান নাই বীরের  
 গোচর । পলাইয়া কোথা বাই, কোথা গেলে তরি । আপনার দস্ত হুটা আপনার অরি ।”  
 ইত্যাদি ।

এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে উঁহার মস্তপুত স্পর্শে  
 পশু জগতে মানবীয় তত্ত্বের বিকাশ পায় ; কবি  
 মনুষ্যসমাজের ছায়া । প্রকৃতির ফুল পল্লবের বর্ণনাগুলিও মাহুষী  
 উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলেন ; এই উপমাটি দেখুন,  
 “এক কুলে মকরন্দ, পান । করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুম্ভমে । এক ঘরে পেয়ে মান,  
 গ্রামবাঙ্গি বিজ্ঞ বান, অস্ত ঘরে আপন সম্মে ॥” কবির চিন্তে মাহুষসমাজ এত  
 স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,—জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় এবং  
 ইতর জীবসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন ।

কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড় । বড়  
 বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ত্রায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ  
 দুঃখবর্ণনায় কুতিত্ব । সংগীতের মর্ম্মস্পর্শী আন্তর্ধ্বনি শুনা যায় ।

সুশীলার বারমাস্তা হইতে ফুল্লার বারমাস্তা  
 হৃদয়কে গভীরতর রূপে স্পর্শ করে ; নিঃশব্দ করুণরস কাব্যখানিকে  
 বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে—সুখবসন্তকাল বর্ণনায়ও  
 কবির প্রেমগীতির মলয় বায়ু পরাভূত করিয়া উদরচিস্তার আক্ষেপবাণী  
 উঠিয়াছে । নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ নুপুর কাড়িয়া  
 লইয়া যেন গতি মম্বর করিয়া দিয়াছে ।

কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রগুলিতে পুরুষোচিত উদ্যম ও স্বাবলম্বন  
 বিরল,—ইহা কবির দোষ নহে, দেশের  
 পুরুষে পৌরুষের অভাব ।  
 বেরূপ পুরুষসমাজ, কাব্যে আমরা তাহারই  
 একখানি ছায়া প্রত্যাশা করিতে পারি ; ঘটনাগুলি অদ্ভুত, কবি খুব  
 বড় দরের পুরুষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া-  
 ছিলেন । কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন খাটো হইয়া গিয়াছে, ধনপতির চণ্ডীর  
 প্রতি অবজ্ঞা, নানারূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতন,—শ্রীমস্তের পিতৃভক্তি  
 এবং বিপদের প্রতি উপেক্ষা, নানারূপ অবস্থাস্তর, এগুলি কি মহামহিম

নায়ক-চিত্র অঙ্কনের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণ নহে ? অথচ কবি এই অবস্থাগুলি শিল্পীর মত সূক্ষ্মশীলতায় ব্যবহার করিতে পারেন নাই,—দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি স্থায়ী শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে নাই । তাহারা অবস্থার ক্রীড়নকের মত অকর্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে, কোন উন্নত চিন্তায় প্রাণোদিত হইয়া তাহারা কোন উন্নত কার্যে বিব্রত হয় নাই ; তাহাদের শক্তি, অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির প্রতি অতিরিক্তমাত্র নির্ভরশীলতা-হেতু স্বাধীন ভাবে উদ্বোধিত হইতে অবকাশ পায় নাই ।

কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই ; উৎকৃষ্ট নাটক বা কাব্যে ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার শ্রেণী  
কাব্য কেন্দ্র-শৃঙ্খল ।

দোড়াইয়া একটি মূলকেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়,—সেই মূল দৃশ্যের চতুষ্পার্শ্বে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায় ; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাজঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রায় বহু অধ্যায়সম্বিত হইয়া সকলের উপরে স্থায়ী অত্যুচ্চ আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে । কবিকঙ্কণের দুই একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অগ্রাগ্রা ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না । চণ্ডীকাব্য বিশৃঙ্খল একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর প্রায় তক, গুহা, পুষ্প, গুহা,—সমস্ত একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে, এই সৌন্দর্যের সাধারণ তন্ত্রে প্রত্যেক শোভাই নিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অপূর্ণ সূদৃশ্য হয় নাই ।

কবিকঙ্কণের অগ্র একবিধ গৌরব আছে । সরলা মিরেঙা, স্নেহশীলা  
কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেসুদেমনা \*ইহার  
রমণী-চরিত্র ।

সহসা ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন—ইহাদের নাম ইতিহাসের পক্ষে অস্বীকৃত হইবার যোগ্য । কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা ও খুল্লনার প্রায় বিলাতি সন্দরীগণ স্বেচ্ছাচরিত্র নহেন ; বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে যে দৈনন্দিন সহিসুতার পরীক্ষা হয়,

নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র জপ করিয়া বঙ্গনারীগণের গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে,—এই স্থানে কাব্য ও নীতি হিসাবে মুকুন্দ কবির নির্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব । আমরা এখানে চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব ।

### কালকেতুর গল্প ।

লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া তপস্তা করিতেছিলেন ; ইন্দ্রপুত্র

নীলাশ্বর তাহার নিকটে যাঠিয়া কহিলেন,

লোমশমুনি ।

“মুনি, আপনি শীতাতপ সহ্য করিয়া তপ

করিতেছেন, একখানি কুটার প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না ?” লোমশ

উত্তরে বলিলেন, “কি হেতু বাধিব ঘর জীবননথর।”—( মা, চ ) । নীলাশ্বর

প্রশ্ন করিলেন “মুনি আপনার আয়ু কত ?”—উত্তরে—“লোমশ বলিল শুন,

ইন্দ্রের তনয় । পরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ সর্ব গায় । এক ইন্দ্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয় ।

সর্বলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয় ।”—( মা, চ ) । এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর

বাধিতে বিরত ছিলেন । ইহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট

আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ

হইবে !

নীলাশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমর কে ?” উত্তর—“একমাত্র শিব ।”

সুতরাং নীলাশ্বর শিবসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

নীলাশ্বরের জন্ম-গ্রহণ ।

নীলাশ্বরের আহুত পূজার ফুলগুলির মধ্যে

একটি ফীট ছিল, তাহার দংশন-জালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাশ্বরকে

শাপ দিলেন—“পৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর ।” তাঁহার স্ত্রী ছায়াও

তৎসহগমন করিল । মর্ত্যলোকে এই দুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুলরা ।

কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই ; পূর্ব

কল্পের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল ;



এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার  
আয় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আদি অন্ত দেখাইয়া  
দিতেন।

কিন্তু সুখের বিষয়, নীলাশ্বর, কালকেতু-অবতারে তাঁহার স্বর্গীয়

বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই ;

বালাকাল।

কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধরূপেই

দেখিতেছি ; শৈশবে তাহার শরীরে দুর্দান্ত তেজ,—সে শশাঙ্ক তাড়িয়া  
ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল  
ছুঁড়িয়া মারিত ; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই—“শিশু নাথৈ যমন মণ্ডল।”—( ক,  
ক, চ, )। ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সে কাবোর প্রধান চরিত্র,  
কিন্তু মুকুন্দকবি তাহাকে বর্ণনা করিতে গগন হইতে চন্দ্র ও জল এবং  
স্থল হইতে বাঁধুলি কিংবা পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার  
“হুই বাহ লোহার সাবল”—( ক, চ )। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন  
কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ,—“শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি  
তোলে বেন তেঁজাটিয়া তাল।” নায়কের প্রাত একরূপ অবমাননাকর কথা  
বলিতে এখনকার কবিগণ কখনই স্বীকৃত হইবেন না। মুকুন্দ ব্যাধের  
রূপ শাস্ত্রীয় প্রভাব সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই—কবির উপর  
স্বভাবের বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে  
পাতিয়াছেন।

কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাইওয়া ঘটক-

রূপে যখন সঙ্করব্যাধের বাড়ীতে যাঁইয়া তাহার

বিবাহ ও জীবনোপায়।

কত্যাটি দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা স্বীয়

কত্মার মেঘবরণ চুল ও চাঁদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি  
বলিলেন “এই কত্মা রূপে গুণে নামে ফুল্লরা। কিনিতে বেচিতে ভার পায়রে পসরা।  
রক্ষন করিতে ভাল এই কত্মা জানে। বন্ধুজন মেলিয়া ইহার গুণ গানে।” ( ক, চ )।

এই স্থলে আমরা ফুল্লরাকে প্রথম দেখি । শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি আমরা ইতিপূর্বে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি ; যৌবনে কালকেতু নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত ; ব্যাঘ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া মাণিত,—“দেবীর বাহন” বলিয়া সিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের বাড়ি’দিয়া তাহাকে একরূপ শিক্ষা দিত যে,—“তুম্বায় আকুল সিংহ পান করে নীর ।”

সারাদিন শিকার করিয়া এক ভাঁড় মৃত পশুস্বন্ধে কালকেতু সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া আসিত ; তাহার ক্ষুধা ও খাদ্য । ভোজনটি খুব বিরাট রকমের ছিল, সে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাত, নেউলপোড়া, পুঁইশাক, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিত—“রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে ?”—(ক, ক, চ) । স্বীকার করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল ।

এদিকে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল ; তিনি বর দিলেন “কালকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না ।”

সে দিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল ; তাহার নিশ্চিন্ত অন্তঃকবণে দেবীর কুপার পূর্বাভাষ পূর্বাভাষ । নিঃশব্দ প্রফুল্লতার উদ্বেক করিতেছিল,—

“প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, ঘর খুর কাছে তিনবাণ । শিরে বাঁধা জাল-দড়ি, কর্ণে কটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ । দেখে কালকেতু হুমঙ্গল—দক্ষিণে গো, মৃগ, বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটপূর্ণজল । চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, কেহ জালে হোম বহি, দধি দধি ভাকে গোয়ালিনী । দেখিল রুচির তনু, বৎসের সহিত খেয়, পুরাঙ্গ দেয় জয়ধ্বনি । দুর্বা ধান্ত পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা, বামভাগে বারনিতম্বিনী । সুদঙ্গ মন্দিরা রায়, কেহ নাচে, কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি ।”

কিন্তু ইহাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল । গোসাপ যাত্রার

পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে ; কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুঃশূণে বাঁধিয়া লইল, “বদি অগ্র শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব ।”

দেবীর চক্র'স্তে সেদিন ঘনঘোর কুজাটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল ।

কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বর্নে বনে  
ব্যর্থ শিকারী ।  
ঘুরিয়া কিছুই পাইল না—কংসনদীর তীরে  
কতকটুকু জল খাইয়া অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু—“বিষম  
সম্মল চিন্তা মহাবীর লাগে । এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে ।”

ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শূন্য  
হস্ত দেখিয়া কঁাদিতে লাগিল ; কালকেতু  
গৃহের বন্দোবস্ত ।  
আপাততঃ গোসাপটাকে “ছাল উতাড়িয়া  
শিকপোড়া” করিতে আদেশ করিল এবং সখীগৃহ হইতে ফুল্লরাকে কিছু  
ক্ষুদ্র ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুধমনে বাসি মাংসের  
পসার লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল ।

ফুল্লরা বিমলার মাতার নিকট দুই কাঠা ক্ষুদ্র ধার করিল, দুই সখী  
একস্থানে বসিয়া একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাসুন্দরী  
ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল ।

এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া কুটীরের  
পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার রূপের প্রভাৱ  
চণ্ডীর স্বর্গপ্রবেশ ।  
“ভান্না কুড়্যা ঘরখানা করে ঝলমল । কোটীচন্দ্র

প্রকাশিত গগনমণ্ডল ।” বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া আগমনের কারণ  
জিজ্ঞাসা করিল । চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া  
আসিয়াছেন । সেই ব্যাধের কুটীরেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন ।  
ফুল্লরা সেই ভান্না কুটীরে স্বামী প্রেমের গর্ভ করিয়া স্থখী ছিল ;  
তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ

দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল ;—“পেটে বিষ, মূখে মধু, জিহ্বাসে ফুলরা ।  
 সুখা তুচ্ছা দূরে গেল রকনের ঘরা ॥” যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক  
 উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন, তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন  
 রাখিয়া ফুলরা-সুন্দরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি  
 ফুলবার হুশিষ্টা ও দেবীর  
 রহস্ত ।

নানা পৌরাণিক রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া  
 বলিতে লাগিল—“স্বামী ছাড়িয়া জীলোকের  
 একদণ্ডও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই  
 শ্রেয়ঃ ।” সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দিতে  
 চেষ্টা করিল—“সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড়বে  
 কেনি ॥” “এ বিষহজ্বরে, যদি স্বামী মরে, কোন্ ঘাটে থাকে পানী ॥”

কিন্তু দেবীর নিঃশব্দ রহস্ত-প্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির ভাণ  
 বরিয়া উপায়হীনা ফুলরার সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ করিয়া দিল ।  
 ফুলরা নীতিবাক্যে ফিরাইতে না পারিয়া দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে  
 লাগিল,—“বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী । ভাতা কুড়ে ঘর তালপাতের  
 ছাউনি । ভেরাণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে । প্রথম বৈশাখ মাসে নিভা ভাস্বে  
 ঝড়ে ॥” প্রভৃতি বর্ণনা পাড়িলে এষ্ট রহস্তের অভিনয়ের মধ্যেও আমাদের  
 কান্না পায় । জ্যেষ্ঠে,—“বইটির ফল খেয়ে করি উপবাস ।” “পসরা এড়িয়া  
 জল খাইতে না পারি । দেখিতে দেখিতে চিলে করে আখসারি ॥” শ্রাবণে,—“কত  
 শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী ॥” “দুঃখ কর অবধান । বৃষ্টি হৈলে কুড়ার ভাসিয়া  
 যায় বান ॥” “মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে । আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে হান  
 বৃষ্টি নীরে ॥” আশ্বিন মাসে,—“উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা । অভাগী ফুলরা  
 করে উদ্ভয়ের চিন্তা ॥ কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে । দেবীর প্রসাদমাংস  
 সবাকার ঘরে ॥” কার্তিক মাসে,—“নিযুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড় । অভাগী  
 ফুলরা পরে ফরিণের ছড় ॥” “ফুলরার আছে কত কর্ণের বিপাক । মাঘমাসে কাননে  
 তুলিতে নাহি শাক ।” “মধুমাসে মলয় মাকত মন্দ মন্দ । মালতীএ মধুকর পিরে  
 মকরন্দ ॥ বনিতা পুরুষ দৌহে পীড়িত মদনে । ফুলরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে ॥”

এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকাশ্য চেষ্টা আছে,—“কোন স্থখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী ।”

কাকালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মূর্তিখানি বঙ্গীয় কুটীরে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে ! ফুল্লরা নিজের এই সম্মুখে সৌন্দর্য্য ।

ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ লজ্জায় কাহাকেও খলিত না, কিন্তু এই রূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না । ফুল্লরার নীরব পতিপ্রেমের এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই—কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈবদহান্ত সম্বরণ করিতে পারি না ।

তথাপি দেবী যাইবেন না, তাঁহার প্রচুর ধন আছে—তিনি ব্যাধ-কুটীরের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন । আর তিনি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই—“এনেছে তোমার স্বামী বাধি নিজ গুণে ।” \* “হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে ।”

স্বামী ইহাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভি-  
দ্রুইট চিত্র ।  
মানিনী ফুল্লরা মনের ভাব গোপন করিতে  
পারিল না ।

“বিবাদ ভাবিয়া কাদে ফুল্লরা রূপসী । নয়নের জ্বলেতে মলিন মুখশর্পী । কাদিতে কাদিতে রামা করিল গমন । শীঘ্রগতি গোলাঘাটে দিল দরশন । গঙ্গাদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর । সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর । শাস্ত্রী ননদী নাহি নাহি তোর সত্য । কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কল্লি রত ।”

ফুল্লরা—“সত্য সত্যই নাহি প্রভু তুমি মোর সত্য । ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ বিধাতা । কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে । দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে । কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাগে দিলা মন । আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ । আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম । তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈলা রাম । পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে । কাহার বোড়শী কস্তা আনিয়াছ ঘরে । শিরেরে কলিক রাজা বড় দুরাচার । তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার ।” ‘গালকেতু—

\* গুণের এখানে সরল অর্থ ‘ধনুগুণ’, কিন্তু ফুল্লরা তাহা বোঝে নাই ।

“শ্রবান্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা । মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥”  
 ফুল্লরা—“সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী । তিন দিবসের চন্দ্র ঘারে বসি দেখি ॥”  
 একদিকে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপর দিকে কালকেতুর নির্মল  
 অমার্জিত চরিত্রে বৃথা সন্দেহজনিত ক্রোধ,—হুইট বিপরীত ভাবের  
 উদ্ভাস; অভিনয় চিত্রকরসোগা নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে ।

কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল “ভান্সা কুঁড়ে ঘর খানা করে ঝলমল । কোটি  
 চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল ॥” বিস্মিত হইয়া কাল-  
 দেবীর প্রতি অভ্যর্থনা ।  
 কেতু বলিল, এই শ্মশান সমান ব্যাধগৃহে  
 তুমি কে ? ব্যাধ হিংস্রক, চতুর্দিকে পশুর হাড় এই ঘরে—“প্রবেশে উচিত  
 হয় স্নান ।” এখানে তুমি কেন ? এখানে রাজিবাস করা উচিত নহে—  
 লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে । তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী  
 লইয়া বাইব । কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা ছিল,  
 সে একাকী বাইবে না—“চল বরুজনপথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পিছে লয়ে যাব  
 ধনুঃশর ।” দেবী উত্তর দিলেন না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ।  
 কালকেতুব রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—“বড় বহরি তুমি বড় লোকের  
 ঝি । বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি ॥” তথাপি চণ্ডী যান না, তখন  
 ব্যাধ বলিল—“চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়” এবং অবশেষে—“এত বাক্যে  
 চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর । ভান্স সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥” কিন্তু সহসা  
 অপূর্ব পুলকে ব্যাধ মস্তমুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে  
 লাগিল,—শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে  
 অতি-প্রাকৃত ।  
 লাগিল—যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা  
 ছাড়িতে পারিল না ; শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল । তখন স্বামীর  
 বিপদে ফুল্লরা সুন্দরী আসিয়া সহায় হইল,—“নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর ।  
 ছাড়াইতে নারে রামা হইল কাশর ॥” এই সময় দেবী ক্লপা করিয়া বলিলেন,  
 “আমি চণ্ডী তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি !” এই স্বভাব-নির্ভীক

সত্যবাদী ব্যাধ স্বীয় সামাজিক হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া চির বিনীত, সে চণ্ডীকে বলিতেছে,—“হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি । কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্কর্তী ।” তখন দেবী স্বীয় দশভুজামূর্তি দেখাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন । সেই মূর্তির বর্ণনাটি এস্থলে বড় সুন্দর হইয়াছে ।

চণ্ডীর অপূর্ব মূর্তি • দেখিয়া ব্যাধ '৩ ফুল্লরা কাঁদিয়া পায় পড়িল ;

চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গুরী উপহার  
দিলেন, কিন্তু—“লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ।

এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্ কাম । সারিতে নারিবে পভু হইবে দুর্বাম ॥”  
সুতরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল, এই সাত ঘড়া ধন ফুল্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল না ; তখন কালকেতু তাহার অভাস্ত সরলতা সহকায়ে একটি অনুবোধ করিল,—  
“এক ঘড়া ১ন মা আপনি কাকে কর ।” ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজে কাঁথে তুলিয়া লইলেন ; কিন্তু কালকেতু মূর্থ, দরদ্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্করতা, মূর্থতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ-নায়েকেরই উপযোগী, অতএব কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অত্যাশ হইবে । যখন চণ্ডী ধনঘড়া লইয়া ধোবে ধোরে চলিতেছেন, তখন—  
“মনে মনে মহাবীর করেন যুক্তি । ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্কর্তী ॥”  
এই সব বর্ণনায় একুপ একটি সুন্দর অক্লান্তমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অতএব কেহ দেখাইতে পারেন না । মুরারীশীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে । একদিকে প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা-সূচক প্রাণ, শঠে সরলে ।  
অপরদিকে কালকেতুব সরল বন্ধুভাবের উত্তর ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্করতাকে যেন প্রকৃত স্ত্রীতীর বর্ণে মার্জিত করিয়াছে ।

ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিল । কিন্তু পরবর্তী অংশে মুকুন্দ ও মাধব । মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারেন নাই । মুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাহার কালকেতু রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ । তাঁহার কালকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, দ্বীর অম্বরোষী শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি ; কবি বাঙ্গালী বীরকে বোধ হয় যথাদৃষ্ট তথা অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্য কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; ফুল্লরা যখন স্বামীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কালকেতু বলিতেছে—“শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাপে ধর ধর, শুন রামা আমার উত্তর । করে লৈয়া শর গাভী, গুজিব মঙ্গল চণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর ॥ যতক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভয়, কুঞ্জর করিব লণ্ড ভণ্ড । বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুঘিব চণ্ডিকা মায়, আগনি ধরিব ছত্র দণ্ড ॥”—( মা, আ, চ । ) এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন—“রাজসভা দেখি বীর প্রণাম করে ।”—( মা, আ, চ ) ।

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন—আমার ভৃত্য কালকেতু, তাহাকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও ।” কলিঙ্গাধিপতি এই আদেশ অনুসারে কালকেতুকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেন ।

ইহার পর সহসা একদিন কালকেতু 'নীলাশ্বর হইয়া ও ফুল্লরা ডায়া হইয়া স্বর্গে গমন করিল ।

### ভাড়ু-দত্ত ।

উপাখ্যান-ভাগে একটি আবশ্যকীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি ।

ধর্ম্মতার প্রতিশ্রুতি । আমরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, ভাড়ুদত্তকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিব,



এইজন্ত পূর্বে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই । ভাড়ু শকুনিশ্রেণীর ব্যক্তি,—  
ধূর্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি । এই চরিত্ৰ বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধবা-  
চার্য্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, আমরা মাধবাচার্য্যের কাব্যকে মূলতঃ  
অবলম্বন করিয়া ভাড়ু-চরিত বর্ণনা করিব ।

ভাড়ুদত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষ্মীর কুপা আঁটে না,

—পরিবারের সকলেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী  
ঘরের কথা ।

থাকিতে হয় । ভাড়ুদত্ত একদিন উপবাসে  
বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় জ্বরী নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,—  
“ভাড়ুদত্ত বলে শুন তপনদত্তের মা । ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা ।”  
তপনদত্ত ভাড়ুর পুত্র । ভাড়ুর গুণবতী ভার্য্যা ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর প্রতি  
হাসিয়া বলিল,—“বেন মতে কথা কহ লোকে বলে আউল । কালি গেল উপবাস  
আজি কোথা চাউল ।”

তখন ভাড়ু হুঃখিত চিত্তে—“ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাঁধিয়া । ছাওয়ালের  
মাথে বোঝা দিলেক তুলিয়া ।” “ভাঙ্গা কড়ি” দিয়া কি হইবে, পাঠক সে  
প্রশ্ন এখন করিবেন না ।

বাজারে উপনীত হইয়া ভাড়ু প্রথমে ধনাপশারীর নিকট গেল,

কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল  
ভারদত্ত বাজারে ।

“তব্বা ভাঙ্গাইবা কড়ি দিয়া যাব তোরে ।” কিন্তু ধনা  
তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবে না । কিন্তু  
ভাড়ুদত্ত তাহাকে নানা রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইক-  
গণ তাহাকে মাত্ত করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত  
শিক্ষা দিবে । ধনা ভয় পাইয়া বলিল—“পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি ।  
চাউল নিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি ।” শাক-বিক্রেতাকে ধানারূপ  
প্রলোভন দেখাইয়া এক বোঝা শাকশবজি লাভ করিল—“কাণি ছই তিন  
ছুমি ইনাম দিব তোরে ।” এইরূপ নানা ধূর্ততা করিয়া সে লবণ ও তৈল

আদায় করিয়া লইল ; কিন্তু গুবাক বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জঙ্ক হইল, তাহাকেও টাকা ভান্ধাইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলিতে সে বলিল,—  
 “তক্কা ভান্ধাইয়া মজুত আন গিয়া কড়ি। মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী।”  
 তখন ভাড়ুদত্ত রাজদরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল ;—  
 স্বীয় গৌরবের নানা খ্যাতি করিয়া বলিল—রাজা তাহাকে গাড়ু, কঙ্কল ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন দিয়াছেন ; বলা নিশ্চয়োজন এ সকলই মিথ্যা। গুবাক বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,—  
 “প্রাতঃকালে পাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে।”  
 এইভাবে গুবাক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দাঁধ বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটু মুখে গালি দিতে লাগিল, ভাড়ু নানা উপায় জানে, সে তাহার কাণে কাণে বলিল,—“তোরা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি। বাদী হইয়াছে যত গামের রায়তি।” ভয়ে ঘোষের মার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মংশ-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মংশ আদায় করিতে গিয়া ভাড়ু প্রকৃতই জঙ্ক হইল ; সে কোনরূপেই মংশ দিবে না। ভাড়ু যত বলিল, মংশ-বিক্রেতা লুকুটি-কুটিল মুখে সব অগ্রাহ করিল, শেষে ভাড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে ছইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল ; এই যুদ্ধে,—“কচ্ছ হতে ভাড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি।” “কাণা কড়ি পড়ে ভাড়ু বহ লজ্জা পায়। মংশ ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায়।”

এই গেল বাজারের পালা ; তার পর ভাড়ু কালকেতুরাজাকে প্রতারণা করিতে গিয়াছে,—  
 রাজদরবারে ।

“ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা, আগে

ভাড়ুদত্তের প্রয়াণ। ফোঁটা কাটা মহাদত্ত, ছেঁড়া জোড় কৌচা লম্ব, অধণে কলম লন্দহান।<sup>১</sup> প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেঁড়া কঙ্কলে বসি, মুখে মল্ল মল্ল হাসি, ঘন ঘন দেয় বাহ নাড়া। আইনু বড় প্রীত আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডুকিবে ভাড়ুদত্তে। যতেক কায়ছে দেখে, ভাড়ুর

পশ্চাতে লেখ, কুললীল বিচার মহত্ব । কহি আপনার তত্ত্ব, আরলহাঁড়ার দত্ত,  
তিনকুলে আমার মিলন । ঘোষ ও বহুর কস্তা, দুই নারী মোর ধস্তা, যিত্তে কৈল  
কস্তার গ্রহণ । গঙ্গার দুকুল পাশে, বতক কায়স্থ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন ।  
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রক্ষন ॥” ইত্যাদি ।—  
ক, ক. চ।\*

সে কালকেতুর মার্জিত পদ পাইতে অভিলাষী । কালকেতু তাহাতে  
সম্মত হইল না ; তখন ভাড়া বকিতে আরম্ভ করিল,—কালকেতুর লোক-  
জন যাইয়া ভাড়ুকে খুব প্রহার করিয়া দিল ; তখন ভাড়ু—“গুনর্ব্বার  
হাটে মাংস বেচিবে ফুলরা ॥” প্রভৃতি ভাবের গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া  
গেল,—

“পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল । হাসিতে হাসিতে ভাড়ু বাড়ীতে চলিল ॥  
বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী । সহরে আনিয়া  
দেও এক ঘটি পানি ॥ প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির ।  
ভাঙ্গা ঘটিতে পুরি বাহির করে নীর ॥ ভাড়ুর দেখিয়া তার রমণী চিন্তয় । দেওয়ানেরে  
গেলা প্রভু ধূলি কেন গায় ॥ ভাড়ু এ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশ । মহাবীর সনে আজি  
খেলিয়াছি পাশা ॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটী হারি । রসে অবশ হইয়া করে  
হড়াহড়ি ॥ ধুলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস । বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ ॥  
কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মহাঙ্গ । বাহার পীরিতে বশ হৈল ভাড়ু দহ ॥”

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্তের হৃদয় ক্রোধে  
জ্বলিতেছিল ; ইহার পরে সে কলিঙ্গাধিপকে  
প্রতিহিংসা ।  
জানাইল যে, তাঁহার রাজ্যের নিকট একজন  
নীচজাতি ব্যাধ রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে এবং কোশলে কলিঙ্গরাজকে  
উদ্বেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল । এই যুদ্ধের  
কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ।

\* ভাড়ুদত্তের প্রসঙ্গে এই স্থলটি মাত্র কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল ; অন্ত্যান্ত  
অংশ সাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি ।

যখন ছই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতিক্রমে  
 নাপিত ভাড়ুর মস্তক অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া  
 ভাড়ুদত্তের শাস্তি।  
 লইল এবং মধো মধ্যে ক্ষুর বাম পদের তলাতে  
 ঘষিয়া মাথাটি বেশ করিয়া মুণ্ডন করিয়া দিল। মস্তক মুণ্ডনের পর  
 নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া  
 দিয়া গেল ; ছেলেরা গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল ;  
 “কাল হাঁড়ি ফেলা মারে কুলের বহড়ী”—এতদবস্থায় ভাড়ুকে গঙ্গা পার করিয়া  
 দেওয়া হইল ; কিন্তু শতবার ধৌত হইলেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না ;  
 গঙ্গাপার হইয়া,—“লোকের সাক্ষাতে ভাড়ু কহে মিথ্যা কথা । গঙ্গা সাগরেতে গিয়া  
 মুড়য়েছি মাথা । এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে ।”

### শ্রীমন্তের গল্প ।

রত্নমালা অম্বরী তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুল্লা হইয়া

জন্ম গ্রহণ করেন ।

খুল্লনার জন্ম ।

একদা উজানিনগরের যুবক ধনপতি-সদাগর শ্রামল প্রান্তরে ক্রীড়া-

চ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন ; এই পায়রা

কৌতুকে বিপদ ।

খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল ; ধনপতি পায়রা

চাহিতে গেলেন, খুল্লা জানিতে পারিল, ধনপতি তাহার খুঁড়তত ভয়ীর  
 স্বামী, স্ততরাং সম্বন্ধটিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল ; ঈষদ্বিক্রম-  
 যৌবনা খুল্লা অন্ধর মুখখানি বিক্রপ-মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া  
 কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেল ; ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল,  
 তিনি ঠাড়াইয়া খুল্লনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ধনপতি কূলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত ; স্ততরাং

লহনাকে প্রবোধ ।

এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন । কিন্তু তাঁহার

প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরীকে প্রবোধ না দিলে হয়

না—সে ত এ কথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া বসিয়া আছে—কথা বলে না ;—

“লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর । অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর ॥ ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান । কপট সম্ভাবে সাধু লহনা বুঝান ॥ রূপ নাশ কৈলে শ্রিয়ে রক্ষনের শালে । চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে ॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী । রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিঁধে পানি ॥ অবিরত ঐ চিন্তা অস্ত্র নাহি গণি । রক্ষনের শালে নাশ হইল পয়িনী ॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী । কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রাজুনী ॥ বৃষ্টি যদি দেহ মনে কহিবা প্রকাশি । রক্ষনের তরে তব করি দিব দাসী ॥ বরিষা বাদলেতে উননে পাড় ফুক । কপূর তাহুল বিনে রসহীন মুখ ॥”

এই কথাগুলির মোহিনীশক্তিতে এবং একখানি পাটশাড়ী এবং চুড়ি গড়িবাব জ্ঞাত ৫ তোলা সোণা পাঠিয়া লহনা আর কোন আপত্তি করিল না ।

লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থূল ; তাহার প্রকৃতি সরল ও স্নন্দর, কিন্তু কোন চুষ্ট ঢালাক লহনা-চরিত্র ; সপত্নী-প্রেম । লোকের হাতে পড়িলে নিকোঁধ লহনা খেলার পুতুলের ভ্রায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্রয়োচনায় সে নিতান্ত গর্হিত কর্মও করিতে পারে ।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় প্রবাসে ( গোড়ে ) যাইতে হইল, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে সঁপিয়া গেল । লহনা স্বামীর কথা মাথায় লইয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল ; দুই-দিনের মধ্যেই খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল ;—

“সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ । পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য, খুল্লনারে করয়ে পালন ॥ যবে ছয় দণ্ড বেলা, কুছুনে তুলিয়া মলা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায় । বাহার্য্য প্রাণের সখী, শিরে দেয় আমলকী, তোলা জলে স্নান করায় ॥ আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে কঁরি, পরিবার যোগায় বসন । করেছে চিরুণী ধরি, কুস্তল মার্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম খালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান । ভুঞ্জে খুল্লনা নারী,

কাছে খোয় হেম ঝাড়ি, লহনার খুলনা গরাণ । ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা, অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা । পরশে লহনা নারী, গায় দেখি বস্ত্র বারি, পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্বলা । অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুলনা নারী, লহনা মাথার দেয় কিরা । দুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধক্, স্ববর্ণে জড়িত যেন হীরা ॥”

লহনার মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না । দুর্বলোদাসী নির্জ্ঞানে বসিয়া খানিক এই চিন্তা করিল,—“যেই ঘরে দু-সতিনে না হয় কোন্‌ল । সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল ॥” “একের করিয়া নিন্দা যাব অল্প স্থান । সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥” তৎপর সে লহনাকে ঘাইয়া এই ভাবে উত্তেজিত করিল—“গুন গুন মোর বোল গুনগো লহনা । এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা ॥ ঋজুমতি ঠাকুরাণি নাহি জান পাপ । হুক্‌ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ ॥ সাপিনী বাঘিনী সত্য পোষ নাহি মানে । অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥ কলাপী-কলাপ জিনি খুলনার কেশ । অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ খুলনার মুখশশী করে ঢল ঢল । মাহিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥ \*\*\* ক্ষীণমধ্যা খুলনা যেমন মধুকরী । যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥ আসিবেন সাধু গোঁড় থাকি কতদিন । খুলনার রূপ দেখি হবেন অধীন ॥ অধিকারী হবে তুমি রঞ্জনের ধামে । মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ নেউটিয়া আইসে ধন হৃত বন্ধুজন । না নেউটে পুন দেখে জীবন যৌবন ॥”

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল ; সে ক্ষেপিয়া গেল ;

—খুলনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা

দরলে গরল ।

তজ্জ মস্ত্র ও ঔষধ খুঁজিতে লাগিল । অবশেষে

এক জালপত্র লইয়া খুলনার নিকট উপস্থিত হইল ; পত্রের মর্ম্ম এষ্ট—  
তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, ঢেঁকিশালে শুইয়া থাকিবে, এক বেলা আধপেটা ভাত খাইবে ও ‘খুঁয়া বস্ত্র’ পরিবে ।

এই স্থান হইতে খুলনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে । খুলনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ; তাহারও একবারে রাগ না আছে, এমন নহে, কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়—  
রাগের বশীভূত হইয়া নিতান্ত একটা হুকুমও করিয়া ফেলিতে পারে,—

খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নিকোঁধ রাগ দৃষ্ট হয় না । জ্বাল পত্র লইয়া লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একবারে অগ্রাহ্য করিল—ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে ; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে । লহনা বলিল—তুমি এসেছ পরেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া গোড়ে যাহতে হইয়াছে, বোধ হয় এইজন্ত তিনি রাগিয়াছেন ; আর তিনি নিজ হাতে ১৮টি না লিখিয়া হয়ত মুহুরি দিয়া লিখাইয়াছেন । খুল্লনা বলিল—ও কথা কিছু নহে, এ পত্র জ্বাল । তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারতে গেল । খুল্লনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্মনামর্শন না জানিত, এমত নহে—“খুল্লনার অঙ্গুলী বিবির বিপাকে । দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে । লহনা হইল তাহে যেন অধিকণা । খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা ॥”—এইত ঘটনা ; তবে খুল্লনাব “অঙ্গুলী” যে নিতান্ত “দৈবাৎ” লহনার বুকে লাগিয়াছিল, তাহা নাও হইতে পারে । শেষে শুদ্ধ শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনা স্তম্ভরী তুলুপ্তিত হইল—“কাতরে খুল্লনা দেয় রাজার দোহাই ।”

এই অবস্থায় খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে বনে বনে যাঁহতে হইল, ঢেঁকিশালে শুইতে হইল ও খুঁয়ার খুল্লনা বনবাসিনী । কাপড় পরিতে হইল । ছাগল রাখার সময় ক্ষুরস্তম্বোবনা খুল্লনা স্তম্ভরী গৃহের আড়াল হইতে বনের শ্রামল প্রদেশে আসিলেন ; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল । তাহার ছেলি-রক্ষণের কষ্ট পিড়িতে আমাদের হতভাগিনী ফুল্লরার কথা মনে পড়িয়াছে ; ইহার বারমাসীতেও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় । এই দুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন বিশেষ সংবাদ লয়েন নাই—“তুমিরা খুল্লনা হুঁখে ছাড়য়ে নিশ্বাস । অবনী প্রবেশ যদি পাই অবকাশ ।” স্তম্ভরীর এই দুঃখের মূর্তিখানা দেখুন—

“ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল । ছাট হাতে, পাত মাখে, যেমন পাগল । নানা শস্ত দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি । দেখিয়া কুবাণ সব দেয় গালাগালি । শিরীষকুসুম তনু অতি অমুপাম । বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম ।”

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায় ; নব যৌবনাগমে খুল্লনা এই দুঃখ ভুলিয়া বসন্তকালে বিরহে মাতিয়া গেল ; বহিঃপ্রকৃতির উদ্দাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের আবেগ মিশিয়া গেল ।

“মল্ল মল্ল বহে হিম দক্ষিণ পবন । অশোক কিংসুকে রামা করে আলিঙ্গন । কেতকী খাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন । কুসুম পরাগে লগ্ন হৈল অলিঙ্গণ । লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক । খুল্লনা বলেন সেই ভূমি বড় লোক । আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল । তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো ।” খুল্লনা ভ্রমবেব নিকট করযোড়ে বলিল,—“চিন্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাখা ।” কিন্তু ভ্রমরের গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন খুল্লনা বাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে,—“তুই মাতোয়াল, মোরে হৈলি কাল, না গুন বিনয়বাণী । ধৃতুরার ফুলে, কিবা মধু গিলে, তাহা মনে নাহি গণি ।” কোকিলের কুহস্বরে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল ; প্রকৃতির তরু পল্লব, পাখী, অদ্য নিরাশ্রয়া খুল্লনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে বলিতেছে,—“সদাগর আছে যথা, কেন নাহি বাও ভথা, এই বনে ডাক অকারণ ।”

বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্দর্য্য এই সব স্থলে উজ্জ্বল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । পাঠক এই সব বর্ণনা পড়িতে বসন্তঋতুর নূতন হিল্লোল ও বনফুল মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন, খুল্লনাকে বড় ভাল ও সুন্দর বোধ হইবে ।

পথশ্রান্ত খুল্লনা এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল ।

চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনাকে মাতৃরূপে দেখা  
চণ্ডীদেবীর বরপ্রদান ।

দিয়া স্বপ্নে বলিলেন—“কত দুঃখ আছে কি তোমার কপালে । সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে । তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিধে ঘুণ ।



আজিলো লহনা তোরে করিবেক খুন ॥” খুল্লনা জাগিয়া দেখিল সত্য সত্যই “সর্বশী” ছাগলটি নাই,—তখন লহনার গাতির ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বনপ্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চ কত্কা তাহাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন ; অশ্রুনেত্রে চিরদুঃখিনী খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“জন্মে জন্মে ছেলে তুমি হ’ও নিজ জন্ম। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ ॥” চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্রলাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

এতদিনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্র খুল্লনা বাড়ী যায় নাই ; লহনার মনে অনুতাপ হইল, “স্বামী প্রভাগত প্রবাসী। আমাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, খুল্লনাকে বনের কোন পশু মারিয়া ফেলে নাই ত ?” প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন লহনা তাহাকে পূর্বের ন্যায় আদর ও যত্ন করিতে লাগিল, ধনপতির চরিত্র-বল বেশী কিছু ছিল না ; সে গোড়ে যাইয়া অসঙ্গত স্মৃতে মত্ত হইয়া বাড়ী ভুলিয়াছিল ; সেই রাত্রিতে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আসিলেন, তাঁহাব আগমন সংবাদে লহনা স্বীয় শিথিল সৌন্দর্য্যকে যথা-সাধ্য টানিয়া বুনিয়া নূতন বেশভূষায় সজ্জিত করিতে বসিল ; “গুয়াচুটি” খোঁপা বড় সুন্দর করিয়া, বাঁধিল কিন্তু—“মাছিতা বদনে দোষদর্পণে চাপড় ॥” দর্পণ ভাঙ্গিলে সুন্দরীগণের মুখের মাছিতা ঘোচে কি ? লহনা “মেঘ ডুবুর” কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গেল। এদিকে সে দিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত ; দুর্ব্বলা দাসী বিস্তর পরিসা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজনপত্র সংগ্রহ করিয়াছে ; সাধু খুল্লনাকে রাখিতে বলিলেন ; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, —খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, উহাকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা খেলিতে জানে—“নাহিরাঁথে, নাহিবাড়ে,

নাহি দেয় ফুক । পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ পান। মুখ ॥” কিন্তু এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাঠি রাঁধিতে গেল ; দেবীর ক্রুপায় পাক বড় উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বালিল, কিন্তু—“বাসি পাস্ত ভাত ছিল সর। দুই তিন । তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন ॥” সকলটিকে খাওয়াইয়া দেবী-কুপীণী লক্ষ্মীবউ খুল্লনা লহনার নিকটে গেল,—“সম্মে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে । ঘুচিল কোন্দল দৌহে বসিল ভোজনে ॥”—খুল্লনা এইরূপ ক্ষমাশীলা ছিল ।

তারপর খুল্লনা সাধুর শয্যাগৃহে যাঠবে ; লহনা তাহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া নিবারণ করিল ; কিন্তু খুল্লনা সেই সব শয্যাগৃহের অভিনয় ।

যুক্তিপ্রবর্তক অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল ও গল্পছলে যুক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে পতিগৃহে গেল ।

শয্যাগৃহে সুন্দর কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুল্লনা শয্যার নীচে পলাইয়া ছিল, তখন ধনপতির মুখে অনাহুত অনেক কবিত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছিল,—

“কহ খটা কোথা মোর খুল্লনা স্তম্ভরী । কহ না প্রদীপ কোথা মোর সহচরী ॥ সত্য করি কহ কথা মধুরবধু । খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু ॥ চিত্রের পুস্তলী যত আছে চারিভিতে । সব জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিত্রে ॥ এতদিন একলা আছিল পরবাসে । স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী বৈসে মোর পাশে ॥ প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর । কি দিয়া স্তম্ভরী মোরে করিলা পাগল ॥”

ক্রীড়াময়ী খুল্লনা ধরা দিল, স্বামীর বৃকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল ; শুনিয়া সাধু রাগে দুঃখে জর্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী—খুল্লনাকে পাঠিয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার ভ্রাস হইয়াছিল, আর এদিকে রাত্রিশেষে যখন সাধু খুল্লনার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, তখন ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্তি লহনা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল । “বা’র হতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট । লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট ॥” কি অপরাধ-

হেতু রাগ করার পরিবর্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন ।

ইহার পরে পিতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল । এই বণিকসমাজে পিতৃশ্রদ্ধে বিব্রাট । মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বধিয়া গেল, সে স্থলটি পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি ; এই কলহের পরিণাম এই দাঁড়াইল, সভায় শ্রদ্ধা হইল, “ধনপতি খুল্লনাকে কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন, সে বনে বনে ছাগল চরাইত ।” “শুকজলে মৎস্য আর নারীর ঘোবন । বনান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন ॥ অথহে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন জন । দেখিলে ভুলয়ে ইষে মুনিজনার মন ॥” খুল্লনা যদি সত্য হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা আমরা আপনার বাড়ী খাইব না । ইহা শুনিয়া খুল্লনার পিতা লক্ষপতি কাতরভাবে রাজার দোহাই দিলেন । তাহা শুনিয়া—“বলে বেণে শঙ্খদত্ত, রাজবলে হয়ে মত্ত, জাতিরে দেখাও রাজবল । জাতি যদি অভিরোধে, গরুড়ের পাখা খসে, ইহার উচিত পাবে ফল ॥” খুল্লনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে ।

জানি-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অদ্য উপাযহীন ধনপতির সেই অবস্থা ; দুর্বল বণিক গৃহে খুল্লনার পরীক্ষা ।

যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল । “তুমি কেন খুল্লনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলে ?” এবং খুল্লনাকে যাইয়া বলিল—“আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দেওয়ার কাজ নাই ।” কিন্তু খুল্লনা সেরূপ মেয়ে নহে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অদ্য দিবে, তৎপর আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে । আর এই কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না—“পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন । গরল ভথিয়া আমি তাজিব পরীক্ষণ ॥”

এইরূপে খুল্লনা সত্য নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রফুল্লমুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন ; তাঁহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,—সম্প

দ্বারা দংশন করা হইল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইল, অবশেষে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া আশ্বিন দেওয়া হইল ; এইবার লক্ষপতি কাঁদিয়া উঠিল এবং ধনপতি শোকে বিহ্বল হইয়া আশ্বিনে ঝাঁপ দিতে গেল ।

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্গেব তায় এই জতুগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইলেন ; এইবার শত্রুগণ পরাভব মানিয়া খুল্লনাকে প্রণাম করিল ।

এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে

রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহন বাইতে হইল ।

পুনশ্চ প্রবাসে ।

ধনপতি “সাতডিঙ্গা” বোঝাই করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের জন্ত প্রস্তুত হইল । যাত্রার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা লগ্নাচার্য্য অশুভ বলিয়া নিন্দা করাতো,—“এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাক । নক্ষরে হুকুম দিয়া মারে তারে ধাক্কা ॥” খুল্লনা পতিব শুভ কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর “ডাকিনী দেবতা” বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিল ।

সদাগর,—ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসিঙের ঘাট, মেটেরি, কালিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল ; সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় ছগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই । কবি সমুদ্রের যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর রেখায় অঙ্কিত, কিন্তু তন্মধ্যে ছএকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব দুর্লভ নহে,—“কিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে । রাত্রিদিন বহে যায় হারমদের ডরে ॥” এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের পৰ্ব্বগিজ দম্বাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে ।

চণ্ডীর ঘটে সাধু লাথি দিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার

কমলে-কামিনী ।

শোধ তুলিলেন ; তুকানে ৭ ডিঙ্গার মধ্যে  
৬ ডিঙ্গা মারা গেল ; একমাত্র “মধুকর ডিঙ্গা”

লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিলেন । কিন্তু পথে কালিদহে দেবী এক অপূর্ণ দৃশ্য দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন । সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন ; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মাকৃতা পরমাসুন্দরী রমণী-মূর্তি ; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন । এই উজ্জল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া সাধু স্বপ্নাবিষ্টের ত্রায় দাঁড়াইয়া রহিল ; হাতীগুহ্ম সুন্দরীর ভরে প্রফুল্ল পদ্মের ক্ষীণাঙ্গ কাঁপিতেছিল , সদাগরের সাহসরাগ সহানুভূতি সেই বেপথুমতী নলিনীলতার উপর ; সে কৃপাপূর্ণ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—“হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ।” যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এদৃশ্য অপর কেহ দেখে নাই । সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি দেখাইলেন । কিন্তু সদাগরের মুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া কাহারও প্রত্যয় হইল না ।\* রাজা ও সাধুর মধ্যে অঙ্গীকার পত্রের বিনিময় হইল, এই কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্ত বন্দী হইবে । সাধু রাজাকে লইয়া কালীদহে সেই দৃশ্য আব দেখিল না—এই উপলক্ষে সাধুর নৈবাশ্রম্ভচক সংগীত—“এ যে ছিল, কোথায় গেল, কালদলবাসিনী ।

---

\* প্রজ্ঞাভাজন কোন সমালোচক এই আখ্যানটি লইয়া মুকুলরামের সৌন্দর্য্য-কল্পনায় খুঁত বাহির করিয়াছেন । এমন অসীম সমুদ্রের শোভা, এমন সুন্দর পদ্মবন, তন্মধ্যে এমন সুন্দরী রমণীমূর্তি, এক মাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীভৎস কল্পনায় সৌন্দর্য্যের চিত্র খানি কবি একবারে কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছেন । কিন্তু চণ্ডীকাব্য ধর্ম্ম-কাব্য, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্য দেবতা । গজগ্রাসনীলা চণ্ডী দেবীর এসঙ্গ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ববর্ত্তী সমস্ত চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মূর্ত্তিই বর্ণিত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত পূজামণ্ডপে ভাস্করহস্তে এই ভাবের মূর্ত্তিই গঠিত হইয়া পূজিত হইত ; কবি এই মূর্ত্তিকে স্বীয় তুলি দ্বারা সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না । গণেশের শুণ্ড বর্জন করিয়া তাঁহার দন্তের সঙ্গে মুকুতা কি দাড়িম্ববীজের উপশা দেওয়াও বৈরাগ্য হস্তকর হয়, এইমতে কবির স্বীয় কল্পনাদ্বারা দেবীর মূর্ত্তি সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপই হস্তকর হইত ।

লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শুভবদনী ।” আমরা অশ্রুপূর্ণচক্ষে যাত্রায়  
শুনিয়াছি ; সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল । কারাগারে  
চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া ইজিতে জানাইলেন,—আমার পূজা করিলে  
তোর এ দুর্গাত মোচন হইবে । কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল,—  
“বদি নীশালে মোর বাহিরায় প্রাণ । মহেশ ঠাকুর বিনে অস্ত নাহি জানি ।”

এদিকে বাড়ীতে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল ; প্রসবসময়ে লহনা নিজে  
বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খুল্ল-  
শ্রীমন্তের জন্ম ও শৈশব ।  
নার গুরুশ্রদ্ধা করিতে কোনরূপ ক্রটি করিল  
না । মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব শিবের গায়ে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া  
জন্ম লইলেন । শিশুটি বড় সুন্দর—“সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ ।”  
বালক সেই অর্দ্ধোদ্যত দন্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ও ক্রোড়া করে ;  
পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত  
খেলাগুলি খেলিতে লাগিল । কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল ; সহচর শিশুগুলি  
খুল্লনার নিকট নালিশ করিতেছে,—“করিয়া জন্মন, বলে শিশুগণ, শুনগো  
শ্রীমন্তের মা । তোমার তনয়, মারয় সবায়, দেখ দেখ মারনের ঘা । সব শিশু মিলি,  
এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড় দুঃস্থ । দাকণ চাপড়ে, সব দণ্ড নড়ে, লাঘবের নাহি অন্ত ।  
ভ্রমণ করিয়া, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া । যাদব মাধব, দুভাই নীরব,  
দস্তবেশে হৈল খোঁড়া । খুল্লনা ঝাড়িয়া ধূলি, দিল হাতে নাড়ু কলা, তৈল দিল সর্ব্বেগায় ।”  
ইত্যাদি । কবি জানিতেন ক্রোড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয় ;  
শ্রীকৃষ্ণজীবনের অশান্তপনাব মাধুর্য্য হঠতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস  
দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে । ইহার পর শ্রীমন্ত পড়িতে গেল ; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের  
ব্যাখ্যা, মাঘ, ভারবি, জৈমিনিভারত, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্প  
দিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল । একদিন তিনি গুরুকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুতনা অজামিল ইহার  
গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল, কিন্তু

শুক ও শিষ্য ।

শূর্ণগাথার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল ; “নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।” সেত সেই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তরে বলিলেন, “এ সকল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা”; কিন্তু শ্রীমন্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর প্রাতি ঈষৎ পরিহাস-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমন্তকে নিতান্ত অসম্মত বাক্যে গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া উচিত উত্তর দিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করাতে শ্রীমন্ত ক্রোধে ছুখে বাড়ীতে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; সেই দিন তরুণবয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহল-যাত্রার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার অনুমোদন, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। পুনরায় সাত ডিঙ্গা শ্রীমন্তকে লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল।

আবার সেই নৌল জলরাশির মধ্যে সেই সেই ঘটনা, কালীদহে আশ্চর্য্য কমলবন, সিংহলাধিপের নিকট যাইয়া মশানে শ্রীমন্ত। সেই বৃক্ষস্ত বলাতে সভাসদগণ ও রাজার অপ্রত্যয়; এবার এই পণ স্থির হইল—যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে পারেন, তবে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য ও নিজ কন্যা দিবেন, নতুবা দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কণ্ঠিত হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়া কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাঁহার শিরশ্ছেদ হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্ত জীবনের শেষ পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন; চক্ষুর জলের সঙ্গে, তর্পণের জল মিশিয়া গেল,— “তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিড়খে পার্বতী। তর্পণের জল লহ ধুলনা জননী। এ জনসম্মত মত ছিরা মাগিল মেলানী। তর্পণের জল লহ

খেলাবার ভাই । উজানী নগরে আর দেখা হবে নাই । তর্পণের জল লহ দুর্বলা পুষ্ণি ।  
তব হস্তে সমর্পণ করিহু জননী । তর্পণের জল লহ জননীর মা । উজানী নগরে আমি  
আর বাব না । তর্পণের জল লহ লহন বিমাতা । তব অশীর্বাদে মোর কাটা বাবে  
মাথা । সবাচারে সমর্পণ আপন জননী । এ জনমের মত ছিয়া মাগিল বেলানী ।”

ইহার পরে নিবিষ্টমনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্তব করিতে  
লাগিলেন । এই উপলক্ষে শ্রীমন্তের নৌকার  
বান্দালদের কাতরতা ।

বান্দাল মাঝিগণের দুর্দশা বর্ণনায় কবি বেশ  
পরিহাস-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—“বান্দাল কাদেরে হাড়ুর বাপই বাপই । কুক্ষেণ  
আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই । \* \* \* আর বান্দাল বলে বাই হইল অনাথ ।  
হর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত । আর বান্দাল বলে বাই কইতে বড় লাজ । অলদি  
গুড়ি বাসা গেল জীবনে কি কাজ । যুবতী যৌবনবতী তাজিলাম রোবে । আর বান্দাল  
বলে দুঃখ পাই গৃহদোষে । ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো । আর বান্দাল বলে  
না দেখিহু মাগু পো ।”\*

বান্দালগণকে লইয়া বিজয় বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে ; চৈতন্যপ্রভু  
এবিষয়ের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন—চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা গিয়াছে ।

ইহার পরে চণ্ডীদেবী আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন ;

রাজার সৈন্তগণ চণ্ডীর ভূতপ্রেতের হাতে  
চণ্ডীর কৃপা ।

মার খাটিয়া পলাইল ; রাজা সসৈন্তে পরাস্ত  
হইলেন । চণ্ডীর কৃপায় তিনি আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন ; পিতা  
পুত্রে মিলন হইল ; শ্রীমন্ত রাজকন্যা সূশীলার পাণিগ্রহণ করিলেন ।

গখন পিতা পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছুক, তখন  
সূশীলার বারমাস্তা ।

সূশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর  
থাকিতে প্রার্থনা করিল ; এই উপলক্ষে সিংহলের বার মাসের সুখ বর্ণিত  
হইয়াছে, রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে

---

\* তর্পণের অংশ ও এই অংশ হস্তলিখিত পুস্তকে ঠিক এই ভাবে নাই । বটতলার  
পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।



চেষ্ঠা করিতেছেন,—বৈশাখে—“চন্দ্রনাথ তৈল দিব হুণীতল বারি । সাঙলি গামছা দিব ভূষা কস্তুরি ॥” জৈষ্ঠে—“পুষ্পশয্যা করি দিব চাঁদোয়া টানায় । হান্ত পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়ে ॥ আষাঢ়ে—দেখহ ঘন নাচয়ে ময়ূর । নবজলধর দৃষ্টে ডাকয়ে দাছুর ॥ শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ । নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত ॥” শ্রাবণে—“বিদেশ তাজিয়া লোক আইসে নারী পাশে । কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পরশাসে ॥” ভাদ্রে—“মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি । চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ॥ মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস । গার না করিহ প্রভু উজানীর আশ ॥” ফাল্গুনে—“ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে । তখি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে ॥ সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত । আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত ॥” চৈত্রমাসে—“মালতী মন্দির চাঁপা বিছাইব খাটে । মধুপানে গোড়াইব সদা গীত নাটে ॥” কিন্তু এই সকল সুখের চিত্র মাতৃদর্শন-ব্যাকুল পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না । পিতা, পুত্র বাড়ী গেলেন, পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিম্বাগুলি চণ্ডীর কুপায় ফিরিয়া পাইলেন ; তিনি চণ্ডী পূজা করিতে সম্মত হইলেন ।

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি দেখাইয়া শ্রীমন্ত দেশীর রাজাকেও মুগ্ধ করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে  
শেষ ।  
বিবাহ করিলেন ।

যথাকালে শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন । পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল ।

চণ্ডীকাব্যের পূর্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে ; এই অংশ নানা কবি নুতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্ঠা  
কবির ভাবের প্রগাঢ়তা ।  
করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অল্পকরণটি তন্মধ্যে বিশেষ প্রাণসং-যোগ্য হইয়াছে ; কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় তৃপ্ত হয় ; শুধু শব্দের মাধুর্য্য যে সকল পাঠকের নিকট কাব্যের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড নহে, তাঁহাদের নিকট মুকুন্দরামের “কামভঙ্গ,” “শিববিবাহ”

প্রভৃতি অংশ গাঢ় রসের আঁকর বলিয়া বোধ হইবে ; তিনি ভারতচন্দ্রের—  
 পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে ।” প্রভৃতি  
 উচ্ছলিত কাম কলাপূর্ণ পদ বিচার্য ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের  
 বতির,—শোর পরমাঝু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে ।” প্রভৃতি  
 সরল উক্তির মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রত্ব বেশী অনুভব করিবেন ।  
 যাহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খেঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র  
 পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতা স্বাদ করিবাব অধিকার  
 তাঁহাদের নাই ।

### রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ।

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয় ; আমরা রতিদেব ও

রঘুরামবায়রূত “মৃগলঙ্কেব” কথা ইতিপূর্বে  
 শিবপ্রসঙ্গ ।

উল্লেখ করিয়াছি । কালে শিববিবাহাদি

ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের  
 অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল ; পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে “শিবের  
 বিবাহ,” “হরগৌরী-কোন্দল” প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা  
 যায় । এই শিবপ্রসঙ্গও কবিগণেব উপযুক্তপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে  
 বিকাশ পাইয়াছে । বৃদ্ধও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হনো জুড়িয়া দিলে  
 যে সব ছুগতি ঘটে, তাহা নির্মল হাস্তের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর  
 প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানি কৌতুককর চিত্র  
 অঙ্কন করিয়াছেন ।

রামেশ্বরভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত । ইঁহার প্রপিতামহের

নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন,  
 রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ।

পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী ।

বরদাপুরগণার অন্তর্গত বহুপুরগ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্বনিবাস  
 ছিল ; তিনি এই বহুপুরে বাস করার সময় “সত্যপীরের কথা” রচনা

করেন ; “পরে সতাপীর বন্দী কহে কবি রাম । সাকীন বরদাবাটী যত্নপুর গ্রাম ॥” শেষে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের সভাসদ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অবাধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন ; যশোমন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি “শিব-সংকীর্তন” কাব্য রচনা করেন ; গ্রন্থের অনেক স্থলেই যশোমন্তসিংহের ষণ্ঠ প্রচারিত হইয়াছে ; সেই সকল পদে জানা যায়, যশোমন্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ ; যশোমন্তসিংহ ১৮৩৪খৃঃ অব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, ইহার ২২ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮১২ খৃঃ অব্দে “শিব-সংকীর্তন” শেষ হয় । কবির দুই জ্ঞা ছিল, এক জনের নাম সুমিত্রা ও অপরের নাম পরমেশ্বরী ; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই ভ্রাতা শম্ভুরাম ও সনাতন,—পার্বতী, গৌরী ও সরস্বতী এই তিন ভগ্নী ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদের কাছে জানাইয়াছেন ।

অত্যাশ্রয় পৌরাণিক কাব্যের ত্রায় শিবসংকীর্তনেও দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণিত কাব্যবর্ণিত বিষয় । হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইহাতে রুক্মিণীব্রত, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে ; বাগ্দিদীপ্তিতে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ত্রায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন ; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী বিজয়শঙ্করের পদ্মা-পুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করিবার বিষয় পাঠ করিয়াছি । পূর্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন্ অংশগুলি কোন্ কবি দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খুঁজিতে যাওয়া এবং আঁধারে লোষ্ট্রনিষ্ক্ষেপ করা একইরূপ কাজ ।

রামেশ্বরের রচনা অতিরিক্ত অনুপ্রাস-দোষ-দুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে

শিষ্যানে হস্তরস ।

নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হস্তরসের খেলা দৃষ্ট হয় । রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্বেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজ্ঞ তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না । কিন্তু “শিব সংকীৰ্ত্তনের” আদ্যন্ত কবির মার্জিত মৃদুহাস্তের রশ্মিতে সুন্দর ।, কার্তিক, গণেশ লইয়া শিব আহ্বার করিতে বসিয়াছেন—এই উপলক্ষে কবি রহস্তের কুটিল আলোতে একটি অনূপূর্ণা গৃহিণীর সুন্দর মূর্তি দেখাইয়া লইয়াছেন—

“তিন ব্যক্তি ভোক্তা এক। অন্ন দেন সতী । দুটি হৃতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ তিন জনে একুনে বদন হ’ল বার । গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার ॥ তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে থায় । এই দিতে এই নাই ঠাড়ি পানে চায় ॥ শুভ্রা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে । অনূপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে ॥ গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা । হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে থা ॥ মূষিকী মায়ে বাকো মৌনী হয়ে রয় । শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখধরজ কয় ॥ রাক্ষস ওরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে । যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে ॥ হাসিয়া অভয়া অন্নবিতরণ করে । ঈষদুষ্ক সুপ দিল বেসারীর পরে ॥ লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের বী । সুপ হল সাক্ষ আন আর আছে কি ? দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজাদশ ॥ খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর, গান যশ ॥ সিদ্ধিকল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা । মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ \* \* \* \* দিতে নিতে গতায়তে নাই অবসর । প্রমে হলো সজল কোমল কলেবর ॥ ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ষবিন্দু সাজে । মোক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্রাতের মাঝে ॥ অন্নদানে গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শিল্প শিক্ষা এবং উন্নত সাহিত্যিকরসপিপাসু রমণীবর্গের নিকট ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না । বুদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা শাখা পরার প্রসঙ্গে বেশ সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী দুগাছি শাখা চাহিয়াছিলেন; শিব তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু শ্লেষ সহকারে বলিলেন—“বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে । জঙ্গল ঘুচুক যাও জন-কের ঘরে ॥” এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন,

কিস্ত দেবী তাহার শোধ তুলিলেন,—“দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দ্বীট পায় । কান্তসনে  
ক্রোধ করি কাত্যায়িনী যায় ॥ কোলে করি কার্তিকেয়ে, হস্তে গজানন । চঞ্চল চরণে  
হৈল চণ্ডীর চলন ॥ গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু । শিব ডাকে শশিমুখী স্তনে  
নাই কিছু ॥ নিদান দাক্ষণ দিয়া দিলা দেবরায় । আর গেলে অধিকা আমার মাথা খাও ॥  
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী । ভাষিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি ॥ ধাইয়া  
ধুর্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে । আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ “বাও যাও বঁত ভাব  
জানা গেল” বলি । ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি ॥ চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে  
যায় । নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায় ॥ রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখে বসে কি ।  
পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্বতের ঝি ॥” এই “পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্বতের ঝি”  
ছত্রে তকণী ভাষ্যার শ্রীপাদ-পদে বিক্রান্ত বৃদ্ধ গৃহস্থের মশা বিপদ হৃদয়ঙ্গম  
করিয়া আমরা একটু কোঁতুক ও হাস্য উপভোগ করিয়া লইয়াছি, ইহা  
উচিত না হইলেও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কি না ?

বহুদিন একত্রবাস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম  
সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়া-  
রামেশ্বরের সত্যপীর ।  
ছিলেন । সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার  
পূজা সেই উদারতার ফল । হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আল-  
খান্না গায় পরিয়াছেন ও উর্দু, জবানে বক্তৃতা দিতেছেন ;—  
“বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায়ে বলে বাছা । দুনিয়ামে এসাতি আদমি রহে সাঁচা ॥ ভালা  
বাওয়া কাহে তেরা মুতাকাল কাহে । রাত দিন বৈসা তৈসা স্থখ দুঃখ হোয়ে ॥ জানা  
গেও বাত বাওয়া জানা গেও বাত । কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ ॥ জগত সত্যপীর  
মেরা জগত সত্যপীর । তেরা দুঃখ দূর করতও হাম ফকীর ॥”

### কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ।

মনসার গল্পেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ; বিজয়গুপ্ত এবং  
নারায়ণদেব প্রভৃতি আদিলেখকগণের দলে  
মনসার ভাসান লেখকবর্গ ।  
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ ।  
একদল নূতন কবি ভর্তি হইলেন ।\* এপর্য্যন্ত  
আমরা মনসার ভাসানরচক ৩২ জন কবির  
নাম জানিয়াছি, তাহা নিয়ে প্রদান করিতেছি ;—

১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণদেব, ৪। বিজয়গুপ্ত, ৫। রঘুনাথ, ৬। যত্ননাথ, ৭। বলরামদাস, ৮। বৈদ্য জগন্নাথ, ৯। বংশীধন, ১০। বংশীদাস, ১১। বল্লভঘোষ, ১২। হৃদয়, ১৩। গোবিন্দদাস, ১৪। গোপী-চন্দ্র, ১৫। জ্ঞানকীনাথ, ১৬। দ্বিজবলরাম, ১৭। কেতকাদাস, ১৮। ক্ষেমানন্দ, ১৯। অনুপচন্দ্র, ২০। রাধাকৃষ্ণ, ২১। হরিদাস, ২২। কমলনয়ন, ২৩। সীতাপতি, ২৪। রামনিধি, ২৫। কবিচন্দ্রপতি, ২৬। গোলোকচন্দ্র, ২৭। কবিকর্ণপুর, ২৮। জ্ঞানকীনাথ, ২৯। বর্দ্ধমানদাস, ৩০। ষষ্ঠীবর, ৩১। গঙ্গাদাস, ৩২। রামবিনোদ।

এই মনসার ভাসানরচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা বোমেণ্ট এবং ক্ষেচারের ছায় ছুঁইজনে একত্র হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন; পুস্তকখানি ২৬০০ শ্লোকে পূর্ণ, ও ইঁহার পদসংখ্যা ৬৬; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতায়ুক্ত, অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দদাসের রচিত। যদিও পুস্তকের সর্বত্রই ছই কবির ভণিতায়ুক্ত পদ পাওয়া যায়, তথাপি মোটের উপর বলা বাইতে পারে যে পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের অর্থাৎ লখন্দরের বিবাহপালা পর্যন্ত অধিকাংশস্থল কেতকাদাসের রচনা ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশস্থল ক্ষেমানন্দ-বিরচিত। ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাস হাস্যরসে পটু। এই ছই কবির রচনার কতকাংশ ১৬০-১৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগা গোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে, এবং বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্র মুগ্ধ হইয়া বাইতে পারে। আমরা যখন এই পুঁথি প্রথম পড়িয়া-ছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার পাতিব্রতের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়া-ছিলাম—বাঁধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দশীর চাঁদ

বেহুলা-চরিত্র।

দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলায় বান্দী হইবার যোগ্য নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া ক্রীড়া হইত ; সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলা ;—সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে উজ্জল হইয়া পল্লী-বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত ; আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের খাঁটি সোণার মূর্ত্তিকে পূজা করিতে ভুলিয়াছি ।

পূর্ববর্ত্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদ-কবিদ্বয়ের পরিচয় ।  
সদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা থর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে ।

কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন, একস্থলে কেতকাদাসের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থকুলের প্রতি আশীর্বাদসূচক—“কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে ।” পাওয়া গিয়াছে, অপর এক স্থলে “ব্রাহ্মণ-চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে, দেবী যারে কৃপা কৈল ।”—দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা তাঁহা-দিগকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা যায় । অত্র দুইটি পদ দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেমানন্দদাসের রাজীব ও অভিরাম নামক দুই পুত্র ছিল—“ক্ষেমানন্দ কহে কবি । রাজীব রাখিবে দেবী ॥” বেহুলার জলপথে ভ্রমণ উপলক্ষে বর্দ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দেশ যথাযথ হইয়াছে, অত্র দেশের তরুণ হয় নাই, সুতরাং কবিদ্বয়কে বর্দ্ধমানবাসী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । এক স্থলে “ক্ষেমানন্দ বিরচিল সেবিয়া ব্রাহ্মণী” পদে তিনি কোন ব্রাহ্মণীর শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমিত হয় ।

অপরূপ মনসার ভাসান-রচকদিগের রচনাও অনেকস্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে ; সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেথাইবার স্থানাভাব । মনসা গোয়ালিনী-

বেশে ধ্বস্তরির নিকট, বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন ; তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিনী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্দ্ধমান-দাস কবির হস্তে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

“কেমনে তোমার স্বামী, পাঠায় তোমায় একাকিনী, গোয়ালী রহিল তোমার ঘরে ।  
 দরিদ্রের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কারে ॥ এত ধন যার আছে,  
 সে কেন বা দবিবেচে, হাটে ঘাটে মাথায় পসার । দুষ্ট জনে লাগ পায়, দবি ষোল করে  
 দেয়, কথা কহিত মুখে মারে । তোমার নাহিক ভয়, দুষ্ট জন যদি হয়, কাড়ি লয় লও  
 ভণ্ড করে ॥ \* \* \* বলিয়া এসব বোল, মূল্য করে দবি ষোল, শিষ্য সব বড়ই  
 চতুর । বর্দ্ধমানদাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দবি মোর টক না মধুর ॥ শিষ্যের  
 বচন শুনি বলে গোয়ালিনী । এদেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি ॥ রাজা চল্লহর  
 হয় দেশে অধিকার । এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার । ভিন্ন দেশী আসিয়াছি দধি  
 বেচিবার । পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কব ॥ আমার জাতির ধর্ম্ম মাথার পসার ।  
 যাহার প্রসাদে মোর ভুঞ্জে পরিবার ॥ বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি । আমার  
 সকল এই ঘরের সম্পত্তি ॥ খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক । পরেরে বলিতে  
 কি পরের লাগে দুঃখ । \* \* \* বর্দ্ধমানদাস কহে কীর্ত্তি মনসার । হাস্ত করে শিষ্যগণ  
 বলে আর বার ॥ তোমার জাতির বুদ্ধি পুরাতন কড়ি । দুনা কড়ি লাগে দিব বেচ  
 দবি হাঁড়ি ॥ যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব । আগে দবি খেয়ে দেখি পাছে  
 কড়ি দিব ॥ \* \* \* পসার ভাজিয়া তোমার হাঁড়ি করি চুর । মোর হাঁই দেখাও  
 তোমার হার কেউর ॥ বর্দ্ধমানদাসে কয় কীর্ত্তি মনসার । ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে  
 আরবার ॥ \* \* \* যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে । বিকাউক মোর হাঁই  
 কিনিব তাহারে ॥ শিষ্যগণ বলে মোর। যেই ধন চাই । সেই ধন পাই যদি তোমাতে  
 বিকাই” বর্দ্ধমানদাস কয় কীর্ত্তি মনসার । ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার ॥”

গোপবন্ধুর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণের দানলীলার পদ মনে হয়, বস্তুতঃ

কবিগণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই  
 বৈষ্ণব কবির প্রভাব ।

ভাবে বৈষ্ণব প্রসঙ্গের মাদকতা সৃষ্টি করিয়া  
 গিয়াছেন । হস্তলিখিত পুঁথিগুলিও রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদাস ও



ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসার ভাসান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পূর্বে এই উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন ।

### ধর্মমঙ্গল ।

পূর্ববর্তী কবিগণ, সীতারাম দাস, রামদাস কৈবর্ত, ঘনরাম চক্রবর্তী, সহদেব চক্রবর্তী ।

বৌদ্ধধর্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাহার হিন্দু সংস্করণ, ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধভাব । রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্তী ধর্মকাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বীকার্য যে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল । ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণহন্তে এমণগণ হৃতসর্বস্ব ও পরাভূত হইলেন ; ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলি ও আয়ত্ত করিয়া ভারতবিজয়ী যে বিরাট পূজার আয়োজন করিলেন, তাহাতে বাইতি, হাড়ি প্রভৃতি জাতির ধর্মশঙ্কর দগ্ধিত হইল না, ধর্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অমুমুখিৎসু পাঠক ইহার গোড়ায় ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্মের লুক্কায়িত ছায়া আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই ।

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুবাণ, ময়ূবতট, রামচন্দ্র, মার্গিক গাঙ্গুলী, ও খেলারামের এতৎসংক্রান্ত রচনার ঘনরামের পূর্ববর্তী কবিগণ । কথা ২১১-২১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি । ১৫২৭

খঃ অর্থে খেলারাম স্বীয় ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ; ১৬০৩ খঃ অর্থে সীতারামদাস নামক আর একজন কবি একখানি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন, ইনিও এক দেবীর স্থপাদেশে গীত রচনায় প্রবৃত্ত

হন, সেই দেবী কে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না, পাঠক যদি কিছু বুঝিতে পারেন, তজ্জন্ত ছত্র দুটি উদ্ধৃত করিলাম—“শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা । উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা ।” পাড়াগোঁয়ে অনেক দেবদেবী এখন আর আমাদের নিকট নামেও পরিচিত নহেন । সীতারামদাস ধর্মকাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ‘খণ্ডঘোষ’ নিবাসী অঘোষ্যারাম চক্রবর্তী এবং নারায়ণ পণ্ডিত নামক অপর একজন । শেষোক্ত ব্যক্তির আগ্রহ সমধিক দেখা যায়, তিনি আমাদের কবির স্বপ্নাদেশ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া “দুয়টি কলম মোরে দিল বানাইয়া” এবং এহেন কবির যদি পরিত্যাগ করিয়া যান সেই ভয়ে “অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া ।” কেবল “গজলক্ষ্মী মা”ই কবির শিওরে উপস্থিত হন নাই, উত্তেজিত কল্পনায় তিনি আরও বিবিধ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন, “ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে ।” এই সকল প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কবি অনায়াসে উদরান লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর কর্তৃক প্রস্তুত লেখনী মস্তাধার প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপকরণ রাশি পাইয়া সচ্ছন্দ মনে “আনন্ডিত পুঁথি সবলিখি বসিয়া ।” ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়াছেন । নিজ পূর্বপুরুষের পরিচয় দিতে কবি ভুলেন নাই । “ইন্দ্রসার অঘগোষ্ঠী স্থানে সর্বলোকে ।” আমরা কিন্তু কিছুই জানি না । আদিপুরুষ গোপীনাথ দে, তাহার ৪ পুত্র । মথুরাদাস ও মদনদাস । ধর্মদাসের ৪ পুত্র, শ্রীহরিদাস, রাজীবলোচনদাস, ছর্যোদনদাস ও কুশলরাম দাস । মদনের পুত্র দেবীদাস ও দেবীদাসের পুত্র আমাদের কবি সীতারাম দাস,—সীতারামের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সভারাম রায় । কবির মাতামহের নাম শ্রামদাস । ১০০৪ সালে এই পুঁথি সমাপ্ত হয় । এই সমস্ত বিবরণ দ্বারা কবি স্বীয় বংশের একটি নামমাত্র তালিকা রক্ষা করিয়াছেন,—সীতারামদাসের পুস্তকের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না ।

সীতারামের পরে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কৈবর্ত বংশোদ্ভব রামদাস আদক নামক জনৈক কবি “অনাদিমঙ্গল” নামক একখানি ধর্মকাব্য প্রণয়ন করেন। রামদাসের পিতার নাম রঘুনন্দন আদক, তাহার

পূর্ব নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অবীন হায়ংপুর গ্রামে, পরে সেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কবি নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,—ভূরস্টে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ। দানদাতা কল্লতক কর্ণের সমান ॥ তাঁহার রাজস্ব বাস বহুদিন হোতে। পূববে পূববে চাষ চষি বিধিমতে ॥”

কবির ধর্মমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করিবাব বৃত্তান্তটি বড় কৌতুকাবহ—হায়ংপুরে চৈতন্তসামন্ত নামক একজন হৃদ্যন্ত তসীলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন,—খাজনাব টাকা শোধ না কবিত্তে পারায় তাহার পিতা ঋণ গ্রহণেব চেষ্টায় গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। স্মরণ্য রামদাস উপায়ন্তর না দেখিয়া দাবওয়ানের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অতি গোপনে অববাহতি লাভ ঘটে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর কবি মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পাড়াবাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, সেকালে সৈনিকপুরুষগণ বলপূর্বক বেগার ধরিয়া লইয়া যাইত। কবি কাতবচিত্তে লিখিয়াছেন,—“ক্ষুধা তৃষ্ণা হায় কেটে যায় বুক। ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই স্তব ॥ সম্মুখে শিপাই শোভে শমন সমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তে যায় প্রাণ ॥” তৃতীয় ছত্রের “শোভে” শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে,—যখন সিপাহী কবিকে তর্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—“মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া। এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া। গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল। এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কঘল। ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি। বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি ॥ \* \* \* আমার সম্মুখে যদি ঘেল এই স্রুট। দিখও করিব তোরে যারি এক

গোট।” তখন ভীত কবির চক্ষে সিপাহী সাহেবের শ্রীমূর্তি অবশ্যই “শোভা” পায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সিপাহীর কথা শুনিয়া ত্রাসে “মুদি গেল জাঁখি। কেথায় শিপাই ঘোড়া আর নাহি দেখি।” সেদিনকার সমস্ত বৃত্তান্তই বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল; তৎপর কবির ভয়ানক জ্বর বোধ হইল,— শুষ্ককণ্ঠ রামদাস সম্মুখস্থ “কাণাদীঘির” জল খাইতে ছুটিলেন, দীঘির দক্ষিণদিকে বাতান্দোলিত অমল ধবল জলের উপর সুন্দর পদ্মকুসুম ধীরে ধীরে ছলিতেছিল, কবি সাগ্রহে জলে নামিতে জল শুষ্ক হইয়া গেল,— রামদাস পদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশা-গ্রস্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গ গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া কবির সন্নিহিত হইয়া বলিলেন—“সুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্রেশ পাও তুমি। তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি। এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল। আজি হোতে হোল তব জনম সফল। জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। ধর্মের সঙ্গীত গাও গুনি কিছু আমি।” রামদাস বলিলেন—“পাঠ পড়ি নাই প্রভু চকল হইয়া। গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া। খেলা ছলে পূজি ধর্ম কর্ম জ্ঞানহীন। জানি না ধর্মের গীত তাঁয় অর্কচাঁন।” কিন্তু দিব্য পুরুষ নাছাড়বান্দা—“আজি হৈতে রামদাস কবির তুমি। জাউগ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি। আসরে জুড়িব গীত আমার স্মরণে। সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে। স্ফুল্ল বন্ধন গীত স্তম্ভাষা সবার। শ্রীধর্ম মাহাত্ম্য মর্ত্যে হইবে প্রচার।” হায়ংপুৰ গ্রামে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদি-মঙ্গলের ভাষা সরস ও সহজ,—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নাই।

রামদাসের পরে রূপরামের শ্রীধর্মমঙ্গল প্রচারিত হয়—এই সকল কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩ খৃঃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার শ্রীধর্মমঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম ময়ূরভট্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—“ময়ূরভট্ট বলিবে সংগীতের আদ্যকবি।”

\* এই পুস্তকখানি বর্তমান রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

(শ্রীধর্মমঙ্গল ১ম সর্গ) । রূপরাম ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন, তাঁহার কাব্য বড় বড় শব্দ পূর্ণ ও রচনা জটিল, কথিত আছে ঘনরাম উহা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—“শব্দ শুনে শুদ্ধ হবে গান শুনে কি ?” রূপরামের খণ্ডিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি ।

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণাস্তর্গত কৃষ্ণপুর-গ্রাম ; তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, ঘনরামের জীবনী ।

পিতামহের নাম ধনঞ্জয়,—ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত ; গৌরীকান্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম সীতা দেবী ; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহর কোকুসাবীর রাজকুলোদ্ভূত ছিলেন । ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন ; তৎকৃত শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার যেকপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয় । ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ প্রিয় ছিলেন ; তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্তী তাঁহাকে বর্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্র-চর্চার স্থান—রামপুরের টোলে পাঠাইয়া দেন ; তথাকার হিতকর সংসর্গে কবির কলহ-প্রবৃত্তির অনেকটা দমন হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া যায় । শৈশবেই কবিতাদেবীর রূপাকটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল ; শুক তাঁহার ভাবী যশঃ অঙ্গীকার কবিয়া তৎকণবয়সেই তাঁহাকে “কবিরত্ন” উপাধি প্রদান করেন ।

কৃষ্ণপুরাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম শ্রীধর্ম-মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—“অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্তী,—কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান । চিস্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, বিজয়নরায় রঙ্গান ।” শ্রীধর্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম-রচিত সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার ৪ পুত্র—রামপ্রিয়, রমেগোপাল, রামগোবিন্দ ও রাম-

কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে ; কয়েক বৎসর হইল, কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একমাত্র পুত্র বর্তমান আছেন ।

ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট শ্লোক-সংখ্যা

৯১৪৭ । ১ম সর্গ স্থাপনপালা, শ্লোকসংখ্যা ২৬৭ ;

তাঁহার কৃত ধর্মমঙ্গলের  
সমালোচনা ।

২য় সর্গ ঢেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক ; ৩য় সর্গ রঞ্জাবতীর  
বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক ; ৪র্থ সর্গ, হরিশ্চন্দ্র পালা,

২৬০ শ্লোক ; ৫ম সর্গ শালভরা পালা, ২৯৭ শ্লোক ; ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের জয়পালা, ৩১৫ শ্লোক ; ৭ম সর্গ আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক ; ৮ম সর্গ ফলকনির্মাণপালা, ৩১৭ শ্লোক ; ৯ম সর্গ, গৌড় যাত্রার পালা, ৪০৭ শ্লোক ; ১০ম কামদল বধ, ৩৫০ শ্লোক ; ১১শ সর্গ, জানাতি পালা ৩২৭ শ্লোক ; ১২শ সর্গ গোলাহাটপালা, ৪৯৪ শ্লোক ; ১৩শ সর্গ হস্তিবধপালা, ৫১৮ শ্লোক ; ১৪শ সর্গ কাঁদুরযাত্রা পালা, ৩৫৯ শ্লোক ; ১৫শ সর্গ, কামরূপ বৃদ্ধপালা ৪১৪ শ্লোক ; ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৩০৭ শ্লোক ; ১৭শ সর্গ, কানড়ার বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক ; ১৮শ সর্গ, মায়ামুণ্ড পালা ৫৬৫ শ্লোক ; ১৯শ সর্গ ইচ্ছাইবধ পালা, ৫৩৫ শ্লোক ; ২০শ সর্গ, বাদল পালা, ২৮১ শ্লোক ; ২১শ (সর্গ) পশ্চিম উদয় আরম্ভ, ১৭৬ শ্লোক, ২২শ সর্গ জাগরণ পালা, ১০৩১ শ্লোক ; ২৩শ সর্গ পশ্চিম উদয়, ৩৩০ শ্লোক ; ২৫শ সর্গ স্বর্গারোহণ পালা, ৩২৪ শ্লোক ।

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে । ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ব কীৰ্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে ; লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জয়ী ; ব্যাঘ্র, হস্তী ও ক্ষিপ্ত অশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন—তাঁহার বাহুবল হামিত ; স্বীয় মাতুল মহামদের ছরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, তিনি দেবানুগৃহীত ; অজ্ঞেয় ইচ্ছাইঘোষকে জয় করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ নাই ; স্বীয় অঙ্গগুলির এক একটা ছেদ করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তিনি কঠোর তপস্বী ; এতদ্ব্যতীত মৃত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান করিয়াছেন, নানা অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে

বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই ; বিচ্ছিন্ন উপকরণরাশি পড়িয়া আছে,—যে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় । লাউসেনের বিপদের সময় হনুমান আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন ; চণ্ডী আসিয়া তাঁহার শরীরের মণক তাড়াইতেছেন, স্ততরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শাস্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই, এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না । পাঠক এই কাব্যের আদ্যস্ত যুগ্মের ঘোরে অর্দ্ধ নিম্নীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোন স্থলে তাঁহার চক্ষু-কোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভব নাই । বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টুব-টাব শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ু বেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহুত জাগিয়া উঠে ; ঘনরামের শ্রীধন্য-মঙ্গলের একঘেঁয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির টুবটাব শব্দের ত্রায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে । উহা পড়িতে একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে দূর দূরান্তরের কি কথা স্মৃতিপথে উদয় হয় এবং যুগ্মঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসে । মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামাবাদ্য এই নিত্রাপ্রবণতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায় ; নিম্নে বীররসের একটু নমুনা দিতেছি—“মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী । সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ, ছবলে করে হানাহানি ॥ রসিগাঁ রণজয়ী, ছন্দুভি বাজাই, ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা । রাজপুত মজবুত, বৈছন্ন যমমুত, সমযুথ যুদ্ধে খানসামা ॥ দাদালিয়া দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিমে দানদক্ষে । ধর ধর বলি ঘন, খাইল দাসগণ, ধমকে ধরাধর কম্পে ॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে একাকার ধুম ।

নিশাহারা দিবসে, হত কত হতাশে, গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম । ঝাকতা ঝাঁকে ঝাঁকে, ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে, লাখে লাখে বরিবে তীর । সামালিয়া হানিতে, গজবাজী সহিতে, সমরে শিফারের শির । করিয়া তর্জীন, ঘোরতর গর্জন, দুর্জুন দানাগণ দর্পে । সমরে সেনাগণ, সংহারে বৈছন, ক্ষুধিত সর্পে ॥”—১৭শ সর্গ । বীরের পর বোভৎস রস—  
 “পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী । নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি ॥ কড়া কড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী । কেহ কাটে কেহ বুটে বাঁটে খানি খানি ॥ কেহ কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল । কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল ॥ রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা । বয়ে লয়ে কেহ করে যোগাইছে ডালা ॥ মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি । বাচিয়া যোগায় বত যোগিনীর ঝি ॥ ধর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা । চুম্বে রুধির পিয়ে সম তার সুধা ॥ কাঁচা মাংস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে । মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে ॥ দশনে চিবায়ে কেহ কুঞ্জরের শুঁড় । মুখা বলে মুখে ভরে মানুষের মূড় ॥ হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে । লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাসে ॥ পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট । মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট ॥ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা । হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা ॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী । করপুটে সম্মুখে ধুসলী করে স্ততি ॥”—১৭শ সর্গ ।

করুণরসের বড় অভাব, তবে মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রুপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পাড়িতে পারে, বথা—“শিক্ষাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে । নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বজ্রগণে, দেখিতে না পেহু শেষকালে ॥ গলার কবচ মোর, শিক্ষাদার ধর ধর, দিহ মোর যেখানে জননী । নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাধিনী ॥ তামে মোর মায়ের হাতে হাতে । স'পে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রাখে সাথে সাথে ॥ শুকায় স্ববর্ণ ছড়া, বাপের ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো । রণে অকাতর হয়ে, শত্রুশির সংহারিয়ে, সম্মুখ সংগ্রামে শাকা মলো ॥ কাপের কুণ্ডল ধর, শিক্ষাদার তুমি পর, ছুরী তীরে তুষ বীরগণে । শুনি শোকে শিক্ষাদার, চক্ষে বহে জলধার, বহে লোহ শাকার নয়নে ॥ কেঁদে কহে পুনর্বার, অপরাধ অভাগার, খণ্ডাইতে মা বাপের পায় । প্রণতি অসংখ্যার, দেখা নাহি হলো আর, অল্পকালে অভাগা বিদায় ॥ মরমে রহিল শেল, হেন জয় বৃথা গেল, মুখে না বলিহু রামনাম । ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠ দেবা, জননী জনক সেবা, না করিহু বিধি হৈল বাস ॥”—২২শ অধ্যায় ॥\*

\* শিক্ষাদার ও শাকা দুই ভাই, ময়ূর শাকার স্ত্রী ।



এই পুস্তকের সর্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ । বৌদ্ধভাব, শাস্ত্রোক্ত দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একবারে উন্মূলিত হইয়াছে, আর তাহার পরিচয় পাওয়ার সুবিধা নাই । শাস্ত্রজ্ঞানের পুঞ্জীকৃত ধূম্র-পটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে স্বামুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটিও বলিবার অবকাশ পান নাই । ঐকমাত্র

কপূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নক্সা বলিয়া  
কপূর ।

বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে । কপূর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে ; বাব্র, কুন্তীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভালবাসে, নিঃসন্দেহ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভালবাসে ; “আত্মার্থং পৃথিবীং ত্যজ্যেৎ” চাণক্যের এই সুবর্ণ-নীতি সে সর্বত্র অনুষ্ঠান করিতে ক্রটি করে নাই । বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, এবং যখন উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে অগ্নির ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে ; লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কপূর অভ্যস্ত ভাবে পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কপূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল—“কাদিয়া কপূর সেনে করেন জিহ্বাসা । কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা ॥ কপূর বলেন যবে বন্দী হ’লে ভাই । রাতারাতি গোড় ছিন্ ধাওয়া ধাই ॥ রাজার আদ্যশ করি জামতি লুটিতে । লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচবিতে । পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই । লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ॥”

উপসংহারে বক্তব্য, ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত এক-ধেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধৈর্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে ।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের পর সহদেব চক্রবর্তী নামক জনৈক কবি

সহদেবচক্রবর্তী।

তৎসংক্রান্ত আর এক খানি কাব্য রচনা করেন; সহদেবচক্রবর্তী হুগলী জেলার বালিগড় পরগণাধীন রাধানগরগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; বাং ১১৪১ ( ১৭৪০ খৃঃ ) সালের ৪ঠা চৈত্র, কবি কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ধর্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত প্রাচীনবঙ্গীয় কবিগণের চিরাভ্যন্ত ঘটনা, লেখনীর কণ্ঠ্যন সমর্থনের এক অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্মৃতরাং সহদেব কবি যখন “দয়া কৈলে কালু রায় স্বপনে শিখালে যারে গীত” বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন, তখন আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত হই নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সহদেবচক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্ত্র। নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ-উপাখ্যানগুলি একবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হর-পার্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে কালুপা, নুপু বৌদ্ধ-তত্ত্বের আভাষ।

হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুবাসী রামাইপাণ্ডিতের কথা, জাজপুবাসী ব্রাহ্মণগণের ‘ধর্মদ্বৈষ’ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচিত হইবে। এই পুস্তকে রামাইপাণ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে,—“এ তিন ভবনমাথে, ত্রীধর্মের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর ভরা।” ধর্ম-সেবক ডোম জাতির নির্ধাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

যাহা হউক কবি এই “ধর্মদেবের” প্রচার উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবীগণের বিবিধ কীর্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মসজিদ রচিত হইতে দেখিয়াছি,—এখন হিন্দুমন্দিরের উপকরণ অমুসন্ধানকালে বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া কেন আশ্চর্য্যাবিত হইব? এমন কি জগন্নাথবিগ্রহের বৌদ্ধউপাদান এখন এক

প্রকার সর্ববাদিসম্মত হইয়াছে, অথচ তিনি হিন্দুর পূজ্য থাকিবেন, শ্রীধর্মমঙ্গলকাব্য মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দুপুরোহিতগণের কক্ষতল হইতে এই পুঁথি স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যক নাই, তবে প্রত্নতত্ত্ব-বিৎগণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব জগতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন ।

সহদেবচক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল স্থানবিশেষে কবিস্বময়;—গ্রাম্য ভাষা

কোন কোন স্থানে মর্ম্ম স্পর্শ করিবার  
সহদেবের কবিত্ব ।

উপযোগিনী হইয়াছে, নিম্নে একটি ভক্তি-সূচক  
পদ উদ্ধৃত হইল :—

“শরণ লইনু, জগৎজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর । ভব জলধিতে অশুকুল হৈতে, কে  
আর আছে মোর ॥ দুঃখকষ্ট শিশু দোষ করে, রোষ না করয়ে মায় । যদি বা ক্রটি  
পড়িয়া কালিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায় ॥ হরিহর ব্রজা, যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব  
আমি । বিপদ সাগরে, তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর ভূমি ॥”

কদলীপাটনের ক্ষুরন্তর্যোবনা সুন্দরীগণ যখন এক সঙ্গে বিলোল-  
কটাক্ষ সন্ধান করিয়া নানাবিধ কামকলাপূর্ণ ভঙ্গিতে মীননাথসাধুর  
সন্মাসভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাব প্রবোধ বাক্য-  
গুলিতে প্রকৃত যোগজীবনের নিবৃত্তিসূচক শাস্তি প্রকটিত হইয়াছিল,  
সেই অংশটি একটি শাস্ত মলয়-লহরীর মত সাংসারিক লোকের ইন্দ্রিয়-  
মথিত চিত্তের উপর বহিয়া যাইবার কথা ; কিন্তু মীননাথ সুন্দরীগণের  
নিষ্কিণ্ড জালে মীনের ত্রায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন । তিনি যোগভগ্ন,  
ইন্দ্রিয়বিমুঢ় এবং পরিশেষে ইতরযোনি প্রাপ্ত হইলেন । এই অবস্থায়  
তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া  
কয়েকটি প্রহেলিকার মত কবিতায় তাঁহার চৈতন্ত সঞ্চার করিলেন ;  
সেই প্রহেলিকার ভাষা গ্রাম্য, কথা অসংলগ্ন, কিন্তু উহা আমাদের নিকট  
বড় মধুর বোধ হইয়াছে,—গ্রাম্যকুষকের ভাষা অথচ তাহার উন্নত নীতি  
প্রকৃত সাধুসুখনিঃসৃত উপদেশামৃতের ত্রায় উপাদেয় । এখনও গ্রামদেশে

এইরূপ দুই একটা সাধু পাওয়া যায়, তাহারা উচ্চশিক্ষার অভিমান মনে বহন করিয়া গৌরব করে না, কিন্তু পর্যাণ্ডরূপে অভ্যস্ত, বহুদর্শিতা ইহাতে চরিত উচ্চনীতিদ্বারা তাহাদের জীবন পরিশোভিত। সেই উপদেশ-লোভে দলে দলে লোক সাধুকে ঘেরিয়া বসিয়া পূজার তায় সম্মান প্রদর্শন করে—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দৃশ্যে “গুঁজাখোরের প্রতাপ্তি” এবং “অজ্ঞলোকের বিশ্বাস” ভাবিয়া স্থায়ী অন্তঃসারশূন্য অভিমানাশ্রয়ে প্রীত থাকেন। গোরক্ষনাথ-কথিত সেই প্রহেলিকাটি আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম;—ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটু বিদ্বেষের বাঁজ আছে;—কিন্তু তজ্জন্ত আমাদের কবি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাধু কবিরই অধিক পরিমাণে দায়ী। প্রহেলিকাটিতে অসম্ভব সম্ভব হওয়ায় বিষয় ও কতকগুলি অম্পষ্ট উদ্বোধনাত্মক বাক্য আছে, সেগুলি প্রাদেশিক শব্দবাহুল্যে কঠিন হইয়াছে, তথাপি বেশ মিষ্ট ও নৈতিক ওজস্বিতাপূর্ণ।

“গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাস্তা পায়।

পুতকীর দ্রুৎ, সিন্ধু উথলিল, পর্বত ভাসিয়া যায়।

গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে।

গুরু কাঠ ছিল, পল্লব মঞ্জরিল

পাষণ বিধিল ঘুণে।

হের দেখ বাঘিনী আইসে।

নেতের আঁচলে, চন্দ্রমণ্ডিত করিয়া।

ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

শিল নোড়াতে কোন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে।

চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে।

এ বড় বচন অদ্ভুত।

আকাট বাঝিয়া প্রসব হইল

ছেলে চায় পায়রার দুধ।

অনেক বতনে নোকা বাঁধিলু,

কাঁকড়া ধরিল কাঁচি।

মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল,  
 ক্ষুদ্র পিঙ্গলিকার হাসি ॥  
 আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ গুড়িল,  
 মাঝে বায় উড়িল ধূলা ।  
 সরিষা ভিজাইতে, জলবিন্দু নাই  
 তুবিল দেউল চূড়া ॥  
 বাঘে বলদে, হাল জুড়িলু,  
 মর্কট হৈল কুবাণ ।  
 জলের কুস্তীর, হুড়া ঝাড়ি গেল,  
 শ্বষিকে বুনিল ধান ॥  
 তালের গাছে শেলের পোনা,  
 সয়তান ধরিল। খায় ।  
 সাগর মাঝে, কই মৎস্ত মুড়লি,  
 পঙ্কু পলই লয়া। ধায় ॥  
 মধ্যসমুদ্রে, ছয়াড়ি পাতিলু,  
 সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক ।  
 মহিষ গণ্ডার ডড়ায়ে মৈল  
 হরিণী পলায় লাগে লাথ ॥  
 তৈল থাকিতে, নীপ নিবাইলু  
 আঁধার হইল পুরী ।  
 সহদেব গায়, ভাবি কালুরায়  
 শরীরবর্ণন চাতুরী ॥”

### অনুবাদ-শাখা ।

ক । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি ।

খ । রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপ্রভৃতি ।

ষোড়শশতাব্দী অনুবাদেব যুগ । কবিকঙ্কণের পর বঙ্গীয় কবি-

বান্ধালা কাব্যে সংস্কৃত  
প্রভাব ।

প্রতিভা যেন শতাব্দীকাল নিদ্রিত হইয়া  
পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কৃতের অতুল ঐশ্বর্য্য  
বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদঘাটিত হইল,  
তাঁহারা যে সুধাময় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সাহিত্য-বিপিন প্রতিধ্বনিত  
করিতেছিলেন,—তাহা যেন কতকদিনের জন্য ক্ষান্ত হইয়া পড়িল। প্রায়  
এক শতাব্দীর জন্ত গীতিকবিতার উপর পটক্ষেপ হইল,—সংস্কৃত শাস্ত্র  
অনুদিত করিয়া ভাষা সংস্কার করা লেখকবর্গের লক্ষ্য হইল। খনার  
বচনে, গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদের গানে আমরা সংস্কৃতের কোন চিহ্ন  
পাই নাই ; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান  
নিজের ভাষায় গাহিয়াছেন ; চণ্ডীদাস পক্ববিশ্ব ও ক্ষুরিত কদম্বের বড়  
ধার ধারেন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের  
প্রভা পতিত হইয়াছে, দুইএক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের ঋণ  
সোণার হারের আয় শোভা পাইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা  
কবিতার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে। কবিকঙ্কণ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি  
রাখিয়া দুইএক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রত্ন আনিয়া নিজের  
কবিতায় যোজনা করিয়াছেন, যথা—“অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দেহ  
যেন দংশে ভুজঙ্গ।” ইহা জয়দেবের—“সরসমসৃগমপি মলয়জপঙ্ক। পশুতি বিবমিব  
বপুশি শশঙ্ক ॥” পদের অনুবাদ ; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের দুই একটি  
ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত ভ্রাত্যের  
আয়ই চলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল ;

ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য  
বান্ধালা কবিতায় সংস্কৃত  
উপমা।

স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ  
না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া  
পাগল হইলেন। সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনী-

গুলি ভূতাপ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কালযুগের মানুষ-গুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এখন এদেশে ‘আজ্ঞানুসন্ধিত-বাহু’ অদৃশ্য ;—নগ্নতাআবরণের চেষ্টায় বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন “লুপ্তদর” ও “নাতি স্নগ্ধী” আর লোকলোচনের আনন্দদায়ক হয় না ; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন শুরঙ্গ, মাতঙ্গের নৈসর্গিক ক্রীড়া সর্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,—তাহা ভাল বোধ হইত,—মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব মিলাইয়া মনে মনে প্রীত হইত, এখন স্বভাবের বিশাল অরণ্যে আমরা কুরঙ্গীর বিলোলকটাক্ষ আর দেখিতে পাই না ; শীর্ণকায় হস্তীগুলি মাহুতের অঙ্কুরের ভয়ে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে ;—ইহা ছাড়া রুচিরও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরস্তার উপমায় মন তৃপ্ত হয় না,—সুতরাং সত্যযুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করার দোষে কবিগণ স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন ; উপমাগুলি স্মৃষ্ণ হইতে স্মৃষ্ণ হইয়া মানবীয়রূপকে ঘোর বিপদাপন্ন করিয়া ফেলিল ; এই সময় কবিগণ যে সকল সুন্দর ও সুন্দরীর্ণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহারা অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাঁহাকে রূপসী জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গসাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শ্বীও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সাহা হউক, ভাবের দুর্গতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত হইতে চলিল ; বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল—কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা বড় হস্তাস্পদ হইয়াছে,—আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব।

এই সংস্কৃতির আনুগত্য বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট অনুবাদচেষ্টার বিশেষ-  
রূপে দৃষ্ট হইবে । ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টা-  
সংস্কৃতির অনুবাদ । দশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক  
অনুবাদিত হইয়াছিল—তাহারা একরূপ নগণ্য ; আমরা বহুসংখ্যক  
অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকল-  
গুলি উল্লেখ করিতে পারিব না এবং সকলগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে ।  
প্রথমতঃ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের  
উল্লেখ করিয়া পরে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রসঙ্গে আলোচনা  
করিব । বলা বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাটি অনুবাদ নহে,  
কবিগণ পুৰাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবগম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজদের  
কল্পনার ইঙ্গজাল বিস্তার করিতে ক্রটি করেন নাই ।

১। প্রহ্লাদচরিত্র,—বিজয়সারিপ্রণীত ; শ্লোকসংখ্যা ২২৪ ; হস্তলিপি ( ১৭০২  
শক ) ১৫০ খৃঃ অব্দ ।

২। পরীক্ষিৎসংবাদ—এই পুস্তকের অবিকাংশই রামায়ণের গল্প পূর্ণ ; শুকদেব  
পরীক্ষিৎকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছেন । গ্রন্থকারের  
নাম পাওয়া গেল না । শ্লোকসংখ্যা ৮০০ ; শ্রীরামধন দেবশর্মার হস্তাক্ষর, ( ১৭৩৮ শক )  
১৮১৬ খৃঃ অব্দ ।

৩। নৈষধ—লোকনাথদত্ত-প্রণীত । ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের  
বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও সর্বশেষ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে মোট  
শ্লোকসংখ্যা ২০৪৪ ; লেখক শ্রীমাদিকাইত, হস্তলিপি ( ১১৭৪ সন ) ১৭৬৮ খৃঃ ।

৪। ইন্দ্রদ্যুম্নউপাখ্যান—বিজয়মুকুন্দপ্রণীত ; শ্লোকসংখ্যা ৬৯০ ; হস্তলিপি ( ১১৮৪  
সন ) ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ ।

৫। দণ্ডীপর্ব—রাজারামদত্ত প্রণীত ; শ্লোকসংখ্যা ১৫০০ ; লেখক শ্রীরামপ্রসাদ  
দেব, হস্তলিপি ( ১৭০৭ শক ) ১৭৮৮ খৃঃ ।

৬। নলদময়ন্তী—মধুসূদননাগিত-প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ২১২৪ ; লেখক শ্রীসৌর-  
কিশোর ধর, হস্তলিপি ( ১৭৩১ শক ) ১৮০৯ খৃঃ ।



৮। হরিবংশ—বিজ্ঞানবানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত শ্লোকসংখ্যা ৩১৬৮; লেখক শ্রীভাগ্যবন্ত ধূপী, হস্তলিপি ( বাং ১১৯০ সন ) ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ ।

৯। ক্রিয়াযোগসার—পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ । অনুবাদক শ্রীঅনন্তরাম-শর্মা, শ্লোকসংখ্যা ১০৫০ । লেখক শ্রীরাঘবেন্দ্র রাজা; হস্তলিপি ( ১৬৫৩ শক ) ১৭০১ খৃঃ অব্দ ।

এই পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে ; ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, বেতালপঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকলগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অত্রান্ত ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি । শ্রীযুক্ত বাবু অকুরচন্দ্রসেনমহাশয় রামনারায়ণ-ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ-উপাখ্যান, সুষমা-বধ, ধ্রুব-উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন ।

ইহাদের প্রায় সকলগুলির রচনাই একরূপ ; রচনা সরল, মধ্যো মধ্যো কোমল কবিতাবিনিতার লীলাখেলাও একটু অনুবাদ গ্রন্থ সমালোচনা । একটু দৃষ্ট হয় । বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতশব্দ ও উপমাশি বহুল পরিমাণে আমদানি করিয়াছে । এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কাশীদাসের রচনায় বে নে গুণ দৃষ্ট হয়, প্রস্কোক্ত অনুবাদপুস্তকগুলিতে ন্যূনাবিক পরিমাণে সেই সকল গুণ লক্ষিত হইবে । এই নগণ্য পুস্তকরাশির সুশৃঙ্খল খদ্যোত-দীপ্তি নিবিড় সাহিত্যইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের পরিষ্কার পথ দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদাসের প্রতিভার সন্নিহিত হইয়া পড়ি । পুঁথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা উচিত, নিম্নে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি ;—

(১) প্রহ্লাদের স্তব—“ধান করিয়া প্রহ্লাদ বলে উচ্চস্বরে । চল্লিখ্য জিনিয়া বে শ্রামরূপ ধরে । ক্রীট কুণ্ডল হার বসন সুন্দর । বিজলিমণ্ডিত যেন নব জলধর । পীতবাস পরিধান চরণে নুপুর । পদনখদীপ্তি কোটি চল্লি করে দুর । চতুর্ভুজ শম্ভুচক্র

গদাপন্ন করে। অঙ্গেতে কৌলুভমণি মহা দীপ্তি ধরে ॥”—প্রহ্লাদচরিত্র, বে, গ, পৃথি; ৯ পত্র।

(২) পরশুরামের বর্ণনা—“হেন কালে আসিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব জিনি নির্ভর শরীর ॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোপ অতি মনোহর ॥ টোণের ভিতরে বাণ জলদগ্নি যেন। এক এক শর মুখে যেন কালবম ॥ স্তবর্ণ বর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অদ্ভুত তেজ করিত ॥ লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটি। রঘুনাথে দেখি করে হস্ত খটখটি ॥”—পরীক্ষিৎসংবাদ, বে, গ, পৃথি, ২৩ পত্র।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—“আমি ব্যাধিরূপ হৈয়া দেই দুঃখ ভোগ। আমি ঔষধ হৈয়া খণ্ডাই সেই রোগ ॥ আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিবানিশি ॥ আমি পণ্ডিতরূপ আমি নৃসিংহ। আমি সে সকল করি উত্তম অধম ॥ আমার নাশ নাট আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমারই প্রকাশ ॥”—পরীক্ষিৎসংবাদ ১০ পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গালাব পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়—  
ইহা উন্নত অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা; যে স্ন, কু, ব্যাখ্যা করিতে অত্যাশ্রয় ধর্ম্মে সয়তান করিত, সেই স্ন, কু-বোধ আমাদের ভ্রান্তির উৎপত্তি; স্ন, কু, মায়াপ্রিত অনন্ত পুরুষের ব্যাপক মহিমার প্রসার; মূর্খ পণ্ডিত, রোগ ও ঔষধ ইঞ্জিতে একে অত্মকে দেখাইতেছে, ইহার একই অবয়বের ভট ভিন্ন দিক মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটি তাঁহা ছাড়া নহে। হিন্দুস্থানের পল্লীবাসিগণ পৌত্তলিক, কিন্তু উন্নত বেদান্তশাস্ত্রের মন্মগ্রাহী।

কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পুঙ্খ তত্ত্বও পাওয়া যায়; সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত উপমার প্রতি প্রবর্তিত হইতেছিল; লোকনাথদত্তের নৈষধ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী কাব্য; মনোনিবেশ পূর্বক লোকনাথদত্তের রচনা পাঠ করিলে

ইহাকে ‘সুদ্র ভারতচন্দ্র’ উপাধি দেওয়া যাইতে  
লোকনাথদত্ত।

পারে; দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে—

“দেখিয়া হরঙ্গ তার গুণাধর। অকণ আকৃতি সূর্য্য হৈতে সমসর ॥ দূরে থাকি

কুম্ভ বাঁধুলি বিধ্বল । অপমানে বলে মোর হ্রস্ব বিফল ॥ দেখিয়া চিন্তিত তার  
দশনের কান্তি । সমুদ্রে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি । তার ত্রুটি বিমল দেখিয়া  
মনোহর । আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল ॥<sup>৩</sup> দেখিয়া হুচাক তান দিবা কেশ পাশ ।  
চামরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ ॥ সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অতুত । ঘন ঘন  
গগনেতে লুকায় বিদ্রুত ॥ দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভাষিত । সমুদ্রেতে গেল হংস  
হইয়া লজ্জিত ॥ তনু কঠিন তার গীন পয়োধর । দূরে থাকি হেরিলেক স্রমে ক মন্দর ॥”—  
নৈষধ, বে, গ, পুথ ৪০ পত্র । কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্বে বিদ্যাপতি কবি  
গাহিয়া রাখিয়াছিলেন—“কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাদ আকাশ ।  
হরিণ নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতিভয়ে গজ বনবাস ॥ ভুজভয়ে কমল মুণ্ডল  
পঙ্কে রহে । কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে ॥”

কল্পনার এই বাড়াবাড়ি বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী  
হইতে লাগিল, এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উক্তরূপ  
নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ; নলদময়ন্তীলেখক মধুসূদননাপিত দময়ন্তী  
কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদাবৃত সুন্দর সিন্দূরের উপমা দিয়াছেন,  
—“রাহি জিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে ॥”

মধুসূদননাপিতরচিত ‘নলদময়ন্তী’ কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি ;

এই নরসুন্দর কবি স্বীয় পরিচয়স্থলে বলিয়া-  
নাপিত কবি ।  
ছেন—“ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব ।

যাহার কবির কীর্তি লোকেতে সম্ভব ॥ তাহার তনয় বর্ণনাথ মহাশয় । পৃথিবী  
ভরিয়া যার কীর্তির বিজয় ॥ তাহান তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন । শুনিয়া প্রভুর কীর্তি  
উল্লসিত মন ॥” সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য লিখিয়া  
লক্ষ্যশা হইয়াছিলেন ; মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী ; নাপিতকবি  
বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ক্লান্ত-  
কার্য্যতায় কেহ বিদ্রূপ করিতে সূবিধা পাইবেন না ; স্বভাববর্ণনা  
এইরূপ—“কতদূর গিয়ে দেখে রম্য একস্থান । দিবা সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান ॥  
তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত । দক্ষিণা পবন তথা অতি হললিত ॥ কোকি-  
লের ধনি তথা ময়ূরের নৃত্য । ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত ॥ পাইয়া শীতল

বারি আনন্দ হনয় । স্নান তর্পণ কৈল সৈন্ত সমুচয় । ছায়া, বারি, শীতল পবন  
মনোহর । নদীতীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর । আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর ।  
চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর । হংসে যুগল তুলি যাচে হংসিনীকে । উড়ে পড়ে  
চকোরী চকোর ডাকে । এই কবির পুঁথিতে দুই একটি স্থলে আমরা লোক-  
নাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি ।

দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই—দুর্কাসার শাপে উর্কশীঅম্পরা পৃথিবীতে  
ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । একদা  
দণ্ডী পর ।  
অবস্তার রাজা দণ্ডী শিকার করিতে যাইয়া  
এই অপূর্ব সুন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈন্তসামন্ত ত্যাগ করিয়া তাহার  
পাছে পাছে ধাবিত হন ; কতকদূরে গেলে নির্জনে ঘোটকী অপূর্ব  
রমণীমূর্তি ধারণ কবে, রাজা তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন ; ঘোটকী  
কামরূপিণী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট  
সুন্দরী রমণীমূর্তি পরিগ্রহ করিত । নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া জানান,  
তাঁহার অধীনস্থ অবন্তীরাজ খুব সুন্দরী একটি ঘোটকী পাইয়াছেন ;  
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান,  
‘তিনি সিংহাসন এবং রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী ছাড়িতে  
পারিবেন না । শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল ; দণ্ডী মহায়  
খুঁজিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিল । বিভীষণ, বাসুকী, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির  
হুর্ঘ্যোদন প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিতে  
স্বীকৃত হইল না । সুতরাং ক্ষুদ্রমনে ঘোটকীপূর্থে দণ্ডী গঙ্গার জলে  
ডুবিয়া মরিতে গেলেন ; এই গঙ্গার ঘাটে সুভদ্রাদেবী স্নান করিতে  
আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্য জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার  
জন্ত অনুরোধ করেন ; ভীমসেন সাহায্য করিতে প্রতীকৃত হন ; তখন  
বড় একটা গোল বাধিয়া গেল ; সুহৃদ বন্ধুগণ সকলে আসিয়া ভীমসেনকে  
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল ;—কিন্তু ভীম পাহাড়ের ত্রায় অটল ; প্রহ্ম

আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়া প্রচ্যন্ন বলিতে লাগিল “সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিন্দেই ভীম কর অন্ন জ্ঞান।”— কিন্তু ভীম যে ভ্রুকুটা করিয়াছিল, সে ভ্রুকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না। বিষম যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব কোরব, একত্র হইল,—এই স্নহদ-চম্পরবৃত্ত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত-আশ্রয়-কারী ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজ্য দেবের ঋণ্য বোধ হয়—কাব্যের সহজ সুন্দর বর্ণনা রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া ফুল-পল্লবযুক্ত লতার ঋণ্য দেখাইতেছে। কতকদূর যুদ্ধ হইয়া আর যুদ্ধ হইল না; যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী অপ্সরা হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। ‘আর কেন?’ ভাবিয়া দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের বশুতা স্বীকার করিলেন।

আমরা পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই।

সম্ভবতঃ ইঁহার সকলেই পূর্ববঙ্গের লেখক।  
অনন্তরাম দত্ত।

উঁহাদের মধ্যে এক মাত্র অনন্তরাম দত্ত (ক্রিয়াযোগসার-প্রণেতা) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়া-ছেন, তাহার সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না, উহাতে জানা যায়, কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ সাহা-পুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্লভ, কবিদুর্লভের তিন পুত্র, রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি ‘বিশারদ’ উপাধিবিশিষ্ট কোন ভোক্তের শরণ লইয়া ক্রিয়াযোগসার লিখিয়াছেন। এই আত্মবিবরণের পর ক্রিয়াযোগসার পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিকা আছে; তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইঁজের তত্ত্ব হইতে কুবেরের ভাণ্ডার এবং মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের কায়েমী স্বত্ব জন্মিবে।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ সঙ্কলনকারীর বিষয় উল্লেখ করিব । অনুবাদ-সম্পাদক রাজা জয়নারায়ণ-কবি জয়নারায়ণ । ঘোঁষাল ; কাশীতে ইঁহার স্মৃতি-জ্ঞাপক জয়-নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান । ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কাশীবাসকালে কাশীখণ্ডের তর্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দোবন্ধে সুপাঠ্য ; পুস্তকের শেষে সে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

“কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর । কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর ॥ মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি । ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥ মিত্র শতচৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে । আমার মানসমত যোগ হৈল তবে ॥ শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাইলি নিবাসো । শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব রায়গত কাশী ॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুয়া আইলা । প্রথম কাঙ্ক্ষণে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা ॥ শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ । ভাস্কিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুস্মরণ ॥ তাহার করেন রায় তর্জমা খসড়া । মুখুয়া করেন সদা কবিত পাতড়া ॥ রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া । পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুবিয়া ॥ এইমতে চলিলা লাচাড়ি হৈল যবে । বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হৈল তবে ॥ ভাস্করমাসে মুখুয়া গেলেন নিজবাটী । বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী ॥ পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায় । বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায় ॥ পচত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা । বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত সন্নিমা ॥ কাশী পঞ্চকোশী আর নগর ভ্রমণ । এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন ॥ পরে সত্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা । শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা ॥ যদাপি নয়ন দুটি দৈবযোগে অন্ধ । তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ ॥ ইষ্ট নিষ্ট বাক্‌নিষ্ট কাশীপুরে জন্ম । পরানিষ্ট পরাশ্রয় বিজয়মন্তী বর্ষ ॥ লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর । গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর ॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান । তর্কালঙ্কারের পিতা স্বর্গীয় বিদ্বান ॥ নিজেরে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন । ছয়মাসে বহুগ্রন্থ করি সঙ্কলন । ষত্ৰু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত । পদোত্তে আনিয়া সংস্কৃত অভিধান ॥ তর্কালঙ্কারের বহু বিষ্ণুরাম নাম । সিদ্ধান্তআখ্যান অতি ধীর গুণ-

বান্। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার। রায় করিলেন সৰ্ব্ব গ্রন্থের প্রচার।\*  
ঘোষালবংশের রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ। তাঁহার আদেশ-  
ক্রমে কিতাব করিয়া। রানতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া। সেই বহি দৃষ্টি করি  
নকলনবিসী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী।”

এই অনুবাদ সঙ্কলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন,  
ইহা এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না  
নৃসিংহদেবের সাহায্য, কাশী-  
খণ্ডের অনুবাদ। হইতে পারে। রাজা জয়নারায়ণের সাহায্য-

কারী নৃসিংহদেব একজন কবিছিলেন, তাঁহার  
রচিত কয়েকটি সুন্দর শ্রামাসংগীত আমরা দেখিয়াছি। নৃসিংহদেবের  
সন্তানগণ এখন হুগলী বাঁশবাড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন, উদ্ধৃত অংশ-  
দৃষ্টে বোধ হয়, নৃসিংহদেব অনুবাদকার্যে মহারাজাকে বিশেষ সাহায্য  
করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের সর্বত্র জয়নারায়ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কাশী-  
খণ্ডের অনুবাদ ১১২০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক  
আছে, তাহা অধ্যায়শেষে প্রাচীনরীতি-অনুসারে একটি প্রহেলিকার  
সঙ্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে, পুস্তকশেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া  
হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজাবাহাদুরের লিপিকৌশল—তাঁহার  
সত্যপ্রিয়তা; তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা এক-  
শত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের চক্ষে  
অঙ্কিত করিয়া দিতেছে; কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে  
আরও বৃদ্ধি পাইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ড-  
খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুর্শানগর এবং নরহরি চক্রবর্তীর

\* অপর একখানি পুঁথিতে ইহার পর এই দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে :—

“নগর বর্ণন যোর গ্রন্থের কারণ।

প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তাহা স্বার্থ র্নগন।”

বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্র খানি এক স্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে ।

কবি গঙ্গার অর্ধ গোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবেস্থিত কাশীকে  
কাশীর চিত্র । মহাদেবের কপালের অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা  
করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন । প্রথমে অসি-

ঘাট, পরেশনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট, নারদপাড়ের ঘাট, প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠনপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ-পূর্ণ জনশ্রুতির উল্লেখ আছে । তৎপর পোস্তাগুলি, তাহাদের সংখ্যাও কম নহে ; সূচীপত্রের সঙ্গে দুইএকটি কোতূহলোদ্দীপক কথা খাঁকলে তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজাবাহাদুরের রচনারও ইহাই গুণ ; পোস্তাগুলির মধ্যে—“শীরের পোস্তাকে সর্ব প্রধান গণিব । উর্দ্ধে বষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশত শ্রমাণ । যেমত পর্বত মধ্যে হ্রমেক প্রধান ।” পোস্তাগুলির পরে “ঘাটিয়া” ব্রাহ্মণদিগের কথা ; স্নানান্তে লোক সমূহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ । কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়-গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী ইহাদের “যজ্ঞমানঅ” হইয়া বসেন । তৎপর অট্টালিকাগুলির বর্ণনা ; দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু—“কদাচিত ছয়তলা সাততলা সাজে ।” শ্রীমাধব রায়ের ধারার। কাশীর সর্বোচ্চ মন্দির-চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত উচ্চ, ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,—“হ্রমেকর দুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ । মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ । তাহার উপর যদি কোন জন যায় । সেইসে কাশীর শোভা দেখিবার পায় ।” এই ধারার। দুঃখী ও নিরাশাপ্রস্তুতের শেষ উপায় ছিল, তাহার। ইহাব উপর হইতে পড়িয়া মরিত । রাজা বাহাদুরের কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে পাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে ; একব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া



তাহার সহিত সেই ধারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়যুগ্ম সেই স্থানে বাপন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে । কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সর্বদা মরা যায় না, “অন্ত একজন সেই ধারারোহে চড়ি । দৈবক্রমে তথা হৈতে তরুণরে পড়ি । তরুণাল সহ পুনঃ হইয়া ভূমিষ্ঠ । অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট ।” এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য্য করেন, পূর্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সুস্পন্ন করিতেন—“মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্বথা । দিনকর হিমকর করহীন তথা । একারণ নিশাযোগে পথিকের আঁতে । দীপ শিখা করে সবে নিজ থিড়কীতে ।”

কবি অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্বত্র উৎসুকনেত্র পথিকের ত্রায় সরলভাবে ভালমন্দ কথার উল্লেখ করিয়া যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস্যরসোজ্জ্বল হইয়াছে—“লামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ । বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট । সদাগরী মহাজনী বাবসা সবার । এক এক জনার বাড়ী পর্বত আকার ।” ভণ্ডপাণ্ডাদের “কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী । বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী ।” এবং উৎকৃষ্ট দধিতৃষ্ণপুষ্ট “শ্রীবিগ্রহশক্তি বেন রাজরাজেশ্বর ।” তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে ; ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ—এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের মত ; এবং আখ্যায়িকার সর্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে । কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্বদা হতাকাণ্ড হইত—“এইমত প্রতি মাসে প্রায় হয় বন্দ । ক্ষণমাত্র গড়াগড়ি যায় কত বন্দ ।” শিল্প-কারগণ কি কি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিকা আছে ; জোলাগণ কিংখাপ, একশাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, গুদড়, তাসের উপর ধনুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও “দ্বিশত পর্ধ্যস্ত খান মল্লের নির্ণয় ।” কিন্তু “সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে । শুদ্ধ সাদা অভ্যস্তম করিতে না পারে ।” নদীয়ার কারিকরগণ অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ পাষণ দ্বারা প্রস্তুত করিত । তৎপর দেবমন্দিরগুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, প্ৰাণপূর্ণ ও নাট্যশালায় ন্যায় বিচিত্র শোভা-উদ্ঘাটক ; তখন অহল্যাবাইএর মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে,; পাষণের খোদগারি ফুল,

ফল, লতা ও দক্ষিণ দেশস্থ মর্শ্বরের বিশাল বুকের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে—“কনক কলস শোভে মন্দির উপর । তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল কাতর।” ইহার পরে বিষ্ণু মহাদেব মহারাট্টার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ—বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে দেখিতে যাইবেন । কাশীবাসিনী ধর্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্মব্রতাদিঅনুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নানাদির পরে রূপবর্ণনা—“গুণারের চূড়ি কাক কনকে রচিত । ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥ কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী । অথও কদলী দলে বিহরে নাগিনী ॥” তাহাদের নোলকে—“বড় ছই মুক্তা মাঝে চুণি শোভা করে । যেমত দাড়িষ বীজ শুক চকু ধরে ॥” কিন্তু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে । কবির অলক্ষিতে উপমাব উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পাড়িয়াছিল—“কাক উরঃ দেশে মুক্তা মালার দোলানী । হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্মাকিনী ॥” কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন—“এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে । কদাচিত অশুভাব মনেতে নহিবে ॥” ইহার পরে কাশীবাসী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধর্মোৎসব, বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বর্ণিত আছে । “তুলসী-বিবাহ” সেই সময়ে কাশীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল—রামলীলা, দুর্গালীলা, প্রভৃতি যাত্রা সর্বদা অনুষ্ঠিত হইত ।

কাশীখণ্ডের যে পুঁথিখানি আমার নিকট আছে, তাহা প্রেমানন্দ-

দাসের হস্তের লেখা । ঈহার হাতের লেখা

কাশীখণ্ডের পুঁথি ।

মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা ও পুষ্পিত লতার

ন্যায় নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াশালী ; এই লেখার সর্বত্রই ‘ব’ অক্ষরটি ‘র’এর মত লিখিত হইয়াছে—ইহা মিথিলার ধরণে ; প্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুঁথি আমার নিকট আছে—কাশীখণ্ডের হস্তলিপি ১৮০০ খৃঃ অব্দের । সর্বশেষ কবিপ্রেমানন্দ নিজ রচিত ছইটি গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য-মাখা দুর্গা-বন্দনা ।

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে কবিজয়নারায়ণের জীবন কাহিনী বিবৃত  
করিব। কবির পূর্বপুরুষগণের তালিকা নিম্নে  
কবির পরিচয়।

দেওয়া যাইতেছে—১। যদুনাথ পাঠক, ২।

গোপীকান্ত, ৩। রামকৃষ্ণ, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। বিষ্ণুদেব, ৬। কন্দর্প।

কন্দর্পের ৩ পুত্র, ১। কৃষ্ণচন্দ্র, ২। গোকুলচন্দ্র, ৩। রামচন্দ্র।

রামচন্দ্রের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। গোকুলচন্দ্রের ৫ পুত্র, ১। বৃন্দাবন-

চন্দ্র, ২। রামনারায়ণ, ৩। হরিনারায়ণ, ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৫। গঙ্গা-

নারায়ণ। এই পঞ্চ পুত্রের কাহারও বংশ রক্ষিত হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের

একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল। যদুনাথ পাঠক “দেশাধিপ” হইতে

গোবিন্দপুর, গর্যা বেহালা, প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কবি-

জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল তাঁহার পিতৃদেবের

জীবনাখ্যান উৎকর্ষ করিয়া একখানি সুবৃহৎ তাম্রফলক প্রস্তুত করিয়া-

ছিলেন, তাহাতে রাজনারায়ণ ঘোষালের জীবনী অতি বিশদরূপে আখ্যাত

হইয়াছে, এই তাম্রফলক হইতে জানা যায়, ১১৫২ সালে ৩রা আশ্বিন

জয়নারায়ণের জন্ম হয়; তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী,

ইংরেজী এবং ফরাশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১১৭২ সনে জয়-

নারায়ণ মোবারেক উদ্দলার অবানে একটি সম্মানিত পদ গ্রহণ করেন।

তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন এবং জরিপ

কার্যে গবর্ণমেন্টকে বিশেষরূপ সহায়তা করাতে, পদস্থ ইংবেজগণ সর্বদা

তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দিল্লীর সম্রাট হঁহাকে “মহারাজা” উপাধি

দান করেন। “জয়নারায়ণ কলেজে”র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে,

তদ্ব্যতীত কাশীতে ছর্গাকুণ্ডের নিকটে ইনি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা

নির্মাণ করিয়া তাহাতে “শুরুপ্রতিমা” প্রতিষ্ঠিত করেন। “শুরু কুণ্ডের

পুকুর”ও রাজা জয়নারায়ণের ব্যয়ে খনিত। ১২০০ সনে ইনি কাশীতে

“শ্রীকরণানিধান” নামক কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৮ সালের

২১শে কার্তিক ৬৯ বৎসর বয়সে রাজা জয়নারায়ণঘোষাল কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাণত্যাগ করেন ।

কাশীখণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত, জয়নারায়ণপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক-  
গুলি পাওয়া গিয়াছে ।

কবির অপরাপর গ্রন্থ ।

১। শঙ্করী-সংগীত ২। ব্রাহ্মণার্চন-

চন্দ্রিকা ৩। জয়নারায়ণ-কল্পদ্রুম ৪। ককণানিধান-বিলাস ।

এই পুস্তকগুলির মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে,  
ককণানিধান-বিলাস ।

এবং পুস্তকখানির নাম স্পষ্টতই তাহার প্রতি-  
ষ্ঠিত “ককণা-নিধান বিগ্রহের” নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে । এই পুস্তক-  
খানিতেও আমরা রাজকবির অভ্যস্ত বিনয় ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয়  
পাই । রঘুনাথ ভট্ট নামক জনৈক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনায় তাহাকে  
সাহায্য করেন,—ইহা গ্রন্থ হুচনায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয় । ১২২০ সালের  
অগ্রহায়ণ মাসে এই কাব্য রচনা আরম্ভ হয়, এবং ১২২১ সালে ইহা  
সমাপ্ত হয় । গ্রন্থারম্ভে কবি স্বীয় অবস্থান্তর ও ভাবান্তরের কথা উল্লেখ  
করিয়াছেন, নিম্নোক্ত পংক্তি নিচয়ে যে বৈরাগ্যের ঝাঁজ আছে, পরি-  
ণামে রাজার চিত্রে তাহাই বিকাশ পাইয়াছিল ।—

“প্রথম বয়সে মন বিষয়েতে গেল ।

মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল ।

পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল ।

মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল ॥”

কবির একটি রচনায় আমরা আধুনিক ভূগোল বৃত্তান্তের হুচনা পাইয়া  
কতকটা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি । যাহারা “ত্রিকোণ ধরাতল” “বাসুকীর  
শির সঞ্চালনের” ক্রীড়নক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাদের একজনের  
মুখে—

“দক্ষিণেতে একরিকা সকলে জানিবে ।

পূর্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে ॥”

“পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গোলাকার ।”

প্রভৃতি বর্তমান মানচিত্রের বিপুল সংবাদ পাওয়ার আশা আমরা করি নাই । তার পর ধর্ম্ম সঙ্ক্ষে কবি হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত অমুরাগপুসার্য হইয়াও অপরাপব ধর্ম্মমতের সত্যতা অগ্রাহ করেন নাই ;—তাহার আর একটি রচনা এইরূপ,

“উত্তরেতে লামাণ্ডক নানক পশ্চিমে ।

রামশরণ নাম এক হবে পূর্ব ধামে ॥

পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে ।

ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে ॥”

(খ) রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ ।

( রামায়ণ )

আমরা কুন্তিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি ; কবিকঙ্কণ ইঁহাকে বন্দনা করিয়া কুন্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । লিখিয়াছেন—“করজোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কুন্তিবাস । বাহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ ॥” ( অনুসন্ধান, ১৩০২ ।

২২৫পৃঃ) এবং পরবর্তী বহুবিধ মহাজন ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমরা কুন্তিবাস সঙ্ক্ষে লিখিয়াছি, তাহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল ; আমরা হস্ত লিখিত পুঁথিগুলিতে তরগীসেনবধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূলবিষয়বহির্ভূত প্রসঙ্গ পাই নাই । রামগতি ত্রায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—“শ্রীরামের ভগ-বতী-পূজা ও রাবণের যত্নাবণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই ।” ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ) সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,—কুন্তিবাস রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের

খাতার সঙ্গে পরবর্তী কবিগণ নানা পুৰাণসঙ্কলিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন\* ; —সৰ্বশেষে যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি— তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ; কিন্তু পূর্ববর্তী জয়গোপালগণকে প্রত্নতত্ত্ব-বিংগণ অভিযুক্ত করিয়া ধৃত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ ; সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই । কিছু পরে ভক্তির বজ্রায় দেণ ভাসিয়া গিয়াছিল ; সেই ভক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী রামায়ণেব অক্ষরগুলির প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিখ্যোত করিয়া তাহাদিগের রূপ সাংস্কৃতিকভাবেব স্নিগ্ধমহিমা-সংশ্লেষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল । সুতরাং জাতীয়

\* ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি কয়েকখানির উত্তরকাণ্ডে মূল-বহির্ভূত অনেক প্রসঙ্গ,—যথা দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি, দৃষ্ট হয় । তুলসীদাসকৃত হিন্দীরামায়ণের উত্তরকাণ্ডেও মহাভারতের শাস্তিপর্ব্বের স্থায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার রহিয়াছে । বাঙ্গালীক-প্রণীত রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না । উত্তরকাণ্ডে সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিংগণের মত এখানে বিচার্য্য নহে, কিন্তু ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে বাঙ্গালীকিরচিত নহে, এতৎ সম্বন্ধে ৩টি যুক্তি অকাটা ।

১। আদিকাণ্ডে বাঙ্গালীকিমুনির প্রম্বানুসারে মহর্ষি নারদ রামায়ণাখ্যানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উত্তরকাণ্ডবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয় নাই—সেই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটিতে লঙ্কাকাণ্ডের বিবরণ অবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় । বলা বাহুল্য রামায়ণের এই পূর্বাভাবই বাঙ্গালীকপ্রণীত মহাকাব্যের মূল অবলম্বনীয় হইয়াছে ।

২। লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে যে ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে, তদ্রূপ ভাবে পূর্ববর্তী অষ্ট কোন কাণ্ডের শেষ করা হয় নাই, উক্ত উপসংহারটি ভাল করিয়া পড়িলে সেই স্থানেই যে রামায়ণ শেষ করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয় ।

৩। বাবাহীপে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরকাণ্ড নাই ; উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পূর্বেই আর্ধ্যগণ সে দেশে রামায়ণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এতদ্বারা ইহাই অনু-সিত হয় । উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পক্ষে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যগণের সঙ্গে বাবা-হীপের সমস্ত সংস্রব বিদ্যুত হইয়াছিল ।

ইহা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থের অন্তর্বর্তী অন্ত্যস্ত বহুসংখ্যক প্রমাণ আছে, তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন । অনুবাদগুলিতেও উত্তরকাণ্ডের একটির সঙ্গে অন্ত্যটির মিল দৃষ্ট হয় না ।

প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভা নূতন রূপে গঠিত হইয়াছিল । কোন্ কোন্ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্থায়ী অক্ষর মিলাইয়াছিলেন, তাহা নিকূপণ করা বর্জিত ; আমরা কাহার প্রাপ্য যশোমালা কাহার কণ্ঠে দোলাইতেছি, কে বলিবে ? শৈশবকালে আমরা বীরবাহুর স্ততির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি ;—“গজ স্বরূপ হইতে বীর নেহালে শ্রীরাম । কপটে মনুষ্য দেহ দুর্বাদল শ্রাম ॥ চাঁচর চিকুর শোভে চৌরশ কপাল । এসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর । ভুবন মোহন রূপ শ্রামল হৃদয় ॥ রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন । সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ ॥ নারায়ণরূপ দেখি রাবণ কুমার । নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণুঅবতার ॥ হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে । গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে ॥ ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর । অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর ॥ প্রথমহ রামচন্দ্র সংসারের সার । সত্যবাদী জিতেদ্রিয় বিষ্ণু অবতার ॥” কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তির গন্ধচন্দনমাখা কবিতা-শেফালিকা কাহার ? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃত্তিবাস নহেন । অঙ্গদের রায়বারের উৎকৃষ্ট বিজ্ঞপাত্মক পংক্তিগুলি কৃত্তিবাসের নহে,—উহা ‘কবিচন্দ্র’ নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতায়ুক্ত, বটতলার রামায়ণে রামচন্দ্র সীতার জ্ঞাত চন্দ্র সূর্য্যকে ডাকিয়া ডাবিয়া যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সে ভাবে লিখিয়া যান নাই । ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্তিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পারে—কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জন দিতে হয়,—এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্বে স্বপ্নরাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায় ;—দ্রুত নেষ্টা শিশুটির গ্রায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের অকুমার বৃন্তির ফুলগুলি ঠাইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে ।

এখন দেখা বাইতেছে, বহুসংখ্যক পরবর্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত নববস্ত্র পরাইয়া কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তবে কৃত্তিবাসকে তাঁহার একবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই । আদিকবির

সারল্য ও কবিতার অনাড়ম্বর মাধুর্য্য বর্তমান আকারগ্রন্থ রামায়ণেরও সর্বত্র লীলা করিতেছে, যাহারা তাঁহার পুস্তকে রচনা প্রাক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজ লেখা কৃতিবাসী পারল্যের ছাঁচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে পারিয়াছেন ।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কৃতিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে অপরাপর রামায়ণ-রচকগণ । দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সমকক্ষতা-ইচ্ছু কবি-

গণের কেহই আদি কবির যণঃ হরণ করিতে পারেন নাই । কেবল যাহারা তাঁহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অল্পরূপ রচনা মিলাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়াছেন, তাঁহারা নামগোত্রশূত্র হইয়া আদি কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন ।

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণরচকদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি ;—

১ এবং ২ । বটীবর ও গঙ্গাদাস সেন—ইহারা পিতা পুত্র । ইহাদের বাসস্থান “দীনার দ্বীপ” বলিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায় ; ত্রীযুক্ত অকুরচন্দ্রসেনমহাশয় অনুমান করেন, এই দীনার দ্বীপ ও মহেশ্বরদি পরগণার বটীবর ও গঙ্গাদাস ।

অন্তর্গত সোণার গাঁর নিকটবর্তী বর্তমান ‘বিনারদি’ একই স্থান । বটীবর ৩০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় । ২০০ বৎসর পূর্বের হস্তলিখিতপুঁথিগুলিতেও ইহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া বাইতেছে । ইহারা উভয়েই সাহিত্যত্রে আজীবন বিব্রত ছিলেন ; পদ্মাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গেই ইহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে । পূর্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে । একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখা গেল—বটীবরের উপাধি ছিল ‘গুণরাজ’ । মালাধর বহু, হৃদয়মিশ্র ও বটীবর—বঙ্গুসাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাধি “গুণরাজ” পাওয়া বাইতেছে । বটীবর, জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয়লাভ করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের অং ১০৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে । রামায়ণের অনেক উপাখ্যান বটীবরের রচিত পাইয়াছি । বটীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সুরল ও পরিপক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য



চঞ্চল ও হৃন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক ; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম্য—কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদাসের রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে নমুনা দেখাইতেছি ;—সীতার অযোধ্যার প্রবেশের পর, শ্রীরাম বলিলেন—“অগ্নিশুদ্ধা হইয়া সীতা পুরীমধ্যে যাউক। পাপিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক ॥” কিন্তু সীতার “মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষু পড়ে পানি। রাম সন্মোখিয়া বোলে গদগদ বারি ॥ সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জান যে আমি সতী কি অসতী ॥ পৃথিবীন্দিনী আমি তোমার ঘরণী। বিধাতা স্বজিল মোরে করি অলক্ষ্মীগণ ॥ বারংবার আমি আশা দোষ পুনি পুনি। নগরে চয়রে যেন কুলটা রমণী ॥ অপমান মহাদুঃখ না সঞ পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে ॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘুপতি ॥ এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদুঃখ। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে ॥ সাগর জঙ্গম ভার সহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার ॥” কবি গঙ্গাদাসসেন প্রায় প্রত্যেক পঙ্কেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—“পিতামহ কুলপতি, পিতা বগীবর। যার যশঃ যোমে লোক পৃথিবী ভিতর ॥” বগীবর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, একপ অন্ত্রমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করিবার সময় এই দুই কবির প্রসঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব।

৩। ভবানী-দাস বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ভবানীদাস জয়চন্দ্র নামক কোন

রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন।  
ভবানীদাস।

লক্ষ্মণ, ভরত ও শকুনি অনুরূপিত নানা দেশ-বিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ গ্লোক আছে, হুতরাং ইহা আকারে বড় ; কিন্তু গুণে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুষ্ক ও একঘেঁষে। এই কাব্যের কয়েকটি স্থলে রামচরণনামক কবির ভণিতা আছে। ভবানীদাস-বিরচিত “রাম-স্বর্গারোহণ” নামক আর একখানি কাব্য আমরা দেখিয়াছি। “লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়” ও “রাম স্বর্গারোহণ” একই ভবানীদাসের লিখিত কিনা বলা যায় না। শেষোক্ত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এই একটু সামান্য পরিচয় আছে ;—“নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য। বাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য ॥ গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম ॥ বামনদেব তথা যশোদা জননী। সপুত্রে বন্দম যবে সর্বলোক জানি ॥” এই সমস্ত পরিচয় সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, পরিচয়ের

অ.ণ প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই পাঠবিকৃতি-দোষে দুষ্ট; গ্রাম এবং ব্যক্তি-বিশেষের নাম কয়েকবার নকলের পরে যথাযথরূপে পাওয়া হকঠিন।

৪। বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ—ইহা শ্রীযুক্ত অকুরচন্দ্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন।

ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজের তাহা অনেক দুর্গারাম।

স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কবির কোনও আত্ম-বিবরণ পাওয়া যায় নাই; আমি এই পুস্তক পড়ি নাই। অকুর বাবু লিখিয়াছেন—ইহার রচনা বড় মধুর। আমরা বিজ দুর্গারামপ্রণীত কালিকা-পুরাণের একখানি অনুবাদ পাইয়াছি।

৫। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ—কিঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার

ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে

তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাঁকুড়ার ২৩ মাইল উত্তরে। সাবেক ভুলুইগ্রাম নদী-গর্ভে,—এখনকার ভুলুইগ্রামে জগৎরাম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন; ভুলুই ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত—“ভুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অন্নদ্বারে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পাশে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার স্তায় ধীরে বহিয়া বাইতেছে।”

(পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১ বাৎ ভাদ্র)। কবির পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম গোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথসিংহভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ সন্থতে (১৬৫৫ খৃঃ অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয়। রামায়ণের পর এই কবি “দুর্গাপঞ্চরাত্রি” নামক একখানা কাব্য রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্তৃক কিঙ্কিঙ্কার অনুষ্ঠিত দুগোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্যের বটী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরাম রায়ের রচিত, অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগৎরাম রায়ের রানায়ুগে মধ্যে মধ্যে বেশ স্থলর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা ততদূর প্রাঞ্জল নহে। মিষ্ট শব্দ ব্যবহারে কবি সর্বত্র পটু নহেন; “দুর্গাপঞ্চরাত্রি” কবির পরবর্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক ও বেশ উপাদেয়। শিব ও গৌরীর কথা বার্তা লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে; গৌরীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের

‘রাখালী’ ‘পীতধটা’ ও ‘তিন ঠাই বাঁকার’ খোঁটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরাশ্রিত-  
উপলক্ষে গৌরীর মিষ্টভৎসন—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে  
রৌদ্রমিশ্রবৃষ্টির স্থায় কোতুলকর । জগৎরাম রায়ের কবিত্বের নমুনা ;—“তুমিহে  
বেমন বলিলে তেমন, এমতি তোমার কাষ । তঁব দোষ নয়, ধুতুরাতে কর, তেঞি সে  
এমন সাজ ॥ এই করিয়া, সব খোয়াইয়া, হয়েছ দিগম্বর । তোমার গুণে, বিধিল  
যুগে, আমার অন্তর ॥ বিভূতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে । এমত  
কথা, বলিতে হেথা, লাজ কি স্তখে এসে ॥ ভাস্কের ঘোরে, নহন কিরে, চলিতে  
ঠাহর নাই । জটার ঘটা, বিভূতি কোঁটা, দেখিলে ভয় পাই ॥” রামপ্রসাদও পিতার  
অযোগ্যপুত্র নহেন,—দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,—“নবমী  
দশমী দুই দিবসের গান । বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞা দান ॥ আজ্ঞা  
পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার । যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার ॥ বামন বাসনা  
যেন বিধু ধরিবারে । পঙ্গু লজ্জিবারে চায় স্নমেক শিখরে ॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু  
পিতার বচনে । আঙু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে ॥” রামপ্রসাদরচিত অপর  
একখানি বড় কাব্য আছে, তাহার নাম—“কৃষ্ণলীলামৃতবস” ।

৬ । সারদামঙ্গল—শিবচন্দ্র সেন প্রণীত । গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ,—“বৈদ্যকুলে  
জন্ম হিন্দুসেনের সন্ততি । সেনহাটি গ্রামে পূর্ব পুষ্ক-  
শিবচন্দ্র সেন ।  
বসতি ॥ রামচন্দ্রনাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত । যশে কুলে  
কীর্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত ॥ রত্নেশ্বর গুণবান্ তাহার তনয় । রতন স্বরূপ কুলে হইলা  
উদয় ॥ এ হেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত । রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত ॥ সেন-  
ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল । রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল ॥ গঙ্গাদেব দত্তপুত্র  
তাচার পবিত্র । শ্রীগঙ্গাপ্রসাদসেন নাম সচরিত্র । বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে  
ধাম । ধনুস্তরিত্বংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম ॥ সরকারে স্থপাত্রে করিলা কস্তা দান ।  
গঙ্গাপ্রসাদসেন ঠাকুর কীর্তিমান ॥ জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান । শিবচন্দ্র,  
শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম ॥” ‘সারদামঙ্গল’ কাব্য বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে সর্বত্র  
পঠিত হইত । এই শিবচন্দ্র সেন কবি ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবির্ভূত হন । শ্রীরাম-  
চন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারদামাহাত্ম্যাজ্ঞাপক, এই জন্ত কবি রামায়ণকে ‘সারদামঙ্গল’  
আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । ‘সারদামঙ্গল’ অনেক দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন  
সেই মুদ্রিত বহি দুস্তাপ্য ।

৭। অদ্ভুতআচার্য্যের রামায়ণ—নিতানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণই ‘অদ্ভুতআচার্য্য’

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন,  
অদ্ভুতআচার্য্য।

এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত  
হইয়াছিল,—অনেক স্থলেই ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্রবহু-  
মহাশয়সংগৃহীত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; “প্রপিতামহো বন্দো  
জাহার খণ্ড। তাহার পুত্র উপজিল নামেতে প্রচণ্ড। তাহার তনয় হ’ল নামে শ্রীনিবাস।  
গুণ মহাশয় তেঁহো নারায়ণের দাস। তাহে উপজিল পুত্র মাণিক প্রচার। জন্মিল চারি  
পুত্র চারি সহোদর। চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রসাদে হইল অলঙ্কিত  
সিদ্ধি। সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ৰমে হইল যে নিতানন্দ নাম।  
মহাপৌরুষ তবে জন্মিল সংসারে। যত যত সংকল্প তার পৃথিবী ভিতরে। দেবগণে মুনীগণে  
কল্প শুভাচার। অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার। মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।  
ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি। প্রভুর কুপা হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত  
হৈল নাম সেই সে কারণ। বজ্রোপবীত নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর। রামায়ণ গাহিতে আজ্ঞা  
দিল। রঘুবর। জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম  
উপদেশ। পয়ার প্রবন্ধে পোখা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার।

“সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বিখ্যতে। সপ্তমি রেবতি যুত বার ভৃগুহুতে।  
কৰ্কটাত্তে স্থিতি রবিপঞ্চদশমীতে। কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।” ১৬৬৪-  
শকের কথা নির্দিষ্ট আছে, অথচ শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বহু মহাশয় ইহাকে “সম্বৎ” বলিয়াছেন,  
কিন্তু এ কার্য্য করা যে সম্ভব হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই একটু সন্দিহান, এই  
জন্মই “বোধ হয় ১৬৭৪ সালে” এই ভাবে গ্রন্থকাল নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্ভুতআচ-  
র্য্যের রামায়ণ প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল, আমরাও ইহা অনুমান  
করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথি খানিরই বয়স আনুমানিক  
১৫০ শত বৎসর। শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার খুব প্রাচীন একখানি পুঁথি সংগ্রহ  
করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত “১৭৬৪ শক” সমর্থিত হওয়ার উপায় কি? এদিকে রসিকবাবুর  
মতানুসারে “শক” শব্দের অর্থ “সম্বৎ” করিয়া নূতন অভিধান হুইপূর্বক ঐতিহাসিক  
কাল নির্ণয় শুদ্ধ করিবার আশাভিলাষের অধিকার আছে কি না তাহাও সন্দেহহীন। আমার  
বিবেচনায় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল। “কৃষ্ণপক্ষে  
সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।” এই চরণ দ্বারা গ্রন্থের নকল সমাপ্ত হইল, অর্থগ্রহণই

স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন অনেক পুঁথিরই শেবাংশে নকল করিবার তারিখ এইরূপ সাক্ষেতিক ভাবে নির্দিষ্ট হইত। বাহা ইউক আমরা রসিক বাবুর উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন করিয়াই এই মত প্রকাশ করিলাম। শক হুলে সম্বৎ অর্থ করিবার যদি অপর কোন কারণ থাকে, তবে তাহা শেষে বিবেচ্য। অদ্ভুতআচার্য্য সপ্তমবর্ষ বয়সে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ তিনি নিজেও এ কথা কোথাও বলেন নাই। রামচন্দ্র তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, ও রামায়ণ গাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কবির যজ্ঞোপবীত হয় নাই। তৎপর কোনও সময় সম্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সেই তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—এইজন্ত তাঁহার উপাধি হইয়াছিল, অদ্ভুতআচার্য্য। তিনি লেখা পড়া না জানিয়া রামায়ণের আচার্য্য হইয়া দাঁড়াইলেন, হুতরাং অদ্ভুত আচার্য্য নন তবে কি? তিনি নিজেই এ কথা বলিয়াছেন,—“জ্ঞানি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ ॥”

তাঁহার রামায়ণ আর একটী অদ্ভুত কথা আছে, ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাম্প্রীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা দাঁড় করান হইয়াছে।

৮। কবিচন্দ্র কৃত রামায়ণ—ইহার বিবরণ মহাভারত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৯। শঙ্কর-বিরচিত রামায়ণ \*—শঙ্কর প্রণীত আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিঙ্কিকা ও হনুস্রাকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ ইনিও সমস্ত-শঙ্কর।

রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—ইহার পরিচয় এইটুকু পাওয়া গিয়াছে,—“সাগরদিয়ার বন্দ্য রবিকরী সর্বানন্দ, গোবিন্দ-তনয় বিজয়রাম। তন্ত পঞ্চ পুত্র দ্বিজ, ভবানী শঙ্করাগজ,”—ইত্যাদি। অপর এক হুলে “বন্দিয়া জানকীনাথে শ্রীশঙ্কর গায়।” শঙ্কর ও কবিচন্দ্র পরস্পরের বন্ধু ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয়, উভয়ের একত্র ভণিতায়ুক্ত হই এক খানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

১০। লক্ষ্মণবন্দ্যোপাখ্যায়-কৃতরামায়ণ—লক্ষ্মণকবি সম্ভবতঃ বশিষ্ঠকৃত অধ্যাক্ষরামা-

---

\* অনন্ত রামায়ণেও শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রণের বঙ্গীয় অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন । এই  
রামায়ণের প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীনপুঁথি  
পাওয়া গিয়াছে ।

১১ । রামমোহনের রামায়ণ—এই অনুবাদ এককণ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এই  
পুস্তক সমাপ্ত হয় । রামমোহনের পিতার নাম বলরাম-  
রামমোহন ।

বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাড়ী নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্বতরীস্থ

মেটেরী গ্রাম । গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন ।  
এই বিগ্রহস্থলের নিকট খুব ভক্তির উৎসব চলিত বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন, “সে রামের  
দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি । কেহ নাচে, কেহ গায়, দেয় গড়াগড়ি ।” পিতার আদেশে  
কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন ও “কুপা করি আদেশ করিলা হনুমান ।  
রামাষণ রচি কর জীবের কলাপ ।” তদনুসারে—“রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মন্তকে ।  
সাজ হইল সপ্তদশ শতবর্ষি শকে ।” এই রামায়ণ সর্বত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থায়  
প্রাপ্ত ন। হইলেও মধ্যে মধ্যে অংশ আছে, বাহা আদিকবির প্রতিভার কণিকা-  
পাতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যথা—“আবাচে নবীন মেঘ দিল দরশন । যেমত  
সুন্দর শ্যাম রামের বরণ । ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব । যেমন রামের ধনু টঙ্কারের  
রব । রবে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে । যেমন রামের কপ সাধকের মনে । ময়ূর  
করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি । রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় স্থখী । সদা জলধারা পড়ে  
ধরণী উপরে । সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে । সরসিজ শোভাকর হৈল  
সরোবরে । যেমত শোভিত রাম সেবক অন্তরে । মধু আশে পয়ে অলি বাস করে  
মোদে । যেমত মুনির মন রাখবের পদে । জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায় । রাম  
পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায় । পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন । যেমত রামেরে  
ডাকে নামপরায়ণ । নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায় । যেমত রামের অঙ্গে জীব  
লয় পড়য় । অবিরত বৃষ্টিতে পৃথীর তাপ যায় । যেমত তপিত রামনামেতে জুড়ায় ।”  
(কিঙ্কিণী ক’ও) । কবির বিদ্রূপ শক্তি বেশ ছিল । ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায়  
ফিরিলে পত্নী কুঞ্জা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুত্রদের নিকট  
অনেক ভূষণ উপঢৌকন পাইবে । তৎপরিবর্তে লাক্ষ্মণের প্রহারে কুঞ্জ দেহ হাজ হইয়া  
পড়িল ও লক্ষ্মণ কুঞ্জা পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল । ওখন—“নারীগণ কহে ভূবা  
দেখাইয়া যা । কুঞ্জা কহে ভাতার পুত্রের মাথা খা ।” হনুমান লক্ষ্মণের পর বন্দী

অবস্থায় ঢাক ঢোল বাদ্য সমন্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন—“হুমুমান কন মোর বিবাহ না হয়। কল্যাণ করিবে রাবণ মহাশয় ॥ রাবণের কল্যাণ মোর গলে দিবে মালা। রাবণ স্বস্তর মোর ইন্দ্রজিত শালা ॥ চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর ॥ হুমুমান কন বিবাহের কাজ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই ॥” স্তম্বরাকাণ্ড। ইহা আধুনিক সংঘত রহস্তের ওষ্ঠাচাপা হান্ত নহে—ইহা ধূলিও কাদা হস্তে উচ ছো ছো শব্দমুখর সেকলে হান্তরস; রামমোহন কবির ভ্রাতৃপোত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বল্লোপাধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

১২। রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত রামায়ণ। রঘুনন্দনও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন ;

১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি

রঘুনন্দন গোস্বামী।

বর্দ্ধমান জেলাস্থিত মাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘু-

নন্দন নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত, বংশতালিকা এইরূপ—১। নিত্যানন্দ, ২। বীরভদ্র, ৩। বল্লভ, ৪। রামগোবিন্দ, ৫। বিশ্বস্তর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরীমোহন, ৮। রঘুনন্দন; কিশোরীমোহনের আর তিন পুত্র ছিল, বিশ্বকপ, সর্কর্ণ ও মধুসূদন, রঘুনন্দন তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন ও তিনি নিজে বহুবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের গুরু নাম গণেশ-বিদ্যালঙ্কার। ‘সেকাল আর একাল’, পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসিতেন; রামকমল-সেন মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দনের মাতার নাম উবা ও বিমাতার নাম মধুমতী ছিল; ‘রামরসায়ন’ বাতীত রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা বিষয়ক ‘শ্রীরাধামাধবোদয়’ নামক একখানি বড়গ্রন্থ আছে। রঘুনন্দনের অপরা নাম ভাগবত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরপর যে সকল রামায়ণের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, তন্মধ্যে ‘রামরসায়ন’ খানিই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বাস্তবিকের অনুসরণ করিয়াছেন, মধো মধো তুলসীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। রামরসায়নের অধ্যায়-বিভাগ ঠিক বাস্তবিকের পথে করা হয় নাই, তবে পূর্ববর্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানি বেশী শৃঙ্খল, সন্দেহ নাই। অধ্যায়গুলি এই ভাবে বিভক্ত হইয়াছে;—আদ্যাকাণ্ড ১২, অযোধ্যাকাণ্ড ৮, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১০, সুন্দরা

১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড ১৮ অধ্যায় । কবির রচনায় সংস্কৃতশব্দ অতিরিক্তমাত্রায় পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহা শ্রুতিকটু হইয়াছে, কিন্তু এরূপ রচনাও বিরল নহে—  
 “এধা রঘুবর, করিতে সমর, হুখেতে মগন হইয়া । অতি হুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা  
 কটিতে আঁটিয়া ॥ শিরে অবিকল, জটীর পটল, বাঁধিলা বেচিয়া বেচিয়া । পরিলা  
 বিকচ, কঠিন কবচ, শরীরে হৃদচ করিয়া ॥” রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪ অঙ্কের নিম্ন  
 কচিং লজ্জিত হইয়াছে, এই কাব্যে নানা ছন্দে লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে  
 আলোচনা করিব । কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সত্ত্বেও হিন্দীভাষার ছিটা ফোটা তাঁহার  
 কাব্যের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয় । কঁহিতু, কেণু, তি হ, তবহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের  
 শুণ্মূল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী প্রভাবের পতনোন্মুখ স্বরূপ উড়াইতেছে ।

কবি রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডে ককণবসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন । সীতা-  
 বর্জ্জন, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ রামরসায়নে স্থান পায় নাই । যে ঘটনা  
 মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ  
 জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়—তাহাদের শ্রুশানের উদ্দেশ্যে  
 ককণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়, বৈষ্ণবগণ সেদপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন  
 না । চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে গৌরান্দ্রপ্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই ।

বিয়োগান্ত দৃশ্য অঙ্কন করিতে হিন্দুকাব্যগণ সততই অনিচ্ছুক, এইজন্য নায়ক-  
 নাথিকার দুঃখময় জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রুশানের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের  
 মনে বাপা দেন না, কল্পনার স্বগরাজ্য গড়িয়া নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌছাইয়া ক্ষান্ত  
 হন, বিয়োগান্ত দৃশ্য কবির লিপি-কোণে শুণ্মূল দৃশ্যের আভা ধারণ করিয়া পাঠকের  
 ত্রঃখ ভুলাইয়া দেয় :

রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়ন গৃহপ্রতিষ্ঠিত ‘শ্রীরাধামাধব’ বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া-  
 ছিলেন—“করিলাম যেই রাম বিলাস বর্ণন । শ্রীরাধামাধবে ইহা করিহু অর্পণ ॥”

পূর্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া, দ্বিজ দয়ানামকৃত তরঙ্গীবধ, ফকির রাম-  
 কবিভূষণকৃত লঙ্কাকাণ্ড ( বাং ১০০৮ সালের পুঁথি ) ভিকণ গুরুদাস  
 কৃত আরণ্যকাণ্ড, দ্বিজ তুলসী কৃত “রায়বার” কাশীনাথ কৃত “বাস য়োর  
 লক্ষ্মীপুরে, আছি টেরে” “কাদনেমীর রায়বার” প্রভৃতি নানাবিধকবিকৃত  
 রামায়ণের বিচ্ছিন্নাংশ পাওয়া গিয়াছে ।



## মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি ।

রামায়ণকাব্যে আদিত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই ; কিন্তু মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়া রহিয়াছে । ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ও দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে যযাতি, নল ও দুয়ন্ত দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উপমন্যু, অর্কণি ও উল্লঙ্ঘ প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়াছেন ; মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইহারা প্রাচীন শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ কেন্দ্রস্থ কোন দেববিগ্রহের উল্লেখে নিম্নে ছোট ছোট অবাস্তব চিত্রের ভায়ে মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন মাত্র । মহাভারতের উপগল্পের অর্থাৎ নাট্য, পাঠক পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়বেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রের ভায়ে তাহারা একরূপ অদৃশ্য । জন্মেজয়ের ভায়ে অশ্বসন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশম্পায়নের ভায়ে ধৈর্য্যশীল বক্রা পরম্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুঁথি এত অপারমিতরূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন ; রুক্মিণী গল্পের অর্দ্ধভাগ শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই আবার সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমন্থনের কথা শেষ না হইতেই ঈজের লক্ষ্মীলুপ্তি হওয়ার বিবরণ,—এই গল্পের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা ।

একরূপ কাব্যে গল্প জোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা । জন্মেজয়কে দিয়া একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন । বাঙ্গালা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে ;—মূল-বহির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ ও চিন্তার উপাখ্যানের ভায়ে অনেক বাজে গল্প মহাভারতরূপ মহাবৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে ।

আমরা কাশীদাসের পূর্বে রচিত সঙ্কল্প-মহাভারত, ও কবীন্দ্ররচিত

( পরাগলী ) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং কাশীদাসের পূর্বগামিগণ।

নসরত সাহার আদেশে রচিত মহাভারতের সংবাদ পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞীবরসেনরচিত স্বর্গারোহণ পর্বের শেষপত্রে জানিতে পাওয়া গিয়াছে, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ কবি সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই মহাভারতই নিত্যানন্দ ঘোষ।

পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত ছিল; সঞ্জয় যেরূপ পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাভারত-অনুবাদ-কারক, নিত্যানন্দও পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই আধিকার করিয়াছিলেন। গৌরীমঙ্গলকাব্যে মুখবন্ধে কবি পৃথ্বীচন্দ্র লিখিয়াছেন—“অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।” নিত্যানন্দঘোষরচিত মহাভারতের নানা অধ্যায় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; কাশীদাসী মহাভারতের শেষ পর্বগুলিতে নিত্যানন্দেব রচনাই অনেক স্থানে অপহৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, আমরা পরে তাহা দেখাইব।

কিন্তু বোধ হয় নিত্যানন্দঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি

কবিচন্দ্র। তাঁহার সমসময়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়া-

ছিলেন, তাঁহার নাম অজ্ঞাত, কিন্তু উপাধি ছিল ‘কবিচন্দ্র’। পাদটীকায় তাঁহার রচিত ৪৬ খানি পুথির নাম নির্দেশ করা গেল \* ; এই সমস্তগুলিই একই ‘কবিচন্দ্র’ রচনা করিয়াছিলেন

১। অকুর আগমন, শ্লোক ১ সংখ্যা ১৫০, হস্তলিপি ১০৯০ বাৎ। ২। অজ্ঞা-  
মিলের টুপাখান, হঃ লিপি ১০৮৭ বাৎ। ৩। অর্জুনের দর্পচূর্ণ, শ্লোক ১০০, হঃ  
লিপি ১২৫৪। ৪। অর্জুনের বাধবাধা পালা, শ্লোক ১৩০, হঃ লিপি  
১১০১ বাৎ। ৫। উজ্জ্বলপালা, ২৩০,—১০৬১ বাৎ। ৬। উজ্জ্বলসংবাদ ৪০০,—  
১০৬১ বাৎ। ৭। একাদশীত্রতপালা, ২৫০,—১০৮৭ বাৎ। ৮। কংসবধ, ৪০০  
শ্লোক। ৯। কণ্ঠমুনির পারণ, ১২২০ বাৎ। ১০। কপিলামঙ্গল ২০০ শ্লোক।

বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । যদিও পুঁথিগুলি সংখ্যায় বেশী, তথাপি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সাধারণতঃ উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ;—(১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) ভাগবত । তিনি এই তিন গ্রন্থের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; এবং লেখকগণ সুবিধা বুঝিয়া ঐ তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পালা লইয়া পুঁথির আকারে নকল করিয়াছিলেন ; এইজন্ত উক্ত তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান এক এক খানি পুঁথিস্বরূপ হইয়া মূল গ্রন্থগুলিকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে । ভাগবতের অনুবাদ হইতে যে সকল উপাখ্যান স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকখানির শেষেই—ভাগবতায়ুত দ্বিজ কবিল্ল গায় ।” কিংবা “গোবিন্দমঙ্গল কবিচন্দ্রে বিরচন ।” এইরূপ ভণিতা আছে । এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পালার শেষেই “সপ্তম স্বন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায় ।” “পঞ্চম স্বন্ধের কথা শুনিতে অমৃত ।” এই ভাবে ভাগবতের স্বন্ধ নির্দেশিত

- 
- ১। কুন্তীর শিবপূজা, ১০০,—১০৭৯ বাং । ১২। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ১২৫,—১০৮৫ বাং । -৩। কোকিলসংবাদ, ১৪৫,—১২৬৬ বাং । ১৪। গেড়ু-চুরি, ২০০,—১২৮০ বাং । ১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান, ২৫০, শ্লোক । ১৬। দশম পুরাণ,—৫৫০,—১২১৪ বাং । ১৭। দাতাকর্ণ, ২০০ শ্লোক,—১০৬২ বাং । ১৮। দিবারাস, ১৮০, ১২৪৯ বাং । দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, ১১০৯ বাং । ২০। দ্রোপদীর স্বয়ম্বর, ১৬০ শ্লোক । ২১। ধ্রুবচরিত্র, ২১১,—১২৬৬ বাং । ২২। লক্ষ্মবিদায়, ১১৬৫ বাং । ২৩। পরাক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ১২৫ শ্লোক । ২৪। পারিজ্যোতহরণ, ২৫০, ১৫০ । ২৫। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪০০,—১০৭১ বাং । ২৬। ভবত উপাখ্যান, ৩০০,—১০৮০ বাং । ২৭। মহাভারত বনপর্ব, ২৯০,—১০৮৫ বাং । ২৮। উদ্যোগপর্ব, ঋগ্ভিত, ১৫০ শ্লোক । ২৯। ভীষ্মপর্ব, দ্রোণ পর্ব, ঋগ্ভিত । ৩০। কর্ণপর্ব, ২০০,—১০৮৩ বাং । ৩১। শল্যপর্ব, ১৭০,—১০৮৩ বাং । ৩২। গদ্যপর্ব, ঋগ্ভিত । ৩৩। রাধিকামঙ্গল, ২৩০—১০৯৭ । ৩৪। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ঋগ্ভিত । ৩৫। রাবণবধ, ৫২,—১২৪৬ বাং । ৩৬। রুক্মিণীহরণ, ২০০ শ্লোক । ৩৭। শিবরামের যুদ্ধ, ঋগ্ভিত । ৩৮। শিবিউপাখ্যান, ১৩১,—১২৪৭ বাং । ৩৯। সীতাইরণ, ৮০, ২২৬ বাং । ৪০। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ২৫০,—১২০৩ বাং । ৪১। অধ্যাক্ষ রামায়ণ, ঋগ্ভিত, ১১৫০ বাং । ৪২। অঙ্গদরায়বার, ১২৫৬ বাং । ৪৩। কুশ্ককর্ণের রায়বার, ২২ শ্লোক, ৪৪। দ্রোপদীর লজ্জানিবারণ, ঋগ্ভিত, ১১৯৪ বাং । ৪৫। দুর্কাসার পারণ, ঋগ্ভিত, ১১৯৩ বাং । ৪৬। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ।

আছে এবং ‘কবিচন্দ্র’ ব্যাসের আদেশে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পরিচিত ভণিতা দৃষ্টে স্বতঃই একজন কবিই সমস্ত পালাগুলি রচনা করিয়াছেন, ইহা মনে হয়। গোবিন্দমঙ্গলকাব্যের ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, কবিচন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি গোবিন্দমঙ্গল নামক ভাগবতের ভাষানুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; ইনিই সেই ‘কবিচন্দ্র’ বলিয়া আমাদের ধারণা। মহাভারত এবং রামায়ণও ‘কবিচন্দ্র’ সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই ব্যাসের আদেশের কথা ভণিতায় উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কথা এই যে কবিচন্দ্রের অপিকাংশ পুঁথি বর্দ্ধমান জেলার পাত্রসায়ের এবং তলিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে, সেই পুঁথিসমূহের অনেকগুলিরই হস্তলিপি বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিংবা ক্রিষ্টাব্দ পরবর্তী সময়ের। পাদটাকায় নির্দিষ্ট ৪৬ খানি পুঁথির মধ্যে ৩৪ খানির তারিখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৭ খানি বাঙ্গালা ১০৬১—১১০৯ সনের মধ্যে লিখিত। এক দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ অনতিদূরবর্তী সময়ের মধ্যে যে সমস্ত পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একই কথায় একই ভাবের ভণিতা দৃষ্টেও আমরা তত্তল্লিখিত ‘কবিচন্দ্রকে’ এক ব্যক্তি সাব্যস্ত করিয়াছি। এখন কবিচন্দ্রের একটু সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে;—“কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রম্যপতি। মেঘের দক্ষিণে ঘর পাওয়া বসতি।” ভাগবতায়ত বা গোবিন্দমঙ্গল ৭ম স্কন্ধ। ১০১ নং পুঁথি (পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা)। “চক্রবর্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধার, তন্তু স্নত কবিচন্দ্র গায়।” ভাগবতায়ত, ১:৩ নং পুঁথি। “শ্রীষতঃ গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে। সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র ভাষে। মহাভারতে, দ্রোণপর্ব, ১৩০৮ নং পুঁথি। ইহা ছাড়া অনেক স্থানেই ‘কবিচন্দ্রচক্রবর্তী’ এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্র (নিধিরাম কিষ্কা অসোধ্যারাম) এই ব্যক্তি নহেন, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়; মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্র কোন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মুকুন্দরাম তাঁহার আত্মীয়গণের কীর্তি স্পষ্টার সহিত বর্ণনা করিতে ক্রটি করেন নাই, অথচ কবিচন্দ্রের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই, শুধু কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । আমাদের উল্লিখিত মুনরামচক্রবর্তীর পুত্র কবিচন্দ্র-উপাধি বিশিষ্ট এই গ্রন্থকার শঙ্কর নামক

এক কবিব সহিত একত্র হইয়া দুই এক তদ্ববু শঙ্কর ।

খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন একরূপ দৃষ্ট হয় ; শঙ্কর নিজে একজন স্নকবি ছিলেন । তিনিও রামায়ণের এবং মহাভারতের অনেকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন ।

কাশীদাসের পূর্বে এইরূপ বহুবিধ মহাভারতব অনুবাদ বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল ; শুধু সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ নহে, কাশীদাস তৎপূর্ববর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোল্ল উপাখ্যান ও পলাবণেশের অনুবাদও হাতে পাটয়াছিলেন । ছুটিগার আদেশে শ্রীকর-নন্দী অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন, রাজেন্দ্রদাসপ্রণীত আদিপর্ব, গোপীনাথদত্তপ্রণীত দ্রোণপর্ব, গঙ্গাদাসসেন প্রণীত আদি ও অশ্বমেধপর্ব, এতদ্ব্যতীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কাশীদাসের পূর্বে হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল । কবিকঙ্কণ বেকরাম ও মাধবাচার্যের চণ্ডীর উপর তুলি বরিয়া তাহা সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাস তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে তুলিক্ষেপ করিতে পারেন নাই । কবিকঙ্কণ পূর্ববর্তী

অপরামর কবিগণের সঙ্গে কাশীদাসের তুলনায় সমালোচন ।

চণ্ডীগুলির ভাষা মাজ্জিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত পাঠ করিয়া প্রাপ্ত উপকরণ রাশিতে হস্ত দিয়াছেন ; যাহারা উপকরণ-রাশি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মুকুন্দরামের মুজুরি করিয়াছেন মাত্র ,

কবি প্রকৃতির মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শত্রু ঘণ্টা বাজাইয়া সেই উপকরণরাশিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কিন্তু কাশীদাসের সেরূপ গৌরব কিছুই নাই ; তিনি অনেক স্থলেই পূর্ববর্তী রচনাগুলির ভাষা একটু মার্জিত করিয়া পত্রশেষে “কৃষ্ণদাসামুজ্জ” কি “গদাধরাগ্রজ” ভণিতা দ্বারা স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন । কাশীদাসের মহাভারত যে অবস্থায় আমরা পাঠিতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা না করিয়া ধারাবাহিকরূপে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীদাসরচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে ; গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ব কাশীদাসের অশ্বমেধপর্বের সঙ্গে তুলিত হইলে যশঃসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই । পরাগলী মহাভারতে ও সঞ্জয় মহাভারতে একপাশে অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে সুন্দর ;—তথাপি ধারাবাহিকভাবে কাশীদাসের পুস্তকখানাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট,—কিন্তু বটতলার কুপায় কাশীদাসের রচনা পরিপূর্ণ ও মার্জিত না হইলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত হইত কি না বলা যায় না ।

এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক সমগ্র মহাভারত ও তাহার পর্ব কি উপাখ্যান বিশেষের প্রাচীন অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । নিম্নে প্রদত্ত তালিকার অনেক কবিষ্ট কাশীদাসেব পূর্ববর্তী ।

১। নসরতসাহের আদেশে সঙ্কলিত ‘ভারত-পঞ্চালী’ ॥ (ইহার উল্লেখ মাত্র, পাওয়া গিয়াছে) ।

২। সঞ্জয়ের মহাভারত,—

আদি হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্য্যন্ত ।

৩। কবীন্দ্রপরমেশ্বর রচিত মহাভারত ।—

আদি হইতে অশ্বমেধপর্ব ।

৪। বিজয় গুপ্তের মহাভারত ।—

এই দুই পুস্তক আমরা প্রকৃত পক্ষে এক

পুস্তক বলিয়াই জানি ।

- ৫। ছুটি খাঁর আদেশে রচিত  
শ্রীকরনন্দী প্রণীত— অখমেধ পর্ব ।
- ৬। দ্বিজ অভিরামের— অখমেধ পর্ব ।
- ৭। কৃষ্ণানন্দবসুর মহাভারত ( ১০৯৯ সনের লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ) ।  
শান্তিপর্ব ।
- ৮। অনন্তমিশ্রের জৈমিনি ভারত— অখমেধ পর্ব ।
- ৯। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত,— আদি, সভা, ভীষ্ম দ্রোণ, শল্য, জ্ঞান  
ও শান্তিপর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ।
- ১০। দ্বিজরামচন্দ্র খানের— অখমেধ পর্ব ।
- ১১। দ্বিজ কবিচন্দ্রের মহাভারত ।
- ১২। উৎকল কবি সারণের—আদি, সভা ও বিরাট পর্ব ।
- ১৩। ষষ্ঠীবরের ভারত ।
- ১৪। গঙ্গাদাস সেনের আদি ও অখমেধ পর্ব ।
- ১৫। রাজেন্দ্র দাস— আদিপর্ব ।
- ১৬। গোপীনাথ দত্ত— দ্রোণপর্ব ।
- ১৭। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত ।
- ১৮। কাশীরামদাসের মহাভারত ।
- ১৯। কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের—ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব ।
- ২০। ত্রিলোচন চক্রবর্তীর মহাভারত ।
- ২১। নিমাইদাসের মহাভারত ।
- ২২। দ্বৈপায়নদাসের দ্রোণপর্ব ।
- ২৩। বল্লভদেবের ভারত ।
- ২৪। দ্বিজ কৃষ্ণরামের অখমেধ পর্ব ।
- ২৫। দ্বিজ রঘুনাথ প্রণীত— অখমেধ পর্ব ।
- ২৬। লোকনাথ দত্ত প্রণীত—মহাভারতাস্ত্যর্গত নলোপাখ্যান ।
- ২৭। মধুসূদন নাপিত প্রণীত ঐ . . ঐ
- ২৮। বিক্রমপুর কাঠাধিযানিবাসী শিবচন্দ্রসেনপ্রণীত, মহাভারতের সাবিত্রী ও  
অপরূপা উপাখ্যানের অনুবাদ ।

২৯। ভৃগুস্বাম দাসের ভারত ।

৩০। দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাসের অশ্বমেধপর্ব ।

৩১। ভরত-পণ্ডিতের অশ্বমেধপর্ব ।

সঞ্জয় ও কবীন্দ্র-রচিত ভারত ও ছুটিখার আদেশে-রচিত অশ্বমেধপর্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । অপরাপর যে সকল মহা-ভারতের উপাখ্যান আমরা কালিদাসের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি, তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব ।

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, ঘণ্টীবর ও গঙ্গাদাসের রচিত মহাভার-  
তের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা  
রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব ।  
পাইয়াছি, সে গুলির হস্তলিপি কিঞ্চিদূর  
দুইশত বৎসর পূর্বের ; রচনা দোঁপিয়া বোধ হয়, এই সকল কবি অনূন  
৩০০ বৎসর পূর্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন ; ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রদাসকে  
আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি ; ইহার রচিত আদিপর্বের প্রায় সমস্ত  
অংশ পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর হই-  
য়াছে—ইহা কালিদাসের শকুন্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি  
কবির উৎপ্রেক্ষা-মণ্ডিত । ভাষাটি পূর্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে  
আবার এত প্রাচীন ; কিন্তু এই জটিল অপ্রচলিতশব্দবহুল রচনা কবির  
তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধকে পরাভূত করিতে পারে নাই—পুনাতন বন্ধুরগাত্র  
বনজ্রমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া বেক্রপ মধ্যে মধ্যে সৌরকিরণের আভা  
খেলিতে দেখা যায়, এই দ্বিশত বৎসরের জীর্ণ পুঁথির অদ্ভুত ভাষার  
মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপযুক্ত সুন্দর ভাব আমাদিগের দৃষ্টি  
আকর্ষণ করে ।

এই কাব্যে অননুয়া, প্রিয়স্বদা, বিদূষক প্রভৃতি কালিদাসের সমুদয়  
শকুন্তলা-উপাখ্যান ।  
চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে । দুয়ন্ত মৃগয়ায়  
চলিতেছেন, তাহার অনুচরদল সঙ্গে সঙ্গে ;



রাজধানীর সুন্দরীগণ গবাক্ষ হইতে,—“যার যার প্রিয়জন এই যান্ত্র বলি । প্রিয়-জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলী ।”—দুহন্ত মুনিব তপোবনে পৌঁছলেন, শকুন্তলা তখনও আসেন নাঠি, কিন্তু আসিবেন ; বহিঃপ্রকৃত দেন আসন্ন প্রেমলীলার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল, প্রকৃতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর—

“শীতল পবন বহে, স্নগন্ধি বহে বাস । ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥ মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব নড়ে । ভ্রমণের পদতরে পুষ্প সব পড়ে ॥ নব নব শাখা গাছি অতি মনোহব । খোপা খোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ নির্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পাড়ি আছে । লক্ষ লক্ষ বানর বেড়ায় গাছে গাছে ॥ হেন জস না দেখিবুম নাহিক কমল । হেন পদ্ম না দেখিবুম নাহিক ভ্রমর ॥ হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া । কেবা মোহ না যায স্ত সে বন দেখিয়া ॥” শেষের চার পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা ভট্টিকাব্যের একস্থলেন পুনরাবৃত্তি মাত্র । বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতিটি ছবির পশ্চাত্বেয়ের ছায়, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী ছবি ; তিনি যখন অনস্থ্যা ও প্রায়শ্চিদার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি “চিত্রের পুতলী যেন পটেতে লিখিল” বলিয়া পটপূর্ণ করিলেন । রাজা শকুন্তলাকে বনদেবী ভাবিয়া ফাডেনেও ১ ছায়া কথা বর্ণিতে লাগিলেন, শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, আবেশময়ী, সে সব শুনয়া—“হইলা লজ্জিত । বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিলা কিঞ্চিৎ ॥” তথা ঋষিকুমারী বন্ধদ্বাসে লজ্জা-রক্তি মগণেব বোধ হয় সব অংশটুকু ঢাকা পড়ে নাঠি, এজন্যই বোধ হয়, দুহন্ত বলিয়াছিলেন “কিমপি হি মধুরাণাং মণ্ডনং না বৃত্তনাম্ ।” তৎপর গন্ধর্ব্ব বিবাহ শেষ । বিনাহের বার্তা মুনকন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর শকুন্তলাকে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য জীবৎ পরিকল্পিত কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, তাহাদের সরল বাক্যাতুদী পাড়িতে পাড়িতে বাগ্মীকর “প্রভাতকালে সুইব কামিনীনাং” শ্লোকটি মনে হইয়াছে । দুহন্ত শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন । শকুন্তলার প্রতি দুর্কাসার শাপ, কব্ধমুনিব স্নেহ, পরে কাদিতে কাদিতে শকুন্তলা এক দিন তাঁহার আজন্মসঙ্গিনী সখীগণ, উদ্যানের তরুলতা ও কুরঙ্গশাবকের গলা

জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন । রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপ-  
মানিতা স্নন্দরীর অভিমানপূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,—রাজসভা হইতে  
তাড়িতা শকুন্তলা একাকিনী “কুহরি কুহরি কাদে তাপিত হইয়া।”—এই  
সব অংশ বেশ সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিশিষ্ট চিত্রকরের হস্তের অঙ্কনের গ্রায় স্নন্দর  
হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিতা হইয়াও পতিতে অনুরক্তা, যিনি  
নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরের গ্রায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে  
কাহাবও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার সাধ্য নাই, শকুন্তলা হৃদয়স্তদেবের  
পূজক ; হৃদয়স্তেব মুখে অমৃণোচনা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়—  
“শকুন্তলা বোলে শুন, নিষ্ঠুর না বোল পুনঃ, প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে । বাইব তোমার  
মনে, কোন ছুৎ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে ॥ ভাবি চাহ মনে মনে,  
চন্দ্রশ্লিপান বিনে, রুষ্টিজলে না জীয়ে চকোর । মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু  
বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর ॥”

এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্ত  
নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, কাশী-  
রচনার দোষভাগ । দাসের শকুন্তলার শ্লোকসংখ্যা ১৭৮, রাজেন্দ্র-  
দাসের শকুন্তলায় ১৫০০ শ্লোক । ইহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দুইটি বড়  
অধ্যায়ের তুল্য । আমরা এরূপ বলি না যে, রাজেন্দ্রদাসের কবিতা সর্বত্রই  
সরস ও স্নন্দর, ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষা  
হইতে যতটা বিভিন্ন, সেই সময়ের কথা বার্তা, হান্ত পরিহাস এবং রুচিও  
বর্ত্তমান সময় হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, পাঠকালে স্থলে স্থলে পাঠকের  
বিরক্তি জন্মিতে পারে ।

বামাঘটের অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা ষষ্ঠীর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের  
বিষয় জানাইয়াছি ; ষষ্ঠীর রচিত স্বর্গারোহণ  
ষষ্ঠীর স্বর্গারোহণ পর্ব । পর্ব আমার নিকট আছে । এবং উহার শেষ  
পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের কথা উল্লিখিত দেখিয়াছি ।

ষষ্ঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর, বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাঁকজমক নাই, মধ্যে মধ্যে ছুই একটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা—“স্বর্ণ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী । পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ উত্তরে দক্ষিণে বহে স্তরেস্বরী-ধার । পৃথিবী পরেছে যেন মালতীর হার ॥” এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের । “মন্দাকিনী ভাতি নগোপকর্থে । মুক্তাবলী কণ্ঠগতের ভূমেঃ ॥” মনে পাড়য়াছিল, কিন্তু কবি বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই ।

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব ও অশ্বমেধপর্ব পাইয়াছি ;  
 আদিপর্বে তাহার রচিত দেবদানী-উপাখ্যান  
 গঙ্গাদাসের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব ।  
 বেশ সুন্দর ; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতা-  
 শালী ; কাশীদাসের রচনা বটতলা কর্তৃক

মার্জিত না হইলে গঙ্গাদাস সেন প্রায় তাহার সমকক্ষ হইতেন,—  
 অনেক স্থলে বেশ সমকক্ষতা চলিতে পাবিত ; গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ-  
 পর্ব কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব হইতে আকারে বড় । রচনার কিছু  
 নমুনা দেওয়া যাইতেছেঃ—“যৌবনাথ পুরী ভীম দেখিলেক দূরে । স্বর্ণপূর্ণিত ঘট  
 প্রতি ঘরে ঘরে ॥ বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সন্মর । দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর ॥  
 অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত । সহস্র কিরণ বেড়ি থাকে চাবিভিত ॥ যুগ আরোপিত  
 পথে আছে সাবি সাবি । যজ্ঞ ধূমে অন্ধকার গগন আববি ॥ নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয়জয়  
 ধ্বনি । বেদধ্বনি নৃপুংসধ্বনি এই মাত্র শুনি ॥ মণ্ডপ প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর । পুরী দেখি  
 হরিষ হইল বৃকোদর ॥ ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত । ডাল সনে পুষ্পভরে হয়েছে  
 নমিত ॥ গন্ধে অমোদিত সব স্থললিত ভ্রাণ । নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্মাণ ॥  
 ধৰ্ম্মর পাঞ্জেলা যত ফলিত সঘন । দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন ॥ বিদারিত  
 দাড়িষে বেষ্টিত পুরীধান । পূণ্যবস্ত্র দেখি যেন দেবতার স্থান ॥ লেখু জাহ্নবী অব  
 নারাজার ফুল । অশোক চম্পক লজ্জ কেশর বকুল ॥ স্বর্ণ কেতকী আদি জাতি দ্রুম  
 লতা । মালতি চম্পক কুম্ভ লতিক, পুষ্পিতা ॥ পশুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া করয়ে সকলে ।  
 কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে ॥”

উদ্ধৃতাংশ ও এইরূপ নানা অংশের সঙ্গে কাশীদাস কবির সেই

সেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে, গঙ্গাদাস তাঁহার নিকট থর্ক হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না ।

গোপীনাথদেবের দ্রোণপর্ব্বে আমরা পাইয়াছি । ইহাতে উক্ত পর্ব্বের অন্ত্য্য বিষয়ের সহিত বহুপত্র গোপীনাথের দ্রোণপর্ব্ব । জুড়িয়া দ্রোপদী যুদ্ধ, বর্ণিত হইয়াছে ; অভিমত্ব্যবধে ক্রুদ্ধা রমণীদল কুবক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রোপদী, সেনাপতি । ঘনরামের কাব্যে আমরা কানাড়াব যুদ্ধ-বিবরণ পড়ি-  
যাছি ; ইতিহাসে দুর্গাবাট ও লক্ষ্মীবাটএর নাম পাঠকমণ্ডলীর নিকট অবদিত নহে, আমরা কালী-দেবীর রণবঙ্গিনী মূর্ত্তি গড়িয়া আজও পূজা করিয়া থাকি, সুতরাং মহাভারতেব দ্রোপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই ; কিন্তু যে দেশের পুৰুষই ললনার স্থায় কোমল, সে দেশের ললনা স্বপ্নস্থষ্ট পুৰুলীর মত আঙ্গিনার রোদ্রে ও বাতাসেই বিলীন হইয়া নাট্যাব কথা ;—যুদ্ধক্ষেত্রের ত কথাই নাই । বোধ হয় কাশীদাস বাল্গা-  
লীন নাড়ী টেব পাঠিয়াই দ্রোপদী-যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । গোপীনাথদেবের দ্রোপদীযুদ্ধে কোন আশ্চর্য্য কবি-  
ত্বের চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কাশীদাসের ভণিতা দিয়া তাহা কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া দিহো কোন সন্মালোচক তাহা অল্প কবির লেখা বলিয়া ধরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পুস্তকজের দুই একটি পদ পারিবর্ত্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন ।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের  
কাশীদাসের জীবনী । শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ; এই কবির জীবন সম্বন্ধে  
আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে পারি-  
য়াছি । কাশীরাম বর্দ্ধমানজেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিদ্ধি-  
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এই গ্রাম ব্রাহ্মণীনদীর তীরস্থ ; কাশীরামদাসের

প্রপিতামহেব নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব ; কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর । এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাঠপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা ;—সে আঙ্গ ২৬৩ বৎসরের কথা । গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; সুতরাং কাশীদাস নুনানিধিক ৩০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন ; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন । রামগতিত্ৰায়দত্ত মহাশয় বলেন, কাশীরামদাসের পুত্র আপন পুত্রোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৫ সালের লিখিত ; বলা বাহুল্য এই দানপত্রোক্ত সময় আমাদের মতের অনুকূল ।- সিন্ধিগ্রামে “কেশে-পুকুর” নামক একটি পুকুর আছে ও তথাকার লোকগণ “কাশীর ভিটা” বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন ।

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন ; রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ-পাঠিকারী পাণ্ডিত আসিতেন, তাহাদের মুখে তিনি মহাভারত-প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অনুরক্ত হন, এই অনুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ । সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসী মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুবাদ নহে, এই জন্ত কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে । নানা পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুবাণ শুনিবার কথা লিখিয়া থাকিবেন । কুত্বিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুবাণ

\* ১৩০৭ সালের ২য় সংখ্যার পঞ্চিৎপত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় একখানি কাশীদাসের বিরাটপর্বের বিবরণ দিয়াছেন—তাহার শেষে লিখিত আছে—“চন্দ্র বাণ পক্ষ ষত্ব শক হুনিচয় । বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কর ।” সুতরাং .৫২৬ শকে ( ১০১১ বাং সম ) কাশীদাস বিরাটপর্ব সমাধা করেন ।

শুনিয়া গীতরচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ভণিতার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে পুঁথিলেখকগণও অনেক কথা যোজনাকরিয়া থাকেন।

“আদি সভা বন বিরীটের কতদূর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।”—

কাশীদাস সমস্ত মহাভারত  
লিখিয়াছিলেন কি না?

এই একটি চলিত বাক্য আছে। কেহ কেহ

অনুমান করেন, স্বর্গপুর অর্থ কাশীধাম ;

কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে

উক্ত মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ বাক্য সত্ত্বেও, কাশীরামদাসই সমস্ত মহাভারত অনুবাদ করেন এই মত সমর্থন-অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণিতা কাটিয়া যদি কাশীদাসী মহাভাবতে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনামূল্য অনেক স্থলেই এককপ ; জয়গোপালগণের প্রসাদে কাশীরামদাসের কিছু কাস্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, এই নবযুগের প্রভাব চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাসী-মহাভারতের সর্বত্র তাঁহার ভণিতা দৃষ্ট হয় ;—যাহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুঁথিগুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্তী পুঁথি-লেখকগণ সর্কাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে ক্রমে বাদ দিয়া যান ; এই ভাবে কৃত্তিবাসী-রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দের লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতের শৈল্য ও মারীপর্কে ভৃগুরামদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গদাধরলিখিত

পুঁথি আমরা দেখি নাই—তাহাতে যদি সৰ্ব্বত্রই কাশীরামদাসের ভণিতা থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহা হইলে “আদি সভা বন বিরাটের কত দূর ।”—ইত্যাদি শ্লোকের মুস্বীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিতে কিংবা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না ।\*

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূৰ্ব্ববর্তী মহাভারতগুলির রচনা কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেষরূপ সাদৃশ্য অপরাপর অমুবাদের দৃষ্ট হইবে, আমরা না বাছিয়া যথেষ্ট ভাষার ঐকা । কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি ।

#### যযাতির পতন ।

“অষ্টক বোলেস্ত তুমি কোন মহাজন ।

পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন ।

অগ্নি প্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ ।

কোন পাপে অধর্মে হইল স্বর্গপাত ।

\* \* \* \* \*

যযাতি আমার নাম কহি শুনি তোক ।

নহব নৃপতিহৃত পুরুর জনক ।

করিলে স্রুতি নর যেবা নরে কয় ।

নরকেতে বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয় ।

কহিলুম ইন্দ্রের ঠাই কথা সকল ।

পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুই পড়িল ভূমিতল ।”

সঞ্জয়কৃত ভারত, আদি ।

\* পূৰ্ব্ব পৃষ্ঠার পাদটীকা দৃষ্টে বোধ হয়, যেন কাশীদাস বিরাটপর্ব নিজেই শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্বের শেষে এই দুইটি ছত্র পাওয়া যায়,—“ধন্য হ’ল কায়স্থকুশেতে কাশীদাস । তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ।” এই কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহাতে আমাদের সম্বন্ধে দৃঢ়ীভূত করিতেছে ।

“অট্টক বলিল তুমি কোন মহাজন ।  
 কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥  
 সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার ।  
 স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার ॥  
 রাজা বলে নাম আমি ধরি যে বযাতি ।  
 পুরুষ জনক আমি নহমে উৎপত্তি ॥  
 পুণ্যবান্ জনের করিলাম অমাগ্নি ।  
 সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য ॥”

কাশীদাস, আদিপর্ব্ব ।

### কুষ্মের ক্রোধ ।

ই বলিয়া সাতাকিরে করি সম্বোধন ।  
 হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন ॥  
 সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম ।  
 চারিপাশে ক্ষুরতেজ যেন কালঘম ॥  
 রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে ।  
 ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে ॥  
 পৃথিবী বিদার হএ চরণের ভারে ।  
 ক্রোধদৃষ্টিএ যেন।জগত সংহারে ॥  
 কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল ।  
 ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল ॥  
 পদভরে কুষ্মের কম্পিত বহুমতী ।  
 গজেন্দ্র ধরিতে যেন যাএ মৃগপতি ॥  
 সজ্জমে না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর ।  
 নির্ভয়ে বোলেস্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥  
 আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার ।  
 তোম্কার প্রসাদে মুঞি তরিমু সংসার ॥



তোক্ষার চক্রেতে মুক্তি যদি সংগ্রামেতে মরি ।

ত্রিভুবনে রহিবে কীৰ্ত্তি পরলোকে তরি ॥”

\* কবীন্দ্র ( পরাগলী )—ভাবত, ভীষ্মপর্ব ।

“অস্তির হইলা হরি কমললোচন ।

লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥

ক্রোধে রথচক্রে ধরি সৈন্তের সাক্ষাৎ ।

ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥

গজেন্দ্র মাগিতে যেন ধায় মৃগপতি ।

বৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বশুমতী ॥

চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্বজন ।

ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥

সম্মন না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর ।

নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥

আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে ।

মারক আমারে যেন দেখে সর্বলোকে ॥

শীঘ্র এস বৃষ্ণ মোরে করহ সংহার ।

তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥

তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব ।

দিবা বিমানেনে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥”

কাশীদাস, ভীষ্মপর্ব ।

বৃষকেতুর পরিচয় ।

“আকর্ণ পুরিয়া ধনু টঙ্কার করিল ।

উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল ॥

অতি শিশু দেখি তুঙ্গি বীর অবতার ।

মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার ॥

\* ১৪৩ পৃষ্ঠায় এই অংশ একবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই স্থল একটু স্বতন্ত্র,।  
দুইখানি ভিন্ন পুঁথি দৃষ্টে এই দুই প্রকার পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

কাহার পুত্র তুমি কিবা তোমার নাম ।  
কোন দেশে বসতি কিবা মনস্কাম ॥  
কি লাগিয়া নেও যোড়া কারণ কিবা তার ।  
কি নিমিত্ত কর' মোর সৈন্তের সংহার ॥

\* \* \* \* \*

রাজার বচন শুনি হাসে কুমার ।  
পরিচয় লও অহে নৃপতি আকার ॥  
যাহার উদয়ে হএ তিমির নাশ ।  
বাহার উদয়ে হএ জগত প্রকাশ ॥  
মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর ।  
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্ধর ॥  
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী ।  
যার বলে দুৰ্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী ॥  
তার পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক ।  
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোকে ॥”

শ্রীকরনন্দীর (ছুটিবার আদেশে রচিত)

ভারত, অশ্বমেধপর্ব ।

“বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর ।  
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্ধর ॥  
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ ।  
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন ॥  
যুবনাথ বচনেতে বৃষকেতু বীর ।  
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর ॥  
রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে ।  
জনম হইল যার কুন্তীর গর্ভেতে ॥  
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু ।  
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির-যজ্ঞহেতু ॥”

কাশীদাসী মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব ।

গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ ।

“কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বৃন্দিয়া ।  
 উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥  
 পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা ।  
 বিচিত্রবীৰ্য্যের বধু রাজার বনিতা ॥  
 দেখে কৃষ্ণ এক শত পুত্র বহাবল ।  
 ভীষ্মের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥  
 দেখে কৃষ্ণ বধু সব উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ।  
 দেখিতে না পায় জারে স্বর্গ্য আর চান্দে ॥  
 শিরীষ কুসুম জিনি হুকোমল তনু ।  
 জাহার দেখিয়া রূপ রথ রাখে ভানু ॥  
 হেন সব বধুগণ আইল কুরুক্ষেতে ।  
 মুক্তকেশ হীনবেশ দেখেহ সাক্ষাতে ॥  
 ঐ দেখে নৃত্য করে নারী পতিহীনা ।  
 প্রতি শব্দ শুনি যার নারদের বীণা ॥  
 পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি ।  
 ঐ দেখে নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥  
 সহিতে না পারি শোক শাস্ত্র নহে মন ।  
 মাএ এড়ি কোথ গেল পুত্র দুর্ঘ্যোজন ॥  
 ওহে কৃষ্ণ হের দেখে পুত্রের অবস্থা ।  
 জাহার মন্তকে ছিল হৃবর্ণের ছাতা ॥  
 নানা অভরণে ব্যার তনু সুশোভন ।  
 সে তনু ধুলায় ঐ দেখে নারায়ণ ॥  
 সহজে কাতর বড় মাএর পরাণ ।  
 সুপুত্র কুপুত্র মাএর একুই সমান ॥  
 এককালে এত শোক সহিতে না পারি ।  
 কি মতে বুঝাই মোরে মুকুন্দ মুরারি ॥  
 পুত্রশোক শেল জেন বাজিছে হিয়ায় ।

দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয় ॥  
 সংসারের মধ্যে শোক আছিএ যতেক ।  
 পুত্রের সমান শোক নহে পরতেক ॥  
 গর্ভধারী হয়্যা জেবা কর্যাছে পালন ।  
 সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম ॥”

নিত্যানন্দ ঘোষ, শ্রীপর্ব ।

গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ ।

কুঙ্কর প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া ।  
 উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥  
 কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা ।  
 বিচিত্রবীর্যের বধু রাজার বনিতা ॥  
 দেগ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল ।  
 ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥  
 দেখ কৃষ্ণ বধুগণ উচ্চৈঃস্বরে কঁাদে ।  
 দেখিতে না পায় দেখ কতু হুয়া চাদে ॥  
 শিরীষ কুম্ভ জিনি হুকোমল তনু ।  
 দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥  
 হেন সব বধুগণ আইল কুরুক্ষেত্রে ।  
 ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥  
 ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধু ।  
 মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥  
 ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা ।  
 কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥  
 পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি ।  
 ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥  
 সহিতে না পারি শোক শাস্ত নহে মন ।  
 আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্ঘোষন ॥

হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি ।  
 বাহার মন্তকে ছিল হুবর্ণের ছাতি ।  
 নানা আভরণে যার তনু হুশোভন ।  
 সে তনু ধুলায় ওই দেখ নারায়ণ ।  
 সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ ।  
 হুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ।  
 এককালে এত শোক সহিতে না পারি ।  
 বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি ।  
 পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে রুদয ।  
 দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয় ।  
 সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতক ।  
 পুত্রশোক তুলা শোক নহে তার এক ।  
 গর্ভধাবী হয়ে যেই করিছে পালন ।  
 সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ॥”

কাশীদাস, স্ত্রীপর্বা ।

এইরূপ সাদৃশ্য সর্বত্রই দেখাইতে পারা যায়, মোটের উপর কাশীদাসই  
 শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অংশবিশেষের তুলনা করিলে সর্বত্র তাঁহার এই গৌরব রক্ষিত  
 হয় না । অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই  
 কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্য, এবং সেই সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব এবং  
 তৎপরবর্তী অধ্যায়গুলিতেই সূক্ষ্মাপেক্ষা বেশী । নিত্যানন্দঘোষের রচনা  
 বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জ্জন, পরিবর্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী  
 মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ; কাশীদাসের সৌভাগ্যক্রমে  
 ছায়ায় নিত্যানন্দ ঘোষের বশঃ বিলীনপ্রায় । প্রবৃত্ততত্ত্ববিদগণের ওকা-  
 লতী-কলে বোধ হয় এত দিন পরে বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকটে  
 কবি নিত্যানন্দ সুবিচার পাইবেন, এবং আশা করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে  
 তমাদী সূত্র উথিত হওয়ার কোন আশঙ্কা দাঁড়াইবে না । তবে একথাও

এখানে বলা উচিত যে, নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীদাসের আদর্শ হইলেও, সেই মহাভারতখানিই যে মৌলিক অনুবাদ, তাহা স্বীকার্য্য নহে ।

বাঙ্গালা ভাষা পূর্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অকুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ কাশীদাসের ভাব ও ভাষা ।

নয়নজল ও শ্রোণের উষ্ণতা দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন ; কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া শকাড়হরের প্রতি রুচিশ্রবলতাহেতু বাঙ্গালাসাহিত্যে প্রেমের প্রভাব তিরোহিত হইল ; সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমাশি দ্বারা ভাষা সুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব নিপীড়িত এবং নিষ্কর্জীব হইয়া পড়িল । কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যবর্তী ; তাঁহার কাব্যে পূর্ববর্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপিপ্ৰণালী এবং মার্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয় । শ্রেয়োক্ত বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ নিপুণ ও ভাবী যুগের অধিকতর নিকটবর্তী ।—“চলং চপলা রূপে কিবা বরকায়া ।” “বিকর কমল, কমলাংঘ্রিতল,” “নিকলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি গীনঘনস্তনী,” প্রভৃতি সংস্কৃতের টুকরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার ভাষা পড়িয়া আছে, ও ‘মুখরুচি, কত শুচি’ ‘সিংহগ্রীব, বকুজীব’, ‘অগ্নিআংস্ত, যেন পাংস্ত’—প্রভৃতি পদে ভাবী অনুপ্রাসপ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে । অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা ;—

“মুখ তুলি বৃকোদর বেই ভিতে যায় । পলায় সকল সৈন্ত তুলা যেন বায় ॥  
সিকুঞ্জল মধ্যে যেন পর্বত মন্দর । পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর ॥  
মৃগেন্দ্রে বিহবে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে । দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে ॥  
দণ্ড হাতে বম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র । খেদাড়িয়া লৈয়া বায় সব নৃপবৃন্দ ॥  
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্ত যায় খেদি । দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী ॥” আদিপর্ব ।

লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীক অর্থ-লোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,—উহা একখানি যথার্থ ছবি । কাশীরামদাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক ; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন-

পর. সৈন্ত বর্ণনা—বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, স্মৃতরাং কবি ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য ;—“যে দিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে । পট্টায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্বদিকে । উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল । পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল । হড়াহড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পশ্চ । একে চাপি আর যায় বেট বলবন্ত । রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার । অবস্থা হইল যত কি কব তাহার । ঠেলা-ঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্ত মৈল । স্থানে স্থানে পর্বত আকার শব হৈল । একপদ কাটা কারু, কাটা দুই ভুজ । বৃকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুজ । সর্বদা বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার । মুক্তকেশনগ্ন দেহ কাণ কাটা কাব । আড়ে, ওড়ে, ঝাড়ে, ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া । জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া । ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উত্তরড়ে । দ্বিজ দেখি ক্ষত্রিয় লুকাই ঝাড়ে ঝোড়ে । দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ ভয় । দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয় । ধর্ম্মব্রাহ্মণ ফেলিল হাতের গদা শূল । মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল । তুলিয়া লইল চন্দ্রদণ্ড কমণ্ডল । ধর্ম্মব্রাহ্মণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল । প্রাণভরে কেহ গিয়া ডুবি রাহে জলে । কেহ কাঁটাবনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে । মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে । ছুর ছুরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে ॥”—কাশীদাস,—আদিপর্ব ।

মহাভারতের আদাস্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত । এক এক খানি পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের স্থায় ; পড়িতে পড়িতে জগৎপূজা, যুদ্ধরীর, ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকগণের মূর্তি মনশ্চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় ; তাঁহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্ত যেন আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে, এবং এই নিঃসঞ্চল, অর্দ্ধভুক্ত, পররোধকটাক্ষে পাণ্ডুরতাপন্ন বাঙ্গালীজাতিও ক্ষণকালের জন্ত পৃথিবীজয়ী, উচ্চ আকাজক্ষাশালী, অভিমানক্ষীত পূর্ব-পুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব্ব অমৃতত্ব করে । কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই মহাভারতপ্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জুনতুল্য কীর্্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার নাম এখন

হাতহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত । বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমুদ্র হইতে এখনও ‘শ্রীকৃষ্ণচরিত্র’, ‘রৈবতক’, ‘কুরুক্ষেত্র’ প্রভৃতি অসংখ্য বৃদ্ধ উৎখিত হইয়া প্রাচীনভাবে অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন করিতেছে । এই কাব্য লইয়া হিন্দুস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আরও কত কাবি, বীর ও চিত্রকর যশস্বী হইবেন. কে বলিতে পারে ?

কাশীদাস মহাভারত ছাড়া আরও তিন খানি ছোট কাব্য রচনা করেন :—১ । স্বপ্নপর্ব, ২ । জলপর্ব, কাশীদাসের অপবাপব কাব্য । ৩ । নলোপাখ্যান ।

কাশীদাসের অপর দুই ভ্রাতা,—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ গদাধরদাস উভয়েই স্নকবি ছিলেন । কৃষ্ণদাস অতি বৃষ্ণদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস’ । ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । এই গোপালদাস অজন্ম কৌমার ব্রত পালন করেন এবং ইহারই আদেশে কৃষ্ণদাস ‘শ্রীকৃষ্ণবিলাস’ নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন । কৃষ্ণদাস তাঁহার গুরু নিকট হইতে ‘শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; ( “সেই কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব নাম ধুঞা । আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞা ।”—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ) । এই “কৃষ্ণকিঙ্কর”-নামেও তিন স্বীয় গ্রন্থেব অনেক স্থলে ভণিতা দিয়াছেন । তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধর তৎসম্বন্ধে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছিলেন , “প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব । বচিল কৃষ্ণে গুণ অতি মনোহর ।” শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচনা প্রকৃতই অতি মনোহর হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্য-তীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি উদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্ধে ১৩০৭ সনের ৪র্থ সংখ্যার পরিষদ্পত্রিকায একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন ।

কনিষ্ঠ গদাধর দাসের “জগন্নাথমঙ্গল” একখানি উপাদেয় পুস্তক । এই পুস্তকের ভূমিকাটিতে ঐতিহাসিক অনেক নূতন তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

গদাধরের ‘জগন্নাথমঙ্গল’ ।



“ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রযাদী নাম । তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধিগ্রাম ॥  
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে । নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥ তাহাতে  
শ্যামলাগোত্র দেব যে দৈত্যারি । দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ দুবরাজ  
সুবরাজ তাহার নন্দন । দুবরাজ পুত্র হইল নিলএ যতন ॥ তাহার তনয় হয় নাম  
ধনঞ্জয় । তাহাতে জন্মিল স্তন এ তিন তনয় ॥ রঘুপতি, ধনপতি দেব, নরপতি । রঘুপতির  
পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ প্রসন্ন রবু, দেবেশ্বর, কেশব, স্কন্দব । চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে  
শ্রীবৎস ॥ প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব । অনু সূধাকর মধুরাম যে রাঘব ॥ সূধাকর  
নন্দন এ তিন প্রকার । ভ্রমোদ্র কুমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস ‘শ্রীকৃষ্ণ  
কিষ্কর’ । রচিল। কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে ।  
রচিল। পাঁচালী ছন্দে ভরত পুরাণে ॥ জগত মঙ্গল কথা করিলা শ্রবণ । তৃতীয় কনিষ্ঠ  
দান গদাধর দাস ॥...নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি । পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে  
নিতি ॥ স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র । কত ব্রহ্ম পুরাণের প্রভুর চরিত্র ॥ না বুঝয়ে  
পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে । তেহারে রচিলাম পাঁচালীর মতে ॥ ইহা শুনি কৃতার্থ হইব  
পঞ্চ ( ৭ ) জন । ইহলোকে স্থখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥ সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চমতে  
( ১৫৬৭ শক ) । সহস্র পঞ্চাশ সন ( ১০৫০ বাং সন ) দেখ লেখা মতে ॥ মহালয়া তপী  
হয় বেরিজ সহর । উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর ॥ মাগনপুরেতে ঘর তাহার ভিতব ।  
বিষেখ্য বাটো চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥ দুর্গাদাস চক্রবর্তী পড়িল পুরাণে । শুনিয়া পুরাণ  
বদ্ধ হইল মনে । নাহি সন্ধিমান মোর না পটি ব্যাকরণ । আমি অতি মৃদুমতি কবি  
রচন ॥”

সে পুঁথি \* হইতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি  
১১৬৫ সালের । এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ২৫০০ । লেখক শ্রীঅনুপ-  
চন্দ্র ঘোষ, “সাত ঝোঞা পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর ॥”

‘জগৎমঙ্গল’ কাশীদাসের কনিষ্ঠের উপযুক্ত কাব্য, ইহার রচনা বৈষ্ণব  
স্কন্দর, রচনার ১০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের পরেও ইহা পুনশ্চ লিখিত  
হইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, এতদ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে জগৎ-  
মঙ্গলের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । সৈ যাহা হউক, ১০৫০ সালে এই

পুস্তক রচনা হয় এবং তৎপূর্বেই কাশীদাসের মহাভারত রচিত হয়, উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম ।

কাশীদাস নিজে কবি, তাঁহার অপর দুই সহোদর কবি, কিন্তু এই স্থানেই প্রতিভাশালী পরিবারের কবিত্ব-বংশের  
নন্দরাম দাস ।

শেষ নহে । কাশীরামদাসের পুত্র নন্দরাম-  
দাস ১৫০০ শ্লোকে মহাভারতের দ্রোণপর্বটিকে অনুবাদ করিয়াছিলেন ;  
যে হস্তলিখিত পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১১৬০ সনের লেখা ।  
“লেখক শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী, সাকিন বেলা ।”

যদি কাশীদাসের কৃত দ্রোণপর্বের অনুবাদটি থাকিত, তবে তৎপুত্র  
পিতৃবংশের লোপ-চেষ্টায় এই অনুবাদকার্যে  
কাশীদাসী ভারত কোন্ কোন্  
কবির রচনা ।  
আর একটি কথা এই দেখা যায় যে, কাশী-  
দাসের দ্রোণপর্ব এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ব,—একই গ্রন্থ । আমরা  
যে পর্য্যন্ত উভয় অনুবাদের রচনা অনুসরণ করিতে পারিলাম, তাহাতে  
কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলাম না,—এই কারণে এবং  
পূর্বোল্লিখিত অপরাপর নানা কারণে মনে হয় যেন, কাশীদাস সমগ্র  
মহাভারতের অনুবাদটি সঙ্কলন করিয়া যাইতে পারেন নাই । কাশীদাস,  
গদাধর দাস এবং নন্দরাম দাস এই তিন জনের চেষ্টায় যে মহাভারতের  
অনুবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ কাশীদাসের ভাণ্ডার বজায়  
রাখিয়া উহা “কাশীদাসী মহাভারত” নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।  
যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি একভাবাত্মক ছন্দঃ ও বৈষম্যহীন  
সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ  
করিলে প্রতীয়মান হইবে “আদি, সভা, বন, বিরাট” এই তিন পর্বে যে  
সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি ও শব্দব্যাকারের পরিচয় আছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে  
তাহার ‘সমূহ অভাব । “দেখ বিজ্ঞ মনসিঃ” প্রভৃতি অংশের শব্দ সরসতা

একঘেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের সহিত এই কাব্যের সম্পর্ক বন্ধন করিয়াছে । পরবর্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ নিত্যানন্দ ঘোষ, বিজ় রবুনাথ \* এবং অপূরণ পূর্ববর্তী মহাভারত-রচকগণের রচনা হইতে অপহৃত হইয়াছে । কাশীদাসের মহাভারতের যদি কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পূর্বাংশেই পর্য্যবসিত ।

রামেশ্বরনন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনু-বাদ করেন ; যে হস্তলিখিত পুঁথি পাঠিয়াছি, রামেশ্বরনন্দীর মহাভারত ।

তাহা ১০০ বৎসরের প্রাচীন ; এই কবির রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত স্বর্গ মর্ত্য লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যপল্লব আছে, ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ—এই জন্ত রামেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্তী কবি বলিয়া মনে হয়,—শকুন্তলার রূপ বর্ণনা—“চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয় । চাঁচর তাহাতে নাই এইত বিশ্ময় । চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নিশ্চিত । তাহাতে কলকহেতু নহে পরতীত । অরুণ তিলক ভালে হেন লএ চিতে । সর্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে । ভুরুগুণ নিরমিল কাম শরাসনে । কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে । কুবলয়দলে কৈল আঁখি নিরমাণ । চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান । বিশ্বকল জিনিয়া অর হেন দেখি । ঈষৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষি ।” একবার উপমা দিয়া আবার সে উপমাটিকে ধিক্কৃত করা, ‘অলঙ্কার শাস্ত্রের পত্র লইয়া এতদ্বিধ কৌতুকপূর্ণ ক্রীড়া’ কাশীদাসের পরবর্তী যুগের বিশেষত্ব ।

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব-বর্ণনার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা বিশুদ্ধ । যথা,—

“সম্মুখে দেখিলা রাজা মুনির আশ্রম । নানা বৃক্ষলতা তথা অতি মনোরম । স্থলপদ্ম

\* এই অনুবাদখানি উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে বিরচিত হয় । পুস্তক আবিষ্কর্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, “কাশীদাসের অধঃমধ্য-পর্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম ; কোন কোন স্থলে হৃন্দের মিল আছে, কেবল দুই একটি শব্দ মাত্র পৃথক্ ।” পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৫ সন, : ৪১ পৃঃ ।

মল্লিকা মালতী বিরাজিত । লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত । নানাজাতি বৃক্ষলতা  
সব প্লবিত । রক্তবর্ণে খেতবর্ণে হৈছে বিকশিত । পুষ্পমধুপানে মত্ত মধুকরগণ ।  
নানাহানে উড়ে গড়ে অস্থির সঘন । অস্ত্রে অস্ত্রে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে । বাহারে  
শুনিলে কামে মূনি মন হরে । নানা জাতি পক্ষী নাদ করে মূললিত । বৃক্ষমূলে থাকিয়া  
খঞ্জন করে নৃত্য । কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে । তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ  
বোলে । ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তৰি । আশ্রম "দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি ।"

রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে, গ, পৃ থি ৮৫ । ৮৬ পত্র ।

ইহা শকুন্তলা উপাখ্যানের পূর্বভাগ । রাজেন্দ্রদাসের শ্রায় রামেশ্বর ও  
কালিদাসের শকুন্তলা ইহাতে উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন ;—“কণ্টক  
লাগয়ে পথে আপনা আঁচলে । খসাইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে ।” প্রভৃতি শকুন্তলার  
চেষ্টা কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে ।

ত্রিলোচনচক্রবর্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ  
করিয়াছিলেন, ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের  
ত্রিলোচনচক্রবর্তী । নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্রবনু মহাশয়  
ইহার বিষয় জানাইয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের মতে ত্রিলোচনচক্রবর্তী  
২০০ বৎসর পূর্বের কবি ।

ভাগবতের অনুবাদ তিন খানির বিষয় ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে ।  
১ । গুণরাজ খাঁব শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২ । মাধবা-  
ভাগবতের অনুবাদ । চার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩ । লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস  
প্রণীত বিষ্ণুপুরীর “বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী”র অনুবাদ ; বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী  
ভাগবতের সারসংগ্রহ মাত্র । কিন্তু এই অনুবাদত্রয় সমগ্র  
ভাগবতের অনুবাদ নহে,—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের এবং  
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ । লাউড়িয়া-কৃষ্ণদাসের অনুবাদে  
অতি সংক্ষেপে ভাগবতের অংশবিশেষের পরিচয় আছে, কিন্তু  
গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্য্য ( রঘুনাথ ) ষোড়শশতাব্দীর

রঘুনাথপণ্ডিতের  
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ।

পূর্বভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার  
করিয়াছিলেন, এই অনুবাদখানি বেশ সুন্দর,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার প্রায় সমস্ত পুঁথিখানি  
সংগৃহীত আছে,—অনুবাদ প্রায় ২০০০০ শ্লোকে পূর্ণ । সম্প্রতি সাহিত্য-  
পরিষদ এই অনুবাদখানি প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন । ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে  
বিরচিত কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ  
আছে—“নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী । শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো পৌরাণাতা-  
বলভঃ ।” রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবতানুবাদের নাম “কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,”—  
ইহা সেই গ্রন্থের সর্বত্রই উল্লিখিত আছে—“শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী ।  
একমনে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥” “কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে ।” চৈতন্য-  
চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ও এই অনুবাদকারকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—  
“শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহত্তম । তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥ শাখাশ্রেষ্ঠ  
প্রবানন্দ, শ্রীধর কৰ্ম্মচারী । ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥”

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কবিচন্দ্রপ্রণীত গোবিন্দমঙ্গলাখ্য ভাগবতানু-  
বাদই সৰ্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-  
কবিচন্দ্র ।

ছিল । ‘কবিচন্দ্র’ সমস্ত ভাগবতের সুললিত  
পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,—কবিচন্দ্রের  
ভাগবতখানির নানা অংশের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্বত্র যেরূপ  
সুলভ, ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদ সেরূপ সহজ প্রাপ্য নহে ; তাহা ছাড়া  
উনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কৃতিবাসুর রামা-  
য়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে  
কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন, রাজার পুস্তকাগারে নানা-  
রূপ পুস্তকই থাকার কথা,—তন্মধ্যে যেখানি যে বিষয়ে সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ,  
তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি ।

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল হইতে একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;  
স্থানাভাব বশতঃ অধিক রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না ;—

“রাধিকার প্রেমনদী রসের পাখার । রসিক নাগর তাহে দেন যে ঠাঁতার ॥ কান্ধলে  
মিশিল বেন নব গোরোচনা । নীলমণি মাঝে বেন পশিল কাঁচাসোণা ॥ কুবলয় মাঝে বেন  
চম্পকের দাম । কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অমুপাম ॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার  
কোলে । কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে ॥”

পূর্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া অভিরামদাস নামক জনৈক স্মৃতি-  
ভাগবতের সমস্ত কিংবা অধিকাংশের অনুবাদ  
অপর্যাপ্ত ভাগবতানুবাদকগণ । করিয়াছিলেন, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সনাতন চক্র-  
বর্তী নামক অপর একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন । লেখক  
আওরঙ্গজীবের সঙ্গে স্বজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার  
কাল-নির্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকার্যালয় ইহাতে ইহার কতকাংশ  
মুদ্রিত হইয়াছে । ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবশ্য বহুসংখ্যক কবির  
রচনা করিয়াছেন, জয়ানন্দের ঋষচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র,—দ্বিজ কংসারির  
প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ-  
চক্রবর্তীর পুত্র জীবনচক্রবর্তী প্রণীত ‘কৃষ্ণমঞ্জল’ প্রভৃতি এই স্থলে  
উল্লিখিত হইতে পারে । কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের ভাগবতানু-  
বাদের বিষয় ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।

ভবানীপ্রসাদ কর, জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী কাঁটালিয়া, এখন মৈমন-  
সিংহের মধ্যে,—কিন্তু ইঁহার মৈমনসিংহের  
মার্কেণ্ডের চণ্ডীর অনুবাদ,  
অঙ্ক ভবানীপ্রসাদ রায় ।  
“সমাজবহির্ভূত বৈদ্য” নহেন, ইঁহাদের  
উপাধি ‘রায়’ । ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর  
পূর্বে জীবিত ছিলেন ; ইনি জন্মাক্ষ, এই টুকুই তাঁহার বিশেষত্ব । ত্রীযুক্ত  
রসিকচক্রবর্ত্তমহাশয় এই অঙ্ককবিকে আলোকে আনিয়া আমাদের  
ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন । কবিমহাশয়ের জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সদ্ভাব  
ছিল না । জ্ঞাতিভ্রাতা কাশীনাথের পুত্রগণের বিরুদ্ধে তিনি অনেক  
অভিযোগ আনিয়াছেন, পাঠকগণ উভয় পক্ষের প্রমাণ না লইয়া অন্ধের

প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া এক তরফা ডিক্রি দিতে পারেন, কিন্তু তাহা উচিত নহে । মুকুন্দরাম-অঙ্কিত ডিহিদার মামুদসরিক দেশের শত্রু, স্তত্রাং কবির বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তদ্বিকল্পে বিচার চলে, —এস্থলে কিন্তু অভিযোগ নিতান্ত ব্যক্তিগত,—কবি স্থায় পারিবারিক বিদ্বেষবশতঃ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লষ্টয়া অপরের গ্লানি না করিলে তিনি সর্বতোভাবে সাধারণের ক্রুপাপাত্র হইতেন, সন্দেহ নাই । তাঁহার অবতরণিকা কি ভাষা, কুচি কিংবা কবিত্ব ইহার কোন হিসাবেই প্রাংশ-যোগ্য হয় নাই ।—“নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজাত । দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ ॥ জয়কাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত । চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত ॥ মনে দড়াইয়াছি আমি কালীর চরণ । দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন স্থান ॥ জ্ঞাতি ভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাথ । তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ ॥ জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যাত । তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্রুত ॥ কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত । পরস্রব্য পরনারী সদায় পীরিত ॥ বিদ্যা উপার্জনে তার নাহি কোন লেশ । পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকাশ ॥ দীর্ঘটানে সদা তেঁহ থাকেন মগন । জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ ॥ তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা । খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা ॥ এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায় । তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায় ॥ দুষ্ট হাত হৈতে কালী কর অব্যাহতি । তুমি না তরাইলে মোর হবে সুযোগতি ॥ মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার । এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার ॥ আমি অজ্ঞ ক্রিয়াহীন না দেখি উপায় । শরণ লৈয়াছি মাতারাত্ত তব পায় ॥” অতঃপর,— “ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল । চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল ॥ কাঁটালিয়া গ্রামে করবংশেতে উৎপত্তি । নয়নক্লেশ নামে রায় তাহান সন্ততি ॥ —জন্ম-অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে । অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে ॥— অন্ধকবি জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়া গিয়াছেন, ‘সেই কষ্ট বর্ণনায় যদি কিছু বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্ট অপভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তজ্জন্ত তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাশ্বাকে কষ্ট করা স্মৃষ্টির পরিচায়ক কিংবা, ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিলে, নিরাপদ হইবে না । ভবানীপ্রসাদের রচনায় প্রসাদগুণ বেশ আছে, কিন্তু তিনি

জন্মান্তর থাকায় তাঁহার অক্ষর জ্ঞান ছিল না, তাহা “চণ্ডী”তে পরিস্কারই ধরা যায় । এই উদ্ধৃত অংশেই,—“প্রসাদ” সঙ্গে “জাত,” “নাথ” এর সঙ্গে “সম্বাদ,” “কথা”র সঙ্গে “বৈরতা” প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মিল দিতে দেখা যায়, তাঁহার পুস্তক ভবিষ্য “রাজন” এর সঙ্গে “পরাক্রম,” “আমি” এর সঙ্গে “মুনি,” “শ্রীরাম” এর সঙ্গে ‘জাম্বুবান,’ ‘অনুপম’ এর সঙ্গে ‘প্রজাগণ’ মিল পড়িয়াছে ; প্রাচীন অনেক কাব্যেই একপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, অত্র কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই । শুধু প্রতিই তাঁহার পদের মিল-নির্ণায়ক, স্মৃতিরাং লিখিত কথা অপেক্ষা তদ্রূপবাসিগণের উচ্চা-  
রিত কথাই তাঁহার কাব্যের অধিকতর আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল ।

ভবানীপ্রসাদের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সর্বত্রই মূলের অনুবাদ নহে, মার্কণ্ডেয় মুনিকে তাগ করিয়া গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে অত্যাশ্রয় মুনিগণেরও শরণাপন্ন হইয়াছেন । অনুবাদ বেশ সরল ও সুন্দর, নিয়ে চণ্ডীর সুপরি-  
চিত একটি অংশের ভাষানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল ;—

“যেহি দেবি বুদ্ধিকপে সর্বভূতে থাকে । নমস্কাব, নমস্কাব, নমস্কার তাকে ॥  
যেহি দেবী লজ্জাকপে সর্বভূতে থাকে । নমস্কাব, নমস্কাব, নমস্কার, তাকে ॥ যেহি  
দেবী ক্ষুধাকপে সর্বভূতে থাকে । নমস্কার, নমস্কাব, নমস্কার তাকে । যেহি দেবী তৃষ্ণা  
কপে সর্বভূতে থাকে । নমস্কাব, নমস্কাব, নমস্কাব তাকে ॥ যেহি দেবী দম্বাকপে সর্বভূতে  
থাকে । নমস্কাব, নমস্কাব, নমস্কার, তাকে ॥”

অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের ক্ষমতা বেশ ছিল ; বামনের চাঁদ ধরিবার সাধ ও অন্ধের কাব্য লেখার সাধ এক মাত্র ভগবানই পূর্ণ করিতে সক্ষম, ভবানীপ্রসাদের সে আশা তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধকবি পাইলেই আমরা মিস্টন ও হোমার স্বর্ণ করিয়া উৎফুল্ল হইব, ইহা ঠিক নহে ।

ভবানীপ্রসাদ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর প্রতিভাশালী কবি রূপনারায়ণ প্রায়



রূপনারায়ণ যোষকৃত,  
চণ্ডীর অনুবাদ ।

সমকালেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অপরা একখানি  
অনুবাদ প্রণয়ন করেন । এই কবি আদিশূর-  
আনীত কায়স্থ মকরন্দঘোষের বংশীয় ; যশো-

হর ঈহার পূর্বপুরুষগণের বসতিস্থান ছিল । যশোহরে রাষ্ট্রবিপ্লব ( সম্ভ-  
বতঃ মানসিংহের আক্রমণঘটিত ) হইলে, জগন্নাথ ও বাণীনাথ এই দুই  
সহোদর—স্বদেশ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ-আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন ।  
সেখানকার জমিদার জনৈক, করবংশীয় নিয়ন্ত্রণীব কায়স্থ দুই ভ্রাতাকে  
আদরের সহিত অভ্যর্থিত করিয়া স্বীয় দুই কন্যার পাণিগ্রহণের জন্ত  
তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন ; জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন  
না,—উভয় ভ্রাতা পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাণীনাথ ধৃত হইয়া  
পদ্মার ক্রোড়ে নিষ্কিণ্ত হন,—মৃত্যুর পূর্বেও তাঁহাকে করমহাশয়ের কন্যা-  
বিবাহ করিয়া জীবন রক্ষার প্রস্তাব করা হইয়াছিল ; তিনি “জগন্নাথের  
দ্বারা আমাদের বংশ রক্ষা হইবে, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বীরের মত  
পদ্মার আবর্তে প্রাণত্যাগ করিলেন ; কিন্তু এই বল্লালীবীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহ বাফলা গ্রামের জমিদার  
বাদবেন্দ্ররায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া আদাজান গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন ।  
বাদবেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাফলার জমিদারগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া  
কবি যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একাধি এখনও তদ্রূপে  
প্রচলিত আছে,—“বাদবেন্দ্রবিহীনং বাফলা নিফলা গতা ।”

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্রবনু অনুমান করেন \*, রূপনারায়ণ খৃঃ ১৫৯৭ কিংবা  
তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন ।\* কবি রূপনারায়ণের  
কৃত অনুবাদখানিতে তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয়  
আছে, ইহাতে দশনের সহিত দাড়িম্ব বীজের, কধুর সহিত কণ্ঠের, এবং

কর্ণের কুণ্ডলের সঙ্গে মদনের রথচক্রের উপমা আছে,—“যো রথ আরোহি মদন বীর। জ্বিল পিনাকপানি ধীর।”—শেষের উপমাটি একটু নূতন হইলেও উহা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতেই আহৃত। কবি, কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনির খাতায় সে বিদ্যার ও উজ্জ্বল দীপ্তি পড়িয়াছে, যথা,—“গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দ্রুতর সাগর চাহি উড়ুপে তবিতে। পাংগুগমা মহাকল লোভের কাবণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন। পবস্ত ভবসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে।” “পরস্ত” আমাদেরও বিশ্বাস এই যে রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি যদি মূলবহির্ভূত অতিশযোক্তির আড়ম্বর একবারে পরিহার করিতেন, তবেই ভাল হইত, এবং তাহা হইলেও তাঁহার সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্রে প্রবেশ নাই, আমবা একথা কখনই অঙ্গীকার করিতে পারিতাম না। গৃহীণীগণ এত অলঙ্কার প্রদর্শনাভিলাষী হইয়া তো কখনও অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে দুই একটি স্বর্ণ দানা কিংবা মুক্তা রাখিয়া বসেন না ;—সেগুলি দেখাইবার স্থান ও সুবিধা বিবেচনা আবশ্যক, প্রাচীন কবিগণের অনেকেরই সেই জ্ঞানটির অভাব। “যেখানে যেটি”—ইহা কবি হইতে সামান্ত মুটে মজুর সকলেরই কার্য্যে সূত্র হওয়া উচিত।

শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ করেন, তাঁহার পরে দ্বৈধরচন্দ্র সরকার প্রভাসখণ্ডের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন

করিয়াছিলেন।

## অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গালা দেশের আচার ব্যবহার  
সমাজের চিত্র । সুচিত্রিত আছে । কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই

সমাজের একখানি সুনির্মল দর্পণের স্থায়  
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য-জীবন প্রতিফলিত করিতেছে । সেই সময়ে  
যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্বদাই সংঘটিত হইত ; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া  
তোপের শব্দে আশ্রয়ন কল্পিত ও মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শাস্তিভঙ্গ করেন,  
ইহা সর্বৈব কালনিক ; বস্তুতঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাস ও কাব্য পড়িয়াই  
আমরা জানিতে পারি, কোন বাঙ্গালা লেখকের সেই দৃশ্য দেখিবার  
কোন আশঙ্কা নাই ; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি  
সর্বদাই ঘটিত এবং এই কুশাগ্র ভীক বঙ্গবাসীদের মধ্যেও সৈনিক  
পুঙ্খের অভাব ছিল না ; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে  
বাঙ্গালীসৈনিক ।

আমরা ব্রাহ্মণপাইক, কাম্বাকারপাইক, চামার-  
পাইক, নটপাইক, বিশ্বাসপাইক ও বাঙ্গাল পাইকগণের বিবরণ  
দেখিতে পাই ; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ ও বলিষ্ঠ  
ছিলেন, কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত,  
কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যসমূহে অতি মাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও  
আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না ; কুত্তিবাসীরামায়ণে দৃষ্ট হয়,  
শ্রীরামচন্দ্র চাঁপা নাগেশ্বর জটায় বাধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্য্যের  
চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈতাকে বধ করিয়া সহচরী-  
গণের নিকট বিশ্রামজন্ত একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ  
স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়ানত—রাজার  
কাব্যে বীর রসের অভাব ।

প্রকৃতি দেখি রাগী সব কাঁদে । কর্ণে জপ করে কেহ  
শিরে শিক্ষা বাঁধে ॥” কবিকঙ্কণের কাণকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে  
পরাস্ত হওয়ার পর স্ত্রীর প্ররোচনায় ধর্ম্মাগারে লুকায়িত হইয়া রহিল,

কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ফুল্লরা কঁাদিয়া বলিতে লাগিল,—“না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল । গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার”।—( ক, ক, চ ) । পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, “ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, গৈতা দেখাইয়া কঁাদে ।”—( ক, ক, চ ) । “যতক ব্রাহ্মণ পাইকু গৈতা ধরি করে । দস্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামত্রে পড়ে ।”—( মা, চ ) ।

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের আয় দুই একজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন । লাউসেনের ভ্রাতা কপূরের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কপূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের শরের শন্ শন্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরশৃঙ্খলের আয় বোধ হয় ।

হিন্দুরাজগণ সকালে বৈকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন

শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদৃত হইত । বড় বড় রাজা ও প্রজা ।

রাজগণের অধীনস্থ রাজগণ “ভূঞা রাজা” নামে আখ্যাত হইতেন ; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় “ভূঞা-রাজগণ” তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজগণ অনেক সময় গ্রামনগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিতেন । রাজাদিগের দৌরাভ্যাও প্রসাদের তুল্য অপরিমিত ছিল ; বাজারে পণ্যজীবগণ রাজকৰ্ম্মচারীদিগের ভয়ে অস্থির থাকিত, আমরা ভাড়ুদত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি । অনেক রাজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্মোত্তর-দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওরা যায়,—“যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত

করিয়া অন্ত কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁহার দাসদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি হরণ না করেন ।” সাধারণতঃ রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ত্রায়-বিচার অধিক লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট-চরিত্র হইলে তাঁহার শাসনে পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হয় । কবিকঙ্কণচণ্ডীতে হুর্কলার বাজার করার

যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে,  
বাজার দর ।

সে সময়ে জিনিষপত্র সমস্তই অতি সুলভ-মূল্য ছিল ; মাধবাচার্যের চণ্ডীতে প্রদত্ত ফর্দে তদপেক্ষাও সুলভ মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া বোধ হয় । ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাত্ৰকা ব্যবহার করিতেন

আচাৰ ব্যবহার ও  
বেশ ভূষা ।

না ; ভদ্রলোক অতিথি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমমেই তাঁহাকে পা ধুইবার জল দিয়া সস্তাষণ করিতে হইত ; বহু কষ্টে একটি জলপূর্ণ গাড়ুর সাহায্যে কাদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ “গাঙ্গীরার পীড়া” চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আহারান্তে একটি অর্দ্ধখণ্ডিত গুবাক চর্বণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন । খুব ভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে শয়নশ্রোত্রে যাইবার পূর্বে ভাল করিয়া পা ধুইয়া পাত্ৰকা পরিয়া শয়্যার বাইতেন, ধর্মপতি লক্ষ-ম্বর ব্যক্তি, তিনি শুইবার পূর্বে—“চরণে পাত্ৰকা দিয়া করিল গমন । পদ্মনাভ অরি সাধু করিল শয়ন ।” জীলোকগণ অঙ্গদ, কঙ্কণ, কর্ণপুর, প্রভৃতি নানারূপ সোণার অলঙ্কার পরিতেন, নামা ছন্দে খোঁপা বাঁধিতেন, ও “মেঘডুমুর” কাপড় এবং কাঁচুলি পরিতেন ; নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীলোকগণ “ক্ষুণ্ণা” বা ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরূপ অন্নমূল্য পট্টিবস্ত্র ; মাণিকচাঁদের গানে দেখিয়াছি গোপীচাঁদের রাজত্বকালে বাঁদীগণও “পাটের পাছড়া” পরিত না ; এই “পাটের পাছড়া” ও “ক্ষুণ্ণাবাস”

একই প্রকারের কাপড় বলিয়া বোধ হয়, ভারতচন্দ্র “খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত” কথার এই “খুঁঞা” বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন । জ্বীলোকগণের অঙ্গমার্জ্জনার জন্ত আমলকীই সাবানের কার্য করিত ; স্বর্ণালঙ্কারেব সঙ্গে ফুল ও অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপিনীগণের বেশ কর্তার প্রসঙ্গে “কিনিয়া টাপাব ফুল কেহ দেহি কাণে” পাইয়াছি । কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক “Rude nations delight in flowers.” এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট নাগকেশর, কুরবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতীর জাতি নষ্ট করিয়াছেন ; সুন্দরীগণ এখন এই সব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত হইতে পারেন । পুরুষগণ বাল্য পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ৩০ দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুরীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতেছে—“নগবে নাগরজন, কাণে লম্বমান সোণা, বদনে গুবাক হাতে পান । চন্দনে চর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন পরিধান ।”—(ক, ক, চ) । নিম্নশ্রেণীর লোকগণ “খোসালা” নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত । বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ি-প্রত্যাশী ছুঁই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইত ; একজন লম্বাচার্য্য,—ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচঞা করিতেন, অপর ‘কুশারী’ উপাধিবিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাঁধে একটা বড় কুশের বোঝা থাকিত এবং ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্বাদ করতঃ কিছু যাচঞা করিতেন ।

তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চা খুব বেশী ছিল, শ্রামানন্দ

সদ্যোপ হইয়াও অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ বিদ্যা চর্চা ।

শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ; চণ্ডীকাব্যে শ্রীপতিবণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা ধনপতি বণিকও—“নাটক নাটিকা কাব্যোৎসাহার উল্লাস”—বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন । সংস্কৃতটোলে বাঙ্গালী অক্ষরের

সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতিবণিক সিংহলে “নাগরী বাঙ্গালা রায় পড়িবার জানি।” বালিয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, টোলে পাঠারম্ভ হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত মাধবাচার্য্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন—“চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলয়ে প্রবেশিল মন। কেয় কর কন আদি, কল কোব অববি, রেফুক্ত পড় যত ফল। কিরি কিলি আর্ক আঙ্ক, একাবধি যত অঙ্ক, কাগলয়ে পারগ হ'ল বাল।। পূজা করি সবস্বতী, আশুভিলা পাঠা পুঁথি, জানিবার সন্ধির প্রকার। স্বরসন্ধি পড়িয়া, সুসম পথেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা অপার।। চণ্ডিকার বর হেতু, পড়িলা সকল ধাতু, দ্বিবিচার জানিতে কারণ। বহু গহ জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে কথা কয় পারগ হইলা ব্যাকরণ।।” কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় টোলেব উর্দ্ধ তন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে ‘শশু শাস্ত্র’ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালারই অমুণীলন বেশী করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্বের যতগুলি বাঙ্গালা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তির হাতের লেখা; কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি;—হরিবংশ ( ১১৯০ সন ), লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধুপ, নৈষধ ( ১১৭৪ সন ), লেখক শ্রীমাক কাঠিত, গজাদাস সেনের দেব-বানী উপাখ্যান ( ১১৮৪ সন ) লেখক শ্রীরামনায়াণ গোপ, ক্রিয়াযোগ-সার ( সনের নির্দেশ নাই, ১৫০ বৎসর পূর্বের হস্তলিপি বাগয়া বোধ হয় ) লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ, রাজা রামদত্তের দণ্ডীপক ( ১৭০৭ শক ) লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুঁথি আমাদের নিকট আছে। ত্রিপুরাজেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি নলদময়ন্তী এক ধোপা বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোপার পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার স্থায় গোটা গোটা, বড় সুন্দর। আমরা মধুসূদননাগিতরচিত নলদময়ন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই নাগিত কবি যে তাঁহাব পিতামহের কবিত্ব-বশের গর্ব করিয়াছেন সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; গোবিন্দ কাম্ব্যারচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ

গ্রন্থ । আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভদ্রলোক-  
গণের ঘরে বাঙ্গালা পুঁথি বড় বেশী নাই, কিন্তু ইতর লোকের ঘরে উহা  
রাশি রাশি পাওয়া যায় ; ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুঁথিগুলি যেরূপ বহু  
সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদিগের নিকট  
কৃতজ্ঞ থাকিবেন ।

এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি  
জন্মে ; মধুসূদননাপিত সংস্কৃত জানিতেন এবং স্বয়ং একজন কবি  
ও কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্থায়ী ব্যবসায় ছাড়িয়া  
দেন নাই । সে সময় ধর্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি কামনায় জ্ঞানের  
চর্চা হইত ; জ্ঞানচর্চা যে শ্রেণীনির্বিশেষে অর্থকরী, একথা তখন  
তাঁহারা জানিতেন না ।

জীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা  
একজন শ্রেষ্ঠ জীলোক কবির বিষয় আলো-  
চনা করিব । কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দৃষ্ট হয়,  
খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাক্বিতণ্ডা  
করিতেছেন,—খুল্লনা বণিক্রমণী ; বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রভু  
যে ৩৬ জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখিমাহি-  
তীর ভগ্নী মাধবী—৬ জন ; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী বৈষ্ণবী ছিলেন,  
পদকল্পতরুতে ঠাঁহাব রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে ( ৭৮৮, ১৮০৪,  
২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দেখুন ) । জীলোকগণের মধ্যে ঔষধ করিবার  
প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোট্টাভাতাদের গালি নিতান্ত অমূলক  
বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথতীর্থে এখনও পাণ্ডারা গাহিয়া থাকে,—  
“ভাল বিরাজহুঁ, উড়িয়া জগন্নাথ । উড়িয়া মাগে ক্ষীর খিচুড়ী, বাঙ্গালী মাগে ভাল ভাত,  
সাধু মাগে দর্শন পর্শন মহা পরসাদ ।” বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাহম্মদী, দেখ্ নয়নকতারী,



ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে বাঙ্গালিনী টোনা ।”  
 জীলোকের কুসংস্কার ।

এই “টোনা” অর্থাৎ ঔষধ করার বৃত্তান্ত মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিম্নকে বৃদ্ধ বলিয়া বাঁচাইয়াছেন, “ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ । বুড়াকে না করে বশ দারুণ ঔষধ ।” এই ঔষধ দ্বারা বশীকরণ প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্ষপীয়-রের মাক্বেথ নাটকে যাহুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্ট দিয়াছেন, মুকুন্দের তালিকা তাহার অনুরূপ ; adders fork, eye of newt, scale of dragon, maw of shark, wool of bat, gall of goat, lizard's leg, swings of owlet, প্রভৃতি বিলাতী যাহুর পার্শ্বে, “কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত, ভজঙ্গের ছাল, কুজীরের দাঁত, বাহুড়ের পাখা, কাল কুরুর পিত্ত, গোখিকার আঁত, কোটরের পেঁচা,”—ইত্যাদি কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণগুলি স্থান পাইতে পারে, এই চাই ভ্রমের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্যকল্পনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য্য করে, একই দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়ায় এবং নরপ্রকৃতি সর্বত্র যে এক সাধারণ নিয়মাবলী তাহা প্রমাণ করে ।

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবতাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া-  
 ছিল, চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও  
 বৈষ্ণবপ্রভাব ।  
 বিবাহোপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম  
 পড়িয়া দেখুন ; তাঁহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপ-  
 বালক ও গোপিনীগণের ; শ্রীমন্ত বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাতৃণা-  
 বর্ত্তবধ প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতু বাধ-  
 পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে “হেথাই নরক স্বর্গ গুনি ভ্রাগবতে ।” (ক, চ), বলিয়া  
 ভাগবতের দোহাই দিতেছে ।

পূর্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাসকবি শকুন্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজে পাপ-  
 পাপ-পুণ্য-বিচার ।  
 পুণ্যেব যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের দূরপল্লী-  
 গুলিতে বোধ হয় এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই

শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,—“ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে যেই জন । তার পুণ্য ব্রহ্মা কৈতে না পারে আপন ॥ গোধন জলেতে যদি জল পান করে । তার কলে সেই জন যায় স্বর্গপুরে ॥” কিন্তু পুষ্করিণী রিজার্ভ করিবার এই হজুগের সময় গোধনের জলপান করায় কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্যসঞ্চয় ভাবিয়া স্তব্ধ হবেন কিনা সন্দেহ । মহাপাপগুলির ভয়ও ইদানীং অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, পূর্বোক্ত কাব্যে এষ্ট সব বান্ধি মহাপাপী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে,—“নিষেধ দিবসে যে মংস্ত্র মাংস খায় । মাংসে মূলা খায় যে নির্দ্বালা পুছে যায় ॥ কুলাচার ছাড়ি যেবা অনাচার করে । কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা অস্ত্র বিদ্যা ধরে ॥ ভোজনাস্ত্রে ক্ষৌর করে না করে বিচার । উত্তম অবশ্যে অন্ন একত্র আহার ॥” এই শতাব্দীতে ইহার অনেকগুলি ধারা রদ হইয়াছে ।

আমরা পূর্ববৎ শব্দার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,—

জাঙ্গাল—সেতু, নাযক—গ্রন্থ-লেখক, নৃপ—বাজ্ঞন, উতা-

শব্দার্থ ।

ড়িয়া—উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল—পৌছিল, উধার—ধার,

পিছিলা—পূর্ববস্ত্র ( “মাংসেব পিছিলা বাকী ধরি দেড়

বুড়ি” ) । জট—চুল, ( “জটে ধরি মগ মোহন কবিল নিস্তার”, “জটে ধরি বাধে মহাবীরে,”

এখন জট অর্থ “জটা” হইয়াছে ), পিছে—প্রতি, ( “হাল পিছে এক তঙ্কা” ) নাবডো—

ঠক, ক্রন্দন—কান্না, নাটুয়া—রঙ্গভূমির অভিনেতা ( “স্নান করি নীলাম্বর, ধবে পূর্ব কলেবর,

নাটুয়া কিরায় যেন বেশ ।” ) উভরায়—উচ্চরবে, জেঠি ( জেষ্ঠ )—টিকটকী, চিয়াইয়া—

চেতন হইয়া, স্ফজি—ভাজন, বাঝি—বাদি, আহড়ে—আড়ে ( “লুকাই গগনবাসী মেঘের

আহড়ে” ) । বালি—বালক ( “চারি বছরের হল বানিয়ার বালি” চণ্ডীকাব্য বাতীত অপরাপর

অনেক পুঁথিতেই ‘বালি’ শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । হহা হিন্দীর অনুকূপ ) ব্যাজে—

ছলে ( যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিয়া ব্যাজে । কুলবতী জলাঞ্জলী দিল কুললাজে ॥”,

এই ব্যাজ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ । দানি—দানব, জরাধি—জরাগ্রস্ত, পুরোধা—

পুরবাসী, মো—মমতা, লো—অশ্রু, কতি—কইন্তে, বোচা—দস্তাহীন, খণ্ড—গুড়, টাবা—

নেবু, রায়বার—দৌত্য, কঢা—কাঁচা ( “বাড়ে যেন হাতী কঢা” ) দিয়ড়ি ( দেউটী )—

দীপ, তোক—অপত্য, শশা ( শশাক )—খরগোশ, বরিয়াতি—বরষাত্মা, বেসাতি—

বাজারের সওদা, শাড়া ( বা শাটা )—“শটক, স্নত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা ।”

( অক্ষয় বাবুর চণ্ডী, ১৫৫ পৃঃ । ) অপরাপর পুঁথিতে—দড়বড়—তাড়াতাড়ি, অম্ববন্ধ—  
অবতারণা, গোড়াইল—সাথে সাথে চলিল, কাশি—ছেঁড়াবস্ত্র, হটে—ছলনায় ( “মনসার  
হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায় ।” —মনসার ভাসান ) । ইটাল—ইট, নেউটিয়া—ফিঙ্গিয়া,  
গড়—প্রণাম, টোণ—তুণ, সমাধান—শেষ ( “নিমিষেকৈ জীবন যৌবন সমাধান,” —মা, চ )  
সমসর—তুলা, বুঝাইল—বুঝাইল, পাড়ে—ফেলে, ( “অর্জুন কাটিয়া প’ড়ে, মুকুট ভূমিতে  
পড়ে ।” কালী ), বাট—পথ, আঙুসারি,—অগ্রসর হইয়া, সাবহিত—সাবধান, সহজে—  
স্বভাবতঃ ( এই শব্দ পূর্বে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে । )  
আচরণ—ভ্রমণ, বিচরণ ( “প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ ।” ( রসায়ন ), চৌরস—  
প্রসারিত ( “চাঁচর-চিকুর রামের চৌরস কপাল,” —রামায়ণ ), গদা—ঠাঠা ( “হেন বৃষ্টি  
গদা মোরে করিল যুবতী” —মা, চ ) । পাথর—পাপড়ি, নাট—নৃত্য, ডলি—অবতরণ কর,  
উড়ন—পরিধান করা, গণ্ড—এই শব্দ পূর্বে নানাকপ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত, যথা চিরা-  
গণ্ড, দরিগণ্ড, চোরগণ্ড, ইত্যাদি, ‘গণ্ড’ কোন কোন সময ‘ভগ্ন’ অর্থে প্রযুক্ত হইত, যথা  
“গণ্ড কপালিনী”; উজা—সোজা, বেড়—প্রতিমা-পঙ্কজ, আশ্বাস—আশঙ্কা ( “উপাশ  
করিয়া গেলে আশ্বাস বুচিবে” জগৎরাম রায়ের রামায়ণ । ), শারি—নিম্নাবাদ ।

বিভক্তিগুলি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; সে সম্বন্ধে

আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যা-  
বিভক্তি ।

য়েও অনেকাংশে খাটিবে ; পূর্ববঙ্গের পুঁথিতে  
“সংক্ষেপে কহিল”—(অর্থ “সংক্ষেপে কহিলম”) “একই দেখিল আমি তোমা যোগ্য বর।”  
ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয় ; জগৎরামের রামায়ণে—“সীতা  
ভেট দিয়া শিব মাগিব রাবণে ।” এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; এইরূপ ব্যবহার  
পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে ; কর্তৃ-  
কারকের পর ক্রিয়ার নানা অভূত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেই  
বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ  
করিলেই জানা যাইতে পারে ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে ১৫-১৮  
কতকগুলি বাঁধা বিষয় । পৃষ্ঠাষ একবার উল্লেখ করা হইয়াছে ; সেই  
বাঁধা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ

করা যাইতে পারে :—১। বারমাসী,—বাঙ্গালা মূলক ষড়ঋতুর প্রিয়-  
লীলাক্ষেত্র ; বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত  
হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ দুঃখের চিত্র সুন্দররূপে আঁকিয়া  
দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সীমান্তনীগণ যখন একটু  
মুক্তি পান, তখন তাঁহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়া পড়া স্বাভা-  
বিক, কবিগণ শ্রামের বাণীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়া ঘরের  
বউগুলির অনভ্যস্ত স্বাধীনতার মূর্তি দেখাইয়াছেন, কাহারও কবরী অর্দ্ধ-  
মুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পরা হয় নাই, অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা,  
অপরাক্ষ এলোথেলো যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, ইহাদের  
উঁকি খুঁকি কতকটা অস্বাভাবিক ও—“হারাঘতী এক ডাকে ভেঙ্গে আনে গাড়া”  
(ক ক, চ), প্রভৃতি অসংযত স্ফূর্তির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের  
মোহিনীশক্তি দেখিতে সুবিধা দেন নাই ; ভাগবতের একাংশে এই  
চিত্রের প্রথম ছায়া পাত হইয়াছিল। ৩। পুকুর ঘাটে রমণী। বঙ্গের পল্লী-  
গ্রামবাসিনী রমণীগণ বাহিরের লোকদিগকে স্বীয় রূপ দেখিবার একবার  
সুবিধা দেন, পুকুরের জলে যখন পদ্মমুখ ভাসিয়া উঠে ও স্নিগ্ধকান্তি ফুটিয়া  
উঠে, তখন সেইরূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে পাবে। বিদ্যাপতি  
হইতে আলোয়াল পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক কবি আদ্রবস্ত্রে কুন্তকক্ষে রমণীগণের  
গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। ৪। দাম্পত্য-  
কলহ—বিদেশ-বিদ্রোহী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া জ্বীর গালি খাওয়া  
নিত্যকর্ম, এই গালির স্বাদ সর্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে,  
তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতীভাষ্যার ক্রোধবৃষ্টি, কুলীনদিগের  
রূপায় কুলললনার বিড়ম্বনা—দাম্পত্য প্রেমে অগ্নিরোগ,—কবিগণ,  
শিবপার্বতী প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতি-  
নিম্ণা, ইহা লইয়া অনেক অঙ্গীলকথা বঙ্গসাহিত্যে কলুষিত করিয়াছে,  
অঙ্গীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সহায়ভূতি নাই, কিন্তু

এই পতি-নিলা এতগুলি কবি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে ; “কটিন ষাঙ্গন আমি যেই দিন রাখি । মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কাঁদি ॥”—( ক, চ ) প্রভৃতি উক্তি মর্শ্বের ; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে প্রাণপ্রিয় কত্যাগুলিকে জলে ভাসাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাসিতে থাকিত, কিছু বলিতে পারিত না—তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায় বলা বাইতে পারে—“বদন থাকিলে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম ।” ৬ । হুম্মান—এই সমুদ্র-লঙ্ঘন সেতুবন্ধন-পটু বীরচূড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের দক্ষিণহস্ত ; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে, বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে, এ সমস্ত ব্যাপারেই দেব দেবীগণ হুম্মানের শরণাপন্ন, কিন্তু বান্দীকির এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে । ৭ । শিশু-কতাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ সময় পিতৃগৃহ যে কারুণ্যপূর্ণ বেদনার তরঙ্গে প্লাবিত হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উমা ও মেনকা-সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন ।

এই নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, এত বিষয়গুলি প্রাচীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি ; দেব-দেবীর ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে । বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এত বাঁধা বিষয়গুলি কোন্ কবির হস্তে কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে সুবিধা পাইবেন ।

আমরা যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়-

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের  
পূর্বাভাস ।

বর্ণিত নানা পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া  
গিয়াছে ; চণ্ডীর চৌত্রিশ অক্ষরা স্ততি  
( চৌত্রিশ ) অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা

যায় ; এই “চৌত্রিশ” শুধু শব্দ লইয়া থেলা,—উহা অনেক স্থলে শ্রতিকটু

হইয়াছে, বথা—“টিটকারী টকারে হইলু পরাজয়ী। টকারিয়া রক্ষা কর মোরে কুপায়ী ॥” এই কোমল গীতি-কবিতার দেশে শ্রুতি-কটুতার অপরাধে কবির ফাঁসি হইতে পারে, জুয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন। যাহা হউক শ্রুতিকটুতাসত্ত্বেও এইরূপ শব্দ লইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজ্জাইবার চেষ্টা আরম্ভ হয়, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে “ঘুচাও মনের দ্রোঘ, কর পতি পরিতোষ, দিখাত বিরাটহৃত দান।” পাওয়া যায়, এই মুন্সীমানা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বিকাশ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রকৃত প্রেমরসের অভাব হইলে হীরামালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্গ্যের হস্তে কবিতাসুন্দরীর দ্রষ্টামীর পূর্বাভাষ পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন—“অশোক কিংগুজ ফুল, হইল যেন চক্ষুশূল, কেতকী কুসুম কামকুসুম। বৈরি দৃশ্যমবাণ, অস্তির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত ॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর যার জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকাব। মলয়েব সমীরণ, অশিকণা বরিষণ, পতি বিনে যাবন অসার ॥” কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাই—“গৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চল নাহি দেয় রেখা। স্নানচন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্বলোকে, মিছে বলে কঙ্কণের রেখা ॥ গৌরীবদন কচি, দেখি দাড়িষ বিচি, মলিন হইল লজ্জাভরে। হেন বুঝি অমুমানে, এই শোক করি মনে, শককালে দাড়িষ বিদরে ॥” পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বাক্য-কলা ও ‘লিপিচাতুর্গ্যের জাঁকালো বিকাশ দেখিতে পাইব।

## নবম অধ্যায় ।

### কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

অথবা

#### নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ ।

১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র ।

২। সাহিত্যে নুতন আদর্শ ।

৩। কাব্যশাখা ।

৪। গীতি-শাখা ।

১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র ।

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন ; নবদ্বীপের অকারুঢ় হইয়া জয়দেব-নবদ্বীপের অবস্থান্তর । কবি সুধাময় গানে বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়া-ছিলেন ; তারপর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । আধুনিক কালে মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছে,—নবদ্বীপের ধূলিরেণুতে হৃদয়বান্ বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিবেন ।

বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল । যুগে যুগে স্বর্গের শাসন লইয়া প্রতিভাবান্ ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু দৈববরে দিগ্বিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত বলপ্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস পর্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই

গিরিতুল্য অচল সমাজের নিকট ধর্মবীরের প্রাণান্ত চেষ্টাও সেইরূপ বিফল হইয়া পড়ে । যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পংগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ ক্ষুরিত কদম্ব কি দাড়িধ্ব দর্শনে কুঁভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন । এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার । বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হান্ধামে অস্থির ছিল ; ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে ১ অংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়, “১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০০০০ গৃহ ও ২০০ লোক অগ্নিতে দগ্ধ কবে ।” (হাটাব, এনালন্ অব কবাল বেঙ্গল ৭০ পৃঃ) । এইসময় দ্বিজ-ভারতচন্দ্র, স্বীয়প্রভু—“সদা জ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ”—সেবী নৃপনন্দনের জন্ত কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন ; জাতীয় চরিত্রের এই হীনতার ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ সূগম হইয়াছিল । এই বিপ্লববত্নায়—“ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে কবি । কালোয়াত মরিল বীণাব লাউ ধরি ॥”—দশটি হইয়াছিল, অবোধ্যার ওয়াজেদআলি তাহান সাক্ষী ।

কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি ; পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেঁটন করিয়া “ললিত লবঙ্গলতার” ছায়া সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল । কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি গানের মুর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকীরণ করিতে লাগিল, তাহা এই রাজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মূছহাস্য করিতেছিল ; নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নিশ্চল প্রেমের রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শাস্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্ত দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল । ধূর্ততা ও প্রতারণা—চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্ত টোল প্রতিষ্ঠিত হইল । আমরা এখানে যুগাবতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব ।



### কৃষ্ণচন্দ্র ।

১৭১০ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতৃব্য রাম-গোপালেরই রাজ্য হইবার কথা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-নীতি । তিনি পথে তাম্রকূটপ্রিয় পিতৃব্যমহাশয়ের বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাব-দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাক্‌চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন । আলিবর্দি খা তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে রাজসভায় না দেখিলে তাহার সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান করিতেন এবং তাঁহাকে ‘ধর্ম্মচন্দ্র’ উপাধি দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ‘ধর্ম্মচন্দ্র’-মহাশয় প্রতারণাপূর্ব্বক আলিবর্দি খাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্ব্বর ভূমিগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান । যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট পূজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার হইয়া আসেন । কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আয়ত্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিঙ্ক্‌স্-পত্নীকে একছড়া মুক্তার হার উপহার দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন । ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু । রাজবল্লভের হাতে “রাখি” বাঁধিয়া তিনি ঢাকার নবাব-সরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্রান্ত করিয়া বিফল করেন । তাঁহার অনুচর-গণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ততায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন ; নবাব যখন অগ্রদ্বীপে লোকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে ফ্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, “অগ্রদ্বীপ কাহার ?” তখন অগ্রদ্বীপের মাণিকের মোক্তার বিপদ আশঙ্কা করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “এস্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের”, তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার একটা কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যাস্তগত করিয়া লইলেন । বীরোচিত সংসাহসের অভাব থাকিলেও কুট রাজ-

নীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন । পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসন এই কুট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল । মুসলমান দরবারের ঘনীভূত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অঙ্গসরণ করিয়াছিলেন ; এক সময় মোগল-সম্রাট পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে ; কিন্তু শেষসময়ে মুসলমান-সম্রাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল,— পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, লাভহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে ; হিন্দুর চক্ষে এই সকল-পাপ অতি অস্বাভাবিক ; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্যপুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজ্য লইয়াছিলেন ; কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যবহারে মৰ্ম্মস্পীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট ছই ছত্র কবিতা লিখিয়া-ছিলেন—“পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য । যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ ।” বস্তুত পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই হইয়াছিল ।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন,

তাহা অতীব প্রশংসনীয় ; সিংহাসনারোহণের  
তাঁহার রাজ্য-শাসন ।

সময় তাঁহার ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল, ইহা ছাড়া বার লক্ষ টাকা নজরানার জন্ত মহাবদজ্জ তাঁহাকে বন্দী করিয়া-ছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন ; তিনি “শিব-নিবাসকে” ইন্দ্রপুরীর মত সাজা-ইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব । একটির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—“এমন স্থান অপ্রাপ্ত ও সুদূর পূর্বার আসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না”—(কিত্তীশবংশাবলী, ৩১ পৃঃ) । তাঁহার পূর্বপুরুষগণের—বিশেষ তাঁহার—যত্নে কৃষ্ণনগরের সুসজ্জায়গণ

এরূপ স্নানর সৃষ্টি গড়িতে শিখিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহে শাস্ত্রিপুত্রের ধুতির বশঃ দেশবিখ্যাত ।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন । তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমন নহে ; দর্শন, বিদ্যাহারাণ ।

• ত্রায়, শ্রুতি, ধর্ম—এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চা হইত । তিনি এই সর্বশাস্ত্র চর্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন ; তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্বভৌমের সঙ্গে ত্রায়ের কুটবিচার করিতে পারিতেন ; প্রাণনাথ ত্রায়পঞ্চানন, গোপাল-ত্ৰায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রেব তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ত্রায়পঞ্চাননের সঙ্গে ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সক্ষম ছিলেন ; বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন । এই উচ্চ-শিক্ষিত কুটরাজ-কৌতুকপ্রিয়তা ।

নীতিপ্রাজ্ঞ, মহিমাঘিত রাজচক্রবর্তী একটি পল্লীগ্রামের ইতরশ্রেণীব ব্যক্তির ত্রায় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন ; তাঁহার কৌতুকরাশিতে স্মৃতি কি সংবত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সেগুলি চার্লস্‌ দি সেকেন্ডের পরিহাস হইতে বেশী দৃশ্যীয় বলিয়া গণ্য হইবে না । কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটা লোক নিয়োজিত ছিলেন ; ১ম—গোপাল-ভাঁড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নরসুন্দরকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন । ২য়—‘হাস্তার্ণব’ শ্রুতপাণিবিদ জৈনক সভাসদ, ইহার বাড়ী বিশ্বপুষ্করিণী, ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইহার নকল করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল । ৩য়—মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ইহার বাড়ী বীরনগর, রাজার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ছিল না, সুরসিক দেখিয়া রাজা ইঁহাকে ‘বৈবাহিক’ বলিয়া ডাকিতেন । এই ব্যক্তিত্বের

কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্ত ও বীভৎস রসের শ্রাব্য হইত ;—  
নয়না এইরূপ,—গোপাল ভাঁড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন  
রাজা বলিলেন “এ যে রাজপুত্র দেখছি !” গোপালের উত্তর—  
“ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম ।”  
মুক্তারামের বাড়ী বীরনগরের কোন দূর গোক কোশলে অল্প এক  
ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করিতে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
“মুখুয্যে, তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয় ?” তিনি উত্তর  
করিলেন, “হাঁ মহারাজ, গত মাত্রেই” । রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে  
বলিলেন—“মুখুয্যে, গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি বিষ্ঠার  
হৃদে ও আমি পায়েসের হৃদে পড়িয়াছি ।” তিনি উত্তর করিলেন,  
“ধর্ম্মাবতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হৃদ  
হইতে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি ।” রাজ-  
সভায় এইরূপ রহস্যের ধূলিখেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভাঁড় প্রতি-  
পালন করিয়া তাঁহাদের নিষ্কিন্তু মুষ্টি মুষ্টি ধূলি খাইতেন ও হাসিতেন ।

এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্য বিস্তা-  
রের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতি জ্ঞান নানারূপ  
উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া ভোটক ছন্দে কবিতা লিখাইতেন ।  
বিলাসের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নির্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে  
গেলে উপহাসাস্পদ হইত ; রাজা “কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি  
বিশেষ করিতেন” ( ক্ষিতীশবংশাবলী ৩২ পৃঃ ) । কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ  
উপাসক ছিলেন, ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণনা করিয়া লিখি-  
তেন,—“ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে । দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ।”  
তখন, আমরা কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিপূর্ণ  
প্লদশ্রবনে প্রিয়কবির প্রতি অমুগ্রহ-হাস্ত বিতরণ করিতেছেন ।

এই শাস্ত্রচর্চা, স্ক্রুতার বিদ্যায় অমুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাস-

প্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত হাঁচে গঠিত করিয়াছে, তাহার দোষ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি ।

## ২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ ।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা কবিতা এখন আর ‘কৃষকের গান’ নহে ; এখন বঙ্গ-ভাষা স্বভাবসুন্দরী লজ্জাবতী পল্লীবধুটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের জিনিষ নহে । ইহার প্রতি সংস্কৃত ও ফার্সীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে স্বভাবরূপ রাজসভা বঙ্গভাষা ।

ঢাকা পড়িয়াছে ; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অমুগ্ধীতা, পল্লীবাসিনীর সাদা জুঁইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, সঙ্কুচিত সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পল্লীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, রাজসভাতে ইহার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয়, এবং নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে ।

কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাগর মস্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, রূপবর্ণনার উপমার বিকৃতি । তিনি তত প্রশংসনীয় ; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে ! আমরা নৈমধ্য-চারিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাই-তেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল ;—“হে রাজন্ । দময়ন্তীর চুলের কথা কি বলিব ? পশু হরিণ যে চামর-খীর পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয় ?”, “দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতে সুরাখাত করিয়া খীর পরাজয় ও কোভ ঘোষণা করিতেছে ।”—“বিধাত চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্মাণ করিয়াছেন, এই জন্ত চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলক বলে ।” “দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন-স্বরূপ জলদূর্গে বাস করিতেছে, অম্বাপি উঠিতে সাহস পাইতেছে না ।” “দময়ন্তীর গুর্কি বিধাতা যত

রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শিকানবিসের মস্তের মত, তারপর বেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনার দময়ন্তীর রূপের শ্রেষ্ঠ দেখাইবার জন্ত।” বহুপত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্সী ও উর্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন ; “তাহার কাল চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ,”—“তাহার নখের জ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যের মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের স্থায়,” “তাহার নিতম্ব আক্ষা-পাহাড়ের স্থায় ;” “তাহার কটিদেশ চুলের স্থায় স্বপ্ন, বরং তাহারও অর্ধেক,” (জ্যেষ্ঠা)। “সুন্দরী নানাস্থে সেন্দীরঞ্জিত অঙ্গুলী দ্বারা চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ বইতেছে” (বদর-চাচ)। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া বিদ্যাপতির—“চিকুরে গলয় জলধারা। মেহ বরিষে যেন মোতিম হারা।” স্বভাবতঃই মনে পড়িবে। এইরূপ অতি-শয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতি বুদ্ধির অবশ্রুই প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কোন সুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধক নহে,—হানিকারক।

বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারাও স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার স্থায় কৃত্রিম সুরে পতি-করুণ রসের দুর্গতি।

ধারাও স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার স্থায় কৃত্রিম সুরে পতি-বিরোগে বিলাপ করিতেছে—“আহা আহা হরি হরি, উহ উহ মরি মরি, হার হার, গোসাক্ষি গোসাক্ষি।” ইহা করুণ রসের বিজ্ঞপ্তি ভিন্ন কি বলিব ? সুন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—“এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়, যেন কাল নাগিনী।” গম্ভীরভাবে বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অল্পদা মঙ্গল রূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি বাই নাচ দেখাইয়াছেন ; যে দেশে এক সময়ে গোকুলচক্রবর্তী, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের গীত গাইয়া শ্রোতাকুলকে মোহিত করিতেন—“ধু কলঙ্কী বলিয়, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ। তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পুরিতে হুখ। সতী বা অসতী, তোমাতে বিমিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাণ পুণ্য সম, তোমার চরণখানি।” ইত্যাদি সরস প্রেমের কথায় মস্তকের আবেগ ব্যক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের

“বলে মুহু মুহু মুখে উহ উহ । বেন কোকিল কুজিত কুহ কুহ ।” ও তৎপথাব-  
লম্বিত ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন ;  
যে দেশে প্রেমের সরস মর্মস্পর্শী কথাগুলি সাহিত্যের অতুল্য গৌরবের  
সামগ্রী, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধূকে স্বামী একটা হরবোলা  
পাখীর ছায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন, বিদেশে গমনোন্মুখ সাধু স্ত্রীকে  
সাবধান করিয়া বলিতেছেন—“বাহিরে পদ রাখা জেন কণিকণ। পরে। স্বীপাত্তর  
বাওয়া হেন মান অস্ত্রঘরে । পর পূর্ববের রব বজ্রতুলা কাণে । ভাল শব্দ। কুহুমকটক  
করি মনে ।” ( জয়নারায়ণের চণ্ডী ) ।

এস্থলে বক্তব্য এই, বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিহু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুটনী ও  
কামিনীকুমারের সোণামুখীর ছায় দাসী বঙ্গীয়  
কুটনী-দাসীর আমদানী । হিন্দু সমাজের খাঁটি চরিত্র নহে ; দুর্ব্বলাদাসীর  
ছায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ছায়  
নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী ; মুসলমানী কেতাবে কুটনীদাসী  
অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, জেলেখার দাসী তাঁহাকে বলিতেছে ;—“কে তোমাকে  
ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিজ্ঞান ছায় বিবর্ণ কেন ? তুমি চন্দ্রের মত  
দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে কেন ? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাদে পড়ি-  
য়াছে, বল সে কে ? যদি সে আশমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমিনে কেলিয়া তোমার  
নিকট বন্দী করিব । সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে  
পূরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব । যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি বাহার দাসী হইতে  
ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে ।” ( জেলেখা ) ।  
লয়ালীমজমুতে পড়িয়াছি—“কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে । তেমন কুটনী  
কেহ না ছিল দেশেতে । মন ভুলাইতে সেই কথায় কথায় ।” জমিনেতে চন্দ্রস্বর্ষ্য করিত  
উদয় ।” ( মুসলমানী কেতাব ) ।

এই যবনীগণের চন্দ্রস্বর্ষ্য ও বাঘের দুধ করায়ত্ত ছিল, ইহার  
আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নানিকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত ; এই  
রমণীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়া-

ছেন, পাঠক তাহাদিগকে—নারদ ঋষির জীসংস্করণ-কুজা কিংবা চুর্কলার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না ।

বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুটনীসংযোগে গৃহস্থের

বিদ্যাসুন্দরে মুসলমানী  
প্রভাব ।

বাড়ীর কথাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ

মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক ।

ফার্সী অমুরাগী ধর্মভীরু কবিগণ চণ্ডী পূজার

বিষপত্র কাণে শুঁ জিয়া মুসলমানী কেছা শুনাইয়াছেন, তাহাদের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মান পৈতা, চন্দনচর্চিত ললাট, কর্ণলগ্ন বিষপত্র ও মুখে “কালি কালি কালি কালি কালিকে । চণ্ডয়ুগু যুগুখণ্ডি, খণ্ডয়ুগু মালিকে ।” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতাগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন ; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, “চণ্ডীর চৌতিশার”ই উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই । লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখিয়াছেন, মুসলমানী কেতাব হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি—“গোস্তা মনে লাল আঁখি, লয়লীকে কহে ডাকি, কালামুখী হায় কি করিলি । এই কি বাসনা তোর, জাত কুল গেল মোর, দেশনাথে কলঙ্ক রাখিলি । . কি পড়া পড়িতে গেলি, গ্রেমে, মন মজাইলি, কে শিখাল । এমন ব্যাভার । লাজভয় গেল তোর, অখ্যাতি হইল মোর, কুলে কালি দিল সবাকার ।” ( লয়লামজমু ) ।

বিদ্যাসুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপূর্ব শকমন্ত্র ।

ভারতচন্দ্রের ভাষা  
ও রচি ।

“তমু মোর হ’ল বস্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র, আলাপে নাভিল  
মন মাতালে নাচাও না । ওহে পরাণ বধু বাই গীত পেও  
না ।” প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের ত্রায়

সুধাবর্ষা, ‘উহাদের ভাব চিত্তে ঊপলব্ধি হইবার পূর্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে । বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার বোগ্য, কিন্তু ইহাদের হাঁচে ঢালা সুন্দর মার্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের বীনত্ব



পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোণার মূল্যে বিকাইয়াছে ।

এই অল্পীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজ্যভূগ্ৰহে পুষ্ট হইতেছিল,

তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাস্র-  
কবি-গীতির সরল -বিধৌত সংগীত পুনশ্চ আরব্ধ হইয়া শ্রোতার  
আবেগ ।

প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রাস-  
প্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত সেই সব সংগীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অল্প  
কোন ঋণ বহন করে না ; তাহারা সামান্য কবিগণের কণ্ঠে ধ্বনিত  
হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল,—কিন্তু বোধ হয়  
তাহাদের ভাবের নিম্নলতা ও আবেগ—কুচিহ্নিত বৃথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া  
কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে ; আমরা পরে তাহাদিগের কথা  
সংক্ষেপে লিখিব ।

### কাব্যশাখা ।

বিদ্যাসুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য ; বরকচি নামক কবি সংস্কৃতে

যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয়  
বিদ্যাসুন্দর কাব্য ।

বিদ্যাসুন্দরের ভিত্তি নহে । পল্লীগ্রামের অত্যাশ্র  
গল্পের স্থায় বিদ্যাসুন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু  
উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই  
আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত । বৃহৎ প্রাচীন  
কাশীতে বিরচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি, উহা ভারতচন্দ্রের  
বিদ্যাসুন্দরের অনেক পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল । ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দরের  
উর্দু ভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন । মুসলমান ও হিন্দু  
দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরম্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি পরা-  
স্রণ হইয়াছিলেন, ফৈয়ানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের  
লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষাকবচ ও অত্যাশ্র মন্ত্রপুত সামগ্রীর সঙ্গে এক-

হিন্দু ও মুসলমান ।

খানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যানারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্মের ছবক শিখাইয়া গিয়াছেন,—তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মিরজাকরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপমোচনের জন্য কিরীটেখরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা । হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্ধি দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ দেবমন্দিরে ভোগ দিতেন । উত্তর পশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন । অষ্ট শতাব্দী হইল, ত্রিপুরায় মজাহসেনখালি নামক জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়ীতে কালীপূজা করিতেন এবং ঢাকার গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজার অমুষ্ঠান করিতেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি । মুসলমানগণের ‘গোপী’, ‘চাঁদ’ প্রভৃতি হিন্দু নাম ও হিন্দুদিগের মুসলমানী নাম অনেক স্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ; চট্টগ্রামের কবি হামিদ্দার ভেলুয়াসুন্দরী কাব্যে বর্ণিত আছে লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহার কোরাণ দেখিয়া অন্ধপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্বে ‘বেদপ্রায়’ পিতৃ বাক্য মান্ত করিয়া “আল্লার নাম” লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আশ্চাবদ্দিন তাঁহার “জামিল দিলারাম” কাব্যে নারিকাঁ দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্তঋষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে ‘লক্ষ্মণের চন্দ্রকলা,’ ‘রামচন্দ্রের সীতা’, ‘বিদ্যাধরি চিত্ররেখা’ ও বিক্রমাদিত্যের ভানুমতীর’ সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন ; \* হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে

\* এই কাব্যের হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে ; ইহাতে উর্দু শব্দ খুব অল্প, বাঙ্গালাটি ঠিক হিন্দুকবির ভাষার স্থায় ।

ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে যে অলঙ্কিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উর্দু ও ফার্সী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল ; এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অল্পসম্মানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমারুঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের

মুসলমানী গ্রন্থে  
নায়কের পূর্বরাগ ।

সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে ।  
বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পূর্বে বরের এইরূপ  
প্রেমাবেশ আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয় নাই ।

### পদ্মাবতী ।

প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলোয়াল পদ্মাবতী নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন । এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র আলোয়ালের পাণ্ডিত্য । রাজার বহুপূর্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য-চিহ্নগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্তে পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্যশাখার মুখবন্ধ করিতেছি । পাঠক দেখিবেন, কবি আলোয়াল সংস্কৃতে কিরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল । এই পুস্তক পড়িলে স্বতঃই মনে উদয় হইবে, মুসলমানের এতটা হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয় । যাহারা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির কবিতা পড়িয়া চমৎকৃত, তাঁহারা কবি আলোয়ালের এই সুস্বাদু কাব্যখানা পাঠ করুন ।

৯২৭ \* সালে মীর মহম্মদ নামক জটনৈক কবি হিন্দী-ভাষার পদ্মাবতী  
রচনা করেন +—ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান ;  
হিন্দী পদ্মাবত ।  
দিল্লীস্থর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্যের রূপ-  
তৃষ্ণায় যে সমরানল বা কামানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য

\* “সন নবমৈ সত্তাইস অইহ । কথা অরন্ত বেন কবি কইহ ।” মীর মহম্মদের পদ্মাবত ।  
“সেখ মহম্মদ বতি,  
যখন রচিল পুঁখি  
সংখ সপ্তবিংশ নবশত ।” আলোয়ানের পদ্মাবতী ।

এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ‘ভারত-জীবন’ পত্রিকার সম্পাদক কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বস্তু আমাকে লিখিয়া পাঠান—“মহাশয়, সাহিত্য নামক মাসিক পত্রে (১৩০১ বাং) মাঘ মাসের সংখ্যায় ‘মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য’ শীর্ষক প্রবন্ধের ৬৯১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে মীর মহম্মদের রচিত হিন্দী পদ্মাবতী পাওয়া যায় নাই । মহাশয়, ধন্যবাদ পূর্বক জানাইতেছি যে হিন্দী মীর-মালিক মহম্মদ রচিত পদ্মাবতীকাব্য কাশী ও লঙ্কোতে ছাপা হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া যায় ।” আমরা এবার মীরমালিক মহম্মদ-রচিত ‘পদ্মাবত’ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি । শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই পুস্তকখানি উপহার দিয়া বাধিত করিয়াছেন—ইহা একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী কাব্য । ২২৭ সনে এই পুস্তক বিব্রচিত হয়, একরূপ উজ্জ হইয়াছে,—কিন্তু কবি সেরসাহের উল্লেখ করিয়াছেন, ৯৪৭ সনে সেরসাহ সত্তাইস হন ; সুতরাং শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্ সাহের অনুমান করেন—২২৭ সন না হইয়া ৯৪৭ সন মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু আমরা প্রাচীন আলোয়াল-কৃত অনুবাদখানিতেও যখন মুদ্রিত হিন্দীকাব্যের অনুযায়ী ২২৭ সনই উল্লিখিত দেখিতে পাই, তখন উহা মুদ্রাকরের ভ্রম, বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না । মালিক মহম্মদ একজন সাধু কবির মৃত্যুর পর আমেথির রাজ-দুর্গের সমীপে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়, এখনও সেস্থলে তাঁহার সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয় । গ্রীয়ারসন্ সাহেব চৈতন্য লাইব্রেরীর অধি-বেশনে হিন্দীসাহিত্য সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ‘পদ্মাবত’ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করেন । তাঁহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে মালিক মহম্মদের কাব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, “চিরাগত ধর্ম ও সাহিত্যিক প্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে হিন্দু জাতির কি পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে,—মালিক মহম্মদের গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—এই দৃষ্টান্ত অতীব উজ্জ্বল এবং হিন্দী সাহিত্যে একান্ত বিরল ।”—(“Malik Mohamad's work stands out as a conspicuous and almost solitary, example of what the Hindu mind can do when freed from the trammels of literary and religious custom.” P.

তাহারই ইতিহাস । হুই এক স্থলে প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের বিপর্যয় আছে—চিতোরাধিপ ভীমসেন কবিকর্তৃক রত্নসেন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পুঁথির শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে ; বাহা ইউক কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুল্যদণ্ড দ্বারা মাপ করা উচিত হইবে না । মীরমহুম্মদের এই কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—কবি আলোয়াল ; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নূতন সৃষ্টি ।

আলোয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় ( ফরিদপুর ) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন আলোয়ালের পরিচয় ।

সচিবের পুত্র ছিলেন ; বোবনারস্তে ঠনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হাশ্মাদগণ ( পর্তুগিজ জলদস্যু ) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, কবির পিতা বুদ্ধ করিয়া নিহত হন, এই সময় হাশ্মাদগণেব অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্বদা বিপদাশঙ্কা ছিল, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও আমরা ইহা দেখিয়াছি । কবি পিতৃবিয়োগের পর রোসাঙ্গের ( আরাকানের ) রাজার প্রধান অমাত্য মাগণঠাকুরের শরণাগত হন । মাগণ ঠাকুর মুসলমান ছিলেন, এস্থলে আবার আমরা মুসলমানের হিন্দু নাম পাইতেছি । সংগীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ; আলোয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মীর মহাম্মদকৃত পদ্মাবতীকেচ্ছার বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয় ; পদ্মাবতী লেখার পর তিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু মাগণঠাকুর তাঁহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে “ছয়ফুল মুলুক ও বদিউজ্জামাল” নামক ফার্সী-

---

১৪) কবির সাধু-জীবনের পরিচয় তাহার গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে । প্রারম্ভে প্রদত্ত ঈশ্বরবন্দনাটি অতি উদার দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ ; গ্রন্থশেষে কবি তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানটি একটি ধর্মের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—চিতোর অর্থে তিনি মানব-শরীর বুঝিয়াছেন, রত্নসেন অর্থ জীবাত্মা ; শুকপাখী—ধর্মগুরু,—পদ্মিনী অর্থ বিবেক, ইত্যাদি ।

কাব্য অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকদূর রচনার পর মাগণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল ; স্বজাবাদস। তথায় আসিয়া আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, আরাকানরাজ স্বজার অনুচরগুণি বিনষ্ট করেন, মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মজা-নামক এক ছুষ্ঠ লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি আলোয়াল কারাগারে আবদ্ধ হইলেন ; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কবি নয় বৎসর অতি দীন ভাবে অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকাল পরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় স্প্রশন হন ; ছৈয়দমুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে “ছয়ফুলমুগ্ধ ও বদিউজ্জমাল” পুঁথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন ; তখন কবি ভগ্নবীণায় পুনরায় তার যোজনা করিলেন ; কিন্তু তখন তিনি অতি বৃদ্ধ, — বয়ঃ গতে বনিতাবিলাসের গীতি কঠে উঠিতে চাহে না ; আলোয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমত অসম্মত হইয়া-

ছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা তাঁহার দেশবিখ্যাত  
তদীয় গ্রন্থাবলী।

যশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে স্বজার মৃত্যু হয়, তাহার অনূন ২০ বৎসর পূর্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতীরচনার কাল ধরিলে, তিনি ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অত্যাশ্চর্য্য হইবে না ; কবি আলোয়াল কবিকঙ্কণ ও কালীদাসের পরবর্ত্তী কবি। পূর্কোক্ত দুই খানি গ্রন্থ ছাড়া আলোয়াল, দৌলত কাজির ‘লোর চন্দ্রানী’ ও ‘সতী ময়নার’ উত্তরাংশ রচনা করেন,—রোসাক্কের রাজার অমাত্য ছোলেমানের আদেশে এই কাব্য রচিত হয় ; তৎপর তিনি সৈয়দ মহম্মদখানের আদেশে পার্শী কবি নেজামিগজনবীর “হস্তপয়করের” একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত রাখাকুফ বিষয়ক কয়েকটি পদপাওয়া গিয়াছে ; একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

“ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ ৫৮ ॥

ঘরের ঘরগী, জগত মোহিনী, প্রত্যাষে যমুনায় গেলি ।

বেলা অবশেষে, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি ।

প্রভাষ বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম ।

বেলা উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম ।

কমল কণ্টকে, বিকশ সঙ্কটে. করের কঙ্কণ গেল ।

কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল ।

সিংখের সিংপুর, নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে ।

হের দেখ মোর, অর্ধ জরজর, দারুণি পদ্মের নালে ।

কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলে নাই সীমা ।

আরতি মাগনে, আলোয়াল ভণে, জগৎমোহিনী বামা ॥”

পদ্মাবতীকাব্যে আলোয়ালের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে ; কবি

পদ্মাবতী ।  
পিজলাচার্য্যের মগন, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহা-  
গণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ; খণ্ডিতা

বাসকসজ্জা ও কলহাস্তারতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষশাস্ত্রে লগ্নাচার্য্যের গ্রন্থ যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; একজন প্রবীণা এয়ের মত হিন্দুর বিবৃতিদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, ঐতহ্যাতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন । আলোয়াল, “ছয়কুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল” কাব্যে লিখিয়া ছিলেন—“আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী । যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শক্তি ॥”

এই উক্তি অতি সত্য ;—তাহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতীকাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই । তিনি বয়ঃ সন্ধি

বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা—“আড় আঁখি, বহুবৃষ্টি ক্রমে হয়। ক্রমে ক্রমে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়। চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। বিরহ বেদনা ক্রমে ক্রমে মনে হয়। অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে। আনন্দিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে ॥ \* \* \* অভেদ আছেয়ে দুই কমলের কলি। না জানি পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি ॥” অত্ৰা—“কুটিল কবরী কুহুমমাথে। তারকা-মণ্ডলে জ্বলদ সাজে ॥ শশিকলা প্রায় সিন্দূর ভালো। বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে ॥ হুম্মরী কামিনী কামবিসোহে। খঞ্জনগঞ্জন নয়নে চাহে ॥ মদন ধনুক ভুরু বিভঞ্জে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণতরঙ্গে ॥ নাসা খগপতি নহে সমতুল। হরঙ্গ অধর বাঁধুলীফুল ॥ দশন মুকুতা বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নাশি ॥ উরজ কঠিন হেমকটোর। হেরি মূনি মন বিভোর ॥ হরিকরিকুন্ত কটিনিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব ॥ কবি আলোয়াল মধু গায়। মাগন আরতি রহক সদায় ॥” স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত,—“বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবালা দুই ইন্দু, শ্রবে জেন হৃদা বিন্দু, মৃদুমল্ল অধরে ললিত মধু হাসে ॥ প্রফুল্লিত কুহুম, মধুব্রত বকৃত, ছকৃত পরভূত কুঞ্জে রতরাসে ॥ মলয়সমীর, স্তসৌরভ স্তম্ভীতল বিলোলিত পতি অতি রস-ভাবে ॥ প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালফ্রম, মুকলিত চূড়লতা কোরক-জালে ॥ যুবজন-হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রঙ্গমল্লিকামালতিমালে ॥” অত্ৰা বিদ্যাপতিকের মনে পড়িবে,—“চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জনগমন শোভিতা ॥ ঋতু বর্ণনার গদ্যশুলি মসৃণ ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রচনার সঙ্গে গাঁথিয়া রাখার উপযুক্ত—“নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্র-ক্রোশে রহে ছায়া চরণে শরণ। চন্দন চম্পক মালা মলয়া পবন, সতত দম্পতি পাশে ব্যাপ্ত মদন ॥” বর্ষাকালে—“ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দর্দুরী শিথিলীরব অতি মনে ভায় ॥ স্বামিসঙ্গে বানারঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিদ্যাত চমকি কণ্ঠে লাগে ॥ বজ্রপাতে কমলিনী আসিত হইয়া। ধরয় পতির গীসে অধিক চাপিয়া ॥ কীটকুলকলরর কঙ্কণঝঙ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার ॥” শরৎকালে—“আসিল শরৎ ঋতু নির্মল আকাশে। দোলয়ে চামর কেশ কুহুমবিকাশে ॥ নবীন শঞ্জন দেখি বড়িহি কোঁতুক। উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ ॥ কহুমিত খেত শব্দা অতি মনোহর। কুহুম চন্দনে লেপিয়া কলেবর ॥ নানা আভরণ গটায় পরিধান ॥



স্বকের মরমে আগয় পঞ্চবাণ ।” শিশিরকালে—“সহজে দম্পতি মজে শীতের  
সোহাগে । হেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে ।” হেমন্তে—“শীতলিত বাসে রবি  
দ্রিতে লুকায় । অতি দীর্ঘ হৃৎ নিশি পলকে পোহায় । পুষ্প শয্যা মুদ্র খেলা  
বিচিত্র বসন । বন্ধে বন্ধে এক হৈলে শীত লিবারণ ।” আলোয়াল কবির  
বারমাস্ত্রা বর্ণনাটিও এই সুন্দর এবং নিপুণ তুলির উপযুক্ত ; ভাদ্রে—  
“ভাদ্রেতে যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয় । নানা অস্ত্র আনিবার মদন ক্ষেপয় ।”—“আধিনে  
প্রকাশ নিশি নির্মল গগন । গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ । সকলের মতে চন্দ্র,  
রাহ মোর মতে । মুদিত কমল আঁধি চল্লিকা উদিত । কার্তিকে—“পরব পেঙালি  
ঘরে ঘরে হৃৎভোগ । নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ ।” ফাল্গুনে—“মোর  
অঙ্গ পরশি পবন যথা যায় । তরকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায় ।” বৈশাখে—“বিদরে  
মহী অরুণ প্রবলে । ঐষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহে অনলে । মিত্র হৈয়া কমল না সহে  
দিনমণি । পতি বিনে কেমনে সহিবে কমলিনী ।” জ্যৈষ্ঠে—“পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায়  
সখিগণ । ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন ।” মহাদেব বর্ণনায় আলোয়াল কবি  
শৈবের প্রশংসা পাইবেন,—“শিরে গন্ধাধারা যটা গলে অস্থিমালা । অঙ্গে ভস্ম  
পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাজ ছালা । কণ্ঠে কালকূট ভাগে চল্লমা হুচারা । কক্ষে শিখা ভূতনাথ  
করত ডুমক । শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল । ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন  
রাতুল ।”\* এতদ্ব্যতীত নানা বিচিত্র বিদ্যাসুন্দরী ধূয়াগুলির মত গীতভাঙ্গা  
পদ পুস্তকের সর্বত্র পাওয়া যাইবে । মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের  
বিকাশ আছে, তদৃষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অন্তর্দৃষ্টির  
রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম ছিলেন, যথা—“কাব্যকথা সকল হৃৎকি তাঁর

\* মূলে এইরূপ রহিয়াছে,—

“ততধন পছচে আর মহেশু ; বাহন বৈল কুষ্টিকর ভেণ্ড । কাংধর ক্ষয়া হড়াবর  
বাংধে । মুণ্ডমাল ও জনেউ কাংধে । শেষনাগ সোহৈ কণ্ঠমালা । তনবিভূতি হস্তী কর-  
জালা । পহঁচী রুদ্র কমলকী কটা । শশী মাখে শিরপর জটা । চবর ঘংটু ও  
ডমর হাথা । দোরী পবিত্রী ধনী সাখা ।” সুতরাং আলোয়ালের অনুরূপ আকরিক  
নহে ।

পুর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর। নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিগীলিকা। বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না জনের রস।” \* এবং ছয়ফলমুল্লুক ও বদউজ্জমালে—“উজ্জল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অধর্ম না হৈলে বল উত্তম কেবা চিনে। লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীমা। কুপণ না হৈতো কোথা দাতার মহিমা। সত্য যে অসত্য দুই মতে হৈলো যত। ভাল মন্দ যে বলে না কর কর্ণধত। যেই পুঞ্জি আছে মাত্র হৃদয় ভাণ্ডার। লাজ ছাড়ি আলোয়াল বাজ কর তার।”

পদ্মাবতী-কাব্যে মুসলমানীভাব না আছে, এমন নহে; এই কাব্যে কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে, মুসলমানী-ভাব।

সেই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে আরব্য ও পারশ্বদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়; রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মুচ্ছিত হইয়া থাকিতেন, শেষে রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে—“বোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী।”—রাজকুমারীর দুঃখ-সংবাদ জানাইতে যে পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহব্যথার পরিমাণ দস্ত হইয়াছে;—“দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল। সেই দুঃখে জলদ শ্রামল বর্ণ হৈল। ফুল্লঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর। অন্তরে শ্রামল তহি ভেল শশধর। উড়িতে নারিল পাখা শূন্তের উপর। উকা পাত হয় যেন বলে তারে নর। সমুদ্র উপর দিয়া কবিল গমন। জলনিধি হৈল তহি পূর্ণিত লবণ।” বখন মুসলমানকবিকে পাঠক

\* মূলে এইরূপ আছে—

“কবি বাস বস কঁবলা পুরী। দুয়হিং নেরে নেরে দুয়ী। নেরে দুয় কুল জস কাটা। দুয় জে নেসে জস গুড় চাটা।” এখানে “নিকটেতে দূর যথা পুষ্পেতে কলিকা” অমুবাদটি ঠিক হয় নাই, মূলে পুষ্প এবং কণ্টকের সম্বন্ধ নিকট হইলেও ইহাদের দূরবর্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু পুষ্প এবং কলিকার উপমায় সে ভাবটি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না; তবে কষ্ট করিয়া একটা অর্থ করা যায়, কলি একবার কুটরা কুল হইলে আর তাহা কলিকার অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবার উপায় নাই, সুতরাং কুল এবং কলিকার সম্বন্ধ নিকট হইলেও দূর। ‘কলিকা’ মূলে ‘কণ্টিকা’ পাঠ ধরিলেই গোল চুকিয়া যায়।

কিঞ্চিৎ কালের জন্য হিন্দুকবি বলিয়া ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক অদ্ভুত আড়ম্বরে শৈশবশ্রুত পরীবাসু কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ পড়িবে, এবং পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানকেচ্ছার আকার ধারণ করিবে ।

পদ্মাবতী মৌলিক কাব্য নহে, ইহা একখানি অনুবাদপুস্তক ।

কিন্তু আলোয়ালের সুগভীর সংস্কৃত-  
পদ্মাবতী-কাব্য-সমালোচনা ।

শাস্ত্রের জ্ঞান এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে সহানুভূতি তাঁহার অনুবাদগ্রন্থখানির উপর একটি মৌলিক সৌন্দর্য্যের ঐভা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না । মূলকাব্য সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর রচনা, তাঁহার মানবীয় আখ্যানের ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ প্রচুর রহিয়াছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলে মালিক মহাম্মদ যেন নিজ স্বাভাবিক রাজ্যে প্রবেশ করেন । সেই সকল স্থলে, পরমেশ্বরের অপার করুণা স্মরণে আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিনি স্বীয় রচনায় সুধামাখা তত্ত্বামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন,—আলোয়ালকবি সেই সকল অংশে মালিক মহাম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে অনুবর্তী হইয়াছেন,—সাধুর সাধুত্ব সম্বন্ধীয় কথা-গুলির তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন,—নিম্নে দুই গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা তুলনা করিয়া দেখুন ।

(১) “একট গুপ্ত সো সর্বাপী ।

ধর্ম্মা চিহ্ন ন চাহৈ পাণী ॥”

মালিক মহাম্মদ ।

(১) “একট গুপ্ত আছে সবাকারে ব্যাপি ।

ধার্মিক চিনয়ে তারে না চিনয়ে পাণী ॥”

আলোয়াল ।

(২) “ধনপতি বহী জেহক সংসার ।

সব দেহ ছনিত ঘটন ভণ্ডার ॥”

মালিক মহাম্মদ ।

( ২ ) “সেই ধনপতি সব বাহার সংসার ।

সকলেই দেখে দান না টুটে ভাণ্ডার ॥”

আলোয়াল ।

( ৩ ) “হুমিরো আদি এক করতার ।

জং জীব দীর্ঘ কীহ সংসার ॥”

মালিক মহাস্বদ ।

( ৩ ) “প্রথমে প্রণাম করি এক করতার ।

যেই প্রভু জীবনানে স্থাপিল সংসার ॥”

আলোয়াল ।

এই সকল ঈশ্বরের স্তব-সূচক অংশ অনুবাদ করিতে যাইয়া আলোয়াল তাঁহার আদর্শের ভাব যথাসম্ভব সত্যতার সাহিত্য রক্ষা করিয়াছেন, উদার ঈশ্বর-স্তোত্রগুলি অনেক স্থানে মূলের মতই সুন্দর হইয়াছে, মূলের মতই তাহাতে সক্রিয় ভক্তিভাব এবং অসীম শক্তির প্রতি সর্বস্বয় বন্দনা-গীতি সরল উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছে—‘আমরা নিম্নে আলোয়ালের সরল অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—“আপন প্রচার হেতু সজ্জিল জীবন । নিজ ভয় দর্শাইতে সজ্জিল মরণ ॥ হৃগন্ধি সজ্জিল প্রভু স্বর্গ বুঝাইতে । সজ্জিলে ক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে ॥ মিষ্ট রস সজ্জিলে কুপা অনুরোধ । তিস্ত কটু কথা সজ্জি জানাইলা ক্রোধ ॥ পুষ্পে জন্মাইল মধু গুণ্ড আকার । সজ্জিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার ॥” কোন কোন স্থানে কবি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য চিন্তায় স্তব ও ভাবগম্ভীর, কুত্রাপি তাঁহার অসীম করুণা স্মরণে কৃতকৃতার্থ—“হেন দাতা আছে কোথা গুন জগজন । সবারে ধাওয়ায় পুন না যায় আপন ॥” সাধারণ প্রণয় প্রণয়ীর উপাখ্যান এরূপ ধর্ম্ম-ভঙ্গি বহুল করা হইলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পরিণত করা কঠিন হয়, লেখক কোন ক্ষুদ্র কথা বা উপাখ্যানবর্ণিত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ লইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইতে ব্যস্ত হন, সুতরাং উপাখ্যানটি কবির নিকট হইতে যথেষ্ট মনোযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিকাশ পাইয়া উঠে না । আলো-

য়ালকবি ‘পদ্মাবত’ পুস্তকের ধর্ম-তত্ত্বের অনুবাদ করিতে যাইয়া নিজের কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ব্যাপারে তাঁহার নিজের অলঙ্কারের শাস্ত্রের জ্ঞান ফলাইতে ক্রটি করেন নাই । সাধারণ আখ্যানের অনেক স্থলে আলোয়াল মূলের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজের অনেক কাব্যকথা পুরিয়া দিয়াছেন । কিন্তু গল্পটি ঠিক একটি সুন্দর কুসুমহারের ত্রায় গ্রন্থন-কৌশলে সুসম্বদ্ধ হইতে পারে নাই । মালী যেন এক রাশ সুন্দর কুসুম লইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু মালা গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই । আলোয়ালের কাব্যে নানারূপ লঙ্কিত ভাব ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা—গল্পস্থত্রে অর্দ্ধ-সংযুক্ত ও অর্দ্ধ-বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়—মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত হয়, কিন্তু কাব্যখানি অনুসরণ কবিত্তে তাদৃশ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না । ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত থাকে, সেই আদর্শের চতুর্পাশ্বে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্য্য-রাশি পল্লবিত হয় । পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু বড় আদর্শের অভাব ; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ সর্বত্র স্থললিত ভাষা, উজ্জ্বল হস্ত রসের দীপ্তি ও সৌক্যবহু প্রতিভার খেলা, পদ্মাবতীর সর্বত্র তাহা নাই, কচিৎ কচিৎ স্নেহপূর্ণ আছে এবং কচিৎ কচিৎ আলোয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ । আলোয়াল প্রচিত “ছয়ফল-মূলক ও বদীউজ্জ্বাল” পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট ; কিন্তু ইহা সুললিত কাব্যেরই ভাষা সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গালা, তাহাতে যবনী ভাষার মিশ্রণ অল্প ; আলোয়াল কবি বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইবেন । এই কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য—চট্টগ্রামের মুসলমানগণের প্রথা অনুসারে আলোয়াল এই দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য ফারসী অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিদুল্লাসেক ফারসী অক্ষর বাঙ্গালায় প্রবর্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি

শুরুতর ভ্রম করিয়াছেন,—তাহা সংশোধন করিয়া এই দুইখানি কাব্য উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক ।

### বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য ।

এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ; কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে ।

এই কাব্যে হীরামালিনী ভিন্ন অল্প কোন চরিত্র পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত হয় নাই । আদিরসের ভূতাপ্রিত নায়ক-  
বিদ্যাসুন্দরের দোষ ।

নায়িকার তোটকছন্দাঙ্কক রাণত্রিজাগরণ বর্ণ-

নায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিষ্কৃত হয় নাই । বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উদ্বেজনার ফল,—উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না । বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনী-লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে । সুন্দরের রাজ-সভায় বক্তৃতায়ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,—তাহাতে সুন্দরের চরিত্র খুঁজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয় । “শুন শশুর ঠাকুর, শুন শশুর ঠাকুর । আমার পিতার নাম বিদ্যার শশুর ।” “বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম । বিদ্যাধর জাতি মোর বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ।”—এ সমস্ত উক্তির অশিষ্টতা লিপিতার্থ্যেব নামে মার্জনীয় নহে । ভাবী শশুর মহাশয়ের নিকট কোন জামাতা যে সত্য সত্যই এরূপ ছন্দ ও ভঙ্গীতে আত্মপরিচয় দিতে পারেন,—ইহা আমাদের ধারণার অতীত । মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্ধ্ব কোটালের খরশাণ খড়্গ উখিত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত-মনে অভিধ্বন খুঁজিয়া চণ্ডীশঙ্কর প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণাস্ত অমুরাগ দৃষ্টে,—বিপদজালবেষ্টিত গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্টচিত্ত, অক্ষিপন্থী আর্কমিডাসের কথা মনে হয় ; হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্নমৃত্যু রাজা অরবিন্দারপ্রস্তু হইয়া “হারং দেহি মে

হরিণি” প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পর্ধিত কবিগণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মণানে পতিত সুন্দরকে দিয়াও ভারতচন্দ্র সেইরূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অভিনয় করিয়াছেন । সুন্দরের স্ববে ভক্তির কথা ছলভ—লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ । সুন্দর ধরা শড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল—ছন্দের প্রাতি সাবধানতা বিশেষ ; রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কথার শ্লেষপূর্ণ বাক্য-বিতণ্ডা পড়িয়া বিজয়গুপ্ত-বর্ণিত পূর্বদেশীয় বর্করগণের কথা মনে হইয়াছিল—“জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠস্তার। সব করে ঠাট্টা । ব্রাহ্মণ সম্বন্ধ তার। বৈসে চন্দ্রকাটা ॥” রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—“আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব । বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥ আলো উদর ডাগর ভোর । বিদ্যা বলে উদরী হয়েচে মোর ॥ আলো স্তনে কেন ক্ষরে পয় । বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥ আলো শখন কেন ভুতলে । বিদ্যা বলে নিরস্তর দেহ জলে ॥ আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ষ । বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম ॥” এই “মা ও মেয়ে”-প্রহসনের আর অধিক উদ্বাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয় ।

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক, কি অত্যাধিক কোন কারণেই হউক, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র হীরা মালিনী । অস্বাভাবিক হইয়াছে ; কিন্তু ভারতচন্দ্র হীরা-মালিনীর যে মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা জীবন্ত হইয়াছে । এই চরিত্রের ভাব কতকটা তাহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত না হওয়াতে, কবি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাক্যজাল বিস্তার করা আবশ্যক মনে করেন নাই ; শিক্ষিত কবির চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরা মালিনী স্বাভাবিক বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাঁটি মূর্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তৎপার্শ্বে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য

করিতে পারিবেন—‘স্বৰ্ঘ’ যায় অন্তর্গরি, আইসে যামিনী। হেন কালে তথা এক আইল মালিনী। কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হান্ত অবিরাম। গাল ভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে। কাণে কড়ি, কড়েরাড়ি, কথা কয় চলে। চুড়া বাধা চুল, পরিধান সাদা সাড়া। ফুলের চুপড়ি কাঁখে, ফিরে বাড়ী বাড়ী। আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে। এবে বুড়া, তবু কিছু গুড়া, আছে শেষে। ছিটা কোঁটা মস্ত তস্ত্র জানে কত গুলি। চেকড়া ভুলায়ে খায়, জানে কত ঠুলি। বাতাসে পাতিয়া ফাদ কোমল ভেজায়। পড়সী না থাকে কাছে কোমলের দায়। মন্দ মন্দ গতি, ঘন ঘন হাত নাড়া। তুলিতে বেকালে ফুল, আইল সেই পাড়া।” — ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল, যে সকল স্থানে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রখানি হস্ত হইতে ফেলিয়া রাখিয়া স্বভাবের আদত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, সে সকল অংশে তাহার বর্ণনা জীবন্ত ও সুন্দর হইয়াছে।

নানা দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন,

তাহার কারণ আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি—

শব্দমন্ত্র ।

ভারতচন্দ্রের অপূর্ব শব্দমন্ত্র। বাঙ্গালা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না; বাঁশীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদায় মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া একসময় বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কুপে পাড়িয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর দুইখানি বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া

গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অশাস্ত্র কবির বিদ্যাসুন্দর।

অপূর্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুই খানি বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর এক খানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে—



“বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ । বিরচিত কৃষ্ণরাম নিমতা বার বাস । তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাই ঠাই । রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই । পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গলে । রচিলেন উপাখ্যান এসবের ছলে ।”

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর<sup>১</sup> অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন ;—এই অবলম্বন অর্থে তুলনায় সমালোচনা ।

একরূপ চৌর্য্য বৃত্তি । কিন্তু প্রীতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রীতিভাষালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে—সংগ্রহ ;—প্রীতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য । প্রকৃতিতেও নূতন সৃষ্টি কিছু দেখা যায় না, শুধু পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরাবির্ভাব মাত্র । পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর-গুলির ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন ; দোমেটে মুর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে—নিম্নে তুলনার জন্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

১ । “কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি, বার ঘো ঘটে ॥ হৃদয়-মাঝারে, রাখিয়া ইহারে, নয়ন দুয়ারে, কুলুণ দিয়া । রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, দেখু সখি আলো, আঁখি মুদিয়া ॥ কহে রামা আর, গলে পরিহার, এ হার কি ছার, ফেলিলো টেনে । সাধ পূরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্ জন কবে ঘটবে এনে ॥ কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পালাইয়া যাই, এদেশ থেকে । নারী কল্যাণদে, বাঁধি নানা ছাঁদে, প্রাণ বড় কাঁদে, দেনালো ডেকে ॥”—রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর ; নাগরী উক্তি ।

১ । “আহা সখি বাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে । যোগিনী ছইয়ে, ইহারে লইয়ে, বাই পলাইয়ে, সাগর পারে ॥ কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নব রতন ভুবন মাঝে । বিরহে অলিয়া, সোহাগে গলিয়া, হারে মিলাইয়া পরিলো সাজে ॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাপা কুলময়, কোঁপায় রাধি । হলুদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া, স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাধি ॥” ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ; নাগরী উক্তি ।

২। “ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখে নু হুণায় । লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥  
নাতিপদ্মে পরিহরি মত্ত মধু পান । ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুন্ত স্থান ॥ কিম্বা লোম-  
রাজি ছলে বিবি বিচক্ষণ । যৌবন কৈশোর স্বন্দ কবিল ভঞ্জন ॥” “কোন বা বড়াই  
কাম পঞ্চ শর ভুণে । কত কোটি শর শর সে নয়ন কোণে ॥”—বিদ্যার রূপবর্ণনা,  
রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর ।

২। “কাড়ি নিল যুগ মদ নয়নহিলোলে । কাঁদে কলকীচাদ যুগ লয়ে কোলে ॥  
নাতিপদ্মে যেতে কাম কুচশল্পবলে । ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে ॥” “কে বলে  
শারদশী সে মুখের তুলা । পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলি ॥” “কেবা করে কাম-  
শরে কটাক্ষের সম । কটুতায় কোটা কোটা কালকূট সম ॥”—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ;  
বিদ্যার রূপবর্ণনা ।

৩। “উত্তম ঘটক স্তম্ভরের গাঁথা হার । বরকর্তা কস্তাকর্তা চিত্ত দৌহাকার ॥  
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন । বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়ালো বচন ॥ উলু দিছে ঘন  
ঘন পিক সীমন্তিনী । নয়ন চকোর স্তখে নাচিছে নাচনী ॥ বরযাত্র মলয়পবন বিধু-  
বর ॥ মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর ॥ উভয়ত কুটুধ রসন । ওষ্ঠাধর । পরস্পর ভুঞ্জে  
স্থখ মুখে নু উপর ॥ নুপুর কিঙ্কিণী জ্বালে নানা শব্দ হয় । দুই দলে স্বন্দ বেন চন্দন-  
সময় ॥ সঙ্গীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক । দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেক বৌতুক ॥”  
—গঙ্গার্কবিবাহ, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর ।

৩। “বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার । গঙ্গার্ক বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥  
কস্তাকর্তা হৈল কস্তা বরকর্তা বর । পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥ কস্তাযাত্র  
বরযাত্র ঋতু হয় জন । বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥ নৃত্যকরে বেশরে নুপুরে  
গীত গায় । আপনি আসিয়া রতি এয়ে হৈল তায় ॥ বিক দিক অধিক আছিল সখী  
তায় । নিশাস আতসবাজি উত্তাপে পলায় ॥ নয়ন অধর কর জঘন চরণ । দুইর কুটুধ  
স্তখে করিছে ভোজন ॥” গঙ্গার্কবিবাহ, ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ।

৪। “কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই । রাজা বলে কাট চেরে মশানে  
বাধাই ॥ আঁখি চেরে আর বার করে নিবারণ ॥” রাজসভায় সুন্দর, রামপ্রসাদী  
বিদ্যাসুন্দর ।

৫। “চাহে কাটিতে কোটাল, চাহে কাটিতে কোটাল । নয়ন ঠারিয়া মানা করে  
মহীপাল ॥”—ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ।

৫। “অশ্রু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে । চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে । জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই । আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই ॥” মালিনীর বেসাতি ; কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর ।

৫। “আটপাণে আধ সের আনিয়াছি চিনি । স্নান লোকে ভুয়া দেয় ভাগো আমি চিনি ॥ হুলত চন্দন চুয়া লজ্জা জায়ফল । সুলভ দেখিছু হাটে নাহি যায় ফল ॥” ভারত-চন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ।

৬। “বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ । হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ ॥ সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী । সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে স্বজনী ॥” প্রথম-মিলন—কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর ।

৬। “হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে । কি ডাকে ধলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥”  
—ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দর ।

কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল । কংস-সভায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিতে গেলে তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—  
“কংসের গায়ন বার, যে বীণা বাজায় তার, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গায় ।”  
কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উথিত হইয়াছিল, তদ্বারাও সেইরূপ পদার্পণমাত্র অতুদ সৌভাগ্যশালী ভারতচন্দ্রের গুণ-কথাই জ্ঞাপিত হইল ; পূর্ববর্তী কবিদ্বয় শ্রাব্য প্রাণসংসা হইতে বঞ্চিত হইয়া হতাদৃত অবস্থার স্থানে স্থপ্ত হইলেন এবং সমালোচকবর্গের জন্ত এই নীতি-সূত্র ফেলিয়া গেলেন,—ভাগ্যবৃক্ষই সর্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় কাটা বনের শ্রায় পদতল ক্ষত বিক্ষত করে মাত্র । আমরা এস্থলে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব ।

কবি কৃষ্ণরামদাস অম্বুমান ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার নিকট-  
কৃষ্ণরামদাস ১৬৬৬ খৃঃ বর্তী বেলঘরিয়া ষ্টেশনের আশ ক্রোশ  
পূর্বে নিম্নতাপ্রাণে কায়স্থকূলে জন্ম গ্রহণ

করেন ; তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস । ১৬৮৬ খৃঃ অক্কে তিনি এক দিবস জৈনিক গোয়ালার ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই রজনীতে ব্যাভ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দরবনবাসী দেবতা তাঁহাকে স্বংসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা “রায়মঙ্গল” হইতে সেই অংশ ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি । এই কাব্যরচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার ‘কালিকামঙ্গলের’ অন্তর্গত । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তহরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরামকবির বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা ; এই পুঁথি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই,—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের ৩০।৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । পূর্বোক্ত দুইখানি কাব্য ছাড়া কৃষ্ণরাম “অশ্বমেধপর্বে”র একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন । কবি-কৃষ্ণরাম চৈতন্ত্যোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি চৈতন্ত্যবন্দনায় লিখিয়াছেন—“যথায় কীর্তিত হয় চৈতন্ত্য চরিত্র । বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র ॥ তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা) প্রেমে নৃত্য করে । জীবন স্মৃতি তার ধন্ত দেহ ধরে ॥ হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কষ্টী ধরে যত । তাহা সবাকারে যোর প্রণাম শত শত ॥” \*

বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর-অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে

১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্ম-  
রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮ খৃঃ ।

প্রহণ করেন । তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন ; + রামরাম সেনের দুই বিবাহ ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র, ৩ দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা, ও ভবানী নামী কন্যাদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও

\* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়ের “কবি কৃষ্ণরাম” শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য ১৩০০ সন. ২য় সংখ্যা, ১১৭ খৃঃ ।

+ “রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয় অভয়া । তৎস্তুত রাম-প্রসাদে, কহ কোকনপদে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কর দয়া” কবিরঞ্জন ।

বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন । কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ-দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় ভগ্নী ভবানীর পরিণয় হয়,—এই ভগ্নীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন । রাম-প্রসাদের রামহুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামী দুই কন্যা হইয়াছিল । এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর এবং বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পাই যে, রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষগণ ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন ;—“শিশুকালে মাতা মৈল, রাজ্য নিল চোরে” বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন । কবির প্রিয় পুত্র রামহুলালের বংশ লুপ্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালাপদসেন এখনও বর্তমান ; ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত আঙ্গুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেছেন । গত পোনের বৎসর যাবৎ হালিসহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে । রামপ্রসাদ সেন কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সমসাময়িক, এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রামপ্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে “গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ ।” যে বৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উত্তীর্ণ করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয় । কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময় কুমারহট্টে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি দিয়া-ছিলেন ও তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়-নিম্পূহ কবি স্থায় পল্লীতে বসিয়া শ্রামা-সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও অপর সকলকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন নাই । কবি লিখিয়াছেন, কুমারহট্টে রামকৃষ্ণের মণ্ডপে তিনি সিদ্ধি-কামনায় যোগ অর্চনা করিতেন, কিন্তু কোন দৈব-ঘটনাহেতু সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই । এবিষয়ে নিজের অপেক্ষা তাঁহার জীব

পুণ্যবল বেশী ছিল বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন,—“ধন্য দায়া, স্বপ্নে তারা, প্রত্যাদেশ তারে । আমি কি অবশ্য এত বিমুখ আমারে । জন্মে জন্মে বিকায়েরি পাদ পড়ে ভব । কহিবার নহে তাহা সে কথা কি কব ॥”

কথিত আছে, রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন, জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের অরণ্যে পথহারা পাহের ন্যায় কবি মধো মধো হিসাবপত্রের ধারে দুই একটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব করিতেন ; একদিন জমিদার মহাশয় সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির হিসাবের খাতায়,—“আমায় দে মা তবিলদারী । আমি নেমকহারাম নই শকরী ॥” প্রভৃতি পদ পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ও কবিকে ৩০ টাকা পেন্সন দিয়া ঘরে যাইয়া শ্রীমা-সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন । তদবধি কবি কুমার-হট্ট গ্রামে তাঁহার সংগীতযুক্তাবলী ছড়াইতে লাগিলেন । শৃঙ্গল-বিমুক্ত পক্ষীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাভর্জন কবিতা সুধামাখা গানে জগৎকে সুখী করিলেন ।

প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন আব একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহার কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় ; ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্রীমসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন । কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে “কালীকীর্তন” রচনা আরম্ভ করেন ; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—“শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন । রচি গান মোহকের ঔষধ অঞ্জন ॥” ভারতচন্দ্র ও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ-জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন,—“মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার ।” (অন্নদামঙ্গল) । ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে, যে বৎসর রোহিলাদিগকে উৎসন্ন করিয়া ঈংরেজ-সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বৎসর রাম-প্রসাদের মৃত্যু হয় ।

কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত ‘বিদ্যাসুন্দর’, তাঁহার ‘কালিকা-

মঙ্গল'র অন্তর্গত, এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে ; কারণ বিদ্যাসুন্দরকাব্যখানি কবিগণের সকলেই কালীনামাঙ্কিত মলাটে পুরিয়া শোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গল'র অন্তর্কর্ত্তী ; এষ্টমতের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে 'কালিকামঙ্গল' পাওয়া যায় নাই । 'কালীকীর্তন' ও 'কালিকামঙ্গল' এক কাব্য বলিয়া বোধ হয় নী ; 'কালীকীর্তন' একখানি গীতিকাব্য, ঠহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পালার স্থান নির্দিষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে ।

রামপ্রসাদ কোন স্থলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাঁহার বৃত্তিদাতা জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই ; রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আজ্ঞাক্রমে কালীকীর্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । যে সময় রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়দাতাদিগকে কল্লনার স্বর্ণখট্টায় স্থাপিত করিয়া স্বর্ণ মর্ত্ত্যের যাবতীয় উপমার উপচোকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামপ্রসাদের তোষামদবৃত্তির প্রতি এই সগর্ভ উপেক্ষা প্রাশংসনীয় বলিয়া স্বীকার্য্য করিতে হইবে ।

রামপ্রসাদের গানের এক শত্রু ছিল, তাঁহার নাম আজু গোসাঞি ; ইনি রামপ্রসাদী গানের সময়ে সময়ে যে টিপ্সনী করিতেন, তাহা বেশ হাস্যরসোদ্দীপক, যথা রামপ্রসাদের গান,—“এ সংসার ধোকার টাটি । ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি । ওরে কিত্তি বহি বায়ু জল শূন্যে অঁতি পরিপাটি ।”—তদুত্তরে আজু গোসাঞির গান,—“এই সংসার রসের কুটী, খাই দাই রাজত্ব বসে মজা লুটি । ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বৃষ্ণ তুমি মোটামুটি । ওরে ভাই বহু দার' হত পিড়ি পেতে দেয় দুখের বাগী ।”

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দৌলার সাক্ষাৎ এবং তাঁহার গান শুনিয়া

নবাববাহাদুরের অনুগ্রহপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে ; ধর্মসম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলৌকিক প্রবাদের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক । কালী কত্তারূপে কবির বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ; কাশীতে বাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া-ছিলেন ; কালীনাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র জেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয় ;—এইসব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় এবং ব্যয়ের আবশ্যক, তাহা আমাদের এখন আশ্রয় নাই ।

বাহারী কৃষ্ণচন্দ্র রাজার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্মপ্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ । আমরা রামপ্রসাদের নিম্নলি ভক্তি বিহ্বলতায় মুগ্ধ, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্বদা পক্ষপাতী ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি ; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গহিত রুচি দোষ-হৃষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথ-প্রবর্তক । ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসপূর্ণ কবিতা আপাতসুন্দর করিয়া দেখাইতে পাবেন নাই ; কিন্তু তাহা শক্তির অভাব জন্ত,—ইচ্ছার ত্রুটিহেতু নহে ।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপব নাম ‘কবিরঞ্জন’ । ‘কবিরঞ্জনে’ রাম-প্রসাদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর । কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই ; বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই,—উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,—“সহজে কলঙ্ক সে তবাস্ত্র সগ্ন নহে ।” “জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে ।” “ক্ষেপ করে দশদিক্ লোষ্ট্র বিবর্জনে ।” “পূর্ণচন্দ্র শোভা বেন পিবতি চকোর ।” কালীকীর্তনে,—“বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগুহি জাগুহি । আগত ভায়ু রজনী চলি যায় । উঠ উঠ প্রাণ দৌরী, এই দিকটে দিদি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি । সূত মাগধ বন্দী, কুতাজলি কথয়তি, নিত্রাং



জহিহি জহিহি ।” এইরূপ সংস্কৃত পদের প্রভাবে বাঙ্গালা কবিতা একান্ত শ্রুতিকটু হইয়া গিয়াছে । কৃষ্ণদাসকবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে যাঁহা উপহাসজনক অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন । কিন্তু রামপ্রসাদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,—সে স্থলে তিনি বাগ্‌দেবীর আদরের কবি ; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে ; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইতে বাগ্র ছিল, এই ছুঁচু রুচির সংক্রমণে যখন রামপ্রসাদের শ্রায় ভাবপ্রধান কবিকেও আমরা লোকমনোরঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন ক্রমাদের ইডেন উদ্যানে এডাম এবং ইভের মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

“The unwieldy Elephant,

To make them mirth, used all his might, and wreathed  
His lithe proboscis” Paradise Lost ; Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, “গোশূর্গে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত” প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় মেন উন্নতা রাধিকার \* শ্রায় তিনি পদের অলঙ্কার কণ্ঠে ও কর্ণের দুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই সব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন,—একটু সাধারণ সৌন্দর্য্যবোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরূপ চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ডশ্রমের শ্রশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উখিত হইয়াছে ।

\* “রাই সাজে, বাঁশী বাজে, না পড়িল উল, কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল । মুকুরে আচরে রাই বাঁধে কেশ ভার, পদে বাঁধে কুলের মালা না করে বিচার । কয়েতে নুপুর পরে জন্মে পরে তাড় । গলাতে কিকিণী পরে, কটিতে হার । চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা । স্মিয়ার উপরে পরে বহুরাজপাতা । শ্রবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা । নয়ন উপরে করে ঘেঁষীর রচনা । বংশীদাসে বলে যাই বলিহারি । রাই-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি ।”

কিন্তু শিক্ষার ধূতপটলের পুঞ্জীকৃত আধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে  
রামপ্রসাদের কতকগুলি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ  
কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন ।  
রচনা দৃষ্ট হয় । মেঘ-বিমুক্ত কিরণ রাশির ভ্রায়  
সেই সব স্থল তৃপ্তিপ্রদ ; আমরা কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন হইতে দুইটি  
ছল উঠাইয়া দেখাইতেছি,—

(১) “গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে । উমা কেঁদে করে  
অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে  
উদয় শশী, বলে উমা ধবে দে, উহারে । কাঁদিয়া ফুলাল অঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে  
ইহা সহিতে কি পারে । আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি  
কোথারে ॥ আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥”  
কালীকীর্তন ।

(২) “প্রথম বয়সে রাই রসরসিণী । ঝলমল তমুকটি হির সৌদামিনী ॥ রাই  
বদন চেয়ে ললিতা বলে ॥ রাই আমার মোহন মোহিনী ॥ রাই যে পথে প্রবাণ করে,  
মদন পলায় ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুসুম শরে । কিবা চাঁচর স্তম্ভর কেশ,  
সখি বকুলে বানাইল বেশ । তার গঞ্জে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ ।  
নবভাসু ভালেতে বিকাশ । মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ ॥” কৃষ্ণকীর্তন ।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন, বৈষ্ণব-নিন্দায় একটু বিজ্ঞপ-  
শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—“খাসা চীরা বহির্বাস  
রাঙ্গা চীরা মাথে । চিকণ গুথডী গায় বাকা কোংকা হাতে ॥ মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে  
ঠাই ঠাই ছাব । দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব ॥ পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান  
সাত আট ।” ডেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট । এক এক জনার খুমড়ী দুটি  
দুটি । দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি ॥ ভুগলামি তাবে ভাব জন্মে থেকে  
থেকে । বীরভদ্র অদ্বৈত বিবস ডেকে উঠে ॥ সে রসে বসিক নবশাক লোক যত ।  
উঠে ছুটে পার্শ্ব পড়ে করে দণ্ডবত ॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী । ভালমতে  
সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥ গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া ঝংকে বাবাজির কাছে । মনে মনে ভয়  
অপরাধী হয় পাছে ॥” বিদ্যাসুন্দর ।—আধুনিক কালের এক জন সুপ্রসিদ্ধ  
কবি শৈব এবং শাক্ত সন্ন্যাসীগণের যে বর্ণনা দিয়াছেন,—তাঁরা পূর্বো-

ক্ষুত কবিতাটির উত্তর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা—“দিন ছুপুরে সন্ন্যাসী-  
দল এসে জুটল। “হর হর” এই রবেতে সে ঘর পুরিল। গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি  
নাম “অহংকার”। বিভূতিভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাতার ॥ পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি  
আয়ত্ন নেশায়। ঢালে, সাজে, সাজে, ঢালে,—সদাই গাঁজা খায়। হাতে চিমটে  
গলায় গাঁথা রুদ্রাক্ষবিশাল; গাঁজায় দেয় দম্, বলে বোম বোম, সদা বাজায় গাল;  
অভিমানের হাঁড়ি জেন নরে হেয় জ্ঞান; জ্ঞানের তত্ত্ব সেই বুঝেছে আর সবে অজ্ঞান।  
পাঁচটি চেলা পাঁচটি অম্বর এমনি বলবান, চক্ষুগুলি কুঁচের মত বয়সে, জোয়ান; বাহগুলি  
লোহার গোলা তাতে মাখা ছাই। খেয়ে উদম ধর্মের ঝাঁড় সম কিছুই চিন্তা নাই।  
ধর্মের ধার কেউ ধারে না, কাজের মধ্যে তিন। গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুস্তিতে  
প্রবীণ। অপভ্রান্ত হাই কথা কয় শুনে সরস লাগে। আশে পাশে, জীলোক বসে  
মনে তা না জাগে ॥”

কালীকীর্তনে রামপ্রসাদ কালীঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন,  
তাঁহার রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার আরাধ্যা দেবতা যে  
কৃষ্ণের মত সকল কার্য্য করিতেই পারেন, কালীকীর্তন দ্বারা তিনি এই  
তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন; কালীর ‘রাসলীলা’ ও ‘গোষ্ঠ’ বর্ণনা পড়িয়া  
শাক্তমহাশয়গণ অবশ্যই স্তীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজুগোসাঞি এই  
মধুরভাবে একটু বিদ্রূপের অল্প নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের গাঢ় রসসম্ভোগে  
বাধা দিয়াছিলেন যথা,—“না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আম সব, মেয়ে হয়ে যেহু  
কি চরায় রে। তা যদি হইত, বশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে ॥” জীলোকের  
যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে মেহাতুরা যশোদা গোপালের  
গোষ্ঠ গমনে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। ‘কৃষ্ণকীর্তন’ সম্পূর্ণ  
পাওয়া যায় নাই, যে ছুই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি মধুর।

কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ কাব্য রচনার জন্ত নহে, ভিক্ষা গান রচনা

করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন,

প্রসাদী সংগীত।

তাহাতে কালীদেবী মেহময়ী মাতার ছায়

চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সম্বল শিশুর ছায় মধুর শুন শুন স্বরে কখনও

তঁাহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধামাখা স্নেহ-কথা বলিতেছেন ; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি—স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা-মাখা,—এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তঁাহার ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেণ,—শিশুর কথা, তাহা পণ্ডিত ও কুবকের তুল্য বোধগম্য ; সেই সংগীতের সরল অশ্রুপূর্ণ আবদারে সাধক-কণ্ঠের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । শিশু যেমন মায়ের হাতে মা'র খাটয়া 'মা', 'মা', বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলে বাইতে চায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সাংসারিক দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও 'মা', 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া তঁাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভর-মিষ্ট সাক্ষর গীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে । আমরা গীতিশাখায় এই গানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব । রামপ্রসাদ তঁাহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছিলেন,—“গ্রন্থ বাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ।” তঁাহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর দ্বারা পুরাভূত হইয়া আজ ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে,—তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের লোকগণও কাব্য ফেলিয়া তঁাহার গানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল,—“বাদুলী ভাবনা বস্ত্র সিদ্ধিৰ্ভবতি তাদুলী ॥”

ভারতচন্দ্ররায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃঃ অব্দে ভূরসুট পরগণাস্থ হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তঁাহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণরায় ভূরসুটের জমিদার ছিলেন; তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন । কথিত আছে, কোন ভূমি সংক্রান্ত সীমানির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন্দ্রনারায়ণরায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন । মহারাণী এই বাৎসব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত্র সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্দ্রনারায়ণের

বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন, তাহারা বহুসৈন্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ ‘ভবানীপুরগড়’, ও ‘পেঁড়োরগড়’ প্রভৃতি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয় ।

নরেন্দ্ররায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন ; ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় ‘নাওয়াগাড়া’ গ্রামে যাইয়া তাজপুত্র টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পড়িলেন এবং অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদাগ্রামে কেশর-কুনি আচার্য্যদিগের বাড়ীর একটি কছার পাণিগ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ এই বিবাহে তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া ছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল । গুরুজন-কর্তৃক তিরস্কৃত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত দেবা-নন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্রমুন্সী নামক জটনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাঁহার আশ্রুকূলে তিনি ফার্সি শিক্ষা করেন ; এই মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি স্বকৃত ‘সত্যপী-রের কথা’ পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন ; এই সময় তিনি হুইথানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক-খানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল, এই পুঁথির শেষে সময় নির্দেশ করা আছে,—“ব্রতকথা সাক্ষ পাণ্ড সনে রুজ চৌগুণা ।” অর্থাৎ ১১৩৪ সাল (১৭২৭ খৃঃ) । ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবার তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন । ইতিমধ্যে নরেন্দ্ররায় পুনশ্চ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি যথাসময়ে রাজসরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তথায় আক-স্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন । কারা হইতে কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্দ্র ত্রিক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট নামক স্রবদারের অনুগ্রহে পাণ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা মূল্যে

প্রতিদিন এক একটি ‘বলরামী আটকে’ প্রাপ্ত হন ; এই সময়ে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মে অমুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অমুরাগ মণ্ডে মণ্ডে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিজ্ঞপে পরিণত হইতে দেখা যায়,—“চল বাই নীলাচলে । খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে ।” এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্বন্ধপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয় । যাহা হউক কবি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি এতদূর কৃপাপরবণ হইলেন যে, তিনি বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হগলীস্থিত থানাকুল গ্রামে শালীপতির বাড়ী, এই মহাশয় নবীন সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন ; অতঃপর বৃন্দাবনে স্নান যাইয়া কবি শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে স্বীয় শ্বশুরবাড়ী সারদা গ্রামে উপস্থিত হইলেন । তিনি জীব আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না,—নিজেব অভ্যস্ত ব্যঙ্গ সহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন—“দুই জী নহিলে নহে স্বামীর আদর । সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর ।”

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাঁহার জীকে সেস্থান হইতে নিজ বাটীতে পাঠাইতে নিবেদন করিয়া, কবি ফরাশভাঙ্গায় উপস্থিত হন ; তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দুনারায়ণচৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া কতকদিন অতিবাহিত করেন । এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০ টাকা বেতনে সত্যকবি নিযুক্ত করেন । এই রাজসভায় তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার বিকাশ পায় কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয় । চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনোপলক্ষে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পালা বিরচিত হয়, ও তাঁহার বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অমুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধূয়াতে পরিণত হইয়া যায় । বৃন্দাবনপ্রত্যাগত কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয় ; ইতিমধ্যে রাজা ঋষিকে মূল্যবোধগ্রাম ইচ্ছা দিয়া তাঁহার বাটী নির্মাণ সম্বন্ধে আহুকূল্য করেন, কিন্তু সেইস্থান

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্দ্ধমান রাজ্যের কর্মচারী রামদেব নাগের নিকট পত্ৰনি দিতে হয় ; এই নাগমহাশয়ের অত্যাচার সহ করিয়া কবি অতি সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির এক দিকে হাসি, অপর দিকে কান্না, উহা অল্প মিষ্ট ; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাসি রাখিতে পারেন নাই এবং দয়াপরব্রণ হইয়া কবিকে আনন্দপুরের গুপ্তে গ্রামে ১০৫/ বিঘা এবং মুলাঘোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন । ৪ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমুত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন ; কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাঁহার প্রিয় কবিকে “রায়গুণাকর” উপাধি দিয়াছিলেন ।

রায় গুণাকরের ‘অন্নদামঙ্গল’ তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ; এই

অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত ; প্রথমভাগে  
দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্মাণ,

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর পালা, ও তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্তৃক যশোর-বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে । অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি ‘রসমঞ্জরী’, অসম্পূর্ণ ‘চণ্ডীনাটক’, ও বহুসংখ্যক হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ।

আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অতি নিকট মনে

করি ; বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে  
দেবচরিত্রের দুর্গতি । আলোচনা করিয়াছি ; অপরাপর কাব্যেও কবি

জীবনের কোন গূঢ় সমস্তা ক্রি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই ; ‘নির্বাত নিরুপ্ত দীপশিখার’ ত্রায় মহাবৌদ্ধি মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন,

শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয়া দাড়াইয়াছে,—“কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল ।  
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল । কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া । ছাই মাটি  
কেহ গায় দেখে ফেলাইয়া ।” দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন  
শিবশক্তিউপাসক কবির যোগ্য হয় নাই । তারপর নারদ ঋষি কলহের  
দেবতা, ঢেঁকি বাহনে আসিয়া সাপের মস্ত বকিতেছেন, যে নারদের নাম  
শুকদেবও প্রহ্লাদ হইতে উচ্ছে, তাঁহার এই হুর্গতি দেখিয়া ভাগবতগণ  
কবিকে প্রশংসা করিবেন না । মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের ঘরের  
আদর্শ জননী ; যশোদা ও মেনকার অশ্রুপূর্ণ অপত্য-স্নেহে বঙ্গের স্নেহা-  
তুরা মাতাগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি নির্মল ধর্মভাবে উন্নীত হইয়াছে,  
ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা-চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন,—  
“ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে তাজি লাজ ভয় । হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছেড়ে কয় ।  
ওরে বুড়া জাঁকুড়া নারদ অগ্নেয়ে । হেন বর কেননে আনিলি চক্ষু খেয়ে ।” যাহা-  
হউক স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখ-  
চিত্র এই সব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে ; “উমার কেশ চামর ছটা,  
তামার শলা বুড়ার জটা । উমার মুখ চাঁদের চূড়া । বুড়ার দাড়ী শণের লুড়া ।” কিংবা  
“আমার উমার দন্ত মুকুতা গগন । বায়ে নড়ে ভাস্ক্য বেড়া বুড়ার দশন ।” প্রভৃতি পাঠ  
করিলে মনে হয় দ্বিতীয়ার শশিকলার ছায় স্নন্দরী কুমারীগণ সামাজিক  
অত্যাচারে শিথিলদন্ত বুদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিসদৃশ খেলার অভিনয়  
করিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি  
শিব-প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সমাজের এক অধ্যায় উদঘাটন করিয়াছেন । পিতা  
মাতা কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় “বাঘ ছাল দিয়া বস্ত্র, দিয়া পৈতা কলী”  
বলিয়া জরাগ্রস্ত বরের নব-সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেন ।

কাব্য সাহিত্যে উপমা একটি ইঞ্জিতের ছায়, উহাতে রূপের চিত্রখানি  
উপমার বাহল্য ।

সুন্দর হইয়া উঠে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ লইয়া  
বেশী নাড়া চাড়া করিলে সৌন্দর্য্যের হানি হয় ;

এজগৎ উপমা যত অল্প কথায় ব্যক্ত হয়, ততই উহা সুন্দর হয় । সৌন্দর্য্য-



সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহার প্রতি আভাষে ইঙ্গিত করিতে হয় ; তাহাতে অসীম বিস্ময় জাগিয়া উঠে,—জলে নামিলে অনন্ত জলরাশির শোভা দর্শন ঘটে না, সমুদ্রের কতকটা অংশে দৃষ্টি এবং গতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে । উপমার আতিশয্য ভাল নহে; উহাতে চিত্রগুলি কুঋটিকা-পূর্ণ হইয়া পড়ে । বিদ্যারূপ ব্যাখ্যা করিতে যাঁইয়া ভারতচন্দ্র নিজের বিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, আমরা তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । অন্তর্পূর্ণার রূপবর্ণনাও বাহ্য্য দোষ-বর্জিত নহে :—

“কথায় পঞ্চমন্ডর শিখিবার আসে ।

দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে ॥

কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিগিতে ঝঙ্কার ।

ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ।

চক্ষুর চলন দেখি শিগিতে চলনি ।

ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ।

দলে দলে কোকিল কৈকিলা, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী, এবং খঞ্জন খঞ্জনী কর্তৃক অনুসৃত্য দেবী শিক্ষয়িত্রীর পদে বসিত হইয়া এখানে কি বিড়ম্বিত হন নাই ? বাস্তবিক রাবণের পুত্রী নিদ্রিত সুন্দরীগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন —“ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তঃ মন্তবটপদাঃ । অমুজানীব ফুলানি ঞ্চার্ঘ্যন্তি পুনঃ পুনঃ ॥” এবং কালিদাস কর্ণাস্তিকচর ভ্রমরকর্তৃক উৎপীড়িত শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অল্প কথায় সেই চিত্রগুলি কেমন সুন্দর হইয়াছে ! কিন্তু “সর্বমত্যন্তগর্হিতঃ” ভারতচন্দ্র সেই রাগের অতি-রঞ্জন চেষ্টা করিয়া ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন ।

শিব-পার্বতীর কলহের আরম্ভে,—“গুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ।

গৃহস্থালীর এক অঙ্ক ।

আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥” হইতে ত্রিশিবের

পরাজয়-সূচক—“ভবানীর কটুভাবে, লজ্জা হৈল কুন্তি-

বাসে, ক্ষুধানলে কলেবর দহে । বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিণ্ডে হৈল গলা ভিক্ত, বৃদ্ধ লোকে  
 ক্ষুধা নাহি সহে ।” ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাকাগিন্নির নিত্য  
 ঘরকন্নার অভিনয় শ্লেষ ও বিজ্ঞপের বর্ণে ফলিয়া বড় সুন্দর হইয়াছে । এই  
 ভাবের আরও অনেক দৃশ্য কবির তুলীতে উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে ;  
 কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছুঁইতে পারিতে-  
 ছেন না ; একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা-  
 পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর  
 প্রাণংসা প্রাপ্য ; চিত্রকরের চিত্র কবির মস্তিস্কত তুলীর স্পর্শে প্রাণ পায়,  
 ভারতচন্দ্রের তুলী প্রাণদান করিতে পারে নাই । তাঁহার কাব্যে কোন  
 বর্ণনা শ্রাণহীন । স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্ম-  
 স্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের  
 কোন অংশ পবিত্র কবে নাই ।

কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাঁহার প্রতি  
 শব্দময়ঃ  
 সুবিচার হইবে না ; ভাব-যুগ গতে সাহিত্যে  
 শব্দ যুগ প্রবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্দ্রের  
 ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রাচীনকালের  
 সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে ; তাঁহার মত কথায় চিত্র হরণ করিতে  
 প্রাচীনকালের অত্র কোন কবি সক্ষম হন নাই । তিনি উৎকৃষ্ট  
 শব্দ-কবি ; এই শব্দময় কি পদার্থ তাহা নিম্নোক্ত পদগুলি পাঠে  
 প্রতিপন্ন হইবে ; ‘ম’কার, ‘ল’কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা যে বাহু  
 প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর জায়  
 স্থান বিশেষে অর্গশূত্র হইয়াও চিত্তবিনোদনে ক্ষমবান,—

(১) “কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে । বসিলা অন্নপূর্ণা মণিমেউলে ।  
 কমল পরিমল, লয়ে লীতল জল, পবনে ঢল ঢল, উছলে কুলে । বসন্তরাজা আনি,  
 ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক ফুলে । কুহুমে পুনঃপুনঃ, ত্রয় গুনগুন,

মদন দিলা গুণ ধনুক হলে । যতেক উপবন, কুম্ভমে হুশোভন, মধু মুদিত মন ভারত ভুলে ॥” অন্নদামঙ্গল ।

(২) শুনলো মালিনী কি তোর রীতি । কিঞ্চিৎ রূপে না হয় ভীতি ॥ এত বেলা হৈল পূজা না করি । ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জলিতা মরি ॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে । কালি শিখাইব মায়ের আগে ॥ বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট । রাঁড় হৈয়ে বেন বাঁড়ের নাট ॥ রাত্রে ছিল বুঝি বধুর ধুম । এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥ দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা ॥ মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা ॥ কি করিবে তোরে আমার গালি । বাপারে বলিয়া শিখাব কালি । হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে ॥ ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥ কাঁদি কহে “শুন রাজকুমারী । ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥ চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা । তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥ বুঝিতে নারিহু বিধির ধন্ম । করিহু ভালরে হইল মন্ম । ভ্রম বাড়িবারে করিহু শ্রম । শ্রম বৃদ্ধা হৈল ঘটিল ভ্রম ॥ বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ । অন্ত গেল রোষ উদয় রস ॥ বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার । এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥ পুনঃ কি যোবন ফিরে আইল । কিবা কোন বধু শিখায়ে গেল ॥ হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে । যোবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥” বিদ্যাসুন্দর ।

(৩) “জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংশদানবধাতন । জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জকাননরঞ্জন ॥ জয় কেশিমর্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগমোহন ॥ জয় গোপবালক, বৎস পালক, পুতনাবকনাশন ॥” অন্নদামঙ্গল ।

শেষ পদটিতে ৩ তরুণ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার হরগৌরীমিলন হইয়া গিয়াছে, এই পরিণয়-ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের আশ্রয় গলদবর্ষ হইয়া পড়েন নাই ; হাসিয়া খেলিয়া যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিয়াও তাহা পারেন নাই । ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি শ্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের আশ্রয় তাহা আশ্রাস ও আড়ম্বরশূন্য । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে মিশ্র ও উজ্জল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র, চিত্রের আশ্রয় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে । ব্যাসের কাশী নির্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মান-

সিংহের সৈন্তে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বামী লইয়া দ্বন্দ—এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও আমোদকর হইয়াছে । স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোন মহামহিমাম্বিত মূর্তির অপূৰ্ব্ব অবতারণা হইয়াছে ; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্য-সাহিত্যের শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগা—ইহাতে কবির ভাষা ও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে ;—

“মহাকল্প রূপে মহাদেব সাজে ।

ভভন্তম্ ভভন্তম্ শিখাবোর বাজে ॥

লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা ।

ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা ॥

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ গাজে ।

দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥

ধকধক ধকধক জলে বহিতালে ।

ভভন্তম্ ভভন্তম্ মহাশঙ্ক গালে ॥

\* \* \* \*

ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে ।

উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥

\* \* \* \*

অমুরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।

অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে ।

সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥”

ধ্বজাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—“ছলচ্ছল, টলটল, কল কল তরঙ্গা ।” এই ছত্রে তরঙ্গের তিনটি ঞ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে, “ছল চ্ছল”—জলের প্রবাহব্যঞ্জক, “টলটল”—জলের নিখলতাব্যঞ্জক,

‘কলকল’ জলের নিকণব্যঞ্জক,—গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই ।

এই শব্দ ও ছন্দৈশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া জটৈক সমালোচক ভারতচন্দ্রের কাব্যগুলিকে “ভাবার তাজমহল” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ।

এস্থলে বলা উচিত- বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বরকচিকৃত কাব্যে উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান ।

বর্ণিত আছে ; কৃষ্ণরামও ঘটনা-স্থান বর্দ্ধমান বলিয়া বর্ণন করেন নাই ; রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই স্থান নির্দেশে প্রতারণিত হইয়া কেহ কেহ এখনও স্ফুট দেখিতে বর্দ্ধমান ভ্রমণ করেন । বর্দ্ধমানে বিদ্যার স্ফুট নির্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব হইতে বিদ্যাসুন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব, আমরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে কবি আলোয়ালকে এই স্ফুটের বিষয় উল্লেখ করিতে দেখিতেছি, যথা ‘ছয়ফলমূলক ও বদিউজ্জমাল’ পুস্তকে—“বিদ্যার হরঙ্গ আদি সিন্ধু জগন্নাথ নদী, একে একে সব বিচারিল ।” এস্থলে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই । বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অতৈক্য আছে, কৃষ্ণরাম মালিনীকে ‘বিমলা’ নামে অভিহিত করিয়াছেন,—সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধেও তাঁহার গল্প একটু স্বতন্ত্র রকমের, রামপ্রসাদ ‘বিহ্বান্ধগী’ নামক একটি নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ও চোরধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন করেন নাই । যাহা হউক, এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি এক-রূপ । ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ডিউসাহার নীলমণি কণ্ঠান্তরণ গায়ন-কর্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব প্রথম গীত হয় । ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্তী নামক জটৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি পাগলের জ্বায় নদীর তীরে বসিয়া কুপ খনন করিয়াছিলেন ।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্বত্রই কথার বাধুনি  
 প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাখা ; ‘অনুকূল’শীর্ষক  
 ছোট কবিতা ।  
 ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা  
 তাঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,—“ওলো খনি প্রাণধন, ওন মোর নিবেদন  
 সরোবরে স্নান হেতু যেওনালো যেওনা । যদ্যপি বা যাও তুলে, অকুলে ঘোমটা তুলে,  
 কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা ॥ মরাল মৃগাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে,  
 নিকটে আইলে ভয় পেওনালো পেও না । তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে  
 দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি, যেওনা লো যেও না ॥”

এই বিকৃতিরূচি ও পদলালিত্য কাব্য সাহিত্যের আদর্শ হইল । গীতি-  
 কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের  
 সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ ।  
 পালা স্থান পাঠিয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা  
 আলোচনা করিব । কিন্তু এই সময়ের যতগুলি বড় কাব্য পাওয়া যায়,  
 তাহার একখানিতে ভিন্ন নির্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । এই সাধারণ  
 নিয়ম-বহির্ভূত, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসু  
 কাব্যের নাম—“মায়া তিমির চন্দ্রিকা”; এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমা-  
 দরের ঘোণা, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব । ভারতচন্দ্রী  
 বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে  
 “চন্দ্রকান্ত”, কালীকৃষ্ণ দাসের “কামিনীকুমার” এবং রসিকচন্দ্র রায়ের  
 “জীবনতারা” এই কাব্যত্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাভ্যাস করিয়া-  
 ছিল । এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জিত, কিন্তু রচনা এত অলীল যে  
 উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও লজ্জিত হইতেন । শুধু কঠোর সমালোচনা  
 করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্যলেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না,  
 তাঁহার নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাতযোগ্য । এই তিনখানি কাব্যেই  
 কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে ; কালীনামের সঙ্গে সংশ্রব হেতু  
 আগাদিগের বৃদ্ধগণ এইসব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব

দেখিয়াছেন, এবং প্রাণিপাতপুরঃসর নিজাম ধর্ম-পিপাসার সহিত উপা-  
খ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন । দেব দেবীগণ যখন এই ভাবে পাণের আবরণ  
হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে  
মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । বর্ণিত  
নারীচরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয় । ফুল্লরা,  
খুল্লনা ও বেহলার আয় হুঃখসহনক্ষমা পতিপ্রাণা সুন্দরীগণ সাহিত্য-  
ক্ষেত্রে দুঃপ্রাপ্য হইয়াছিলেন । সহমরণ প্রথা নিবারণার্থ আইন করা প্রয়ো-  
জন কেন হইল তাহা সর্বাঙ্গীণে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই  
সমাজ প্রতিকূলিত হইয়া থাকে । প্রায় একশত বৎসর হইল, ‘কামিনী  
কুমার,’ ‘চন্দ্রকান্ত’ ও ‘জীবনতারা’ রচিত হইয়াছিল, এই গুলি জাতীয়  
অধোগতির শেষ চিহ্ন, কবি ‘উইচারলীর’ নাম করিতে ইংরেজগণ বেক্রম  
লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্যপ্রণেতাগণের নাম করিতে  
আমাদের তেমনই লজ্জা হয় ; কিন্তু ইহার মধ্যে মধ্যে ভারতচন্দ্র  
অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লিপিচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সেই ছাঁচে  
ঢালা ভাবার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব । ধনুস্ত-আগমন,—  
“হিমালয় হইল পরে বসন্ত রাজন । দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন ।  
এখনে সংবাদ দিতে পাঠাইল দূত । আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া যাক্ত ।  
বায়ু মুখে শুনি বসন্তের আগমন । হুসজ্জা করিল যত পুষ্প সেনাগণ ।  
কেতকী করাত করে করিয়া ধারণ । দন্তে দাঁড়াইল হৈয়া প্রফুল্ল বদন ।  
শূলহস্তে করি শীঘ্র সাজিল চম্পক । অর্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক ।  
গোলাব সেউতি পুষ্প সেনার প্রধান । প্রফুল্লিত হইয়া মোহে হৈল আশ্রয়ান ।  
গন্ধরাজ ধাইলেক পরি যেতবস্ত্র । গুড় জবা ধাইলেক ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ।  
মল্লিকা মালতী জাতী কামিনী বকুল । কুল আদি সাজে তারা যুদ্ধেতে অতুল ।  
পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায় । রজন তাহার বাণ হেন’ অভিপ্রায় ।  
সরসহ চাল হয়ে ভাসিল জীবনে । এইরূপে সজ্জা কৈল পুষ্প সেনাগণে ।  
মলয়ার মুখে শুনি রাজ আগমন । অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন ।  
শরাসনে সন্ধান করিয়া পঞ্চশর । বিরহী নাসিতে বীর চলিল সত্বর । কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন ।

বেশ রাজ্যে বিরহিণী আছে কোন জন । প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার । শীতগতি  
কর দিতে বসন্ত রাজ্যার । বিশেষ রাজ্যার আজ্ঞা কর অবধান । যে না দেয় কর তার  
বধ পরণ । আজ্ঞা পেয়ে দুই সেনা করিল গমন । রমণী মণ্ডলে আসি দিল দরশন ।  
প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোপরে । রাজ আজ্ঞা জানাইল নিজ কুহবরে । পতি সঙ্গে  
রঙ্গে ছিল বতক যুবতী । শব্দ শুনি কর তারা দিল শীতগতি । প্রথমে চূষন দিল প্রণামি  
রাজার । হস্ত পরিহাস দিল বাজে জমা আর ।”—কালীকৃষ্ণ দাসের কামিনী কুমার ।  
মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্ত বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর  
হইলেও উঠাইতে পারিলাম না । বসন্তরাজার রাজধানীর একটি সমগ্র  
সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজগণের অধিকার শাসন ও কর-  
আদায়ের জন্ত যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে  
নাই । কবির হস্ত বেশ নিপুণ ; সুসঙ্গতভাবে হউক, অসঙ্গতভাবে হউক  
তাহা পরিপক্ব হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার ইতর ক্ষুদ্র  
জ্ঞান প্রবৃত্তির উদ্বেক দৃষ্টে তাঁহাকে গ্রায্য প্রশংসাটুকু দিতেও ইচ্ছা হয়  
না । অপর দুইখানি কাব্যসম্বন্ধেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত  
হইতে পারে ।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও আদোয়াল কবির গদ্যাবতী ছাড়া বঙ্গ-

দেশের এক প্রান্তে আর তিনখানি কাব্য

তিনখানি গ্রন্থ ।

রচিত হইয়াছিল । ইহাদের রচকগণ বিক্রম-

পুরবাসী ও একপরিবারভুক্ত । জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার বিহুষী  
ব্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী ১৭৭২ খৃঃ অব্দে উভয়ে মিলিয়া ‘হরিলীলা’  
নামক কাব্য রচনা করেন ; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর  
পরে এই কাব্য রচিত হয় । এই কাব্য রচনার পূর্বে রামগতি সেন  
‘মায়ামিরচঞ্জিকা’ রচনা করিয়াছিলেন, ও পূর্বোক্ত দুই কাব্যের  
রচনার পরে জয়নারায়ণকর্তৃক ‘চণ্ডীকাব্য’ প্রণীত হয় । এই মনস্বী  
পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের কাব্যগুলিতে সেই পাণ্ডি-



ভ্যের পরিচয় আছে। ইহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জ্ঞাত নিবাসভূমি যশোর ইত্নাগ্রাম হইতে বিক্রমপুর আগমন করিয়া-  
 রামগতি ও জয়নারায়ণ ছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর), জপ্সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের অধস্তন ষষ্ঠ-পুরুষ। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার ঊষষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চমস্থানীয় গোপী-রমণ সেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট হরনাথ রায়ের নাম মেঃ বেভারিজ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণ-রাম “দেওয়ান” ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন “ক্রোড়ী” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিপ্‌থ্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁহার চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের দ্বিতীয় পুত্র “লালারামপ্রসাদ” বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালারামপ্রসাদের স্ত্রী স্মৃতিদেবী অতি গুণবতী ছিলেন; ইহাদের পাঁচটা পুত্র জন্মিয়াছিল—১ম লাল রামগতি, ২য় লাল জয়নারায়ণ, ৩য় লাল কোর্টিনারায়ণ, ৪র্থ লাল রাজনারায়ণ ও ৫ম লাল নরনারায়ণ। রামগতি, বাঙ্গালা ভাষায় “মায়াজিমিরচন্দ্রিকা” ও সংস্কৃতে “যোগকল্প-লতিকা” প্রণয়ন করেন। জয়নারায়ণ “চণ্ডীকাব্য” ও “হরিলীলা” নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী হরিলীলা প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজনারায়ণ ‘পার্বতীপরিণয়’ নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা, এই পুস্তক আমরা পাই নাই।

সর্বজ্যোষ্ঠ রামগতি সেন ৫০ বৎসর অতিক্রান্তে ধর্মব্রত ধারণ করিয়া-

ছিলেন, তিনি যোগানুশীলন জন্ত প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন । ১০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয় ; চিরানুগতা সহধর্মিণী সেই সঙ্গে অল্পমৃত্যু হন । বাল্যকালে যে সব ভাবের লীলা চতুর্দিকে লক্ষিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা চিরকালের জন্ত কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায় । রামগতি সেন শৈশবে তাঁহার খুল্ল পিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া খাই-  
তেন, একদিন ভৎসিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন, “দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমারাই খাই, তুমি কাশী যাও ।” কিন্তু সেই শিশুর আবদার-ময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের জ্ঞায় কার্য্যকরী হইল, রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন ; পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফুল্ল মুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন । খুল্লপিতামহের এই গেরুয়া পরা দেবমূর্তি বালক রামগতির মনে চির-জীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল ; তিনিও সর্বদা বিষয়নিষ্পৃহ সন্ন্যাসীর জ্ঞায় সংসারাপ্রমের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন । কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের প্রকৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল । তৎকালে তিনি ব্যবহাশাজ্ঞানুসারে ১/১৥// অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ১০ আনা হিন্তা কলিকাতানিবাসী মাণিকবস্তুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন । তচ্ছবণে তাঁহার কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাঁহার অংশ হইতে সূচ্যগ্র ঢুমিও ছাড়িয়া দিবেন না । অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি-জয়নারায়ণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গে মৰ্ম্মাহত হইয়া সংসারাপ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তদর্শনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্ঠকে সন্মত করিয়া ভ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত ১০ আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন ।

সেনহাটী, পরগ্রাম, মূলঘর, জপ্সা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের আনন্দময়ী ; তাঁহার পাণ্ডিত্য । বিদ্বদী কন্তা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায় ।  
পরগ্রামনিবাসী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম-

কবিত্ববর্ণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৯ম বর্ষ বয়সে আনন্দময়ীর পরিণয় হয় । লালারামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাঁহার পতিকের বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কৌতুকচ্ছলে “আনন্দীরামসেন” বলিয়া অভিহিত হয় ; পতি পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত সঙ্কর নামের উদ্ভব হয় । অযোধ্যারাম সংস্কৃত বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশঃ লোপ করিয়াছিল । রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেববিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি সংস্কৃত শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন, তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি থাকাতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোবোগী বলিয়া তিরস্কার করেন । রাজবল্লভ ‘অগ্নিষ্টোম’ যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞ-কুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি সেই সময় পূজায় ব্যাপ্ত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি সহস্বে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন । এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অত্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—“সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন ।” আনন্দময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকগণেরও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না ।

রামগতিসেনের ‘মায়াজিহ্মিচন্দ্রিকা’ ধর্ম্মের রূপক ; উহা সংস্কৃত

‘প্রবোধচন্দ্রোদয়ের’ পথাবলম্বী ; সংসারে মন  
শায়া-জিহ্মিচন্দ্রিকা ।

ইঞ্জির দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বস্তু বুঝিতে পারে না, পথহারা হইয়া নানা কল্পনা জন্মনা শ্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিন্তে বোধের উদয় হয় ; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি ভাবিয়া লোষ্ট্রখণ্ড

আদর করিয়াছি, যাহার জন্ম ভবে জন্ম—সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ভূতের বেগার খাটিয়াছি,—এইসব তত্ত্ব অমুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র হইয়া চিন্তে প্রকটিত হয়,—তখন বানিয়ানের তীর্থযাত্রীর জ্ঞান মন এই রাজ্য ছাড়িয়া তৎপথে প্রবিষ্ট হয় ; তৎপর উদাসীনীর কথা, যোগ ক্রীড়ায় হয়, তাহার নানারূপ কুটব্যাখ্যা, সেইসব শব্দের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,—আমরা সে ভাবের ভাবুক নহি। যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে বাইয়া কবি গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনেক হুর্বোধ শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। কবি—“পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল।” বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহানুভূতি ও ভয়কম্পিতকণ্ঠে লিখিয়াছেন,—“অমের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ। মায়ামুগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ।” তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগর্বে স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, “যৌবন কুহুম সম প্রভাতে বিলীন” এই অনিত্য জীবনে মায়াবুদ্ধ মনুষ্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জন্মিল, কবি রূপকচ্ছলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

“কোপে অতি নীভ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানারসে সদা জীব রায়। তনু বার হুবিভার ক্রিয়া ব্রাজধানী। হৃদি তারি রমাপুরী তখায় আপনি। অহঙ্কার হয় বার মোহের কিরীটী। দম্পটাতে বৈসে ঠাঠে করি পরিপাটী। পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ আনিবার। ছুই মিহ্ন সচরিত্র বান্ধব রাজার। শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীলা নারী। মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি। পতিব্রতা ধর্মরতা, অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী। নারী সঙ্গে রীতি রঙ্গে রসের ভরঙ্গে। এইরূপে কামরূপে জীব আছে রঙ্গে।”

আমাদের প্রত্যেকের এক একটা রাজত্ব আছে, এই শরীরের

বিদ্রোহী প্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্য আমাদের দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের দ্বারা স্নানীকৃত হইয়া না ; কবি পরিষ্কার একটি রূপক দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, এই প্রতিবিম্ব ক্রমশঃ আরও পরিষ্কৃত হইয়াছে,—তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন । সংস্কৃতকাব্যের ভাবে অধ্যায়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, যথা “ইতি মায়ামিরচলিকায়াম্ জীবচৈতন্ত্যপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় কলা নাম দ্বিতীয়োন্মাসঃ ।”

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, পাচা আদিরসের গন্ধ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছুঁইতেও ঘৃণা হয়, সেই সময় জপ্সা-পন্নীর এই প্রবৃত্তি সংযম সম্বন্ধে কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেক-বাণীর দ্বারা উপলব্ধি হয় ।

রামগতি সেন চক্ষু মুদিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন,

সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার

চণ্ডীকাব্য ।

পুষ্পরথারোহণে আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতে-

ছিলেন ; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য ; ছন্দগুলি ইহার কল্পায়ত্ত ; নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরসদৃষ্ট হইয়া ইহার মনস্তৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত । জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে শিব-বিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলী ধরিতে সাহসী ; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, বলি যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধুষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে ; মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ আসিয়াছেন, কামদেব সেনাপতি । \*কবির বর্ণনা এইরূপ ;—

“মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল । দাম্যম্ ভ্রমরব সখনে বাজিল । নব  
কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে । উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে । ত্রিগুণ

পবন হয় বোগ গতি বেগেতে । ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করগরেতে ॥ ভরাইয়া ভাসে  
আড় হেরি আঁখি কোণেতে । কুমুদের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে ॥ বামবাছ  
রতি গলে, রতিবাছ গলেতে ॥ ভুবন মোহন কর হর মন মোহিতে ॥ বায়ুবণে সকলে  
উত্তরে হিমগিরিতে । আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে ॥ কুমুদে প্রকাশ গিরি বন  
উপবনেতে । নানা ফুল ফুটিল ছুটিল বব পিকেতে ॥ ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধনি  
কাণেতে । মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে ॥ ধরধর কেতকী কাঁপিছে যুদ্ধবাতে ।  
অকালে অশোক কোটে সেকালিকা-দিনেতে ॥ ললিত মালতী কোটে যুথিকার ডালেতে ।  
বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে ॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে ॥ কুহরিছে  
কোকিলসমূহ পাঁচ শরেতে ॥ নব লতা মাধবীর নতশির ভূমেতে । পলাশ টগর বেল  
নত ফুলভরেতে ॥”

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া  
হইয়াছে,—তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, . এজ্ঞাত উদ্ধৃত করিতে  
বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই  
অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি দেখাই ; ভাবাবেশে  
হরিণী শূকরের সঙ্গে যাইয়া মিশিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে  
লাগিল ; স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া—  
“চর চর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে । সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে ॥”—  
কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু কবি মহিমায়িত শিব-  
মূর্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন ; তিনি কালিদাসের  
স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে  
পারেন নাই, এইজ্ঞাই বিশাল দেবদাক্ষ্যমবেদিকা হইতে তাঁহাকে  
উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি  
কালিদাসের কুমারসম্ভব একরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক  
স্থলে তাঁহার পদ কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যথা—  
“নিরখিতে দেবগণ, ডাকে শুন জিঘোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ । বাবৎ এ দেববাণী,  
শিবকর্ণে হৈল ধনি, তাবৎ মদন ভস্মশেষ ॥”

জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর, এই রতিবিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অপহৃত ; কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে আহৃত কথা যোজনা করিয়াছেন, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা,—

“অশ্রু নারিকার ঘরে, নিশীথে বসিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিল। তুমি । খণ্ডিতা অধীর হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া, মল্ল কাজ করিহিনু আমি । রত্ননের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন করিয়া, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে । সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রস রঙ্গ সকলি তাজিলে । আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নুপুর খসেছিল । ঘরা তুমি দিতে পায়, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল । তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি বসিয়া রহিনু মোনী হয়ে । যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না মাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে ।” ইত্যাদি ।

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমল পুষ্পমালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানি ছাইয়া ফেলিয়াছেন ; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুন,—“করেতে বদন যবে তোমার ধরিবে । ঐরাবত শুও কি কমলিনী শোভিবে । বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন । শিরীষ-কলিকা হিমগিরিতে যেমন । আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী মৃত । সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ দুলিত । আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম বার । সিদ্ধি দিতে পারিলে পাইবে মন তার ।”

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের দ্বিত্ব সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা বড় সহজ নহে ; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী ; এস্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত শ্রুষ্ট বলিব । জয়নারায়ণের চণ্ডীতে তুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দ-বিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যানটি পাঠকের ক্লাস্তিকর হয় নাই ; নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,—“শরীর থাকিলে দেখা সখায় অবশ্য । কমল ভ্রমরে দেখ

তাহার রহস্য । শিশিরে কমল মজি থাকে হুলক্ষণ । বর্ষাকালে পাই হয় জীবনে বাসনা ।  
দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠিয়া । হইয়া কলিকা, সখা সহায়ে কুটিয়া । প্রকুল হইয়া  
প্রপ্রেমে মনের উল্লাস । মিলে আসি পূর্বভূঙ্গ মনে বহু আশ । পুনঃ পদ্মিনীর মধু মধুকর  
পিয়ে । অবশ্য যে দেখা হয় যদি দুই জীয়ে ॥”

“হরিলীলা”—সত্যানারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা

ব্রতকথার ক্ষুদ্র সৌর্মা লঙ্ঘন করিয়া একখানি  
হরিলীলা ।

সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে ; আমরা  
প্রাচীন সত্যানারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে  
সেগুলির তুলনা হয় না, ঠোঁট বিস্তীর্ণ, নানারসপুষ্ট বড় কাব্যকথা ।  
এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সেগুলিতে তাঁহার  
ভণিতা নাই, জীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না ; বিশেষ পূর্ব-  
বঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভণিতায় দিতে সম্মত হন নাই ।  
আনন্দময়ীর পিতৃকুলোদ্ভব প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাঁহার রচনাগুলির সঙ্গে  
বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সেই সকল অংশ নির্দেশ করিয়া  
থাকেন । অশীতিপর বৃদ্ধ, ফরিদপুর সেনদিয়ানিবাসী সুবিজ্ঞ  
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে যে সকল অংশ আনন্দ-  
ময়ীর রচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, কবির বংশীয়েরাও ভিন্ন সময়ে  
ভিন্ন স্থানে আমাদিগের নিকট সেইগুলি তদীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ  
করিয়াছিলেন । এবিষয়টি স্থানীয় অমুসন্ধান দ্বারা সুলেখক শ্রীযুক্ত  
অজুর্চন্দ্র সেন ও আনন্দনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও নিঃসন্দেহ ভাবে প্রতি-  
পন্ন করিয়াছেন । পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনার আড়ম্বর  
ও পাণ্ডিত্য বেশী, আমরা তাহা পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের  
নিজ লেখার ‘কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) সভা মধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি : শিরে ষেত ছয় ইন্দুকুণ্ড জিনি ভাতি ।  
কক্ কক্ জলে ভঙ্গ ত্রিগনব ভালে । মিস্ মিস্ বজ্র ভঙ্গ জমখে জ্বলে । \* \* \* টল  
টল মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে । চল্ চল গজমতি মালা দোলে গলে । কস্ কস্





[illegible]

ভালান্যযোত বংগ। হা। ত্রিপুরাভূমণ্ডো দেবোক্তক ৭০ ২২সব পূর্বে  
নিষিদ্ধ হইলোনা পুঁথির এক পৃষ্ঠার অন্তিহিপি।

কসাতা সটুকা কটিতে । ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে । উগমগ সপ্ত কস্তা চামর লইয়া । ধীরে ধীরে গোলাইছে রহিয়া রহিয়া । ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি । ঝকমক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলে মণি ।”—রাজসভা-বর্ণন ।

( ২ ) আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় স্তম্ভরী । মান ভঙ্গ করি, সন্মুখে আনিল, নাগর যতন করি । সোণার নাগর নাগরী দ্বন্দ্ব, হেরিয়া করিল রঙ্গ । স্বত্ব-তাগেতে করিলা দান, আপনাব বর অঙ্গ । কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর; হৈল নাকি মান ভঙ্গ ।”—নাথিকার মানভঙ্গ ।

( ৩ ) “যোরতর রজনী অতীত এই মতে । পূর্বদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে । আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা । চক্রবাকী প্রবর্ত পতির প্রেম-খেলা । \* \* \* পাখীগণ ইতিউক্তি নিজ বাস ছাড়ে । বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে । চল্লভাণ করযুগ ধরি স্নেন্দ্রার । ‘বাই’ বলি বিদায় মাগিছে বার বার । উষা কালে যাত্রা করি যায় চল্লভাণ । সজ্জন নয়নে ধনী পাচেতে পয়াণ । যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া । হৃথাকর যায় ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া । নিশি ভরি কুমুদিনী কোতুকে আছিল । রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল ।”—সুখনিশি-প্রভাত ।

মিষ্টশব্দপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ আছে,—উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রেরও অব্যাহতি নাই । এইসব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়ই নিষ্ফল হইয়া পড়ে । এত বড় কাব্যগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না । কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, “কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং” রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্রে কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করে না ; ঘষা মাজা স্তম্ভর শব্দ কর্ণেদ্র তৃপ্তি সাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে গৌছে না । সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা রহিত হয় নাই, বরং ক্রমে বুদ্ধি পাইয়াছে,—আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

“হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে । সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ।  
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি । হসন্তি, খলন্তি,  
আনন্দময়ীর রচনা ।

ঐবন্তি, পতন্তি ॥ কত চার বস্ত্র<sup>১</sup>, হৃবেশা, হৃকেশা ॥  
হুনাঙ্গ, হুহাঙ্গ, হুবাঙ্গ, হুভাঙ্গা ॥ কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, হুবেগা, রতিজ্ঞা,  
বলীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥ দেখি<sup>২</sup> চল্লভাণে, কত চিত্তহারী । নিকারা, বিকারা  
বিহারী, বিভোরা ॥ করে দড়ি দোড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া ॥ অমুঢ়া, বিমুঢ়া, নবোঢ়া, নিমুঢ়া ॥  
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড যুগ্মা । প্রহুগ্মা, সচেগ্মা, কেহ গুণ্ডমগ্মা ॥ অনঙ্গাঙ্গভিন্না, কত  
স্বর্ণবর্ণা । বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা ॥ কারো ব্যস্ত বেগী নাহি বাস বক্ষে ।  
কারো হার কুপাঁস বিস্তস্ত বক্ষে ॥ গলভূষণা কেহ, নাহি ঝাস অঙ্গে । গলদ্বাগিনী কেউ  
নাতিয়া অনঙ্গে । কারো বাহুবল্লী কারো স্বক দেশে । রহিয়া সাধু বাক্য বক্তে, প্রকাশে ॥  
\* \* \* হৃকক্ষে নিতম্বে উর হেমকুণ্ডে । এভাবে ও ভাবে হাঁটিতে বিলম্বে ॥ তাহে  
দোলিতা লাজভারি ভারতে । পরে হেলি ছলি অনঙ্গ অরতে ॥ হুনেত্রকে কেহ, কেহ  
চল্লভাণে । করে সেক তোয়ে সবে সংবধানে ॥ হুন্তে চালিছে সর্ব বারি অঙ্গে । ঝন্ত-  
ঝন্ত গলত, গলত, পড়ে নীর অঙ্গে ॥ \* \* \* সখী চল্লভাণে বলে চাতুরীতে । এরতের  
মালা কাকের গলাতে ॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে । ঢলাঢল গলাগল সখী  
সর্ব তাতে ॥” চল্লভাণ ও হুনেত্রার বাসি বিবাহ—(হরিলীলা)।<sup>৩</sup> বান্ধালা কবিতা এখন  
আর আপামর সাধারণের বুঝিবার বিষয় নহে । ইহার অর্থ বোধের জন্ত  
এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয় ; এজন্ত সহজ পদ্য রচনার প্রথা  
প্রবর্তিত হওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল । সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ,  
শুঙ্কগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন,  
তাহা না হইলে সংস্কৃতাজ্ঞ বান্ধালিগণ বান্ধালা ভাষায়ও দস্তক্ষুট করিতে  
অক্ষম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয় ।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি,—“আসি দেখহ নয়নে ।  
হীন তনু হুনেত্রার হয়েছে ভূষণে ॥ হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, কক্ষ কেশ অতি । ঘরে আসি  
দেখ নাথ এসব দুর্গতি ॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে । অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা  
পথ পানে ॥ \* \* \* ভাবি যাই যথা, আছ হইয়া যোগিনী । না সহে এদার প্রব্রহ্ম  
আগুনি ॥ যে অঙ্গে কুহুম তুমি দিয়াছ যতনে । সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে ॥

যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি । তাতে জটাতার করি হইব যোগিনী । শীতভরে  
যে বুকোতে লুকায়েছ নাথ । বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত । যে কঙ্কণ করে দিয়া-  
ছিল্য হস্ত মনে । সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে । তব স্নেহময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র  
করি । মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী । তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি ।  
আর তব স্থাপ্য ধন বিবস যৌবন । লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন ।” বিরহিণী স্নেনেত্রী ;  
(হরিলীলা) । কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শঙ্কালঙ্কারের  
প্রতি পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে ; অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের  
স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নো-  
ক্ত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারস্পৃহা পাঠক কি জ্বীলোকসুলভ  
রোগ বলিতেই চ্ছা করিবেন ?—“পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন  
পাগরে, ডাক ছাড়ি । হইয়ে জীব শেখা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা ভূমে পড়ি ।”

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি  
আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন ;—“জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম । ধর্ম্মাকৃতি  
বুদ্ধদেব কঙ্কি সে বিরাম ।” এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ;  
বলা বাহুল্য, এই দুই ছন্দেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ।

পূর্বোক্তরূপ শব্দ-বিশ্লেষণের কোণল গিরিধরকৃষ্ণ “গীতগোবিন্দের  
অনুবাদ”ও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে । এষ্ট  
গীতগোবিন্দের অনুবাদ ।

গীতগোবিন্দানুবাদখানি ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে—  
( ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৬ বৎসর পূর্বে ) সমাপ্ত হয় । রসময়দাস-  
কৃত একধেয়ে পয়ার ছন্দের অনুবাদে মূল গীতগোবিন্দের প্রদলালিত্যের  
চিহ্ন উপলব্ধি হয়, না, তথাপি উহা বেশ প্রাঞ্জল ও অতিমধুর । প্রথমাংশ  
হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক “যেইযেইরসময়” স্মরণ করিতে  
করিতে পাঠ করুন ;—“মেঘ আচ্ছাদিলা সব গগনমণ্ডলে । মেঘাবৃত চন্দ্রমা হই-  
য়াছে সেই কালে । বনভূমি ভঁমালের বর্ণ সজ্জ্ব হানে । শ্রাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে ।  
বদি বল মনুস্যের গমনগমনে । যেমনে চলিবে তার স্তন বিবরণে । অলঙ্কার অতিসারের  
বেশ ভূবা করি । চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহারি । আনন্দে নিমেষ পাইয়া চল ছই জন ।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে ছইজন । অথ কুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে । চলিলেন বৃন্দা-  
বনে স্বচ্ছন্দে বিহারে । শ্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেই কালে । মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগন-  
মণ্ডলে ।” গিরিধর যথাসম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেবকৃত গীতিগুলির মনোহারিত্ব  
বাক্সালা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন ; গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে  
কেবল অনুস্বার বিসর্গগুলি নাই, কিন্তু শব্দের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে ;  
চতুর বাক্সালা লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদূর সংস্কৃতির মত করা যায়,  
তাহা সক্ষম লিপিকৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন । আমরা  
কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ;—

(১) “তবদন্ত অগ্রে ধরণী রয়, যেন চন্দ্রে লীন কলক হয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত  
শুক্লরূপ ধরি । হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে, দলিলে ভুঞ্জের মত নখরে, জয় জগদীশ  
হরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি ।

(২) এ সখি স্নানরী যুবতী জনে হরি, নাচত কত প্রকার । পবনে লবঙ্গলতা, মুহু  
বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায় । কুহ কুহ করি, কোকিল কুল কুজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ।  
বকুল ফুলে মধুশিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরুডাল । পতি দূরে যার, তার প্রতি  
মনোরথ, মনমথনে হয় কাল । মুগ মদ গন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল স্রবাস । যুবধন  
জন্ম বিদারিতে, কামোৎসব নথ কিবা হইল পলাশ । মদন নৃপের ছত্র হেম নির্মিত কি  
নাগেশ্বর ফুল । শিলীমুখসদৃশ বাণ নিরমাণুল, পাটলী ফুল অতুল । দেখি বিলক্ষণ,  
জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয় হাশে । কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহী-  
বিদারণ আসে ।”

(৩) “বমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ । কর অভিসার, করি  
রতি রস, মদন সানোহর বেশে । গমনে বিলম্বন, না করু নিভম্বনী, চল চল প্রাণনাথ  
পাশে । তুয়া নিজ নাম, শ্রাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী ব্রহ্মভাসে । তুয়া তনু পরনি,  
ধূলিরেণু উড়ত, তাতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে । উড়ইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে, তুয়া আগ-  
মন হেন মানে । দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই, নিরখত তুয়া পথ পানে । শব্দ অধীর  
নৃপূর হুরে, রিপূর সদৃশ রতিরঙ্গে । অতিতমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি  
নেহ অঙ্গে ।”

। এখন আমরা আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য-শাখার

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী । উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম ‘গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিনী’ । ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’-লেখক

হুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরাস্থগত উলাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ; ইহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী ; অনুমান ১০০ বৎসর পূর্বে, ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ লিখিত হয় । সকল দেবতাই ভাষাকাব্যরূপবাহনে আরোহণ করিয়া বন্যায় গৃহস্থের ঘরে পূজা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন ; বোধ হয় শিবের জটায় কুটিল বাহে আবদ্ধ গঙ্গাদেবী যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল “ভাষায় আমার গান নাই ।” তখন কাল-গোণ না করিয়া উলাগ্রামে হুর্গাপ্রসাদের জ্যৈ হরিপ্রসাদকে আকৃষ্ট হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন—“তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্ম কাব্য লিখাও ।” কিন্তু তখন ইংরেজাগমনে দেবদেবীর আঁকিস বন্ধ-প্রায় ; যে বৎসর বাজা বামমোহন রায় “হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর জ্যৈ মারকৎ প্রত্যাশে প্রাপ্ত হইয়া হুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ লিখিতে প্রবৃত্ত হন । গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে মধ্য মধ্য রচনার পারিপাট্য আছে ; আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাঁহারা কি কি অলঙ্কার পরিয়া আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিম্নোক্ত পংক্তি নিচয়ে দৃষ্ট হইবে ;—

“ঢেঁড়ি, চাপি, মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল । কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল ॥  
নাসিকাতে নখ কারো মুক্ত চুণী ভালো । লবঙ্গ বেশেরে কারো মুখ করে আলো ॥  
কিবা গজমুখা কারো নাসিকার কোলে । দোলে সে অপূর্ব ভাব হাসির হিল্লোলে । কুল-  
কলিকার মত কারো দস্তপাঁতি । দাড়িখের বীজ মুক্তা কারো দস্তভাতি ॥  
মাজিতে দস্ত মধ্যে কালরেখা । মনে মনে মনের পরিচয় লেখা । মুখ শোভা করে  
কারো মল্ল মল্ল হাসি । সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি । পরিল গলায় কেহ  
তেনরী সোপার । মুক্তায় মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার ॥ যুকযুকি জড়াও পদক পড়ে হুখে ॥

সোণার কঞ্চি কারো শব্দের সম্মুখে । পতির আয়াৎ চিহ্ন সোহাগ বাহাতে । পরাণ  
বাকান লোহাসকলের হাতে । পাতা মল পাণ্ডুলি আনট বিছা পায় । শুক্লরী পঞ্চম  
আর শোভা কিবা তায় ।”

এই অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোঁজ করিলে  
পাওয়া যাইবে ।

## ২য়—গীতি-শাখা ।

মুসলমানী কেছার কলুষস্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত

হইয়াছিল ; বিদ্যানুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা

গীতি-সংস্কার ।

প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন ; কিন্তু

চিত্রের পক্ষে মধুমক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-কৌশলেও শ্রোতার  
মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না ; সাহিত্যের পক্ষ উদ্ধার করিয়া  
নির্ম্মল ভাবের প্রবাহে পাঠকের কামনা পরিতৃপ্ত করিতে, পুনশ্চ প্রতিভা-  
বান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল । এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে  
রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দূরে  
—পল্লীগ্রামের স্বভাবস্নিগ্ধ ছায়ার অনেকগুলি কলকণ্ঠী কবির আবির্ভাব  
হইল । কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দোষ নহে, ইহার একাংশ  
বিদ্যানুন্দরাদি কাব্যের রুচি কর্তৃক অবিকৃত রহিয়াছে,—কিন্তু অপরাংশ  
অতি স্তূনির্ম্মল । এই দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়,  
কারণ এখানে কল্প অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী, এই যুগের সাহি-  
ত্যেও গীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে ।

বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্ডার

গীতি কবিতার গার্হ্য  
চিত্র ।

পিতৃগৃহ হইতে গমন, ছুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে

গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধূলি-

খেলা সাজ করিয়া দেবগুণ্ঠনবতী যুবতী

বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিয়হে বালিকা ঘোমটা-ঢাকা স্নন্দর



মুখ থানি চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত ;  
 মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন  
 দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন,—“উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে  
 দেখা দিয়ে, চৈতন্ত করিয়ে, চৈতন্তরূপিনী কোথায় লুকাল।” বহুদিনের অশ্রুসিক্ত  
 এই বিরহ ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত  
 সুখ,—“আমার উমা এসে, বলে রাগী এলোকেশে ধায়।” এই সকল গানের সরল  
 কথায় শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির প্রকৃত রঙ্গভূমি  
 কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অম্লভূতি-  
 ক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবে আমাদের নাথকগণ ধর্মের  
 ছায়ার স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি স্নেহ যশোদা-চিত্রে ধর্মভাবে পরিণত  
 হইয়াছে। “শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে।  
 যেন সে চকল চাঁদে, অকল ধরি কঁাদে, জননি দে ননী, দে ননী বলে।” প্রভৃতি স্নেহ-  
 উদ্বেলিত ভাব-মধুর গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ  
 করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত  
 নিম্নলিখিত স্বর্গের প্রতি—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও  
 স্বর্গের কথা। পুরুষের প্রতি রমণীর ভালবাসা এই দেশে উন্নত ধর্মতাবা-  
 পন্ন হইয়া বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একাত্মীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা ‘বৈষ্ণব-  
 যুগ’ অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মাধুর্য্য এক দিকে, নির্ভরান্বিত শিশুর

মিথ্য অভিমানপূর্ণ আবদার অপন্ন দিকে।

রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও  
 ধর্ম বিশ্বাসের উচ্চতা।

মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড়

মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্যিক কঠোরতা

অশ্রুজলে ধোঁত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের  
 মায়ের প্রতি ক্রোধ অশ্রুজলগঠিত, উহা নামে মাত্র ক্রোধ—উহা  
 নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্বস্থাপন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই প্রেমভক্তিই সময়ে সময়ে অঞ্জনশলাকার ন্যায় লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধান পূর্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তিবিশ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য হুঁইতে পারিয়াছিলেন। “কি কাজ রে মন বেয়ে কাশী।” “নানা তীর্থ পর্য্যটনে এম মাত্র পথ হেঁটে।” প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীকভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। “ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জ্ঞেও কি তা জান না। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার কর্তে চাওরে উপাসনা। খাতু পাষণ মাটি মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সেগঠনে।” প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের “আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার।” প্রভৃতি গান এক স্থলে রক্ষিত হইবার যোগ্য। “বেদে দিল চক্ষে ধূলা, বড়দর্শনের সেই অক্ষণ্ডলা”—বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদের সূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উথিত হইয়া নবোন্মোহিত মাতাইয়া তুলিল।

‘রামপ্রসাদ বিগ্রহপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদ-তলে বসিয়া অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন, যে ভোগসম্ভার তৎ-পদপ্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও কখনও হস্তপূর্ব্বক মনে মনে গাহিয়াছেন,—“জগত কে খাওয়াচ্ছেন যে মা, দুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন্ লাভে খাওয়াইতে চাস তায়, আলচাল আর বুটভিজান।” কখনও পুষ্প, বিষ্ণু-

পত্র পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জানে বলিয়াছেন,  
“বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।”

কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, গূঢ় রহস্তে ব্যক্ত—অতি সুন্দর ; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও উপমার জন্ত লালায়িত হইয়াছেন ; অপ্রক্ষুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,—“চলিয়ে চলিয়ে কে আসে দ্রুতগতি, দলে দানবগলে, ধরি করতলে গজ গরাসে। করে—কালীর শরীরে, রুধিরে শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংবদ ভাসে।” প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিচল মানসপটে মাধুর্য্যমিশ্র এক ভৈরব ছবি অঙ্কিত হয়।

সাংসারিক্রীষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাধ-নেত্রে তাহাদের প্রশংসা করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া শ্রাম সন্ধ্যাকালে যখন চিরপরিচিত সুহৃদ কণ্ঠে,—“নিতান্ত বাবে এদিন কেবল ঘোষণা হবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।”—প্রভৃতি গান শুনি-তাম, তখন বাল্যকালের অকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদমাখা, মাহ-মাঘিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। “ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল। চিত্তের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রৈল। নিম খাণ্ডালি মা চিনি বলে, কেবল কথার করি ছল। মিঠার আশে তেতো মুখে সারাদিনটা গেল। খেলবি বলে আশা দিয়া মা এনেছিলি এ ভুলল। যে খেলা খেলিবি শ্রামা আশা না পুরল। রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হ’ল তা হ’ল। সন্ধ্যা হল, এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল।” প্রভৃতি গান সাংসারিক কষ্টবিড়্ধিত চিত্তের, পক্ষে মাতৃ-অবলম্বনজনিত সাঙ্কনায় সুখাতুলা। রামপ্রসাদের বৈষ্ণববিষয়ক গানও কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি ;—“ওহে নৃতন নেয়ে। ভান্ধা নৌকা চল বেয়ে। দুকূল রইল দূর, খন খন হানিহে চিকুর, কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাখ বসুনার ভাসে খেয়া, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক ছানা দধি, কিন্তু মনে করি এই ক্ষেদ। কাঙারী বাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা তবু হইবে হে বেদ।”

রামপ্রসাদের পর শ্রীমাবিষয়ক সংগীত রচনার আরও করেকজন  
কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমরা  
শ্রীমাসংগীতকারগণ ।  
এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ  
করিয়া যাইব ।

কবিওয়লা রামবহু ( ১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ ) কলিকাতার পরপারস্থিত  
শালিকাগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন ।  
রামবহু । ১৭৮৬ খৃঃ ।  
কথিত আছে পাঁচ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ইনি  
পাঠশালায় বসিয়া কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, ছাদশবর্ষ  
বয়স্ক কবির রচিত গান, ভবানীবর্ণিক নামক কবিওয়লা প্রাদরের সহিত  
গ্রহণ করিয়া নিজদলে গাওয়াইতেন । যে ফুলাট অতি শীঘ্র ফোটে,  
তাহা অতি শীঘ্র শুকায় ; রামবহুর ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় । প্রথম  
বয়সে ইনি ভবানীবর্ণে, নীলুঠাকুর, মোহনসরকার প্রভৃতির দলে  
গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই এক দল সৃষ্টি করেন । রামবহুর বৈষ্ণব-  
সংগীতগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, আমরা স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করিব ।  
তাঁহার উমাসংগীতগুলিও মেহরসে উদ্বেলিত । মায়ের নয়নজলসিক্ত  
এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,—“তুমি যে কোয়েছ আমার গিরিরাজ, কত দিন কত  
কথা । সে কথা আছে শেল স্নেহে গাঁথা । আমার লছোদর নাকি, উদরের জ্বালায়  
কঁদে কঁদে বেড়াতে । হোরে অতি ক্ষুধার্তিক, সোণার কার্তিক, খুলায় পাড়ে লুটতে ।”  
পরিবার ভরণপোষণঅসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের জ্বা  
বিধিবার কথা, গানের সময় গগনশ্রবনেজে দরিদ্র শ্রোতা ঘরের কার্তিক,  
গর্গণেশের কথা ভাবিতে থাকিতেন ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—১৮০০ খৃঃ অঙ্গে অধিকা-কালনা হইতে  
বর্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া  
বাস করেন ; ইনি বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের  
কমলাকান্ত ।

সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন । ইহার রচিত শ্রামাবিষয়ক পদাবলী  
রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর ।

রামহুলাল রায়—( ১৭৮৫—১৮৫১ খৃঃ ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ-

গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ইহার কুলউপাধি 'নন্দী' ।

রামহুলাল ১৭৮৫ খৃঃ ।

কঁতককাল ইনি নোয়াখালির কুলেক্টার  
হেলিডে সাহেবের সেরেসাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের  
দেওয়ান হন । ইহার গানগুলিতে বিবাদ, বিরাগ ও ভক্তির কথা  
আছে । আমাদের স্থানাভাব, একটি গান হইতে কিছু অংশ তুলিয়া  
দেখাইতেছি—“ধনাশা, জীবন-আশা গেল না সকলি গেল মা । কোয়ার যৌবন  
গত জরা আগমন হল । \* \* \* অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের  
গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি । আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে দেখার আশ । দরশনে  
জরা বলে কি দায় হল ।”

দেওয়ান রঘুনাথ রায় ( ১৭৫০—:৮৩৬ খৃঃ ) । বর্ধমানস্থ চুণীগ্রাম-

নিবাসী ব্রজকিশোররায় দেওয়ানের পুত্র ।

রঘুনাথ । ১৭৫০ খৃঃ ।

ইহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্ধমানরাজ-  
তেজশচন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদদিগের  
নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন ; ইহার শ্রামাবিষয়ক গানগুলি  
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামহুলাল রায়প্রণীত গানসমূহের সঙ্গে একত্র  
উল্লিখিত হইবার যোগ্য ।

মুজাহসেন আলি ও সৈয়দ জাকর খাঁ, এই দুইজন মুসলমান গীত-

রচক সমসাময়িক । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

মুসলমান কবিগণ ।

দশশালা, বন্দোবস্তের কাগজে মুজাহসেন-

আলির নাম পাওয়া যায়, স্মৃতিরাত্নে ইহার এক শতাব্দী পূর্বের  
কবি । মুজাহসেন আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমিদার  
ছিলেন, কথিত আছে ইনি সমারোহ করিয়া কালী পূজা করিতেন ।

আমরা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে এই দুই মুসলমান শাক্ত ধর্ম্মে আস্থাবান কবির কথা বলা বাইতে পারে ; মৃজাহসেনআলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—  
 “বারে শমন এবার ফিরি, এসো ন' মোর আঙ্গিনাতে । দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি । আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্রামা মায়ের খাসতালুকে বসত করি । বলে মৃজাহসেন আলি, বা করে মা জয়কালী, পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাণ নিয়ে বাও নিলাম করি ।”  
 এই দুই মুসলমান কবির পাশ্বে আমরা আর একটি কবির স্থান নির্দেশ করিব, ইহার নাম এণ্টুনি । ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটীর নিকট

এণ্টুনি ফিরিজি ।

এণ্টুনি কবিওয়ালার বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয় । এণ্টুনি পর্তুগিজ ছিলেন, ইহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন ; এণ্টুনি একটি ব্রাহ্মণরমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন, তিনি দোল ছুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন, এবং অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া নিজে আসরে নামিয়া-ছিলেন । তখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে এরূপ বিদ্বেষের ভাব ছিল না ; মনে করুন, মাথার টুপি ও গায়ের কুর্তি ছাড়িয়া ভদ্র ও ইতর শত শত শ্রোতার গুঞ্জনগণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পাশ্বে দাঁড়াইয়া ফিরিজি কবি গানে তান ধরিয়াছেন । প্রতিপক্ষের দল-নেতা ঠাকুরসিংহ সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বলিতেছে,—

“বলহে এণ্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই ।

এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ।”

এণ্টুনি ইহার জবাব কি দিবেন, মনে করিতেছেন । তিনি বিলাতি স্বাতন্ত্র্য লেখা স্ক্রুচিসঙ্কত রহস্তের ভঙ্গভঙ্গ এখানে কুলাইতে পারিবেন না, তিনি কবিওয়ালার আসরে আসিয়া ঘোড়শকলায় পূর্ণ কবিওয়ালাই

সাজিয়াছেন ; তিনি ঠাকুরসিংহকে ‘শ্রালক’ সম্বোধনে অভিহিত করিয়া  
এই আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন,—

“এই বাঙ্গলার বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি ।

হংসে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই, কুর্স্তি চুপি ছেড়েছি ।”

রামবল্ল আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্বপক্ষ  
করিলেন—

“সাহেব ! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি ।

ও তোর পাদ্রী সাহেব শুন্তে পোলে, গালে দেবে চুণ কালী ।”

সাহেবের উত্তর,—

“থুটে আর কুটে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই ।

শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই ।

আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,

ঐ দ্যাখ শ্রাম দাঁড়িয়ে আছে,

আমার মানবজনম সকল হবে যদি স্বাস্থ্যচরণ পাই ।”

এষ্টুনি যে নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয়  
না ;—শুধু আমোদের জন্য এই যুক্তপ্রাণ, সামাজিক বৈষম্যগর্ভবর্জিত,  
একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভঙ্গলোকটি দেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া আসরে  
গাঁহিতেন,—

“আমি ভজন সাধন জানি না যা নিজে ত করিয়া ।

বদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে সতন্ত্রী ।”

এই অনন্তসাধারণ দৃশ্য দেখিবার জিনিষ ছিল বটে ।

পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড়া বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও

অল্পগ্রহপূর্বক শ্রামাবিষয়ক সংগীত রচনা

অপরাগর কবিগণ ।

করিয়াছেন । প্রচলিত সংগীতসংগ্রহগুলিতে

কুকনগরাধিপতি মহারাজকৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র,

নাটোরাদিধিপতি রাজারামকৃষ্ণ প্রভৃতি রাজস্ববর্ণের রচিত বলিয়া অনেক গান নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীতরচকগণের মধ্যে সকলেই

গোপাল উড়ে ।

নির্ম্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন

না । এই সময় বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রার

দলে গীত হওয়ার জন্ত,—কতকগুলি ললিত শব্দবহুল, কদর্য্যভাবপূর্ণ গান, রচিত হইয়াছিল ; এই সকল গানের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদকবি গোপাল উড়ে ; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; এই গানগুলির রচনার ভঙ্গী এতাদৃশী যে ইহা গাওয়ার সঙ্গে নাচাও চলিতে পারে ; হাটে, মাঠে, বাটে এইসব গান পথিকগণ গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এখন সমালোচনার অহুরোধে সেগুলি পুনর্বার পড়িয়া গোপাল-চন্দ্র উড়ে মহাশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে,—বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী ; সুন্দর ইহাকে “মাসী” বলিয়া সম্বোধন করিতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,—“বাহু এমন কথা কেন বলি । ভোরের বেলা হুথের স্বপন এমন সময় জাগলি ।” ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যখন বায়ুনপাড়া ফুলের যোগানে গমন করেন, তখন পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ষকেশী রূপবতীকে দেখিয়া,—“রহে কোশাকুশী অম্বিন ধরে ।” অনেক স্থলেই কেবল শব্দের মা’র,—“বামিনীতে কামিনীফুল নিতি নে যায় চোরে”—পড়িতে ভাল, গানে শুনিতে ততোধিক, কিন্তু কামিনীফুল ছুইতেই পড়িয়া যায়, চোরে লইবে কিরূপে ? বিদ্যা হীরা’কে দেখিয়া বলিতেছে,—“হেঁড়া চুলে ষকুল ফুলে খোপা বেঁধেছ । প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ।” এইসব নাচিয়া গাহিয়া কহিবার কথা ; হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন তাহা মিঠেকড়া রসিকতা হয় ; সন্মাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়া টাট্টা করিয়া হীরা



বলিতেছে,—“ভাল ধান্ধা মিলি লো তুলে, এই রান্ধারি কুলে । সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি, সন্ন্যাসী কুলে । আকড়াধারি মহৎ আশ্রম, অতিথ আসবে রকম রকম, গান্ধাতে লাগাবি লো দম, ‘বোমকেশ্বর’ বোলে ।” কৈলাসচন্দ্র বাকুই ও শ্রামলাল মুখোপাধ্যায়

এই দুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলা-  
কৈলাস বাকুই ও শ্রামলাল মুখোপাধ্যায় ।  
গরিব করিয়াছেন, ইঁহারা দুই জনই অতি যোগ্য

শিষ্য, কৈলাস বাকুই কবির আবাস চুটকি  
রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করিবার হাতযশটুকু ছিল, নমুনা এইরূপ,—  
“গা তোলরে নিশি অবসান ঞ্জণ । বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, গাধার  
পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ।”

এই ঐতিস্মিকর কিন্তু কুরুচি-দুষ্ট গীতরচকগণের মধ্যে দাশরথি  
রায় ( ১৮০৪—১৮৫৭ খৃঃ ) সর্বশ্রেষ্ঠ । জেলা  
দাশরথি রায় । ১৮০৪ খৃঃ  
বর্ধমানস্থিত বাঁদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের  
পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল । কিন্তু দাশু শৈশবকাল হইতে  
পাটুলির নিকটবর্তী ‘পীলা’ নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন ।  
তিনি প্রথমতঃ সাঁকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীতে ফেরাণীগিরি পদ  
গ্রহণ করেন । কিন্তু অকাবাই নাম্নী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে  
যুদ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন । অকাবাই এক ওস্তাদী কবির  
দল গঠন করে, তন্মধ্যে দাশুরায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর কোন  
এক কবির দলের সরকার দাশুকে ছড়া বাঁধিয়া বিশেষরূপ গালি দেন,  
সেই ভর্ৎসনার কথা তাঁহার মাতা শুনিয়া পুত্রকে যথেষ্টরূপ গঞ্জন  
করেন । মাতার ভর্ৎসনার দাশু প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান  
বাঁধিবেন না ; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল  
পাঁচালী ।

সৃষ্টি করেন, এই নুতনাজ হস্তে দাশু দিখিজয়ী  
হইয়াছিলেন । প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, যানভঞ্জন,  
লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পালা এখন

ছাপা হইয়াছে ; তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়,— ইতিপূর্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাঁতু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রহস্ত । তাঁহার অগ্নীলতা এত জঘন্ত যে তাঁহাকে অর্দ্ধ-চন্দ্র দক্ষিণা প্রদানানন্তর ভদ্রপোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়,—কিন্তু হোরেশ, বোকাশিও, বাইরণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতে-ছেন,—দাঁতুও তদ্রূপ যশের কতকটা অংশী হইবেন, সন্দেহ নাই । দাঁতুর রচনা ভ্রমরের মত—মুখে মধু, কিন্তু ছলে বিষ বহন করে ; উহা শিশুর নবোদগত দন্তের গ্রায়—দর্শনে সুন্দর কিন্তু দংশনে তীব্র ; দাঁতু যে স্থলে গালি দিবেন,—সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই ; শত্রুর গালে চুন কালী দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন, বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,— “গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংরা, যত অকাল কুম্ভও নেড়া, কি আপদ করেছেন নৃষ্টি হরি । বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমন্ডে উপাসনা, নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলায় গড়াগড়ি । গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্মীকোটাল ধোপা কলুতে, একত্র সমস্ত । বিঘ্নপত্র জবার ফুল, দেখতে নারেন চক্কের শূল, কালী নাম শুন্নে কাণে হস্ত । \* \* \* কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা সেবাদাসী, ভজন কুঠরী আইরি কাঠের বেড়া । গোসাঁঞকে পাঁচশিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাতাংশে কুলীন বড় নেড়া । ভজ হরি ত্রিনিবাস, বিদ্যাপতি, নিতাইদাস, শান্ত ইহাদের অগোচর নাই কিছু । এক এক জন কিবা বিদ্যাবস্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ।”

কথিত আছে কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ, ও

ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এইসকল কবিগণের

উপমা ।

গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাঁতুরায়ের গুণের

সীমা নির্ধারণ করা যায় না ; যখন কবি উপমা দিতেছেন, তখন দিগ্ভিদিব্জ জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন, লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্বগিত হওয়া নাই—

“পণ্ডিতের ভূষণ মণ্ড জ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি । বোগীর ভূষণ ভয়, মৃত্তিকার ভূষণ শস্ত, রত্নের ভূষণ জ্যোতি । বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম । পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর, উভয়ে উভয় প্রেম বন্ধ । শরীরের ভূষণ চক্ষু বাতে জগত হয় দৃষ্ট । দাতার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট ।” কবিকে ‘ধাম’, ‘ধাম’ বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্বগিত হওয়ার নহে । ‘নলিনীভ্রমরোক্তি’ নামক ক্ষুদ্র গালা কবির বিক্রপ, কবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক অমর কীর্তি বলা যায় ।\* পদ্মের সঙ্গে বন্দ কায়দা মধুকর তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,— “চলিলেন পদ্মিনী-বাহী, যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাক্লে কথা কন না কার সনে ।” এইভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর জগৎ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ত্রায় নায়ক ও অকাবাইএর ত্রায় নায়িকার রসকোন্দল উদঘাটন করিয়াছেন, কচি ও পবিত্রতার অমুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় ।

নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া দাগুকে সাহিত্যের তুল্যদণ্ডে ধরিলে দেখা যাইবে, শব্দের বাধুনির জন্ত যেরূপ উপাখ্যানভাগে অপটুতা । প্রশংসাই দাগুর প্রাপ্য হউক না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই । দাগুর প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্বত্রই ইনি ‘দস্তকচি কোমুদী’ দেখাইয়া ঠাট্টার হাসি হাসিতেছেন ; ‘প্রভাস-মিলন’ পড়িয়া দেখুন,—যে প্রভাসমিলনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিতোর হইয়াছেন, যে প্রভাসমিলনের সঙ্গে হিন্দুর স্মৃতি দুঃখের কত উন্মাদকর স্বপ্ন জড়িত, দাগু তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তত্ত্বপলক্ষে কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া ক্রুরপে গলধাক্কা লাভ করিয়াছিল, এইরূপ একটি ব্রহ্ম গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন । দাগুর

\* নিতান্ত অনীল বলিয়া এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন নিবন্ধ হইয়াছে ।

পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গপ্রসঙ্গ গণ্য করে না । পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্ধশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দাণ্ড গাহিয়া যাইতেছে ; যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাণ্ড প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের শ্রোত বহাইয়া দিতেছে,— অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঞ্জ, গ, ম বাধিয়া স্তব্ব দিতেছেন এবং কোন্ সময় কবি মূল স্তব্ব ধরিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে দেখিলেন পালা শেষ হইয়া গিয়াছে ।

দাণ্ডের পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা মেরুপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্রামাবিষয়ক গানগুলির আমরা শ্রাভাসদ্বীত ।

প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব ; এখানে বাক্য-চপল অসাড় আমোদপ্রিয় শব্দকুশল দাণ্ড সহসা ধর্ম-গম্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন, “দোষ কা'রও নয় গো মা” প্রভৃতি গান প্রকৃত বৈরাগ্য ও অমু-শোচনার অশ্রুপবিত্র । দোষ রামশ্রামের, আমিত সম্পূর্ণ নির্দোষ, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দোষ গাহিয়া গাহিয়া জীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত করিয়াছি ; কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে যখন পরছিদ্র-অল্পসন্ধিৎসু চক্ষু গতি ফিরিয়া যায়, এবং নষ্টবৃত্তি দ্বারা স্বীয় কার্য্য সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন মায়াতিমিরাতুলিপ্ত সংসারচিত্র চক্ষু হইতে সরিয়া পড়ে, এবং নিঃসহায় হইয়া জগন্মাতার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া মানুষ নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায় । এই পুণ্যক্ষেত্রে রিপূর্ব্বশে নিজে কুপ কাটিয়া ডুবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব ? “দোষ কা'রও নয় গো মা” বলিয়া সরল মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তখন দয়ার জল, ক্ষমার জল লালারিত হইয়া পড়ি,—অভিমানক্ষীত মানুষ—প্রকৃতির মহাকরণীময়ী মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর আশ্রয় রূপা-ভিখারী ; এই

বৈষ্ণব-ধর্মের ব্যাখ্যা ।

ভাবের গান দাশরথির অনেকগুলি আছে ।  
একটি বৈষ্ণব-বিষয়ক সঙ্গীতে দাণ্ড রাধা-  
কৃষ্ণের রূপকের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই গানটি আমরা এস্থলে  
উদ্ধৃত করিতেছি,—

“হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর বধু কমলাপতি । ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা-  
সতী । মুক্তি কামনা আমার (ই), হবে বৃন্দে গোপনারী, আমার দেহ হলে নন্দের পুরী,  
স্নেহ হবে মা বশোমতী । ধর ধর জনাৰ্দ্দন, পাপ ভার গোবর্দ্ধন, কামাদি ছয় কংসচরে  
ধ্বংশ কর সস্ত্রতি । বাজারে কুপা-বাঁশরী, মনধেয়কে বশ করি, গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পুরাও,  
পদে তোমার এই মিনতি । প্রেমরূপ বমুন্যর কূলে, আশাবংশীবটমূলে, ‘দাস’ ভেবে সদয় হয়ে  
সদা কর বসতি । যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বন্ধ আছে ব্রজধামে, জ্ঞানহীন রাখাল  
তোমার দাস হ’তে চায় দাশরথি ॥”

ইহার আর একটি শ্রাব্যবিষয়ক গানের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত  
করিলাম । ভক্তের নিকট মৃত্যুচিন্তা ও কেমন  
আর একটি গান ।  
সুখস্বপ্নময়, পাঠক গানটি পড়িয়া তাৎ  
উপলব্ধি করিতে পারিবেন ;—

“দুর্গে ক’র মা এদীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায় । আমার এদেহ পঞ্চত্ব কালে,  
তব প্রিয় পঞ্চস্থলে, আমার পঞ্চভূত যেন মিশায় । শ্রীমন্নিরে অন্তর আকাশ যেন যায় ।  
এ সুভক্তিকা যায় যেন তৎপ্রতিমায়, মা মোর পবন তব চামর ব্যঞ্জে য়ায়, হোমাগ্নিতে  
ময়াদি যেন মিশায় । আমার জল যেন চায় পাদ্যজলে, যেন ভবে যায়, বিমলে, দাশরথির  
জীবন মরণ দায় ।”

দাণ্ডর রচি, দাণ্ডর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদের গকে আশ্রয়  
কবি স্ফুর্ভার্ডের কথা স্মৃতিতে উদ্রেক করে ।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার “ভাই তিনকড়ি” ও ভ্রাতৃপুত্রের কিছুকাল  
তাঁহার দল রাখিয়ছিলেন । কিন্তু ‘পাঁচালীর’ দল তাঁহার মৃত্যুর পরে  
আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই—যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া ‘পাঁচালী’

লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়াগ্রামনিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব রসিকচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য ।

কদর্যা আদিরসের শ্রোত হইতে দূরে নির্মল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা

পুনঃ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল,  
পুনরায় বৈষ্ণব-গীতি ।

সেই সঙ্গীত প্রাণের কামনা ও নিঃস্বার্থতার  
আবেগপূর্ণ । এই গীতগুলি যাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে  
কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা,  
মধুসূদন কিন্নর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তন্তুদাস, প্রভৃতি কবিগণ  
নিয়ন্ত্রেণী হইতে উদ্ধৃত হন । বস্তুতঃ কবিওয়ালাগণের বহুসংখ্যক গীতি-  
রচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন ; যখন বড় বড় রাজা-  
গণ, সম্রাট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম  
সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পক্ষ দ্বারা  
তাহাকে কাব্য-পিপাসুর অসেব্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন নিয়ন্ত্রেণীর  
লোকগণ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নির্মলতা রক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছি-  
লেন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রেণীর মধ্যেই  
বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—যে দেশের সামাজিক পদবীতে  
নিতান্ত ঘৃণ্য ও অধঃপতিত ব্যক্তিগণ তদ্রূপ উৎকৃষ্ট নিকাম প্রেমের কথা  
বলিতে পারে—সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত  
করিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে ।

কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আমরা রামনিধিরায়ের

উল্লেখ করা উচিত মনে করি । ইনি

রামনিধি রায় । ১৭২১ খৃঃ ।

১৭৪১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুর নিকট চাঁপাতা

গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা—কুমারটুলি আসিয়া বাস  
স্থাপন করেন । ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন ।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ১৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয় । রামনিধি রায়ের

গানগুলি সাধারণতঃ ‘নিধুর টপ্পা’ বলিয়া খ্যাত । প্রাচীন সাহিত্যে কবি-নিধুর স্বতন্ত্রপথাবলম্বী ; ইনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধাকৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা । তাঁহার প্রেমসংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্ম সমর্পণের কথা অধিক,—“ভাল বাসবে বলে ভাল বাসিনে । আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥” “সুৱভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গজা পূজা গজাজলে ।” “তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে । আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার স্মৃথে থাক, এ দেহে সকলি সবে ॥” “যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ, নুয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ ॥” বিদ্যাসুন্দরাদির পঙ্কিল স্রোত হইতে সমুখান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ অঙ্গের প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই ।

এখানে আমরা সংক্ষেপে কবিওয়ালাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব ।

কবিওয়ালাগণ ।

শ্রামাসঙ্গীতরচকগণের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে শুধু বৈষ্ণব সঙ্গীত-কারগণের প্রসঙ্গ লিখিতেছি ।

কবিগণ প্রথমে “দাঁড় কবি” নামে পরিচিত ছিলেন, আসুরে দাঁড়াইরা কবিতা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । রঘু, মতে, নন্দ, এই তিনজনই সর্বপ্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন । ইঁহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক । রঘু, চন্দ্রকার জাতীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন, অপর এক দলের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন ।

রামবন্ধু—বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে । ইঁহার রাধা-

রামবন্ধু । কৃষ্ণবিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংস-  
নীয় । রাধা জলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের

স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধা, অশ্রুনেত্রে করবোড়ে সেই রূপ দেখিতেছেন ও সখীগণকে বলিতেছেন,—“চেটে দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে, হবে পাতকী।” এই দৃশ্য ছবির উপযুক্ত। রামবসুর বিরহে বঙ্গবধুর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী জানেন এদেশে সেই হৃদয়ের দাম নাই। “বখন হাসি হাসি সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে।” তাঁহার বিদায়ের সময়ের এই নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া যত দুঃখ হইয়াছিল, তাহা মানিনী লজ্জায় জানাইতে পারেন নাই। “তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম স্বজন। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।” সে হাসিতে হাসিতে অনায়াসে চলিয়া গেল—কিন্তু নীরব অশ্রুপূর্ণ একখানা সুন্দর মুখ এবং বুকভাঙ্গা লজ্জা ও বিরহের একখানি ভ্রিয়মাণ মধুর ছবি পাছে ফেলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গে রাধিকা আবার কাঁদিতেছে—“দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। \* \* তুমি চক্ষু মুদে আমার দুঃখ দিও না।” পৃথিবীর উর্দ্ধভাগে অল্পকালশ্রুত চলন্ত স্বর্গবাসী পাখীর মধুর স্বরের শ্রাব্য এই সব কবির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবসুর গানে মধ্যে মধ্যে অল্পপ্রাসের লীলা আছে, যথা,—“এত ভঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বৃষ্টি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে, গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুলে।”

হরে' কৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ১৭০৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। হরুঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাস হরু ঠাকুর ৫ ১৭৩৮ খৃঃ। নামক একজন তত্ত্ববায়ের নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করেন। কথিত আছে, একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহা-  
হুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দলে সখ করিয়া গাহিতেছিলেন, রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একজোড়া শাল প্রদান করেন, হরু ঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল জোড়া তৎক্ষণাৎ চুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। হরুঠাকুর রামবসুর শ্রাব্য প্রতিভাপন্ন না হইলেও স্নিগ্ধ



ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ ; একটি গান এইরূপ,—“হরিনাম লইতে অলস হ’ও না, রসনা বা হবার তাই হবে । এইকের স্বপ্ন হল না বলে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে ।” বিরহ-বর্ণনায় হরুঠাকুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন,—একটি গানের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল ;—

“স্বধীর খার বহিছে এই ঘোরতরা রজনী ।  
এ সময়ে প্রাণসখীরে কোথায় গুণমণি, যন গরজে যন শুনি ।  
এ ময়ূর ময়ূরী হরবিত, হেরি চাতক চাতকিনী,  
এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেউতি সেফালিকে,  
জ্ঞাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,  
বিদ্রুত থলোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি,  
প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে দিবস রজনী ।”

১৮১৩ খৃঃ অব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয় ।

রাসু ও নৃসিংহ—ইহার দুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দল-পাড়া গ্রামে বাস করিতেন । ইহার সখী-রাসু, নৃসিংহ এবং অপরাপর সংবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়া-ছিলেন । অমুমান ১৫০ বৎসর পূর্বে ইহার সঙ্গীত রচনা করেন । রচনার নমুনা যথা,—“শ্যাম জোয়ার চরিত, পথিক্ষ যেমত, হোঁয়ে শ্রান্তিবৃত, বিশ্রাম করে । শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় কিরে ।” এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বের কবি গোঁজলাঙই রচিত অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে । নিত্যানন্দদাস বৈরাগী ( ১৪৫১ খৃঃ—১৮২১ খৃঃ ) চন্দননগরবাসী ছিলেন, ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিগোলা ছিলেন । তাঁহার দলে রচিত কোন কোন গান বড় মিষ্ট, যথা—  
বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে । শ্রামের বাঁশী কুন্নি বাজে বিপিনে । নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুখা বরবিল প্রবণে । বৃন্দালালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন কারণে । যমুনায় জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে ।” আমাদের আর

স্থানে কুলাইতেছে না, স্ততরাং কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রকার ( কৃষ্ণে মূর্তি ), লালু নন্দ-  
লাল, নিত্যানন্দ ভবানী, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরার  
গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী,  
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরক্ষনাথ, নবাইঠাকুর, গৌরকবিরাজ  
প্রভৃতি বহুবিধ কবিওয়ালার গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না । কিন্তু  
এস্থলে যজ্ঞেশ্বরী নায়ী রমণী কবি রচিত একটি সখীসংবাদ গানের কত-  
কাংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,—“কর্ম ক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান । হেরে  
মুখ, গেল হুংখ, দুটো কথা'র কথা বলি প্রাণ । আমায়' বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষান্ত

যজ্ঞেশ্বরী ।

হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিগে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে । আমি  
কুণবতী নারী, পতি বই আর জানিনে ॥ এখন অধীনী

বলিয়া ক্ষিরে নাহি চাও ; যরের ধন ক্ষেলে প্রাণ, পরের ধন আঙুলে বেড়াও । নাহি চেন  
ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও ॥”

আমরা ভোলাময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি ; ইনি হরু-

ভোলাময়রা ।

ঠাকুরের চেলা ছিলেন, তাঁহার ‘ভোলানাথ’

নামে শিবত্ব আরোপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দল ব্যঙ্গ  
করাতে ভোলা গালি খাইয়া বলিতেছে—“আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে  
ভোলানাথ নই । আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্রামবাজারে রই, আমি যদি সে  
ভোলানাথ হই, তোরা সবাই, বিষদলে আমার পুজলি কই ॥” পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড়া  
মধুসূদনকিন্নররচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া যায় ।

এই সময় পূর্ববঙ্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা

করিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত কবিগণের  
পূর্ববঙ্গের রামরূপঠাকুর ।

পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য ; আমরা আপাততঃ  
তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে পারিলাম না, সংগ্রহকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে  
তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল । পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালা  
রামরূপঠাকুর-কৃত একটি সখীসংবাদ গান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করি-

তেছি,—( চিত্তান ) “শ্রাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী ।  
বেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতা জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেয়ি কমলিনী ।  
জাতী যুধি কুটরাঙ্গ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কুসকেলী, নবকলি অর্দ্ধবিকশিত, বাতে  
বনমালী হরবিত, সাজাল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয়  
যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত । ফুলের শয্যা সব বিকল হল, অসময়ে চিকণ কালা  
বাণী বাজায় । রক্তদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে । ( ধূয়া ) কিরে বাও হে নাগর,  
প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে । কিরে বাও শ্রাম তোমার সন্ধান নিয়ে ।  
( পর চিত্তেন ) ছিলে কাল নিশীথে বার বাসরে । বধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি-  
শেষে এলে রসময় । বধু প্রেমের অমন ধর্ম নয় । তুমি জানতে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই  
প্রেমেতে যে জন দীক্ষে, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয় । প্যারী  
ভাগের প্রেম কববে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে ॥”

কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রাওয়ালা দলেরও উল্লেখ আবশ্যক । সখী-  
সংবাদগান অপেরার ভ্রায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়,—এদেশে  
শ্রীকৃষ্ণযাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণযাত্রার  
সাধারণ নাম ছিল ‘কালিয়দমন’, কিন্তু এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে  
সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই ‘কালিয়দমন’ যাত্রায়  
অভিনীত হইত । আমরা এস্থলে প্রাচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা  
অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব ; গোপালচন্দ্র দাস-  
উড়ের নাম আমরা পূর্বে লিখিয়াছি । যাত্রাগুলির সর্বান্বিত “গৌরচন্দ্রী”  
পাঠ হইত, তাহাতে বোধহয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্তমান আকারে  
প্রবর্তিত হয় ।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রায়,—বীরভূমনিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্বা-

পেক্ষা প্রসিদ্ধ । তৎপর শ্রীদাম সুবল অধিকারী

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা ।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ে যুগ অর্জন করেন । এই

কবির সমসাময়িক লোচন অধিকারী অত্রুসংবাদ এবং নিমাইস্বপ্নাস

গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন । কথিত আছে ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মনমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া কবিকে অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করেন । কল্পণ রসে বিভ্রাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অত্র কোন ধনী ব্যক্তি ইহাকে গান গাইবার জন্ত আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই । জাহাঙ্গীরপাড়া—কৃষ্ণনগরনিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী, ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরনিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রায় পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন । পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী রামযাত্রায় লক্ষপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিলেন । ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ-নিবাসী লাউসেন-বড়াল ‘মনসার ভাসান’ পালা গাহিতেন ও দুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্বী ছিলেন ।\*

পূর্ববঙ্গ কৃষ্ণযাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,

এই সকল কবির নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ  
কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

আমরা এখন করিতে পারিলাম না—কিন্তু পরবর্তী সময়ে যিনি পূর্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন না । এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমরা যে সকল কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের স্থায় পদকর্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই—তিনি এই বৈষ্ণব-গীতি-সাহিত্যের পুনরুত্থানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর, বৈদ্যবংশীয় সদাশিব-

বংশাবলী ।

কবিরাজের বংশোদ্ভব ; বংশাবলী এইরূপ, ১ ।

সদাশিব, ২ । পুরুষোত্তম, ৩ । কানাই ঠাকুর,

৪ । বংশীবদন, ৫ । জনার্দন, ৬ । রামকৃষ্ণ, ৭ । রাধাবিনোদ, ৮ ।

রামচন্দ্র, ৯ । মুরলীধর, ১০ । কৃষ্ণকমল । সুখসাগর ইঁহাদিগের আদিম

বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানাগ্রামে বসতি স্থাপন করেন ;

বোধখানাগ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন ;

কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাটবাসী ছিলেন । এই বৈষ্ণব-

বৈদ্যবংশের এক বিশেষ শ্লীষার বিষয় এই—পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যা-

নন্দ প্রভুর জ্যোতী মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন, স্মৃতাং ইঁহার নিত্যানন্দ-

প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান সন্ততির গুরুকুল ।

কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ অব্দে ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার

মাতা সাধ্বী যমুনাদেবী পরদুঃখকাতরা আদর্শ-

বাল্যজীবন ।

রমণী ছিলেন । সপ্তম বৎসর বয়স্ক বালককে

মাতৃকোড়বধিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান । সেইখানে

কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আবস্ত করেন,—কথিত আছে তৎকাল এক

নিঃসন্তান ধনকুবের বালকের স্নিগ্ধ রূপ ও হরিভক্তির উদ্দাম ভাবাবেশ

দেখিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া ‘পোষ্য পুত্র’ স্বরূপ

রাখিতে ইচ্ছা করেন । মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির জন্ত পুত্রসহ

পলাইয়া গৃহে আগমন করেন । ৬ বৎসর পরে মাতা যমুনাদেবী পুনরায়

শিশুর মুখ চুম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ।

কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ শাস্ত্র করিয়া ‘নিমাইসঙ্ক্যাস’ যাত্রা

রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন ।

ইঁহার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় ; পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল

হুগলীর সোমড়া বাঁকিপুর গ্রামে স্বর্ণময়ীদেবীর পাণি গ্রহণ করেন । বিবা-

হের পর তিনি স্বীয় বদান্ত শিষ্য রামকিশোরের সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেন । এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে । সেই সময় ঢাকা সংগীতচর্চার ক্ষত্র প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানা দল তথায় প্রতিযোগিতা করিতেছিল, কৃষ্ণকমলের “স্বপ্ন-বিলাস” রচিত হওয়ার পর সেইসব প্রতিদ্বন্দী দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল । বৈরাগীগণ সারেং লইয়া স্বপ্নবিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চীৎকার করিয়া—“এষ হতে ওষর যেতে, অঞ্চল ধরি সাথে সাথে, বলত দে মা ননী খেতে, সে ননী অবনীতে পড়ে র’ল গো” প্রভৃতি গাহিতে লাগিল ; স্বপ্নবিলাস রচিত হওয়ার পর প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই সব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন, সেই নিঃশব্দ স্বার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্যধামের হৃৎপিণ্ডিত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিকাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয় । আবহুলা-পুর গ্রামে ‘স্বপ্নবিলাসের’ প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তৎপর কবি ‘রাই-উন্নাদিনী,’ ‘বিচিত্র-বিলাস,’ ‘ভরত মিলন,’

অন্তান্তগ্রন্থ ।

‘নন্দ হরণ,’ ‘সুবল সংবাদ’ প্রভৃতি পালা রচনা করেন । বিচিত্র বিলাসের ভূমিকায় কবি ‘রাই-উন্নাদিনী’ ও ‘স্বপ্নবিলাসের’ কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—“যোধ হয়, ইহাতে সাধারণেরই ঐতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি ?” ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ‘স্বপ্নবিলাস,’ ‘রাই-উন্নাদিনী’ এবং ‘বিচিত্রবিলাস’ জন্মেনী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া “The popular dramas of Bengal” নামক স্বল্প পুস্তক প্রণয়ন করেন ।

শেষজীবন কৃষ্ণকমল । ঢাকায় অসামান্য প্রসিদ্ধির সহিত অতিবাহিত

করেন । প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিম্‌সন্ সর্বদা  
শেষজীবন ।

তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও ‘পণ্ডিত গৌসাই’  
বলিয়া সম্বোধন করিতেন,—“বড়গৌসাই” বলিলে ঢাকাবাসী লোক  
কৃষ্ণকমলকে বুঝিতেন ; অশ্রুগদগদকণ্ঠে যখন “বড়গৌসাই” ভাগবত  
পড়িতেন, তখন তাঁহার কল্পণ ব্যাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত । জীবনে  
তিনি অনেক পাষণ্ড কোমল করিয়াছিলেন ।

কবির বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপালগোস্বামীর মৃত্যু হয়, এই  
শোকে ও নানারূপ অটীজ ব্যাধিতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয়,—১৮৮৮ খৃঃ  
১২ই মাঘ ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমে চুচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাঁহার লীলার  
অবসান হয় । তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকার  
আছেন, এবং তাঁহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হইল  
কলিকাতা হইতে ‘কৃষ্ণকমল প্রহ্লাবলী’র এক নব সংস্করণ বাহির করিয়া-  
ছেন । কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ  
মাসের ‘শ্রাসনেল ম্যাগাজিনে’ এবং পৌষ মাসের ‘সাহিত্যে’ আমরা  
বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর “রাই-উম্মাদিনী” বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য ।

এই পুস্তকের প্রতি পড়েই চৈতন্তদেবকে মনে  
রাই-উম্মাদিনী ।

পড়িবার বিষয় আছে । যাহাঁরা “চৈতন্ত-  
চরিতামৃত” প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা “রাই-উম্মাদিনীর” স্বাদ  
ভাল করিয়া পাইবেন না,—অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উম্মাদিনীর নামে  
নবমীপের উম্মাদের । কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনার বলিয়াছেন,—  
“বাদিতে নিজ শাধুরী, \* \* \* নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কীদি বলে হরি  
হরি ।” চৈতন্ত-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে ৮ম পরিচ্ছেদে ঠিক এই কথাই  
আছে,—“আপন শাধুরী হরে আপনার মন । আপন আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ।”  
আমরা নরসিংহের স্থায় আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি,

বাহিরের বস্তুতে কে কবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ! বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি ; এই রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত ; রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল কি স্নিগ্ধ পল্লবটি দেখিয়া মানুষের আয় ইতর, প্রাণিগণও মুগ্ধ হইত ; জাতিগত হইলে চীন-দেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম ; সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না । আমরা প্রত্যেকে ‘নিজের মাধুরী’ দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একাংশে আত্মসমর্পণ বলা যাইতে পারে, নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদের অঙ্গসরণ করিয়া থাকে, \* গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ফুট—নিজকে তুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—“দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বারে বার, স্বরূপ দেখারে একবার,—নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ, হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরতে যায় করিয়া দৈব ।”—(রাই-উন্মাদিনী) । কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিন “রাই-উন্মাদিনী” রূপ উৎকৃষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়াছেন । কৃষ্ণকমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অল্প সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন—“চাঁদে যে কলঙ্ক আছে । ছি, ছি, চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে ।” ‘প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তবে বিরহ কেন ? গোস্থামী মহাশয় বলিয়াছেন,—“তবে যে গোপিকার হয় এতই বিবাদ । তার হেতু প্রোষিতভর্তৃকা রসাস্বাদ । ক্ষুণ্ণরূপে মূর্তি যখন দেখেন নয়নে । তখন ভাবেন বুঝি এল বলাবনে । অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী ।” (রাই-উন্মাদিনী) । এই মিলন-বিরোধী পথের অন্ত-রায় ‘যমুনা,’ যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি

---

লর্ড বাইরনের পদে এই তত্ত্বের আভাস দৃষ্ট হয়—

“It is to create and in creating live,  
A being more intense, that we endow,  
With from our fancy, gaining as we give the life we enjoy.”



করিতেছে,—তাহা আত্মবিশ্বাসিত মাত্র । চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার বিশেষরূপ আলোচনা আছে ।

পূর্বের উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণকমলের রাধিকা—চৈতন্যদেবের ছায়া ।

তাঁহার প্রেমের আবেগ—নির্মল, নিষ্কাম  
কৃষ্ণকমলের রাধিকা ।  
ও আত্মবিশ্বাসিতপূর্ণ । রাধিকা এই প্রেমের

আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণসত্ত্বা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার প্রেম-বিলাপ প্রলাপের ত্রায় অসংখ্য, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুণ্য-মাখা । কবি প্রেমচিন্তার মোহিনী-মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন । তাঁহার প্রেম-মাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাত্ম-উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কল্প কি কমলের তুলনার আবশ্যক নাই । চন্দ্রাবলী মূর্ত্তাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,—  
“যখন বধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা ক’ত, তখন এই না মুখে—মুখের কতই যেন শোভা হ’ত—তা নৈলে এমন হবে বা কেন, বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, কেঁদে উঠ’ত রাধা বলে ।”—“বঁধু থেকে কুসুমশযায়, হৃদয়ে রাখ’ত যায়, সে ঘন আঁজ ধুলায় গড়াগড়ি যায় ।”—“অতুল স্নাতুল কিবা চরণ দুখানি । আল’তা পবাত বঁধু কতই বাখানি—এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে—বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে । হেন বাহা হ’ত যে পাতিলে দেই হিয়ে ।” পাঠক দেখিবেন, রাধিকা যখন কৃষ্ণের প্রীতি-পাত্রী, কিম্বা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা,—চন্দ্রাবলী সেই সকল স্থলেই শুধু রাধিকাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধিকা হাসিয়া কথা বলিতেন, সেই সময় তাঁহার হাসির মাধুর্য্যে চন্দ্রাবলী মুগ্ধ হইত—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতিবন্ধে বক্ষে রাখিতেন, এই জ্ঞাত ধূলিগুণ্ঠিতা রাধিকার প্রতি চন্দ্রাবলীর এত রূপা, বঁধু আল’তা পরাইতেন,—এইজ্ঞাত সে পাদ-পদ্মযুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে সুন্দর—এবং যখন কৃষ্ণদর্শনের জ্ঞাত ব্যগ্র হইয়া রাধিকা ছুটিয়া বাইতেন, তখন অনুরাগগীর পদে কুণাস্কুর বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চন্দ্রাবলী বক্ষঃপাতিয়া দিতে চাহিয়াছেন । এস্থলে রাধিকার প্রেমই তাঁহার সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে ।

দিব্যোন্মাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দমুখি  
লতিকার নিকট হৃৎকথা কহিতেছেন,—সে  
বিরহ।

স্থলটি কবিকুমার,—“এই কদম্বের স্থলে, নিয়ে গোপ-  
কুলে, চাঁদের হাট মিলাইত। সেরূপ র’য়ে র’য়ে মনে পড়ে গো।” ইত্যাদি স্মরণ  
করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন; বান্ধা অতীত সুখের কথা  
মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুসুমদর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া  
অজ্ঞান হইয়াছিলেন, হৃৎপ্রহরে রাধা সুবল সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট  
আসিলেন,—“দেখি নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অগ্নি তুচ্ছ নিলাম ধূলা ঝেড়ে, রাধিলাম  
শ্রাম হিয়ার উপরি। কত যতন ক’রে গো। আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার  
সুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী, সুবল বলরে। কইলাম আমি তোমার সেই  
শাসী, আমার বুঝি চিন নাই নাথ,—অগ্নি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বঁধু কতই বা সুখে।”  
তাব পরে কিরূপে তপস্কার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা  
বলিতেছেন,—“প্রেম করে রাখালের সনে, কিরূপে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কটক পঙ্ক  
মাঝে—সখি আমার যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বাঁশী,—অঙ্গনে ঢালিয়ে জল,  
করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেন, সখি আমার চলতে যে হবে গো, বঁধুর  
লাগি পিছল পথে। “হইলে আঁখার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে  
শিথিতেম, সদা আমার কিরূপে যে হবে গো, কটক কানন মাঝে।” ইহা কি নিষ্কাম  
দেব-আরাধনার কথা নহে! শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাঁহার  
উপেক্ষা কি সহ্য যায়!—“আঁচরি চিকুর বানাইত বেগী, সখি সে বেগী সখরি,  
বাঁধিত কবরী, মূলতীর মাঝে বেড়াইত গো। কত সাজে সাজাইত, সুখ পানে চেয়ে  
র’ত, বঁধুর বিধু বদন ভেসে যেত, দুটি নয়নের জলপুঞ্জে।” এই বিলাপাঙ্গক গীতির  
স্তরে স্তরে আসন্ন মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা; এই অবস্থায় সহসা পাখীর স্বরে কি  
মেঘোদয়ে মন উতলা হইয়া পড়ে,—উদ্ভ্রান্ত চক্ষুর নিকট মেঘ  
কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধানামে সাধা বাঁশীর ধ্বনিতে  
পরিণত হয়; রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্তকরে বলিতেছেন,  
“ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে, অমন করে বাওয়া উচিত নয়, যে বার স্মরণ লয়, নিতর

বঁধু, তারে কি বধিতে হয়, হেথা থাকতে যদি মন না থাকে, তবে বেণু সেথাকে, যদি মনে মনরত, না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে । তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে, না থাকে, না থাকে, কপালে বা থাকে তাই হবে; বঁধু বধা বে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধরে বেঁধে কবে রেখে থাকে ।”

উন্মাদিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন,—“নেত্রপলকে বে নিম্নে বিধাতাকে, এত ব্যাঞ্জে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহোক দেখা হ’ল দুঃখ দূরে গেল—এখন গত কথায় আর নাই প্রয়োজন”—গত কথা বলিতে ক্রোধের নির্ভরতার কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমাশীলা বলিতেছেন,—“গত কথায় আর নাই প্রয়োজন ।” তারপর আবার,—“বঁধু আমার মতন তোমা অনেক রমণী, তোমার মতন আমার ছুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি”—“বঁধু আমার হৃদয়কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ”

পাগলিনীর এই ভ্রমময় কৃষ্ণপ্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার চিত্রখানির সমগ্র পাঠক নিজে দেখিবেন । এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের জায়, কিন্তু চৈতন্য হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয় । রাধা এই ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেঘের অদর্শনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; সখীগণ এই মুর্ত্তিমতী পবিত্রতা—সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার প্রেমাশ্রুশ্রিত, প্রেমোক্তি, শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল ; চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থায় বিলাপ শুনিয়া এই ভাবে গদাধর, মুরারি প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিত ; এই ছবি এত সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত, যে তাঁহারা জগতের কথা বুলিয়া তাঁহাকে নিশ্চল বিশ্বস্তির, সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইত না । রাধিকার—“নিখাসে না বহে কমলের আস” এবং “গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে, মুখে নাহি সরে, শুধু গো গো করে, বিধুযুগ হেরি পরাণবিদরে । আজ বুঝি রাখারে বাঁচান না যায় ।” এই চিত্রের সঙ্গে আর একখণ্ডনি চিত্র দেখুন—“প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন । নাম সঙ্কীর্ণ করি কঁরে জাগরণ । \* \* \* সর্বরাজি করে ভাবে মুখ সংবর্ষণ । গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন ।” চৈ, চ, অন্ত ১২ পঃ । উন্মাদিনী রাধিকার

“ওগো মালতি জাতি কুন্দলতিকে, যুথি, কনকযুথিকে গো” প্রভৃতি গান চৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম শ্লোকানুবাদ—“তুলসি, মালতি, যুথি, মাধবি মল্লিকে” প্রভৃতি অংশের সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন। রাধিকার মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা—“কিবা সজ্জন জলদ শ্রামল হুম্বর।”—গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম সর্গের চতুর্থ শ্লোকের কৃষ্ণরূপসূচক পদটির অবিকল অধুরূপ,—“কি হেরিব শ্রাম রূপ নিরূপম” গানটিও জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের একটি শ্লোকের অনুবাদ। এই সফল শ্লোক চৈতন্য বারংবার আবৃত্তি করিয়া পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, একজ্ঞ সেগুলি পড়িবার সময় তাঁহাকে মনে পড়া স্বাভাবিক। রাধার সঙ্গে সখীগণ কাঁদিয়া অজ্ঞান হইল, তখন চন্দ্রাবলী আসিয়া সেই মুদিত পদ্যসংকুল তড়াগের ত্রায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে—“মরি একি সর্বনাশ আজ বিপিনে, এসব কনক পুতলী, পড়িয়াছে ঢলি, বিপিনবিহারী শ্রীহরির বিনে, গজোৎখাতে যেন কমল-কানন, মহাবাতে যেন হেম রক্তাবন।” ইত্যাদি। রাধাকে চন্দ্রাবলী চিনিত, কারণ চন্দ্রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দী,—ত্রায়পর শত্রু আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে,—“মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্বতী, যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী” এস্থল চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যমখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনরাবৃত্তি।

মুচ্ছা-ভঞ্জে রাধা ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আধ ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন,—“কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে। দে দে দে দেখো, সে ব ব ব বঁধুকে ॥ না না না না দেখে বি বি বিধু মুখে। প প পরাণ বেঁধা যা যায় দুঃখে ॥” চন্দ্রা মথুরা হইতে দাসখণ্ডের সর্ত্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন, “বেঁধ না তার কমল করে, ভরসনা কর না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখে। যখন ডাক্তে মল্ল কবে, চল্লমুণ মলিন হবে, তাই ভেবে কাটে মোর বুক ॥” এইরূপ নির্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন।

অভিনিবেশ সহকারে বহু স্থান লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণকমলক্লত পদাবলী পাঠকের চক্ষে এক নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার আয় চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়া পড়িবে এবং তৎস্থলে এক উপবাস-ক্লশ দীন অথচ পল্লম সুন্দর ব্রাহ্মণবালকের মূর্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে। এই পদাবলীবর্ণিত রাধা-চরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে ব্যাখ্যাত গৌরলীলার সার সংগৃহীত। রাই-উন্মাদিনীতে তাঁহারই মধুর আখ্যান বৃন্দাবননিবাসিনীর নামে বর্ণিত; আমরা কৃষ্ণ-কমলের পদ অত্র ভাবে পড়ি নাই।

## ৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ( ১৮১১ খৃঃ—

১৮৫৮ খৃঃ ) নাম উল্লেখ করি নাই । তাঁহার  
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জিত

নহে—এজ্ঞ আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসই তাঁহার গ্রন্থাদি আলোচনার  
উচিত স্থল হইবে । বিমল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে “হিন্দুস্থানী রেবিলেস” আখ্যা  
প্রদান করিয়াছেন \* ; ইনি অনেকগুলি সখীসংবাদ গান রচনা করিয়া-  
ছেন, কিন্তু বোধ হয় সখীসংবাদ গান অপেক্ষা ব্যঙ্গকবিতা রচনাতে কবি  
সুপণ্ডিত ছিলেন । তাঁহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি ব্যক্তি-  
বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না,—পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের  
তীব্ররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,—লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ, † আইনের  
হুত্ৰ লইয়া ব্যঙ্গ, ‡ ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ, § । গোস্বামীগণ লইয়া  
ব্যঙ্গ ¶ । তাঁহার এই প্রথরব্যঙ্গরাশিও সখীসংবাদগীতি কালে সাহিত্যের  
অধঃস্তরে পড়িয়া বিস্মৃত হইবে—কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের চিরস্মরণীয়

---

\* “Ishwar Chandra Gupta, a sort of Indian Rebelais.” Beames  
Comparative Grammar Vol. I, P. 86.

† “লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে । কিছুমাত্র স্থখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে ।  
বতকণ ধাক্কা ধন ঠাকুর আগারে । নিজের খাও, খেতে দাও সাধা অনুসারে । ইথে  
যদি কমলার মন নাহি সরে । পাঁচা লয়ে ষাউন মাতা কৃপণের ঘরে ।”

‡ বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে—“সকলেই এইরূপ বলাবলি করে । ছুঁড়ির  
কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে । শরীর পড়েছে বুলি চুলগুলি পাকা । কে ধরাবে মাছ  
তারে, কে পরাবে শাখা ।”

§ ‘বিড়ালাকী বিধুমখী মুখে গন্ধ ছুটে ।’

¶ “অনেক কবাই ভাল গোসায়ের চেয়ে ।”

কীর্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে । আমরা বর্তমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় আলোচনা করিব ।

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুকৃত হইরাছিল ।

কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের  
ছন্দ ।

সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে প্রবর্তিত করার চেষ্টা দেখা যায় । এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয় । আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতেছি ;—

### বৃন্তগন্ধী ( Hemistich ) ।

“কোটায় কি আছে দেখ খুলিয়া । থাকিয়া কি ফল বাই চলিয়া ॥ বিদ্যা খোলে কোটা কল ছুটিল । শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥” বি, হু ( ভারতচন্দ্র ) ।

### ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ।

“থাক, থাক, থাক, কাটাইব ‘নাক, আগেতে রাজারে কহি’ মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি ॥” এ

### ভঙ্গত্রিপদী ।

“ওরে বাছা ধুমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্মের বাধহ সেতু ।” এ

### দীর্ঘ ত্রিপদী ।

“কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা ।” ক, ক, চ ।

### দীর্ঘ চৌপদী ।

“এক কাণে গোঁড় বশিষণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি কুণ্ডল, আধঅঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীয়ে ।” অ, ম ।

### লঘু চৌপদী ।

“আহা মরে বাই, লইয়া বাংলাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে । যোগিনী হইয়া  
উহারে লইয়া, বাই পলাইয়া, সাগর পারে ॥” ভা, বি, হু ।

### মাল ঝাপ ।

“কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে । প্রাণ দহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে ॥”  
কবিরঞ্জন, বি, হু ।

### একাবলী—একাদশাক্ষরাবৃত্তি ।

“বড়র পীরিতি বালির বাধ । ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণে চাঁদ ॥” ভা, বি, হু ।

### একাবলী—দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি ।

“নয়ন যুগলে সলিল গলিত । কনক মুকুরে মুকুতা ঞ্চিত ॥” কবিরঞ্জন, বি, হু ।

### তুণকছন্দ ।

“রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিফলিঙ্গ ছুটিছে । হলহুল, কুলকুল, ব্রহ্মডিষ কুটিছে ॥”  
অ, ম ।

### দিগাক্ষরাবৃত্তি ।

“মৃদুমন্ড দক্ষিণ পবন, হৃদীতল হৃগন্ধি চন্দন, পুষ্পসরস্বত্যাভরণ, আজু কেন হৈল  
হতাশন ॥” অ'লোয়াল ।

### তরল পয়ার ।

“বিনা হৃত, কি ঐজুত, গাঁথে পুষ্পহার । কিবা শোভা মনোমোহা, অশ্রি চমৎকার ॥”  
কবিরঞ্জন; বি, হু ।

### হীনপদ ত্রিপদী ।

“হর হর ম” দুঃখ হর । হর রোগ, হর তাপ, হর শোক, হর পাপ, হিমকর শেখর-  
শকর ॥” অ, ম ।

### মাত্রা ত্রিপদী ।

“কল বন কঙ্কণ, নুপুর রণ রণ । যুহু যুহু যুহু বোলে ॥” ভা, বি, হু ।



মাত্রা চতুপদী ।

“হে শিব-মোহিনী, শুভ-নিম্বদনি, নৈতা-বিষাতিনি, দুঃখ-হরে ।” অ, ম ।

তোটক ।

“রমণী-মণি নাগর-রাজ কবি । রতি-নাথ বিনিমিত চাক্ষু চবি ।” কবিরঞ্জন—বি, হু ।

ভূজঙ্গপ্রয়াত ।

“অনুরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে । অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ।” অ, ম ।

পূর্বোদ্ধৃত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দিলাম । সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে সুন্দররূপে প্রবর্তিত হইয়াছে এবং পদবিভাগ সংস্কৃতের ত্রায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে । কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্বত্রই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্কৃতের নিয়মানুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গালা-পদবিভাগ করিতে গেলে শব্দগুলি সর্বত্র স্থললিত হয় না ; ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একবারে না আছে এমন নহে,—যথা তোটক ছন্দে,—“তুনি হুন্দর হুন্দরীরে কহিছে,” এখানে “রী” গুরু হওয়া উচিত হয় নাই । ভারতচন্দ্র ভিন্ন অত্যাশ্রয় কবির রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের বিদ্যা-সুন্দরে,—তোটক ছন্দে,—“ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে ।” পদে “মু” ও “বু” লঘু হইয়াছে, এই দুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্যিক ; হরিলীলায় ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে—“বসিয়া স্বর্ণের পীঠে হাসিছে । প্রবালধরে মল্ল মল্ল ভাসিছে ।” “হাসিছে” ও “ভাসিছে” শব্দদ্বয়ের “সি”র গুরু-উচ্চারণ রাখা উচিত । আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই ; সংস্কৃতের ছন্দানুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেব-পালিতরচিত ‘ভক্তির’ কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়, আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি । মালিনী ছন্দ—

“কুল সম হুকুমারী, দীর্ঘকেশী কুশাদ্রী । অচপল তড়িতাভা হুমারী গৌরকান্তি । মধুর নববয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্য । যুবক নয়নলোভা কামিনী কামশোভা ।” বংশস্থবিল,—  
 “তথায় ভীমাসিত-বর্ষ-ভূষিত । প্রচণ্ড আভাময় চক্ৰ মস্তকে । সবিস্ময়াগ্নি প্রলয়ানুধা-  
 ত্রবৎ । কৃপাণ-পাণি প্রহরী ত্রজে ভূমে ।” এখন সংস্কৃতের পছা হইতে তিৰ্য্যক্  
 গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন,  
 তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে ।

পদ্যসম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য । শুধু শেষ  
 অক্ষরের মিল পড়িলেই পদ্য শ্রুতিমধুর হয়  
 পদের নিয়ম ।

না, শেষ বর্ণের আদ্য বর্ণের স্বরের মিল  
 থাকিলে দুইটি চরণে প্রকৃত মিল পড়িল, বলা যায় । ভারতচন্দ্র ছাড়া  
 প্রাচীন কালের কোন কবিই এ বিষয়টিতে মনোযোগ প্রদান করেন  
 নাই ;—স্থানে স্থানে শুধু শেষ বর্ণের মিল থাকিলেও, দুইটি চরণ  
 নিত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, যথা :—“দিবানিশি, থাকে বসি, ডানায় ঢাকিয়া ।  
 ইহাকেই বলে লোকে ডিমে, তা’ দেওয়া ।” এখানে “ঢাকিয়া” এবং  
 “দেওয়া” নিত্যন্তই শ্রুতিকটু শুনায় । কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি  
 সকল কবিই এ নিয়মটি উপেক্ষা করিয়াছেন । শুধু ভারতচন্দ্র এ  
 বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, তাঁহার অতি অল্প বয়সের লিখিত “সত্য-  
 পীরের” কথা, এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,—উক্ত  
 কবিতাটিতে ‘বসি’—‘আসি’, ‘গুণে’—‘ত্রিভুবনে’, ‘স্তুতি’—‘অব্যাহতি’,  
 ‘উত্তরিগ’,—‘পেল’, ‘কথা’—‘গাঁথা’ প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা মিল দেওয়া  
 হইয়াছে,—‘সত্যপীরের কথা’ ভারতচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা ।  
 এই ক্ষুদ্র পুথ্যকথানি ছাড়িয়া দিলে, তৎপ্রণীত অল্প কোন কাব্যেই আমা-  
 দের নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না,—ভারতচন্দ্রের কবিতায় অবলম্বিত  
 এই অতীব প্রশংসনীয় গুণ—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অন্তঃসাধারণ । আর  
 একটি কথা, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় “ন” এর সঙ্গে “ম”, “ক” এর

সঙ্গে “খ”, “চ” এর সঙ্গে “ছ”, “জ” এর সঙ্গে “ঝ”, দ্বারা অবিরত মিল পড়িতে দেখা যায়। ইহা স্বাভাবিক পরিহার করিতে পারিলে যে কবিতা শ্রুতি-মধুর হয়,—তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই সকল নিয়ম দ্বারা কবিতাসুন্দরীর গতি ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করিলে অবশেষে, তাঁহার পক্ষ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা যাহারা মনে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন,—স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন কবিগণের শ্রুতিই তাহাদিগের কবিতাকে উৎকৃষ্ট নিয়মানুযায়ী রচনার দিকে প্রবর্তিত করিবে, তাঁহারা এ সকল নিয়ম মনে করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন না,—নিয়মগুলি কাব্যকলার স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে, তাঁহাদিগকে আপনা আপনিই অনুসরণ করিবে; অবশ্য কষ্ট-কবিগণ এই সকল নিয়ম দ্বারা বিড়ম্বিত হইতে পারেন, তাঁহারা গদ্য দ্বারা স্থায় মনোগত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করুন, কিংবা একপ কোমল ব্যবসায়ের অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়া কার্যাসুত্রে লিপ্ত হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

আমাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীকৃত নিয়মটি সম্বন্ধেও ভারতচন্দ্র সতর্ক, এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের কবিগণের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এ স্থলে বলা উচিত, প্রাচীন হিন্দীকাব্য সমূহে এই দুইটি নিয়মই সর্বদা অনুসৃত হইতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্র হিন্দীকাব্যগুলির আদর্শে এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

এই পুস্তকে আমরা গদ্য-সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম।

গদ্য রচনার নমুনা একবারে না আছে, এমন গদ্য-সাহিত্য।

নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু আধুনিক বঙ্গভাষায় আমরা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি,—সেই ক্ষুদ্র ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি নব্য সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ‘গদ্য পদ্যময়’ রচনার উল্লেখ পাইয়াছি, স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে—এই ‘গদ্য রচনা’ পদেরই এক প্রকার রূপভেদ । এই মত নিঃসন্দেহ ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না । চৈতন্যপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর রূপগোস্বামি-বিরচিত ‘কারিকা’ নামক ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক পাওয়া

গিয়াছে । \* প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বের রূপগোস্বামীর ‘কারিকা’ ।

বাক্সালা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয় ; দুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি—প্রারম্ভ-বাক্য,—“শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জয় । অথ বস্তু নির্ণয় । প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয় । শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ । এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে । ‘শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে । এই পঞ্চগুণে পূর্বরাগের উদয় । পূর্বরাগের মূল দুই ; হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ ।” ইত্যাদি । শেষ অংশ—“আগে তারে সেবা । তার ইন্দ্রিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে । ইতি ।”

আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত “রাগময়ীকণা” নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহা পদ্যগ্রন্থ, কিন্তু যে স্থলে কৃষ্ণদাসের ‘রাগময়ীকণা’ ।

কোন সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন হই-  
যাচ্ছে, সেই সব স্থল গদ্যে লিখিত ; একটা অংশ এইরূপ—“রূপ তিন কি কি রূপ—শ্যাম ১ কেশ ২ গৌর ৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ । কৃষ্ণ জিউর পঞ্চ নাম । গুণ তিন মত হয়ে কি কি গুণ । ব্রজলীলা ১ । দ্বারকালীলা ২ । গৌরলীলা ৩ । ৬ দশা তিন কি কি দশা ।” ইত্যাদি ।

“দেহকড়চ” পুস্তিকা খানি ১৩৪৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রি-

\* বর্ধমান রায়নানিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন । বাক্সব ১২৮৯ সন, অষ্টম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃঃ ।

‘দেহকড়’ ।  
কায় মুদ্রিত হইয়াছে,—ইহার রচনাও অতি

সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রকাশক,  
যথা,—“তুমি কে । আমি জীব । আমি তটর জীব । থাকেন কোথা । ভাও ।  
ভাও কিরূপে হইল । তব বস্তু হইতে । তব বস্তু কি কি । পঞ্চ আত্মা । একাদশেশ্বর ।  
ছয় রিপু ইচ্ছা । এই সকল য়েক যোগে ভাও হইল । পঞ্চ আত্মা কে কে । পৃথিবী ।  
আপ । তেজঃ । বাউ । আকাশ । একাদশেশ্বর কে কে । কর্ণ-ইন্দ্র পাঁচ । জ্ঞানীন্দ্র  
পাঁচ । আবরণ এক ।”

১১৮১ বাৎ সনের হস্তলিখিত ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গদ্যপুস্তকের  
‘ভাষাপরিচ্ছেদ ।’  
আরম্ভ ও মধ্যভাগ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত  
করিতেছি । ‘এই পুস্তকখানি সংস্কৃত ‘ভাষা-  
পরিচ্ছেদ’ নামক গ্রন্থের অনুবাদ ।

আরম্ভ—গৌতম মুনি কে শিবা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি  
প্রকারে হয় ? তাহা বৃথা করিয়া বলহ । তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন । তবৎ  
পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয় । তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো ।  
তাহাতে গৌতম কহিতেছেন । পদার্থ সপ্তপ্রকার । জবা শুণ কৰ্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়  
অভাব । তাহার মধ্যে জবা নয় প্রকার ।

মধ্যে—সীমাংসা মতে কৰ্ত্তাস্বক শব্দ নিজে ধন্যাস্বক শব্দ জন্ত স্বর্ণাস্বক শব্দকে  
ঈশ্বর কহেন । সীমাংসকেরা পরমায়া মানেন না । অতঃপর কর্ণের পরিচয় কহিতেছি ।  
\* \* \* ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ । কারণজন্ত হইয়া কার্যজনক যে হয় তাহার  
নাম ব্যাপার । \* \* অনুমিতির অপর কারণ পুরুতা আছে । ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা  
কহেন পৰ্ব্বতে বহ্নিনন্দনের নাম পুরুতা । একথা ভালো নহে কারণ যে হয় সে অবশ্য  
কার্যের অব্যবহিত পূৰ্ব্ব ক্ষণেতে থাকে । প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির স্থিতি পরে  
পরামর্শ । তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূৰ্ব্বক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ সে ক্ষণে  
সংশয় থাকিল না । জ্ঞান ইচ্ছাশেষবৃত্ত স্থখঃস্থঃ । ইহার বিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ, ত্রিক্ষণে  
নষ্ট হয় জানিবে ।”

অল্পদিন হইল ‘বৃন্দাবনলীলা’ নামক একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন

‘বৃন্দাবনলীলা ।’

গদ্যপুঁথি (খণ্ডিত) আমার হস্তগত হইয়াছে, আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—“তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন খেনুৎসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন যে দিবস খেনু লইয়া সেই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজ্জীন বহিষাছিলেন এবং পাষণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন । গঘাতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্যবনে এবং চরণ পাহাড়িতে এই চারি স্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম ( তারতম্য ? ) নাঞী । চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেস শাহি তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক সেবা আছেন, তাহার পূর্ব দক্ষিণে সেরগড় । \* \* \* গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ “পশ্চিম নিধুবন চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্বপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর জাইতে বামদিগে এক অটালিকা অতি গোপনীয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌল্যাকে বর্ণন করিবেক শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন । নিধুবনের পশ্চিমে কিছু দূর হং নিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিশ্রাম করিতেন, ঠাকুরাণীজীটির পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পূজা করেন ।” অচেতন পদার্থের প্রতি গভীর সম্মানসূচক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং “না এগী” প্রভৃতিরূপ অদ্ভুত বর্ণ বস্ত্রাসদৃশে বিন্মিত না হইলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এ রচনা অনাড়ম্বর ও সহজ গদ্যের নমুনা । পরমভক্ত বৈষ্ণবলেখক যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অলিগলির প্রতি সম্মানসূচক পদ প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আমাদেয় আপত্তি করিবার বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ নাই । এই পুস্তক ভিন্ন কৃষ্ণদাস প্রণীত

সহজিয়া পুঁথি ।

( ১০ ৯৮ সনের হস্তলিপি ) “আশ্রয় নির্ণয়,”

১১১২ সনের হস্তলিপি “ত্রিগুণাঙ্কিকা”, চৈতন্যদাসপ্রণীত । “রসভক্তি-চক্রিকা”, “দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ”, নীলাচলদাসপ্রণীত, “বাদশ পাট নির্ণয়,” ১০৮২ সনের লিখিত “প্রকাশনির্ণয়”, এবং (১১৫৮ সনের হস্তলিপি )

“সাধন কথা” প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন গদ্য রচনার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । এস্থলে বলা উচিত এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই “সহজিয়া” সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত ।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় ‘স্মৃতিকল্পদ্রুম’ নামক নিজ বাটীতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা স্মৃতিগ্রন্থ ।

গদ্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে ( সেরপুর ) প্রাপ্ত অপর একখানা বাঙ্গালা গদ্যে রচিত স্মৃতিগ্রন্থের বিষয় জানাইয়াছেন । \* আমরা রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের রচিত গোরী-মঙ্গল কাব্যে “স্মৃতি ভাষা কৈল রাখাবল্লভ শরণ ।” পদে স্মৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা খুব সম্ভব গদ্যগ্রন্থ ।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দ্বারা বোধ হয় হ্রস্ব স্বত্রের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু ধারাবাহিক গদ্যরচনার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না ।

আমরা দেবডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের আয় কতকগুলি বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি । এই তন্ত্র খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, বাঙ্গালাটি বোধগম্য হইল না, একটি ছত্র এইরূপ, “গোসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাড়াল পাই মুই আকটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া ।” বৈঃ গঃ হস্তলিখিত পুঁথি ।

স্বত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গালার নমুনা দৃষ্ট হয় ; বৈষয়িক পত্রাদির ভাষাও বেশ সহজ ; আমরা ক্ষুদ্রচন্দ্র মহা-  
নন্দকুমারের পত্র ।  
রাজ্যের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখি-

\* শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত, বিদ্যাভাগের জীবনচরিত ১৫২—১৬০ পৃষ্ঠা ।

রাছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয় । ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের ও 'দীননাথ সামন্তজীউ'র নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে ; মেঃ বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ত্রাসনাল মেগাজিন পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । এই পত্র দুইখানির ভাষা সহজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দূর সহিত মিশ্রিত, যথা—“অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাখিয়া আমার উচ্চার করিতে পার, তবেই যে ইউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকররর, মকররর জানিবা । নাগাদি ওরা ভাত্র তথাকার রোয়াদাদ সমেত, মজুমদারের লিখন সঞ্চলিত মনুষ্য কাসেদ ওখা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা ।” ১৭ই ফাল্গুন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের যে একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ( ১৩০৬ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠা ) প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পত্রাদিতে প্রচলিত তাৎকালিক গদ্য রচনার একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে । এই দলিলে সহজিয়া মতের প্রাধান্য দৃষ্টে বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির সূচনা উপলব্ধ হয় ।

‘রাজদরবারে উর্দূ ও সংস্কৃত মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গালা গদ্য গঠন করিয়াছিল ; এখনও “কস্ত কৰ্কপত্রমিদং দরবারী ভাষা । কার্যকাণ্ডে,” “টাল মাটালে টাকা আদায় না করাত্তে,”

“ওয়ারা কার্তিক মাসে টাকা পরিশোধ করিব” প্রভৃতি দলিলপ্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃত রূপের ‘নমুনা’ কিছু বিদ্যমান আছে । আমরা পাঠ্য পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী কাচারী ও জমীদারের সেরেস্ভায় প্রাচীন জটিল গদ্য বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না । আমরা



নিম্নে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যপ্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি,—“৭৮৩ শ্রীশ্রীশ্রী গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমরবিজই মহা মহোদয় রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মোজে বোলনল অজ হামিলা জমা ১৮ আটার কাপি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম এহার পাঁঠা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা স্থখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ তে ১৯ কার্তিক।” ১২৯ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উদ্ধৃত অনন্তরাম শর্ম্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, তাহাও প্রায় এই সময়ের রচনা; এই উর্দ্ধু মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এইচ, পি, ফষ্টার সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জমা করেন, তাহা এতলে আলোচ্য নহে। সেই তর্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অব্যয় ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার যথেষ্টাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির পরিষ্কার রূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না।

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর “আলালের ঘরের দুলাল” রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন আলালী ভাষার প্রাচীন আদর্শ বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে “কামিনীকুমার” রচক কালীকৃষ্ণদাস ‘গদ্যছন্দের’ যে নমুনা দিয়াছেন, তদৃষ্টে “আলালী ভাষা” তাহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা “কামিনীকুমার” হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১. রামবল্লভের তামাক সাজা।

গদ্যছন্দ। সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করিতে হুন্দরী ইষং হান্ত পূর্ব্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কটু দিবা বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিল। করিতেছে অতএব শরণাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে বরং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিসম্মত বটে। আর বিশেষত আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গতে নাই অতএব অন্ত ২ কর্ম্ম উহা হৈতে যত হউক

আর না হউক কিন্তু এক আখ ছিলিম তামাক চাহিলেও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক । তাহার আর তো কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার । সোনা কহিলেক হাঁ ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক । কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সনাগরকে কহিতেছে । শুন চোর তুমি যে অকর্ণ করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত নুনতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম । এইক্ষণে আমার সর্বদা আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হইবেক আমি যখন বাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম করিবে তাহাতে অশ্রুধা করিলে তদ্বৎ রাজার নিকট প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্তু যদি কর্মের দ্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে পারহ তবে তোমার পক্ষে শেষ বিবেচনা করা বাইবেক । সনাগর এই কথা শুনিয়া মনেই বিবেচনা করিলেক যে রাস বাঁচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতান্তলীপূর্বক কামিনীর সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আপনি জন্মান্তরে এদিনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই নতুবা এমন উপকার পর পরের যে তো কখন করেন না । সে বাহা হউক আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভূতা কৃতসাধ্য প্রাণপণে পালন করিব । কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার আর কি কর্ম করিবে কেবল হঁকার কর্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম । সনাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি । রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আল-বোলা অনিয়া ধরিয়া দিলেক । এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজা কর্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমন অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ বর্ণাপি জেজনে কিবা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি ।\*

১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কৃত “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত” লণ্ডন-

রাজীবলোচনের ‘কৃষ্ণচন্দ্র-  
চরিত’

নগরে মুদ্রিত হয় ; ইহা প্রাচীন কালের  
খাঁটি বাঙ্গলায় লিখিত, ইহার উপর ইংরেজী-  
গদ্যের কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না । প্রাচীন

গদ্যের এই নিদর্শন দেখিয়া বোধ হয় গদ্য রচনা পূর্বে এতদ্দেশে বিশেষ রূপ প্রচলিত না থাকিলেও,—ইহার বেশ বিকাশ হইয়াছিল ;—আমরা নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি । “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত” শুধু গদ্য-সাহিত্যের হিসাবে নহে,—ঐহা সেকালের এক খানি তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট ইতিহাস ।

“পরে ইঙ্গরাজের বাবদীয় সৈন্ত পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল । নবাব সৈন্ত সকল দেখিল যে প্রধান ২ সৈন্তেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শত ৯ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উদ্ভ্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে । যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেক আপনি কি করেন আপনার চাকরেরা পরাস্ত করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে । নবাব কহিলেন সে কেমন । মোহনদাস কহিল সেনাপতি মিরজাকরালি খান ইঙ্গরাজের সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্ত দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি বাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্ত লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্বেই ঘরে বসে লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না । নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়বৃত্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্ত দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরিত করিলেন । মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত হইল । মোহনদাসের যুদ্ধে ইঙ্গরাজ সৈন্ত শঙ্কান্ত হইল । মীরজাকরালি খান দেখিলেন এ কর্তব্য ভাল হইল না যদিপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমাদের সকলেরি প্রাণ বাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারিত করিতে হইয়াছে । ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন । সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাবসাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন । মোহনদাস কহিল আমি রণ-ত্যাগ করিয়া কি একারে বাইব । নবাবের দূত কহিল আপনি রাজা জায়ে মনেন না । মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরচ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল । মীরজাকরালি খান বিবেচনা করিল যুদ্ধ প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল

তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ । আজ্ঞা পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল । সেই বাণে মোহনদাস পতন হইল । পরে নবাবি বাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল ॥

পরে নবাব শ্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি । ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন । পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালিখান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পাতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়ের দিগের জয় হইল । তখন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল । বাবদীয় প্রধান ২ মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন । সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ণে নিযুক্ত ছিলেন সেই কর্ণে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন । মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্বক রাজকৰ্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায় । সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন ।

পরে নবাব শ্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক । ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব শ্রাজেরদৌলা বিষন্নবদন । ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাটুক আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন । ফকিরের প্রিয়বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন । ফকির খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালিখানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব শ্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর । নবাব জাফরালিখানের লোক এ সম্বাদ পাবামাত্রে অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব শ্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক ॥”

‘ভোতা ইতিহাস’, ‘বজ্রিণ সিংহাসন’, ‘পুরুষ-পদীক্ষার অনুবাদ’  
 প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্য-পুস্তক উনবিংশ  
 শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়,—উহাদের  
 ভাষা কতকটা এই রকমের । ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা  
 শিখাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় কোর্ট উই-  
 কোর্ট উইলিয়ম কলেজের  
 অধ্যাপকগণ ।  
 লিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়,—কয়েকজন  
 সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক  
 পদে প্রতিষ্ঠিত হন । গুভর্নমেন্ট কর্তৃক তাঁহারা কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক  
 প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত হন । তাঁহারা ভাবিলেন—উহাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা  
 বাঙ্গালা ভাষা অলঙ্কৃত করিতে হইবে,—সাধারণের ছুধিগম্য উৎকট  
 সমাসাবদ্ধ রচনা দ্বারা তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যকে বেরূপ বিড়ম্বিত করিয়া-  
 তিলেন,—তাঁহার নিদর্শন “প্রবোধ-চক্ষিকা” প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে  
 পাওয়া যায় । প্রাচীন একখানি শিশুবোধকে  
 শিশুবোধকের ধারা ।  
 স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার  
 যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

“শিরোনামা ঐহিক পারত্রিক ভাবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়  
 পদপন্নবাস্ত্রপ্রদানেষু ।”

“শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী-স্বরী দেবী প্রণম্য  
 প্রিয়বর প্রাণেশ্বর, নিবেদনকাণ্ডে মহাশয়ের শ্রীপদসরোরূহ স্মরণমাত্র অত্র শুভম্বিশেষ ।  
 পরঃ মহাশয় ধনাভিলাষে পরমেশে চিরকাল কাল বাপন করিতেছেন, যে কালে এগাসীর  
 কাঙ্ক্ষণ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত  
 হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সাধনা করা দুই কালের সুখকর বিধে-  
 চনা করিবেন । \* \* \* অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ  
 পূর্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানঃ প্রদানঃ কুরু নিবেদনমিতি ।”

স্বামীর উত্তর—শিরোনাম, “প্রাণাধিকা স্বধর্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঙ্গলী দেবী সাবিত্রীধর্মপ্রাপ্তিতেষু।”

“পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবরাস্ত্রসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়প্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ষণঃ ঝটিত ঘটুত বাহিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনবাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর-কমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুভদ্বিশেষ । কৃষ্ণদিবসাবধি প্রত্যবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রয়াস নিবাস তাহাতে কর্ণ কাঁস ব্যতিরিক্ত উত্ততান্তঃকরণে কাল বাপন করিতেছি । অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্বদা একতা পূর্বক অপূর্ব সুখোন্মত্ত মুখারবিন্দ যথা-যোগা মধুকরের ন্যায় মধুমাংসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয় । প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-রেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্বক কালযাপন কর্তব্য, বিত্রোপার্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জনে প্রয়োজন নাই হির সিদ্ধান্ত করিয়াছি । ত্রাপনামিতি ।”

অনুপ্রাস বাহুল্যাহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে ঢকানাদের ত্রায়

শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ত্রায় দুর্কোধ্য হইয়া  
অনুপ্রাসের বিবৃতি ।

পড়িত, যথা—“রে পাবও যও এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড

কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড শত্যাশার ন্যায় লওও হইয়া ভও সম্রাসীর  
ন্যায় ভক্তিতাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীহ গণ্ড-  
শিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছে ?” অনুপ্রাস এস্থলে ভাষার অলঙ্কার  
হয় নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে । পূর্বোক্ত রচনার পার্শ্বে “কৌকিল  
কালাপ খাচাল যে মলয়াঢলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাতাচ্ছ নিব্বাস্তঃ কণাচ্ছ হইয়া  
আসিতেছে।” (প্রবোধ-চন্দ্রিকা) প্রভৃতি উৎকট গদ্য সন্নিবেশ করা যাইতে  
পারে ।

প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখ-

যোগ্য । অনেক স্থলে গদ্য রচনার পূর্বে “গদ্য-  
প্রাচীন গদ্য লিখিবঙ্গ রীতি ।

ছন্দ” এই কথাটি লিখিত দেখা যায় । পদ্য  
রচনার বেক্রপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, গদ্য পুস্তকেও মধ্যে  
মধ্যে সেক্রপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা কালীকৃষ্ণদাস রচিত কামিনীকুমারে—

“কালীকৃষ্ণ দাস বলি পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কন্তু হইল যে, কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না, রাম বলিবা মাত্রেই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত ।”

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে দৃষ্ট হয়, এক একটি প্যারাপ্রাফের শেষে ছুইটু দাঁড়ি (।।) প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধ্যায়ান্তের মধ্যবর্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরামচিহ্ন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, সেই সকল স্থানে এক একটি দাঁড়ি (।) প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন গদ্যরচন্যুগুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্র-

চলিত কিম্বা ভিন্নার্থ বোধক হইবে তাহা গদ্য পুস্তকে অপ্রচলিত শব্দ ।

স্বাভাবিক ; গদ্য পুস্তকে আমরা “সমাধান”—গুছান, “প্রকরণ”—কার্য্য, ঘটনা, “খেদিত”—বিমর্ষ ; “সমুভ্যব্যহৃত”—সঙ্গবৃত্ত, “অন্তঃকরণে করা”—মনে করা প্রভৃতি ভাবের অর্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। “দিগের” এই বিভক্তিটির পূর্বে প্রায়ই একটি ‘র’ প্রযুক্ত হইত, যথা “লোকে<sup>১</sup>র—দিগের”, “ভূতের—দিগের” “পণ্ডিতের—দিগের” এইরূপ প্রয়োগ রাজ্জা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এবং প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমূহেও অনেক পাওয়া যাইবে। প্রাচীন পুথির বর্ণবিজ্ঞাসগুলিব অদৃষ্টপূর্বরূপ পরিদর্শন করিয়া এখন আমাদের আর বিস্ময় হয় না, মনোনীত শব্দের স্থলে “মনোস্থিত”, থাকিবে না—“থাখিবে না”, কুটু<sup>২</sup>ষ—“কুতু<sup>৩</sup>ষ”, বটে—“ভটে”, এক—“য়েক”, প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষে সহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই “মহামহোপাধ্যায়” শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। স্মরণ্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইবার পূর্বেও সাবেকী বাঙ্গালার ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, স্বীকার্য্য করিতে হইবে। পূর্বোক্ত শিশুনোদকের পত্র লিখিবার ধারা সংস্কৃত বিদ্যাভিমানী বিকৃতমস্তিষ্কের রচনা,—সাধারণ

কাজকর্মের জন্ত একরূপ পত্রাদি প্রচলিত ছিল না। হালহেড্ সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—সমস্ত বঙ্গদেশে কাববারের জন্ত বাঙ্গালা পত্রাদি সর্বদা লিখিত হইত। এইরূপে পত্রাদি-রচনায় বাঙ্গালা গদ্য নিত্য ব্যবহৃত হইত, সে সকল গদ্য সহজ ভাষা ও সরল কথায় লিখিত হইত।

প্রাচীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্ত আমরা এই-স্থলে দুইখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব; প্রথম পত্রাংশ ৬ছগাঁপ্রসাদ মিত্রের লেখা ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয় \*—দ্বিতীয় পত্রখানি ড্রেক সাহেবের নিকট সিরাজউদ্দৌলা লিখিয়াছিলেন, তাহা রাজীবলোচন যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

### প্রথম পত্রাংশ—

“সেবকান্ত প্রণামা নিবেদনকাগে মহাশয়ের শ্রীচরণশীর্ষাদে সেবকের মঙ্গল পরন্ত।—

সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক দ্বারা জানিলাম যে, মহাশয় পুনর্ব্বার সংসার করিবেন এমত অভিলাষ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রামমোপাল চক্রবর্তী পাত্রী অধেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিকপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আত্মা হইবেক।”

### দ্বিতীয় পত্র।

“তাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন, এবং পূর্ব্বকি যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন, এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তাঁর রাজ্যের বাহুল্য হয় না, এবং

---

\* ঙলপি-সংগ্রহ আমরা এই পত্র এবং পরবর্তী পত্র খানিতে বিরাম-চিহ্ন প্রদান করিলাম, যুগ্মে বিরাম-চিহ্ন ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।



পরাক্রমেরও দ্রুত হয় । আপনি রাজা মহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, ইহাতে রাজার শ্রায় ব্যবহার কেন, অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব । আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক, কিন্তু আর আর বত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি যিবেচক সংপারামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন ।”

প্রায় শতাব্দী পূর্বে যে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল,

শব্দের পরিবর্তন  
ও অর্থান্তর গ্রহণ ।

তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে

উঠিয়া যাইতেছে । পুছিল, পেখিল, মেনে,

( এই শব্দ চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ

করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেখোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শব্দের কোন অর্থ দৃষ্ট হয় না,—পাদপুরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ) নেহারে, ঘরণী, দৌহে ( ছইজন ), আচস্থিত, এথায়, এবে, এড়িল, প্রভৃতি শব্দের গদ্য সাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের কোন কোনটির প্রভাব পদ্য সাহিত্যেও অন্তগামী ।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় পরিবর্তিত হইয়াছে, সংস্কৃত “প্রীতি” শব্দ বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালা ‘পীরিত’ শব্দে বোধ হয়, তাহা বুঝায় না । সংস্কৃত ‘রাগ’ শব্দ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর সময়েও রাগ অর্থ ক্রোধ ছিল না,—গোবিন্দ দাসের কড়চায় “রাগে ভগ্নমগ্ন প্রভু ঘেয় সম্ভরণ । পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখে বত ভক্তগণ ।” অংশে রাগ শব্দ মূল অর্থবিচ্যুত হয় নাই, এখন রাগ এবং অম্বরাগ বাঙ্গালায় ছই ভিন্নার্থবোধক শব্দ । ভর্তা হইতে যে শব্দটি

উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় কেবল মাত্র অর্থদৃষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অস্পষ্ট হইয়াছে। ভাণ্ডারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহারাজ হুৰ্য্যোধনও কুণ্ঠিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তদ্রূপ গৌরবজনক নহে। দেব শব্দ হইতে ‘দে’ শব্দ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় নিতান্ত নিগূহীত হইয়াছে, একটু মর্যাদা বিশিষ্ট হইলে “দে” গণ ‘দাস’ আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। ‘দেব’ গণের বংশধর ‘দাস’ হইতেও হীন হইয়াছেন। মহুষ্যের ভাগ্যচক্রের ত্রায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্রও পরিবর্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। “মহোৎসব” শব্দের অর্থ বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। মহোৎসবের ত্রায় বোধ হয় “সঙ্কীৰ্ত্তন” শব্দও তাঁহাদের দ্বারা সঙ্কুচিতার্থ হইয়াছে।

পূর্বে যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। “খেঁউর” গানে গালা-খেঁউর গান।  
গালির চূড়ান্ত করা হইত; দেড়শত বৎসর পূর্বে নদে ও শান্তিপুর ‘খেঁউর’ গানের জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা-সুন্দরকে বর্ধমানের ভুলাইয়া রাখিবার জন্ম প্রলোভন দেখাইতেছেন,—  
“নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন টাটে খেঁড়ু শুনাইব।” (ভা, বি)।

কৃষ্ণনগরের পুতুল, ও শান্তিপুরের ধুতির বিষয়ও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য।  
পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মূর্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধর্মমণ্ডে তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা হালিসহরনিবাসী নয়নভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি—(“নয়ন ভাস্কর হালি সহর গ্রামে ছিল” ভক্তিরত্নাকর, ১০ তরঙ্গ)। জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের ঢাল, লাহোরী কামান, কাশ্মীরী

কুঙ্কুম, মূলতানের হিজ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষ-  
রূপ আদৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত “কাশ্মীর দেশের ভাল শাল গন্ধাজলি” উক্ত  
পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিক্গণ বাণিজ্য  
করিয়া বিপুল ধনোপার্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,—  
প্রভৃতি নাম ধনের মর্যাদাব্যঞ্জক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে  
নায়ক রূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত,—আমরা  
শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র  
উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মানীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গসাহি-  
ত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক-নায়িকা—সদাগর-  
কুলোদ্ভব। এখন বণিকসম্প্রদায় যুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে  
নিগ্রহভাজন।

অন্তঃপুর শিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে

পারে না ; আনন্দময়ী দেবীর বেকরূপ রচনা-  
শ্রীশিক্ষা।

পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে,  
তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা  
মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়ভাগে  
আমরা যজ্ঞেশ্বরী নামী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া  
দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে লালাজয়নারায়ণের ভগ্নী গন্ধামণি দেবী  
এক শতাব্দী পূর্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতক-  
গুলি এখনও তদ্দেশে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে।

রমণীমহলে লেখাপড়ার এতদূর চর্চা হইতেছিল, পুরুষগণের অনে-

সংস্কৃত ও কারশী।  
কেই যে সরস্বতীর বরপুত্র হইতে লালারিত

হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি। বাঙ্গালা-  
ভাষায় ফারশী ও সংস্কৃত এই দুই পদ মধ্যে মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, আমরা  
রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সংযোগ চোঁ দেখাই-

য়াছি ; সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই ছুই পদ ভালরূপ মিশ্রিত হয় নাই । ভারতচন্দ্র, কবি আলোয়াল প্রভৃতি এই বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; ভারতচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন, “মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী । উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্দুস্থানী । পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবার পারি । কিন্তু সে সকল লোক বৃষ্টিধারে ভারি ॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল । অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল ॥” কেবল যবনীমিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই । স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, ফারশী, বাঙ্গালা, হিন্দী এই চতুর্বিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞাস্তে পুনর্জীবিত দক্ষমূর্তির ত্রায় উৎকট, \*—যথা, “শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাজ দেখে আদর কর, কাহে মররো রোয়কে । বজ্রং বেদং চন্দ্রমা, চু লালা চে রেমা, ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিমে কাহে শোয়কে ।” এই শিক্ষার চেউএ নিমন্ত্রিত সভাগৃহ আন্দোলিত হইত । সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি ভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ সেন তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি সূচাক্রভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি । পাঠক ইহাতে সে সময়ে কি কি পুস্তক পাঠ হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে পাইবেন ।

“ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পূত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহনে । কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম সংস্থাপন কারণে । তেজস্পূঞ্জ হকিরণ, গুরুবর্ষ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা সূতিকাকোটা । গুরু বজ্রোপবীতে, রক্তভোট আসনেতে, বসিতেছি বিচারের ঘট ।<sup>১</sup> অহুমান প্রত্যক্ষোক্তে, পরস্পর সম্বন্ধোক্তে, তार्কিক ঘটায় নানা তর্ক । প্রমাণ কুহুমাল্ললী, নানামতে ব্রহ্মবলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক । পদ পদার্থ

---

\* ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে বিরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় গ্রন্থকার হালহেড সাহেব লিখিয়াছিলেন,—“At present those persons are thought to speak this compound idiom with the most elegance who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns.”

বিচারিতে, এক দণ্ড আসেতে, কার কত নিশ্চিত ঘটাইয়া । বৈয়াকরণিরা সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া । মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিগে কহিছে রসেতে । ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিক লয়ে, কাব্যপ্রকাশ উদাহরণেতে । নানা ছন্দে শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কতমত বর্ণনা ভাবের । রসিক বিবৃথগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্ট, মাধু, নৈষদের । গৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে । বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তম্ভক ভাষণে, অস্ত্রপ্রভাস্তর লিখি । দশা বিদশা বসতি, জ্ঞানায় সাধু । প্রতি, স্বর্ধ/সিদ্ধান্তের মত দেখি । সকলেতে ব্রহ্মমুয়, বেদান্তে এমত কর, পাপ পুণ্যায় নিরঞ্জন । শত্রু মিত্র নয় তিনি, জ্ঞান ভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্যের এ লিখন । পড়িলে বিপত্তিকালে, দোষ যদি ঘটে বলে, ধর্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে । স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা এই, শূলপাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মজ্জ কহে ।”

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুত্রগণ এক হস্তে শুক পক্ষী ও অপর হস্তে রসকথাপূর্ণ কাব্য লইয়া—বিলাস কলায় দীক্ষিত হইতেছিলেন,—এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নবভাবে গঠিত হইতেছিল ; তাঁহাদের শাস্ত্রকথা ও রসকথা বে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক ঝাপটা বাতাসে থামিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা মনেও করেন নাই ।

ইংরেজ, আগমনেব সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে,

পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত  
নবস্তাবের সূচনা ।

প্রবাহিত হইয়াছে ; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি ও নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে । সাহিত্যে এই নবস্তাবের ফলে গদ্যসাহিত্যের অপূর্ণ আঁর্বুদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্ত করিতে শিখিতেছে, এবড় শুভ পূর্বলক্ষণ । ক্রোড়শীল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ধ্বরাশির অক্ষুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপ্ত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূর-

বর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা বলনা করিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছি।  
 অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য বেক্রপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে  
 কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কিত না হয়! আমার ভগ্ন-  
 স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে ভবিষ্যতে নবভাবে ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত, নব-আশা-দৃষ্ট বঙ্গ-  
 সাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব, আশা রহিল ।

সম্পূর্ণ ।

## গ্রন্থভাগে অনুলিখিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণী ।

- ১। অবৈততত্ত্ব—শ্রামানন্দপুরী। “ধরেন্দ্রা, বাহাদুরপুর”-বাসী ছুরিকানন্দন প্রসিদ্ধ শ্রামানন্দ এই পুস্তকে অবৈতপ্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।
- ২। অস্তপ্রকাশ খণ্ড—শ্রীনিবাস পুত্র গতিগোবিন্দ প্রণীত। শ্লোক ১২৫।
- ৩। অভিরামবন্দনা—রাইচরণ দাস। অভিরামগোস্বামী ও জাহ্নবীঠাকুরাণী সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে আছে। শ্লোক ৪২৫। হঃ লিঃ ১০৯৫ বাৎ সন।
- ৪। অমৃতরসাবলী—মুকুন্দ দাস। বৈষ্ণবধর্মের রূপক গ্রন্থ।
- ৫। অমৃতরসাবলী—শ্রীমুকুন্দ দেবের আদেশে কোন অজ্ঞাত লেখক দ্বারা লিখিত। ইহাতে সহস্র-ভজনের ব্যাখ্যা আছে। গ্রন্থকার স্বপ্ন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির দোহাই দিয়া সহস্র-ভজনকে ধর্মের উচ্চ অবস্থে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী। শ্লোকসংখ্যা ৩২০।
- ৬। আটরস—গোবিন্দদাসপ্রণীত।
- ৭। আশ্বজিহ্বাসা—গদ্যপুস্তিকা। কৃষ্ণদাসপ্রণীত। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় হঃ লিঃ ১২০৮ বাৎ।
- ৮। আশ্বনিরূপণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। আশ্বতত্ত্ববিষয়ক পুঁথি। শ্লোকসংখ্যা ২১১।  
হঃ লিঃ ১২১৮ সাল।
- ৯। আশ্বনিরূপণ—খণ্ডিত।
- ১০। আত্মসাধন—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২২২ সাল।
- ১১। আনন্দভৈরব—প্রেমদাসপ্রণীত।
- ১২। আনন্দলহরী—খণ্ডিত।
- ১৩। ইতিহাসসমুচ্চয়—খণ্ডিত।
- ১৪। উদ্ধবদূত—মাধবগুণাকরপ্রণীত। “তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। কবিশেষের পুত্র কবিচন্দ্র নাম। তার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর। পূর্বন পণ্ডিত ছিল সর্বগুণধর। গঙ্গসিংহ নাম রাজা ছিল বর্জবানে। তার সভাসদ ছিল বিজ সর্বগুণে।”

- ১৫। উদ্ধবসংবাদ—দ্বিজ নরসিংহ প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।
- ১৬। উপাসনাতত্ত্বসার—হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল।
- ১৭। উপাসনাপটল—নরোত্তমদাসপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৮১০।
- ১৮। উপাসনাপটল—শ্লোক ১২৫।
- ১৯। উপাসনাসারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।
- ২০। একাদশীত্রয়কথা—শ্যামদাস প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৮০।
- ২১। কণ্ঠমুনির পাররণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১১৩৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ১৫০।
- ২২। কণ্ঠমুনির পালা—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।
- ২৩। কপিলামঙ্গল—সুদীরামদাস ও কেতকাদাসপ্রণীত। 'হঃ লিঃ ১২২৮ বাং।
- ২৪। কবচাবলী—সত্রঙ্গরূপ। হঃ লিঃ ১০৮২। শ্লোক ১৪০।
- ২৫। কালনেমির রায়বার—কাশীনাথপ্রণীত। ১২৫৯ সাল। হঃ লিঃ।
- ২৬। কালকেতুর চৌতিশা—শ্রীচাঁদদাসপ্রণীত।
- ২৭। কালিকাপুরাণ—দ্বিজদুর্গারামপ্রণীত।
- ২৮। কালিকাষ্টক—শত্ৰুপ্রণীত।
- ২৯। কালিকাভিলাস—কালিদাস প্রণীত, খণ্ডিত পুস্তক, যে অবধি আছে, শ্লোকসংখ্যা ১৭৪০।
- ৩০। কালিদাস—দ্বিজপরাশরামপ্রণীত। হঃ লিঃ ১৭৬১।
- ৩১। কাশীখণ্ড—ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুরনিবাসী কেবলকৃষ্ণবহকর্জুক এই অনুবাদখানি ১২২২ সালে রচিত হয়।
- ৩২। কিরণলীপিফা—দীনহীনদাস—কবিকর্ণপুরপ্রণীত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদ।
- ৩৩। কৃষ্ণবর্ণন—নরোত্তমদাসপ্রণীত। “শ্রীলোকনাথগোসাঞি পাদপদ্ম কল্পি আশ।  
কৃষ্ণবর্ণন গায় নরোত্তম দাস ॥” শ্লোকসংখ্যা ১৫০।
- ৩৪। কৃষ্ণদাগীতচিন্তামণি—পদসংগ্রহ গ্রন্থ।
- ৩৫। কৃষ্ণলীলামৃত—বলরামদাস।
- ৩৬। কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা—ভবানন্দ।
- ৩৭। ক্রিাযোগসার—রামেশ্বর নন্দী প্রণীত, বৈষ্ণবদিগের নিত্য নৈমিত্তিক গ্রন্থ।  
পৃঃ নঃ ১২১৯ বাং।
- ৩৮। গঙ্গামঙ্গল—জয়রামপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৩৫০; সন ১২৪৮।



- ৩৯। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভবানীদাসপ্রণীত। শকাব্দা ১৬১৫ হঃ লিঃ।
- ৪০। গীতগোবিন্দ—(অমুবাদক) অজ্ঞাত লেখক। “হেন জয়দেব বাক্যরচনা সংস্কৃত।  
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে। এই দোষ আমার ক্ষেমিবে ত্রীকূট ভক্ত-  
গণ। বৈকবের আচ্ছাহেতু আমার রচন। সমাপ্ত করিল গজইকুরস সোনে  
(১৬৫৮)। কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চম। পটের তৃতীয় কর মধ্যেতে  
আকার। সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্বাধার। ইঞ্জের বাহুন পরে দময়ন্তী-  
পতি। বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি।”
- ৪১। গীতগোবিন্দসার—গীতগোবিন্দের অমুবাদ।
- ৪২। গীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাস, (দ্বিষ্যসিংহের পুত্র)।
- ৪৩। গুরুদক্ষিণা—অযোধ্যারামপ্রণীত। হঃলিঃ ১২২২ সন। শ্লোক ১৫০।
- ৪৪। গুরুদক্ষিণা—পরশুরামপ্রণীত। শ্লোক ১৫০। হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল।
- ৪৫। গুরুদক্ষিণা—স্বরূপরাম। হঃ লিঃ ১২৫৩ বাৎ।
- ৪৬। গুরুদক্ষিণা—শঙ্করপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫২ সাল, শ্লোক ৩০০।
- ৪৭। গুরুশিষ্যসংবাদ—নরোত্তমদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১২২২।
- ৪৮। গুরুশিষ্যসংবাদ—হঃ লিঃ ১২৫৩ বাৎ।
- ৪৯। গোপালবিজয়—কবিশেখর প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। হঃ লিঃ শকাব্দা ১৭০১।
- ৫০। গোপীভক্তিরস } ঋত্বিত। শ্লোকসংখ্যা (প্রাপ্ত) ২১০০।  
বা কৃষ্ণলীলা }
- ৫১। গোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাসপ্রণীত। সূন্দর পদাবলী।
- ৫২। গোলকবস্তুবর্ণন—গোপালভট্টপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ১০০।
- ৫৩। গৌরগণাখান—দেবনাথপ্রণীত, ভক্তগণের বিবরণ। শ্লোকসংখ্যা ৩২৫।
- ৫৪। গৌরগোন্দোদগোপিকা—বিজ্ঞ রূপচরণ দাস, কর্ণপুরকৃত সংস্কৃষ্টের অমুবাদ।  
এ           \* হৃদয়ানন্দ দাস—গ্রন্থকার ঋত্বিতসী রঘুনন্দন বংশীয়। এখানিও  
কবিকর্ণপুরকৃত সংস্কৃষ্টের অমুবাদ।
- ৫৫। গৌরীবিলাস—বিজ্ঞ রামচন্দ্র প্রণীত।
- ৫৬। গুণচরিত্র—ভবানন্দপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২১২ সাল।
- ৫৭। চন্দ্রচিন্তামণি—শ্রোমানন্দদাস প্রণীত গদ্যাপদ্যময় গ্রন্থ। “কনকমঞ্জরী পাদপদ্ম  
অভিলাষে। চন্দ্রচিন্তামণি, কহে শ্রোমানন্দ দাসে।”

৫৮। চমৎকারচল্লিকা—শ্রীমুকুন্দদাস—হঃ লিঃ ১২৪২ সাল।

ঐ নরোত্তম দাস—হঃ লিঃ ১১৪৫ সাল।

৫৯। চম্পক কলিকা—গদ্যাংশযুক্ত পদ্যগ্রন্থ শ্রীরসময় দাস প্রণীত।

৬০। চাটুপুষ্পাঞ্জলি—রূপগোবামি-বিরচিত, খণ্ডিত পুঁথি।

৬১। চিন্তামণিটীকা—খণ্ডিত। হঃ লিঃ ১২৪৩ সাল।

৬২। চৈতন্তচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ।

৬৩। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী—প্রেমদাস বিরচিত, জীবনাখ্যায়িকা গ্রন্থ। শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। হঃ লিঃ ১১০৬ সাল।

৬৪। চৈতন্ততত্ত্বসার—রামগোপালদাস প্রণীত, হঃ লিঃ ০১০৮১। “শ্রীমধুমতীচরণে বার অভিলাষ। চৈতন্ততত্ত্বসার কহে রামগোপাল দাস।”

৬৫। চৈতন্যপ্রেমবিলাস—লোচনদাসপ্রণীত, শ্লোক ১০০।

৬৬। চৈতন্যমহাপ্রভু—হরিন্দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২২০ সাল। শ্লোক ২৫০।

৬৭। চৈতন্যরসকারিকা—যুগলকিশোর দাস প্রণীত। শ্লোক ৩০।

৬৮। জগন্নাথমঙ্গল—দ্বিজ মুকুন্দ প্রণীত। হঃ লিঃ। শকাব্দা ১৭৩৫। শ্লোকসংখ্যা ২০০০।

৬৯। জয়গুণের বারমাস্তা—প্রায় ১৫০ বৎসর গত হইল চট্টগ্রামস্থ আনোয়ারার নিবাসী মহম্মদ হারি কর্তৃক বিখচিত সংস্কৃতাস্তক মধুর পদাবলী।

৭০। জ্ঞানরত্নাবলী—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।

৭১। বাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ—খণ্ডিত।

৭২। তত্ত্বকথা—মুহুরাধ দাস প্রণীত। খণ্ডিত পুঁথি।

৭৩। তত্ত্ববিলাস—বৃন্দাবন দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১০৮৭। শ্লোক ৮৫০।

৭৪। তামাকুচরিত্র—সীতারামকর প্রণীত।

৭৫। তুলসীচরিত্র—বিজয়গীরথ প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫৩ সন। শ্লোকসংখ্যা ১৮০।

৭৬। ত্রিগুণাঙ্কিকা—কুন্ড গদ্য ব্যাখ্যাময় পুস্তক। সন ১১১২।

৭৭। দধিধণ্ড—বৃন্দাবন বিরচিত। হঃ লিঃ সন ১২১৩।

৭৮। দণ্ডীপর্ক—কবি মহীন্দ্র প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫২ সন। শ্লোক সংখ্যা ১৫০০।

৭৯। দর্পণচল্লিকা—নরসিংহ দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। শ্লোক ২৫০।

৮০। দয়ন্তরী চৌতিশা—বিকুসেন প্রণীত।

- ৮১। দানখণ্ড—জীবন চক্রবর্তী প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২২৫।
- ৮২। দাসগোবিন্দী নৃচক—রাধাবল্লভ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল। শ্লোক-  
সংখ্যা ২০।
- ৮৩। দ্বাদশপাট নির্ণয়—নীলাচল দাস প্রণীত, গদ্যপদ্যময় ক্ষুদ্র পুঁথি। শ্লোক ১১০; শেষ  
এইরূপ :—“দ্বাদশ পাটের নির্ণয়। আদৌ ঠাকুর অভিন্নানের পাট থানাকুল  
বৃন্দনগর ১। অধিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ২। আকনা মহেশ পণ্ডিত ঠাকুর  
৩। ঠাকুর হুম্মরানন্দ হলদা মহেশপুর ১। উদ্ধরণ দত্ত সপ্তগ্রাম ৫। কালা কৃষ্ণ-  
দাস আকহিহাটের ৬। এই ছয় পাট। নবদ্বীপ পুঁথিবোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর ১।  
কমলাকর পিপলাই ২। বনজয় পণ্ডিত ৩। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর ৪। মুকুন্দদাস  
ঠাকুর ৫। কাশীধরদাস ঠাকুর ৬। জোজানে মালীদাস ঠাকুর নবদ্বীপে ছয়  
পাট (?) উপমহাস্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রদ্বীপ ১, তমলুকে বাহ-  
দেব ঘোষ ঠাকুর ২, গোবাপুর। ৩।
- ৮৪। দ্বারকাবিলাস—দ্বিজ জয়নারায়ণ প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫২। শ্লোক সংখ্যা ২০০০।
- ৮৫। দিনমণিচন্দ্রোদয়—মনোহর দাস “শ্রীযুক্ত অনঙ্গমঙ্গরীর পদে আশ। দিনমণি-  
চন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস।”
- ৮৬। দীপকেজল—বংশীদাস প্রণীত, ষণ্ডিত ( বৃহৎ পুঁথির অবশেষে বলিয়া বোধ হয়। )
- ৮৭। দেহনিরূপণ—লোচন দাস প্রণীত শ্লোকসংখ্যা ১০০।
- ৮৮। দেহভেদদত্তনিরূপণ—গদ্যপদ্যময় ক্ষুদ্র পুঁথি।
- ৮৯। দুই দিশার আখ্যা—হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল।
- ৯০। দুর্গামঙ্গল—দ্বিজরামচন্দ্র প্রণীত।
- ৯১। ধর্মমঙ্গল—দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত “দ্বিজ রামচন্দ্র গায় নিবাস চামটে।”
- ৯২। ধ্রুবচরিত—ভারত পণ্ডিত। শ্লোক ৫২০৭
- ৯৩। ঐ—চট্টগ্রামনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত দাস বিরচিত।
- ৯৪। নবদ্বীপপরিভ্রমণ—ক্ষুদ্র পুঁথি।
- ৯৫। নামামৃতসমুদ্র—নরহরি দাস প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২২০।
- ৯৬। নারায়ণদেবের ঝাঁচালী—দীনরাম প্রণীত।
- ৯৭। নারদপুরাণ—কৃষ্ণদাস, হঃ লিঃ ১১০৮ সাল। প্রথমে কবির পরিচয় এইরূপ,  
“অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার ! স্বর্ষ বণিক কুলোউৎপত্তি আমার। শৈত্রিক

বসতি পূর্বের অধিকানগর। হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর। পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্মপরায়ণ। এ সকল পুণ্যবান আছে পূর্বকীর্তি। এ অবশ্যের সংসারে রহিল অণকীর্ণি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম ছিল রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হুয়া তীর্থ করেন ত্রয়ণ। রঘুনাথ মথ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিহ চাপিয়া বিমান। আপনি কনিষ্ঠ যোর রামকৃষ্ণ নাম। সাক্ষিম কলিকাতা বহুবারেতে ধাম। সন দশ শত নিরেনকুই সালে। মাহ জ্যেষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে।

৯৮। নিকুঞ্জরহস্তস্তব গীতাবলী—শ্রীকপ এবং সনাতনকৃত মূল 'এবং বংশীদাস কৃত অনুবাদ হঃ লিঃ ১২০০ সাল।

৯৯। নিগম—শ্লোক ১৬০। হঃ লিঃ ১২২২ সাল।

১০০। নিগমগ্রন্থ—গোবিন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ -২৫৫ বাং। ১৪০।

১০১। নিগমগ্রন্থ।

১০২। নিগুচার্থ-প্রকাশাবলী গৌরীদাস প্রণীত। শ্লোক ১৫১৫। বৈকুণ্ঠ ধর্মের কপক গ্রন্থ।

১০৩। নিগুচ তত্ত্ব—হঃ লিঃ ১২৪২ সাল।

১০৪। নিত্যবর্তমান—শ্রীজীব গোষাধী।

১০৫। নিমাইচাঁদের—বারমাস্তা।

১০৬। নিকামী আশ্রয় নির্ণয়—এই পুস্তকে কপ ১৩ রঘুনাথ গোষাধীর কথায় ভক্তির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১০৭। নৌকাখণ্ড—জীবন চক্রবর্তী, হঃ লিঃ -২০২ সাল, শ্লোক ১২০।

১০৮। পাষাণদলন—কৃষ্ণদাস।

১০৯। প্রার্থনা—গৌচন দাস ঠাকুর।

১১০। প্রেমদাবানল—নরসিংহ—শ্লোকসংখ্যা ৩০০।

১১১। প্রেমবিধির বিলাপ—মৃগলকিশোর দাস, শ্লোক ৪৪২।

১১২। প্রেমভক্তিসার—গুণদাস বহু প্রণীত।

১১৩। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস। শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনকাহিনী। গ্রন্থকার শ্রীনিবাসাচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরপ্রিয়ার আদেশে পুস্তক রচনা করেন। শ্লোকসংখ্যা ৪৪০০।

- ১১৪। বাণ-যুদ্ধ—শ্রীগৌরীচরণ গুহ বিরচিত।
- ১১৫। বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান—খণ্ডিত।
- ১১৬। বিদ্যামঙ্গল—শ্রীনিধিরাম কবিরত্ন প্রণীত।
- ১১৭। বিলাপকুম্মল্লি—শ্রীরঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস প্রণীত। রাধিকার স্তব।
- ১১৮। বিলাপবিবৃতিমালা—খণ্ডিত।
- ১১৯। বীররত্নাবলী—গতিগোবিন্দ।
- ১২০। ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত—হঃ লিঃ ১০৮২ সাল।
- ১২১। বৃন্দাবন-খ্যান—খণ্ডিত।
- ১২২। বৃন্দাবন-পরিক্রমা—তুইখানি পাওয়া গিয়াছে—একখানি কৃষ্ণদাস প্রণীত ও অপরখানি শ্রীমানন্দ পুরী প্রণীত। বৃন্দাবনের স্থান মাহাত্ম্য।
- ১২৩। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। হঃ লিঃ ১০৮৮।
- ১২৪। বৈষ্ণবাস্তত—খণ্ডিত।
- ১২৫। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস।
- ১২৬। ভক্তিউদ্বীপন—নরোত্তম দাস।
- ১২৭। ভক্তি চিন্তামণি—বৃন্দাবনদাস—শ্লোক ৬০০। হঃ লিঃ ১০৬৯ সাল।
- ১২৮। ভক্তিরসাস্বিকা—অকিঞ্চন দাস, শ্লোক ১৭৫।
- ১২৯। ভক্তিরসাস্বিকা—খণ্ডিত।
- ১৩০। ভগবদ্গীতা—বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী প্রণীত। গীতার অনুবাদ। পুঃ নঃ ১২৪৬ বাৎ।
- ১৩১। ভ্রমরগীতা—দেবনাথ দাস—শ্লোকসংখ্যা ২৫০।
- ১৩২। ভ্রমরগীতা—খণ্ডিত।
- ১৩৩। ভাগবতসংসার—রসময় দাস—হঃ লিঃ ১২৭৬ সাল। শ্লোক ২৫০।
- ১৩৪। মঙ্গলচণ্ডী—রঘুনাথদাস—হঃ লিঃ ১২২৪ সন, শ্লোক ১৫০।
- ১৩৫। মঙ্গলচণ্ডী—শ্রীমদন দত্ত বিরচিত।
- ১৩৬। মদনমোহনবন্দনা—জরকৃষ্ণ দাস—হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল।
- ১৩৭। মনঃশিক্ষা—দ্বিরিবর দাস—হঃ লিঃ ১১৪৮ সন, শ্লোক ৩৫০।
- ১৩৮। মনসামঙ্গল—জগন্নাথ (নৈবল)। খণ্ডিত পুঁথি; প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা।
- ১৩৯। মনসামঙ্গল—জগন্মোহন মিত্র প্রণীত। শেষাংশে গ্রন্থকার তাঁহার বংশের হাবিদ্ধত

পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে সন্নিবিষ্ট করিবার একান্ত স্থানাভাব স্বীকার করিতেছি। বালাঙার গোহপু্রে তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিগণ বহুপুরুষ পূর্বে হইতে বাস করিতেছিলেন। কবির পিতার নাম রামচন্দ্র। নিজের নাম সম্বন্ধে কবি সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন। “নাম রাখি-  
য়াছে সবে শ্রীজগমোহন। অজ্ঞের যেমন নাম কমললোচন।” কবি জগমোহন ১৭৬৬ শকে মনসামঙ্গল রচনা করেন; তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়; সাংকেতিক ভাবে পুস্তকরচনার কাল নির্দেশ করিয়া “মুখের হইবে দুঃখ মুখ ভাবনায়” বিবেচনা করত মুখগণের প্রতি কৃপাপরায়ণতার একশেষ দেখাইয়া নিজের সংস্কৃতির ব্যাখ্যা। নিজেই করিয়াছেন। প্রাপ্ত পুঁথির শ্লোক-  
ব্যাখ্যা ৬৭০০।

১৪৬। মনসামঙ্গল—জীবন চক্রবর্তী প্রণীত।

১৪৭। মাধব-মালতী—দ্বিজরাম চক্রবর্তী প্রণীত।

১৪৮। মোহমুল্লার—পুরুষোত্তম দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১১৯৯ সন।

১৪৯। মুক্তাচরিত্র—নারায়ণ দাস প্রণীত। ১৫৪৬ শকে বিরচিত, হঃ লিঃ ১১০৪ সাল।  
শ্লোক সংখ্যা ২০০০।

২৪৪। যম উপাখ্যান—শঙ্কর দাস, হঃ লিঃ ১২৫৩ সাল, শ্লোক ১২৫।

১৪৫। যোগাগম—যুগলদাস—শ্লোক ২২৫।

১৪৬। রতিবিলাস—রসিক দাস প্রণীত, শ্লোক ২১০।

১৪৭। রতিমঞ্জরী—হঃ লিঃ শকাব্দা ১৬৯০; শ্লোক ১০০।

১৪৮। রতিশাস্ত্র—গোপাল দাস প্রণীত, শ্লোক ১৫০।

১৪৯। রত্নমালা—পদ্যসংগ্রহ।

১৫০। রসকদম্ব—কবিবরভট্ট প্রণীত। কবিবরভট্টের পিতার নাম রাজ-বরভট্ট, মাতার নাম বৈষ্ণবী, নরহরি দাস কবির দীক্ষা-গুরু। মুহুটরায় নামক ব্রাহ্মণ বহুর অমুরোধে ১৫২০ শকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। কবি বরভট্টের বাসস্থান “করোত জাতির মহাহান্যের সমীপবর্তী আমবাড়া গ্রাম।”—বর্ণনা মথো মথো বেশ স্থলর—বৈকুণ্ঠ বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল।

“গীতচ্ছন্দে কথা বাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি। সহজ কথনে বাতে বেদের উৎপত্তি।

না ভোগিলে সর্ব রস ভোগে সর্বজন। না দেখিয়া সর্বরূপ করে নিরীক্ষণ।

না বলিলে সর্ব্ব কথা বোঝে অনুমানে । না শুনিলে সর্ব্ব ধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে ।

না জানিঞা জানে তবে না রমিঞা রমে । মনের সকল কৰ্ম্ম পূরে বিনিশ্চমে ।

১৫১ । রসকম্পসার—নিত্যানন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ শক ১৭০১, শ্লোক ৮০ ।

১৫২ । রসভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১২৫ ।

১৫৩ । রসসাগর,—বৃক্ষনগর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র<sup>১</sup> রায়ের সভাসদ বৃক্ষকান্ত ভাট্টার উপাধি । তৎপ্রণীত বিবিধ উদ্ভট্ কবিতার অল্প কোন সংজ্ঞা না পাইয়া আমরা উহা ‘রসসাগর’ নামে অভিহিত করিষ । রসসাগরের উদ্ভট কবিতাগুলি তদীয় উপাধিতে বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ রহস্ত শক্তির পরিচায়ক । “বড় দুঃখে সুখ” “গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর” “কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ?” প্রভৃতি সমস্তা তাহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাহা পূরণ করিয়াছিলেন—

“বড় দুঃখে সুখ” ।

“চক্রবাক চক্রবাকী এক(ই) পিঙ্গরে,

নিশিথে নিবান আনি রাখিলেক ঘরে ।

চখা কহে চখী গিয়ে এষড় কোঁতুক ।

বিধি হ’তে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ ।

“গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।”

“বৃক্ষের নগর বৃক্ষনগর বাহির ।

বার(ই)য়ারী মা ফেটে হয়েছেন চোচীর ।

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির ।

গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।”

“কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ?”

“তোমার চা’ল না চুলো ঢেকি না কুলো

পরের বাড়ী ইবিয়া ।

আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষ্মী,

কতকগুলি কুপিয়া ।

আমার কার্টের না',                      দিলে পা,  
না' হবে মোর মুনিয়া ।  
আমি ঘাটে থাকি,                      বুঝি রাখি,  
কাঠপাথরে প্রভেদ কি ?”

- ১৫৪ । রসোজ্জ্বল—জগন্নাথ দাস প্রণীত, শ্লোক ৬৬০, হঃ লিঃ ১২৮৯ সাল ।
- ১৫৫ । রসোজ্জ্বল—প্রসিদ্ধ পদকর্তৃগণের ৩৬টি পদ সংগ্রহ ।
- ১৫৬ । রাগমালা—নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১৮০ । হঃ লিঃ ১১৪৩ সাল ।
- ১৫৭ । রাগবার্গলহরী—শ্লোক ১২৫ ।
- ১৫৮ । রাগরত্নাবলী—কৃষ্ণদাস প্রণীত, শ্লোক সংখ্যা ২০০ । হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল ।
- ১৫৯ । রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী ।
- ১৬০ । রাধাকৃষ্ণলীলারসকন্দ—বহুদল দাস বিরচিত, বিদগ্ধমাধবেব অনুবাদ বহুদল দাস কৃত অপরাপর পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকেও “শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী”র প্রতি বন্ধনাদি আছে । প্রাপ্ত পুঁথির হঃ লিঃ ১০৯০ সাল ।
- ১৬১ । রাধাচৌতিশা—দেবদাস প্রণীত ।
- ১৬২ । রাধারাগসূচক—( বহুনাথ দাস গোস্বামি-কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ ) রাধাবল্লভ দাস প্রণীত । শ্লোক ৫০ ; হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল ।
- ১৬৩ । রামায়ণ—গোবিন্দ দাস প্রণীত । আদি, অযোধ্যা, স্কন্দরা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, উত্তর-কাণ্ড, পাণ্ডুরা গিয়াছে । এই কয়েক কাণ্ডের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ ;—আদি, ১৫০০ । অযোধ্যা, ৭৫০ । কিষ্কিন্ধ্যা, ১০০০ । স্কন্দরা, ৩৪০০ । লঙ্কা, ৯৯০০ । উত্তর-কাণ্ড, ৮৩৫০ । গ্রন্থকারের পরিচয় এই—“কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ । তাঁহার তনয় বটে শেখভার্য্য দাস । গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ । কে বাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ ॥ গোবিন্দ দাসের মন রাম গুণ-নিধি ॥ কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি । যে কর সে কর মোরে নিল সুনিরাম । শেষ হৈল পরমায়ু বিধি হৈল বাস । শিশু গোবিন্দ দাস গায় রামনাম । আমি কি গাওয়াব মোরে গাওল্লন হে রামন”
- ১৬৪ । রামরত্ন-গীতা—ভবানীদাস রচিত হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল ।
- ১৬৫ । রায়বার—বিজ ভুলসী । শ্লোক ১২৫ ।



- ১৬৬। রূপমঞ্জরী—কৃষ্ণদাস প্রণীত। ত্রীকূপ গোস্বামীর অন্তর্ধানে বিলাপ। অনুবাদক বৈষ্ণবদাস। হঃ লিঃ ১২৪৪।
- ১৬৭। লক্ষ্মীব্রত পাঁচালী—শ্লোক সংখ্যা ১০৮। দ্বিজ অভিরাম প্রণীত।
- ১৬৮। শতরুকুবধ—কৃষ্ণিবাস—হঃ লিঃ ১২৫০।
- ১৬৯। শাখাবর্ণন—রাসিক দাস।
- ১৭০। শ্রীমানন্দ প্রকাশ—কৃষ্ণদাস—হঃ লিঃ ১২১১ বাং। শ্রীমানন্দ পুরীর প্রসঙ্গ।
- ১৭১। শিবায়ন—রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র—হঃ লিঃ ১০৯১ সাল।
- ১৭২। শুক-পরীক্ষিত-সংবাদ—হরিচরণ—৯ পত্র খণ্ডিত পুঁথি। গ্রন্থকারের পিতার নাম দাশরথি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুনিরাম।
- ১৭৩। সতানারায়ণ—ফকিররামদাস।—গ্রন্থকারের নামটি খেমন, রচনার ভাষাও সেইপ্রকার; বাবনিক ভাষার সংমিশ্রণে সিদ্ধ। সতানারায়ণ ও সত্যপীরের সঙ্গে সম্বন্ধিত। ভাষার নমুনা—“দেখ থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো। জ্যেই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একে।” “ফকির রাম কবিরাজে কয়। যাকু দেখি বড় মঙ্গলময়। ইতি সন হাজার সত্তর জ্যেষ্ঠ মাসে। সাদ্ধ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে।” শ্লোক ৮৫০।
- ১৭৪। সতানারায়ণ—নরহরি। শ্লোক ১৩৫।
- ১৭৫। সতানারায়ণ—দ্বিজ রামকৃষ্ণ, হঃ লিঃ ১:৪১ সন।
- ১৭৬। সতানারায়ণ—দ্বিজ বিশ্বেশ্বর—শকাব্দ ১৫৩১। শ্লোক ২৬০।
- ১৭৭। সত্যপীর-কথা—শঙ্করচাঁদ্য—হঃ লিঃ ১০৬২ সাল।
- ১৭৮। সত্তাবচলিকা—নরোত্তম দাস—খণ্ডিত পুঁথি, শ্লোক ৪৩২।
- ১৭৯। সনাতন গোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস—সাল ১২০৬ হঃ লিঃ।
- ১৮০। সরকার ঠাকুর-শাখা বর্ণন—রামগোপাল দাস।
- ১৮১। সহজতরু—রাধাবল্লভ দাস। হঃ লিঃ ১১৯৫ সাল।
- ১৮২। স্বরূপবর্ণন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
- ১৮৩। সাধন-লক্ষণ—খণ্ডিত।

\* সন্দেহিত মুকুন্দরামের আতা কবিচন্দ্রকে “অযোধ্যারাম” প্রতিপন্ন করিয়া ই. যুক্ত বোমকেশ মুস্তফি মহাশয় একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিপিতেছেন।

- ১৮৪ । সাধন-৳৳—গদ্যপুস্তক, হঃ লিঃ ১১৫৮ ।
- ১৮৫ । সাধানোগায়—মুকুন্দদাস ।
- ১৮৬ । সাধ্যশ্রেমচল্লিকা—নরোত্তম দাস, শ্লোক ১৮২ ।
- ১৮৭ । সাধ্যবস্তুসাধন—হঃ লিঃ ১২৫২ সাল, শ্লোক ৩১২ ।
- ১৮৮ । সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ । হঃ লিঃ ১১০৫ সন ।
- ১৮৯ । সারাংশসার কারিকা—হঃ লিঃ ১২৬৬ সাল ।
- ১৯০ । সিদ্ধসার—গোপীনাথ দাস, হঃ লিঃ সন ১২৫৫, শ্লোক ১৮০ ।
- ১৯১ । সিদ্ধাস্তচল্লিকা—রামচন্দ্র দাস, হঃ লিঃ সন ১০৮২ শ্লোক ২৬১ ।
- ১৯২ । সিদ্ধি নাম—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হঃ লিঃ শকাব্দ ১৭১৫, শ্লোক ১২৫ ।
- ১৯৩ । স্তদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম, হঃ লিঃ সন ১২৩১ সাল শ্লোক ২০০ ।
- ১৯৪ । স্তম্ভার চৌতিশা—রামানন্দ ।
- ১৯৫ । স্মরণ-দর্পণ—রামচন্দ্র দাস—হঃ লিঃ সন ১০৮৩, শ্লোক ১৫০ ।
- ১৯৬ । স্মরণ-মঞ্জল—নরোত্তম দাস—শকাব্দ ১৬৪০ হঃ লিঃ ।
- ১৯৭ । স্মরণ-মঞ্জল সূত্র—গিরিরাম দাস ।
- ১৯৮ । স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস, গদ্যপদ্যময় পুস্তক, হঃ লিঃ সন ১০৮১ ।
- ১৯৯ । হংসদূত—নরসিংহ দাস—হঃ লিঃ সন ১২০১ ।
- ২০০ । হংসদূত—দাস গোস্বামী—হঃ লিঃ সন ১০৭৫, শ্লোক ১০০০ ।
- ২০১ । হবপার্বতীবিবাহ—তিলকচন্দ্র, হঃ লিঃ সন ১১০৭ ।
- ২০২ । হরিনামকবচ—গোপীকৃষ্ণ দাস হঃ লিঃ সন ১১৬৫ । শ্লোক ১৫৪ ।
- ২০৩ । হাটবন্দনা—বলরাম দাস—হঃ লিঃ ১১৭৫ । শ্লোক ১২৫ ।
- ২০৪ । স্বর্ষাব্রত পাঁচালী—১৬১১ শকাব্দায় শ্রীরামজীবন কর্তৃক প্রণীত ।

## অনুক্রমণিকা । \*

| অ                      |                                  | আনন্দ অধিকারী     |                |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| অগ্রদ্বীপ              | ৫৩১                              | আনন্দদাস          | ৬১২            |
| অতীশ (দীপকর)           | ৬১                               | আনন্দময়ীদেবী     | ২০৫            |
| অদ্বৈত প্রকাশ          | ৩২, ৩৫৩                          | আনন্দনতিক         | ৫৭৬, ৫৮০, ৫৮৮  |
| অদ্বৈতবিলাস            | ৩৫৬                              | আপ্তাবদ্দিন       | ৩২৭            |
| অদ্বৈতমঙ্গল            | ৩৪২, ৩৫৬                         | আর্ধ্যাভাষা       | ৫৪০            |
| অদ্বৈতসূত্রকড়চা       | ৩৩৩                              | আলালের ঘনাব ছালাল | ১২, ৪৫         |
| অদ্বৈতাচার্য্য         | ২০৩, ২৪৮, ২৬১, ৩৪২               | আলিবাঈদী গাঁ      | ৬৭৩            |
| অদ্বৈতের বালালালাসুত্র | ৩৪২                              | আলোয়াল           | ৫৩১            |
| অদ্ভুত আচার্য্য        | ৪৭৮                              | আশ্রয়নির্গম      | ৫৪১, ৫৭৫, ৬৪৪* |
| অনন্তরাম দত্ত          | ৪৬৩                              | আসামী অক্ষর       | ৬৩৩            |
| অনন্তরামায়ণ           | ১২২                              | উ                 | ১১             |
| অনন্দিমঙ্গল            | ৪৪৫                              | ইভাঈ ঘোষ          | ২১০            |
| অনুপ্রাসের বিকৃতি      | ৬৩৮                              | ইতিহাস            | ৩২১, ৩৪৬, ৩৬৬  |
| অনুবাদগ্রন্থ           | ২৪, ১০৫, ১২৬, ৩৬৭, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৮১ | ইন্দুকথল          | ৮০             |
| অন্নদামঙ্গল            | ২১, ৩২৫, ৫৩৬, ৫৬৯                | ইজ্ঞানারাম চৌধুরী | ১৬৮            |
| অপ্রচলিতশব্দার্থ       | ৭৪, ২২৯, ৩৯০, ৫২৪, ৬৩৯           | ইন্দুমিঠা         | ৮১             |
| অবতারবাদ               | ৩২৮, ৩৭৪                         | ইংরেজ কবি         | ২৩             |
| অভিরাম গোস্বামী        | ৩১৫                              | ঈশাননাগব          | ৩৫৩, ৩৬২       |
| অযোধ্যারাম             | ৪০১, ৪৪৪                         | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | ৬২২            |
| অশোকবল্ল               | ১২                               | ঈশ্বরচন্দ্র সরকার | ৫১৬            |
| অশোক-লিপি              | ৪, ৮                             | ঈশ্বরপুরী         | ৩৫৩, ২৫৪, ২৫৫  |
| আজু গোসাঁই             | ৫৬১                              | ঈশ্বর ভায়টী      | ২৬১            |
| আনন্দ অধিকারী          | ৬১২                              | উ                 |                |
| আনন্দদাস               | ২৮৫                              | উড়িয়ালিপি       | ১              |
|                        |                                  | উদ্ধব দাস         | ২৮৩            |
|                        |                                  | উদ্ধারণ দত্ত      | ৩৪৪            |

\* গ্রন্থ-ভাগে অনুমিত পূর্ণধর যে তালিকা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই তালিকা-নির্দিষ্ট পূর্ণি এই অনুক্রমণিকার অন্তর্গত করা হয় নাই ।

|                            |                                               |                                       |                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| উপাধি                      | ৩৮১                                           | কাশীখণ্ড                              | ২,৪৬৪,৪৬৮                                |
| উদ্ভূ                      | ৩৬৮                                           | কাশীদাস                               | ২৫,১২৬,৪৫২,৪৮৫,৪৯৪,<br>৫০৮, ৬২৬          |
| এটুনি কিরিত্তি             | ৫৯৮                                           | কীর্তিচন্দ্র রায়                     | ৪৪৭                                      |
| এলাহাবাদের প্রস্তরাশ্রয়ান | ৬                                             | কীর্তিলতা                             | ১৯৭                                      |
| ক                          |                                               | কুটিল অক্ষর                           | ১০                                       |
| কথিত ভাষা                  | ১৩, ৩৪, ৩৬৯                                   | কুবের পণ্ডিত                          | ৩৬২                                      |
| কবিওয়ালা                  | ৬৭৭, ৬৭৯                                      | কুন্তিবাস                             | ৯৪,৯৫,১০৩,১০৫,১১৬                        |
| কবিকল্প                    | ৯৪, ১০১, ১৭৭, ২২৯,<br>২৩৭, ৩৯২, ৩৯৬, ৪১০, ৬২৬ | কুন্তিবাসী বামায়ণ                    | ১১৪,১১৫,২১৯,<br>২৩০,৪৭১                  |
| কবিকর্ণপূব                 | ৩৬৯, ৩৮৯, ৩৪৪                                 | কৃষ্ণকমল                              | ৯৮,৯৯,১০১,৬১২                            |
| কবিচন্দ্র                  | ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮৪                            | কৃষ্ণকমলগ্রন্থাবলী                    | ৬১৪                                      |
| কবিতালিকা                  | ৩১৭ ২৬৪                                       | কৃষ্ণকর্ণামৃত                         | ৩০                                       |
| কবিরঞ্জন                   | ৫৬২                                           | কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী               | ৩৩৩                                      |
| কবিশেখর                    | ৯৯                                            | কৃষ্ণকান্ত চামার                      | ৬০৬                                      |
| কবীন্দ্র পরমেশ্বর          | ৯৫, ১০৬, ১৩৯,<br>২১৮, ২৩১                     | কৃষ্ণকীর্তন                           | ২৩৫, ৫৬৪                                 |
| কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য     | ৫৯৬                                           | কৃষ্ণচন্দ্র                           | ৫৩১, ৫৯৯                                 |
| কমলে কামিনী                | ৪৩১                                           | কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রকাব ( বৃষ্টি মুচি ) | ৬১০                                      |
| কর্ণসেন                    | ০৯                                            | কৃষ্ণচন্দ্র চবিত                      | ৬৩৪, ৬৩৯                                 |
| কর্ণানন্দ                  | ২৭৮                                           | কৃষ্ণদাস কবিরাজ                       | ৯৩, ২৮৫, ৩১৬,<br>৩৩২, ৩৫৬, ৩৬৩, ৩৬৪, ৬২৮ |
| কর্ণামৃত                   | ৩৭৬, ৩৫২, ৩৬৩                                 | কৃষ্ণদাস                              | ৫০৬                                      |
| কপূব                       | ৪৫১                                           | কৃষ্ণদাস বাবাজী                       | ৩৬৩                                      |
| কর্ণানিধানবিলাস            | ৬৭৩                                           | কৃষ্ণপ্রসাদ                           | ২৮৫                                      |
| কাণা ঠরিত্ত                | ৯৪, ১৬৬                                       | কৃষ্ণপ্রমত্তরঙ্গিনী ( ভাগবতানুবাদ )   | ৫১১                                      |
| কানুবা                     | ২৮৫                                           | কৃষ্ণমঞ্জল                            | ৩৬২                                      |
| কাব্যোতিহাস                | ২১২                                           | কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য                | ৬১৩                                      |
| কামিনীকুমার                | ৫৩৩                                           | কৃষ্ণরাম                              | ৯৪, ২১৯, ৫৫৪, ৫৫৭                        |
| কালকেতু                    | ৮৯, ৪১০                                       | কেশবকাস                               | ১৩৩, ২২৫, ২৩৭, ৪৪০                       |
| কালচাঁদ গোল                | ৬১২                                           | কেশবকাশ্মীর                           | ২৫২                                      |
| কালিকা                     | ৬০৮                                           | কেশবভারতী                             | ২৫৬                                      |
| কালিদাস                    | ৩৭, ৩৮৯, ৪৯০, ৫১০                             | কেশবসামন্ত                            | ২৯৯, ৩১১                                 |
| কালীকীর্তন                 | ৫৬৪                                           | কৈলাস বাকই                            | ৬৩১                                      |
| কালীকৃষ্ণ দাস              | ৬৩৩                                           | কর্ণদগীতচিন্তামণি                     | ২৮৬                                      |
| কালী                       | ৬৪৬                                           | ক্লেমানন্দ                            | ১৩৩, ২২৫, ২৩৭, ৪৪৩, ৫০৯                  |

|                        |                       |                            |                              |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| ক্রিয়াপদ              | ২২৫, ২৩৩              | গোপালদাস                   | ২৮৫                          |
| ক্রিয়াযোগসার          | ৪৬৩                   | গোপাল ভট্ট                 | ২৮৫, ৩৪৪                     |
| ক্রোশাক্ষবৃদ্ধ প্রস্তর | ৮                     | গোপাল ভাড়া                | ৫৩৩                          |
| খ                      |                       | গোপিকামোহন                 | ৩৬৪                          |
| খুলনা                  | ৮৩, ৮৮, ৩৯২, ৪২২, ৫২২ | গোপীনাথ দত্ত               | ৪৯৪                          |
| খুয়াবস্ত্র            | ৪২৪                   | গোপীনাথ বহু ( পুরন্দর থা ) | ১৪৮                          |
| খেতুরীর উৎসব           | ৩২০                   | গোপীন্দ্রমণ চক্রবর্তী      | ২৮৫                          |
| খেলারাম                | ৯৫, ২১২, ৪৪৩          | গোবিন্দ অধিকারী            | ৬১২                          |
| গ                      |                       | গোবিন্দ কবিরাজ             | ২৭৪                          |
| গঙ্গাবাক্যাবলী         | ১৯৭                   | গোবিন্দচন্দ্র              | ৫৮, ৬৪, ৩৮৫                  |
| গঙ্গাদাস পণ্ডিত        | ২৫১                   | গোবিন্দদাস                 | ২৭১, ২৮৭, ২৮৯,               |
| গঙ্গাদাস সেন           | ৪৭৪, ৪৯৩              | গোবিন্দদাসের করচা          | ২৯৫-৩১৪ ৬৪১                  |
| গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী | ৩৪৬                   | গোবিন্দলীলামৃত             | ২৭৮, ৩৩৩, ৩৬৩,               |
| গঙ্গামণি দেবী          | ৬৪৩                   | ৬২৭                        |                              |
| গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী     | ৫৯১                   | গোবিন্দানন্দ               | ২৮৪, ৩৬৫                     |
| গদাধর                  | ২৫১, ৩৪৪, ৪৯৫, ৫৩৭    | গোমাংসভক্ষণ                | ৩৭৯                          |
| গদাধর মুখোপাধ্যায়     | ৬১০                   | গোরক্ষনাথ                  | ৬১৭                          |
| গদ্যসাহিত্য            | ৬২৬, ৬৩১, ৬৩৭         | গৌড়েশ্বরগণ                | ১৭৩                          |
| গাবুর                  | ২৩৭                   | গৌর কবিরাজ                 | ৬১                           |
| গিরিধর                 | ৩৬৩                   | গৌরচরিত চিন্তামণি          | ৩৫১                          |
| গীতকল্পতরু             | ২৯০                   | গৌরীদাস                    | ২৭৮                          |
| গীতকাব্য               | ২৩৪                   | গৌরীমঙ্গল                  | ৬৩১                          |
| গীতগোবিন্দ             | ৩৭, ৩৬৩, ৫৫৯          | ঘ                          |                              |
| গীতচন্দ্রোদয়          | ২৯০                   | ঘনরাম                      | ৫৬ ৯৫, ১৭, ২২৩, ৪৪৩          |
| গীতচিন্তামণি           | ২৯০                   |                            | ৪৪৬                          |
| গীতিকবিতা              | ২৯৪, ৫৯২              | ঘনশ্যাম (নরহরি চক্রবর্তী)  | ৯৮,                          |
| গীতিসংস্কার            | ৫৯২                   |                            | ২৮০, ৩২৫, ৩৭৭                |
| গুণরাজ থা              | ৯৫, ১০৩, ২২৫, ৫১৭     | চ                          |                              |
| গুপ্তলিপি              | ৯                     | চণ্ডী                      | ৩৯১, ৪৩৫, ৫১২, ৫১৫           |
| গুরুপ্রসাদ বল্লভ       | ৬১২                   | চণ্ডীকাব্য                 | ৫৭৮, ৫৮৩                     |
| গোকুলদাস               | ২৮৪                   | চণ্ডী-উপাখ্যান             | ৪১০                          |
| গোকুলানন্দ সেন         | ২৮৫                   | চণ্ডীদাস                   | ৯১, ৯৯, ১৮৪ ২৭৯, ২২৫,        |
| গোজলা গুই              | ৬৭৬, ৬৭৯              |                            | ২২৭, ২৩৪, ২৩৫, ২৪১, ২৪২, ২৭৩ |
| গোপাল উড়ে             | ৬৭০, ৬১১              |                            | ২৮৭, ২৮৯, ৬২৮, ৬৪১           |
| গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী  | ৪৭৩                   | চণ্ডীনাটক                  | ৫৬৯                          |

|                                |                     |                       |                         |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| চন্দ্রকেতু                     | ৮৪                  | জয়দেব                | ৯৯, ১১১, ১৮৫, ২০৭, ২৬০, |
| চন্দ্রবর্ণার শিলালিপি          | ১০                  |                       | ৫২৯                     |
| চন্দ্রতিরায                    | ২৮৫                 | জয় নারায়ণ           | ৪৬৪, ৪৬৯, ৫৭৮, ৫৭৯,     |
| চন্দ্রদত্ত                     | ১৭                  |                       | ৬১০, ৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৪      |
| চন্দ্রকবি                      | ১৮                  | জ্ঞানানুরাগ কল্পদ্রুম | ৪৭০                     |
| চাঁদসদাগর                      | ৮৩, ১৫৭, ১৭৪, ২৩৯   | জয়ানন্দ              | ৩১৫                     |
| চিত্রাক্ষর                     | ৫                   | জরাসন্ধ-কা বৈঠক       | ৭                       |
| চৈতন্যগোবিন্দ                  | ৩৫৯                 | জলপর্ক                | ৫০৬                     |
| চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক          | ৩৩৪, ৩৪৪            | জামিল দিলারাম         | ৫৪০                     |
| চৈতন্যচরিতামৃত                 | ৩৩৩, ৩৬৭, ৩৭৭,      | জাহ্নবী দেবী          | ৩৭৮                     |
|                                | ৩৮৬, ৬১৫, ৬২০       | জীব গোষ্ঠা            | ৩০৩                     |
| চৈতন্যদাস                      | ৬৩০                 | জীবনী                 | ২৬৩, ২৭৪, ২৯৫           |
| চৈতন্যদেব                      | ১৫৫, ২৪৩, ২৪৭, ২৯৬, | জৈমিনি ভারত           | ১৪৭                     |
| ৮ ২৯৮, ৩০৭, ৩১৬, ৩৫৫, ৩৮০, ৩৮৭ |                     | জ্ঞানদাস              | ১১১, ২৭৭ ২৮৯            |
| চৈতন্যভাগবত                    | ৩১৯, ৩২৫, ৩২৭       | জানিদ্দ               | ৬৪                      |
| চৈতন্যমঙ্গল                    | ৩১৬, ৩২৭            |                       |                         |
|                                | ছ                   | ট                     |                         |
| চকড়ি চট্টোপাধ্যায়            | ২৮২                 | টেকচাঁদ ঠাকুর         | ৬৩৩                     |
| ছড়া ও পাঁচালী                 | ১৫৫, ১৮১            | ঠ                     |                         |
| ছন্দ                           | ৪৬, ৩৭২, ৩৯৫, ৬২৩   | ঠাকুরদাস চক্রবর্তী    | ৬১০                     |
| ছয়ফুল মুমুক ও বদিকুন্ডা জামাল | ৫৪০                 | ঠাকুর সিংহ            | ৪৯৮                     |
| ছুটি থা                        | ১০৪, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬  |                       |                         |
| ছোট হরিদাস                     | ২৫৯                 | ড                     |                         |
|                                | জ                   | ডাক ও খনার বচন        | ২, ২১ ৪৮, ৬৭, ২২৫       |
| জগন্নাথ বসু                    | ৬২০                 | ঢ                     |                         |
| জগজীবন মিশ্র                   | ৩৫৯                 | চুণ্ডরাম তীর্থ        | ২৬২                     |
| জগৎরাম রাঘ                     | ৪৭৬                 | ত                     |                         |
| জগদানন্দ                       | ২৫৯, ২৮১            | তে'তা ইতিহাস          | ৬৩৫                     |
| জগন্নাথমঙ্গল                   | ৫০৬                 | ত্রিগুণাস্থিকা        | ৬৩০                     |
| জগন্নাথ মিশ্র                  | ২৪৯, ৩১৬, ৪০২       | ত্রিলোচন চক্রবর্তী    | ৫১০                     |
| জগন্নাথী পান                   | ৮১                  | দ                     |                         |
| জগাই মাধাই                     | ৩৭৯                 | দণ্ডপাখা              | ৮০                      |
| জনাঙ্গন                        | ৯৪, ৭৬, ৩৯০         | দত্তকাব্য             | ৪৬২                     |
| জয়গোপাল                       | ১২০                 | দরবারী ভাষা           | ৬৩২                     |
| জয়চন্দ্র অধিকারী              | ৬১২                 | দানকাব্যবলী           | ১৯৭                     |
|                                |                     | দশরথি                 | ৮৫, ৬০১                 |

|                           |                   |                                |                   |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| বিজ্ঞ মাধব                | ৩৬২               | নরোত্তম ঠাকুর                  | ৩৪৪, ৩৭৩ ৩৭৬      |
| দীপঙ্কর (অতীশ)            | ৬১                | নরোত্তম বিলাস                  | ৩৪২, ৩৭২          |
| দীপস্বিতা                 | ২৮৩               | নলদময়ন্তী                     | ৪৬১               |
| দ্রুগাপ্রসাদ মিত্র        | ৬৪৭               | নলোপাখ্যান                     | ৫-৬               |
| দ্রুগাভক্তিভরঙ্গিণী       | ১২৭, ১২৮          | নন্দরত সাহা                    | ৪৮৪               |
| দুর্গারাম                 | ৪৭৬               | নাগা অক্ষর                     | ১১                |
| দুর্লভ মল্লিক             | ১৪                | নাভাজী                         | ৩৬১               |
| দুর্লভসার                 | ৩২৭               | নারায়ণ দেব                    | ৯৪, ১৭১, ২১৮, ২২৫ |
| দুর্লভ শঙ্কর তালিকা       | ৩৮২               | নারায়ণ পণ্ডিত                 | ৪৪৪               |
| দেহকডচ                    | ৬২৯               | নিত্যানন্দ ঘোষ                 | ৯৫, ৬৮৪           |
| দেবকী নন্দন               | ১৮২, ২৮৫          | নিত্যানন্দ চন্দ্রবর্তী         | ১৮২, ৩৪১          |
| দেহভেদভূতনিকপণ            | ৬৩৭               | নিত্যানন্দ দাস                 | ২৭৭, ৩৫১          |
| দ্বাদশ পাণ্ডি নির্ণয়     | ৬৩৭               | নিত্যানন্দ বৈরাগী              | ৬৭৬, ৬৭৯          |
| ধ                         |                   | নিত্যানন্দ বংশমালা             | ৩২১               |
| ধনঞ্জয় দাস               | ২৮৪               | নিধিরাম                        | ৫২                |
| ধনপতি সদাগর               | ৮৩, ৪২২           | নীলমণি পাট্টনী                 | ৬৭৬, ৬১৭          |
| ধর্ম ও ভাষা               | ১৬                | নীলাচল দাস                     | ৬৩৭               |
| ধর্ম কলহ                  | ৮২                | নীলাদ্র                        | ৪১৭               |
| ধর্মপুঞ্জ                 | ৫৫                | নুসিংহ                         | ৬                 |
| ধর্মমঙ্গল                 | ৫৬, ৯৫, ২১১, ৪৪৩  | নুসিংহদেব                      | ৪৬৫               |
| ধ্রুবচরিত্র               | ৩১৯               | প                              |                   |
| ন                         |                   | পঞ্চগোড়                       | ১২, ২২১           |
| নকুল ঠাকুর                | ১৮৭, ১৯৩, ১৯৫     | পঞ্চালী গীত                    | ২২১               |
| নন্দকুমারের পত্র          | ৬৩১               | পদকল্পতক                       | ২৯৭, ৬২৮          |
| নন্দরাম দাস               | ৫৮                | পদকল্পতিকা                     | ২৯৭               |
| নন্দহরণ                   | ৫১৪               | পদচিন্তামণিমালা                | ২৯৭               |
| নব জয়দেব                 | ১৯৮               | পদসমুদ্র                       | ২৮৯               |
| নবদ্বাপ                   | ২৪৭, ৫২৯          | পদাবলী ১৮৩, ২৪৪, ২৬৪, ২৮৯, ২৯১ |                   |
| নবাই ঠাকুর                | ৬১০               | পদামৃত সমুদ্র                  | ২৯৭               |
| নয়নানন্দ                 | ২৮৬               | পদার্থবসাবলী                   | ২৯০               |
| নরসিং দেব                 | ২৮৬               | পদোব নিয়ম                     | ৬৩৬               |
| নরহত্য                    | ৩৭৯               | পদ্মাপুরাণ                     | ২২৭, ২২৯, ৪৩৭     |
| নরহরি চক্রবর্তী (যনশ্যাম) | ৯৮, ২৮০, ৩২৯, ৩৭৭ | পদ্মাবতী                       | ৫৪১               |
| নবহরি সরকার               | ২৭৯               | পদ্মনানন্দ অধিকারী             | ৬১১               |
|                           |                   | পদ্মনানন্দসেন                  | ২৮৪               |

|                         |                   |                      |                                             |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| পবনেশ্বরী দাস           | ২৮৩               | শ্রেমবত্নাকব         | ৩৬৩                                         |
| পরগল পাঁ                | ১০৪, ১৩৯          | শ্রেনানন্দদাস        | ৪৬৮                                         |
| পবাগলী মহাভাবত          | ২১, ১৩৯           | ফ                    |                                             |
| পাটের পাছড়া            | ৮৭, ২৩৮, ৪২৭, ৫১৯ | ফুলবা                | ৮৮, ৩৯২, ৪১০                                |
| পাষণ্ডদলন               | ৩৬৪               | ব                    |                                             |
| পাষণ্ডী                 | , ৩৭৫             | বঙ্গজয়              | ২৮৪                                         |
| পাঁচালী                 | ১৫৫, ১৮১, ৬ ১     | বঙ্গভাষা             | ১, ১৫, ২১, ৩১, ৩১, ৩১, ৩১, ২২২, ৩৬৮ ৩৮৩ ৫৩৫ |
| পীতাম্বর অধিকারী        | ৬১২               | বঙ্গলিপি             | ২, ৯                                        |
| পীতাম্বর দাস            | ২৮৩               | বত্রিশ সিংহাসন       | ৬৩০                                         |
| 'পুরুষ'                 | ২৩৯               | *বদরীনাথ             | ১৯৫                                         |
| পুরুষপবীক্ষা            | ১৯৭               | বনমালী               | ১৯৫                                         |
| পুরুষপবীক্ষাব অনুবাদ    | ৬৩৭               | বর্দ্ধমান দাস        | ৪৪১                                         |
| পৃথীচন্দ্র              | ৬৩১               | ববকচি                | ৫৩৩, ৫৭৫                                    |
| একাত্মনির্ঘণ            | ৬৩০               | *বলবাম দাস           | ২৭১, ২৭৬, ২৮৯ ৩৯                            |
| প্রবোধচন্দ্রিকা         | ৬৩৭               | *বলদেব পানিত         | ৬২৫                                         |
| প্রভাসখণ্ড              | ৫১৬               | বসন্ত রাঘ            | ২৭৯, ৪৩৬                                    |
| প্রসাদদাস               | ২৮৩               | বংশীবদন              | ২৮২                                         |
| প্রসাদী সঙ্কীত          | ৫৬৫               | বংশীশিক্ষা           | ২৭৭ ৩৫২                                     |
| প্রহ্লাদচবিত্র          | ৩১৯               | বাস্কাল              | ৪৩৪                                         |
| প্রাকৃত                 | ২১, ৩১, ৩১        | বাস্কাল বিভক্তি      | ৩৮ ২৩২ ৩৭৩, ৫২৫                             |
| প্রাকৃত শব্দেব তালিকা   | ২২                | বাস্কাল সাহিত্য      | ৯৩, ১৫৬, ২৮৮, ৩১৮ ৩৬৪, ৩৮৬, ৪৫৬ ৫২৫         |
| প্রাচীন ও পরবর্তী লেখক  | ৩৮৮               | বাস্কালী             | ২৩৬, ২৩৯ ২৪১, ৫১৭                           |
| প্রাচীন কীর্তিব লোপ     | ৫                 | বাস্কালি কবির অনুকরণ | ৯৪ ৯৭ ১০০                                   |
| প্রাচীন গদ্য            | ৬৩৯               | বাজাব                | ৩৭৯ ৫১৯                                     |
| প্রাণবাম                | ৯৫, ৫৫৪           | *বাণেশ্বর            | ৫৩৩                                         |
| প্রার্থনা               | ৩৬৩               | বাণ' আউল মনোহর দাস   | ২৮৯                                         |
| প্রিয়দর্শী             | ৬                 | বান্ধাস্তা           | ৯৮, ৪৩৪                                     |
| প্রিয়দাস               | ৩৬১               | বাস্তবী দেবী         | ১৮৫, ১৮৬                                    |
| প্রেমচাঁদ অধিকারী       | ৬১২               | বাস্তদেব             | ২৬৭, ২৮৪                                    |
| প্রেমদাস ( পুরুষোত্তম ) | ২৭৮, ৩৫২          | বিচিত্র বিলাস        | ৬১৪                                         |
| প্রেমবিলাস              | ৩৫১, ৩৬৩          |                      |                                             |
| প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা    | ৩৬৩               |                      |                                             |

\* তার্য চিত্রিত শব্দগুলি বর্ণী 'ব' এবং অপরাপব শব্দ অন্ত্যাহ 'ব' এর অন্তর্গত ।



|                            |                                                             |                          |                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| বিজয়                      | ১৫৭                                                         | *ব্রাহ্মণের জাতির উন্নতি | ৮৯                                                                                          |
| বিজয় গুপ্ত                | ৯৪, ১৬৬, ১৭৪, ২১৮                                           | *ব্রাহ্মীলিপি            |                                                                                             |
|                            | ৪৩৭                                                         | ভ                        |                                                                                             |
| বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত     | ১২৭                                                         | ভক্তমাল                  | ৫৬০                                                                                         |
| বিদ্যুৎ মাধব               | ২৭৮, ৪৬১                                                    | ভক্তিরত্নাকর             | ৩২২, ৩২৯, ৩৪৬                                                                               |
| বিদ্যাপতি                  | ১৮৩, ১৮৬, ১৯৭, ১৯৫,<br>২৩৩, ২৭৩, ২৮৭, ২৮৯, ৩৫৪,<br>৩৬৫, ৬২৮ | ভবানীদাস                 | ৩৭৫                                                                                         |
| বিদ্যাসুন্দর               | ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৫২, ৫৫৪,<br>৫৬২, ৫৭৫                             | ভবানীপ্রসাদ রায় (অনু.)  | ৫১২                                                                                         |
| বিদ্যাসুন্দর তরঙ্গিনী      | ৮২, ৮৬                                                      | ভরতমিলন                  | ৬১৪                                                                                         |
| বিবর্তবিলাস                | ৩৬৩                                                         | ভাগবত                    | ৯৫, ১২৭, ৫১১                                                                                |
| বিভাগসার                   | ১৯৭                                                         | ভাট্টদত্ত                | ৪১৮                                                                                         |
| বিশ্বনাথ চক্রবর্তী         | ৩৪০                                                         | ভাবচন্দ্র                | ৮৫, ৯৪, ১৭৭, ১৭৮,<br>২১১, ৩৬৮, ৩৮৯, ৩৯৫, ৪৩৫,<br>৪৬৭, ৫৩০, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৬৬,<br>৬২৫, ৬৪১, ৬৪৪। |
| বিশ্বরূপ সেনের তাত্ত্বশাসন | ১২                                                          | ভারতীয় অক্ষর            | ২৩৪                                                                                         |
| বিশ্রাম র্থা               | ৫৩১                                                         | ভাষাপরিচ্ছেদ             | ৬২৯                                                                                         |
| বিক্রপুর্নী ঠাকুর          | ৩৬১                                                         | ভূগোল                    | ৪৭                                                                                          |
| বিক্রপুর্নায়              | ২৫৫, ৩৫৫                                                    | ভেল্লুয়া সন্দরী         | ৯৫, ৫৪                                                                                      |
| বীরহাঙ্গির                 | ২৮৬, ৩৩৯, ৩৭৬, ৩৮২                                          | ভোলানাথ ময়রা            | ৬০৬, ৬১১                                                                                    |
| ব্রহ্মাবনদাস               | ৩১২, ৩২৮, ৩৬৪, ৩৬৯                                          | ম                        |                                                                                             |
| ব্রহ্মাবনলীলা              | ৬২৯                                                         | মঙ্গলচণ্ডা               | ১৫৬, ১৭৬                                                                                    |
| বেদের দোষাবাহ পংক্তি       | ৯                                                           | মদন কড়ি                 | ২৩৬                                                                                         |
| বেহলা (বিপুলা)             | ৮৭, ৮৯, ১৫৯, ১৬৭,<br>২২৮, ৪৪১                               | মধুসূদন কিল্লব           | ৬১৬, ৬১১                                                                                    |
| বৈষ্ণব কবি                 | ২২১, ২৮৮, ৪৪২                                               | মধুসূদন নাস্তি           | ৪৬১                                                                                         |
| বৈষ্ণব গীতি                | ১৭১, ৬১৬                                                    | মনসার ভাসান              | ২২৫, ৪৩৯                                                                                    |
| বৈষ্ণবদাস                  | ২২০                                                         | মনঃসন্তোষিণী             | ৩৫৯                                                                                         |
| বৈষ্ণব ধর্ম                | ৩৭৮, ৬০৫                                                    | ময়নামতী                 | ৬৪                                                                                          |
| বৈষ্ণবাচারদর্পণ            | ৩৫৯                                                         | ময়ুরভট্ট                | ৯৫, ২১২, ৪৪৬                                                                                |
| *বৌদ্ধ ধর্ম                | ১৮, ৫৩                                                      | মল্লভাট্ট                | ২৩৬                                                                                         |
| *বৌদ্ধ প্রভাব              | ১৬, ৩৮৫, ৪৪৩                                                | মহাপ্রসাদবৈভব            | ৩৫৯                                                                                         |
| ব্যাকরণ                    | ১৪                                                          | মহাভাবানুসারিণী          | ২৯০                                                                                         |
| ব্যাস ও সর্প               | ১৫৬                                                         | মহাভারত                  | ১২৬, ৪৮৩                                                                                    |
| ব্রজবুলি                   | ২৩৫                                                         | মহাভারততালিকা            | ৪৮৮                                                                                         |
| *ব্রাহ্মগার্জনচলিকা        | ৪৭০                                                         | মহামোদগল্যায়ণ           | ৮                                                                                           |
|                            |                                                             | মাণিক গাঙ্গুলি           | ৯৫, ২১২                                                                                     |

|                                |                                 |                               |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| নাগিকচান্দ                     | ৫৭, ৬৭, ১২৫, ১২৭                | ব                             |                    |
| মাতৃশু                         | ৩৭                              | বসুন্দরন                      | ১৪৭, ৪৮১           |
| মাধব                           | ১৮৮                             | বসুনাথ দত্ত                   | ১৮২                |
| মাধবাচায়া                     | ৯৪, ৯৯, ১৭৬, ৩৮৯, ৩৯১, ৪১৮, ৫১৩ | বসুনাথ দাস                    | ৩৪৪, ৩৭৬, ৬০৬      |
| মাধবা দাসী                     | ১৭৬, ১৮৬                        | বসুনাথ পণ্ডিত ( ভাগবতাচায়া ) | ৫১১                |
| মাধবা                          | ১৮৬                             | বসুনাথ বাব                    | ৫৯৭                |
| ম নমিঃ                         | ৫১০                             | বসুনাথ শিবোমণি                | ১৪৭                |
| মানুঃ সবিষ্ণু                  | ৩৯৮, ৫১৩                        | বসুনাথ বাব                    | ৯৫, ১৯৯, ৪৩৬       |
| মাঘ তিমিষচন্দ্রিকা             | ৭৭৮, ৫৮১                        | বসুনাথ দেব                    | ৮৯                 |
| মাঘ শুক চণ্ডী                  | ৫১০                             | বসুনাথ দেব                    | ৯৫ ১৮, ১১৮ ৪৩৬     |
| মাঘাৎ বসু                      | ৯৫, ১৩৮, ১৬৮                    | বসুনাথ দেব                    | ৩৯৯                |
| মি জাফর                        | ৫৮                              | বসুনাথ দেব                    | ৩৯১                |
| মিচল                           | ৩৮৯                             | বসুনাথ দেব                    | ৫৬, ৯৫, ১১১        |
| মিঃ মহম্মদ                     | ৫৮                              | বসুনাথ দেব                    | ১৮৮                |
| মুন্সেবাম কবিকল্প শব্দ দণ্ডবা। |                                 | বসুনাথ দেব                    | ৬৩৭                |
| মুন্সেবাম মুগাপাখায়া          | ৫১৩                             | বসুনাথ দেব                    | ১৪১                |
| মুন্সেবাম                      | ১৭                              | বসুনাথ দেব                    | ১৮৮, ৫৬৯           |
| মুন্সেবাম শাল                  | ১১৭                             | বসুনাথ দেব                    | ১৬৩, ৫৮৯           |
| মুন্সেবাম অতচাণ                | ১৯৬                             | বসুনাথ দেব                    | ২৭৩                |
| মুন্সেবাম গহু                  | ৫১১                             | বসুনাথ দেব                    | ৩৫৮                |
| মুন্সেবাম কবি                  | ১৭৩, ৫৯৭                        | বসুনাথ দেব                    | ২৮৬, ৩৫৯           |
| মুন্সেবাম                      | ৮২, ৯৫, ১৮১, ৪৩৬                | বসুনাথ দেব                    | ৬১৪                |
| মুন্সেবাম আলি                  | ৫৪১, ৫৯৭                        | বসুনাথ দেব                    | ১৩৩, ৬২৮           |
| মুন্সেবাম কাপুড়               | ৮০, ৪২৭, ৫১৯                    | বসুনাথ দেব                    | ৬১১                |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ১১৩                |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ৬১৭                |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ৬৩৪, ৬৩৯           |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ৫৮                 |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ৪৯৭                |
| মুন্সেবাম                      | ৩, ৯৮, ২৭৮, ৩৫২, ৩৬৩            | বসুনাথ দেব                    | ২৮৩, ২৮৬           |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ২৩, ৯৮, ২৯১        |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ৫৭৮, ৫৭৯           |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ২৮৭                |
| মুন্সেবাম                      |                                 | বসুনাথ দেব                    | ২১২, ২৭৪, ২৮৩, ৩৬৪ |

|                        |                             |                   |               |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| রামচন্দ্র মুন্সী       | ৫৬৭                         | লাউসেন            | ২১১, ৪৪৮, ৬১২ |
| রামদাস কৈবর্ত          | ২১৩, ৪৪৩, ৪৪৫               | লালা জয়নারায়ণ   | ৯৪            |
| রামচুলাল রায়          | ৫৯৭                         | লালু নন্দলাল      | ৬১০           |
| রামনিধি রায়           | ৬১৬                         | লিখিত ও কথিত ভাষা | ১৩, ৩৪        |
| রামপ্রসাদ              | ৯৪, ৩৭১, ৫৫৪, ৫৭৮, ৫৯৩, ৬৪১ | লীলাদমুদ          | ২৯৩           |
| রামবন্ত                | ৯৯, ৫৯৬, ৬০৭                | লোকনাথ গোস্বামী   | ৩৫৭           |
| রামমণি (রামী)          | ১৮৬, ১৯২, ১৯৪, ২৭৩          | লোকনাথ দাস        | ৩৭৭           |
| রামমোহন                | ৪৮৩                         | লোকনাথ দত্ত       | ৪৬১           |
| রামকপ ঠাকুর            | ৬১১                         | লোচন দাস          | ৩১, ৩১৭, ৩২৬  |
| রামানন্দ বন্ত          | ৩৮১                         | লোটন গৌপা         | ২৩            |
| রামানন্দ রায়          | ২৬১, ২৮১                    | লোমশ মুনি         | ৪১১           |
| রামায়ণ                | ১৭, ১২১, ৪৭১                | লৌকিক ধর্ম        | ১৫৫, ১৯১      |
| রামায়ণ তালিকা         | ৪৭৪                         | শকুন্তলা উপাখ্যান | ৮৯১           |
| রামেশ্বর নন্দী         | ৫১৯                         | শঙ্কর             | ৮৭৯, ৪৮৫      |
| রামেশ্বর ভট্টাচার্য    | ৪৩৬                         | শঙ্করী-সঙ্গীত     | ৪৭১           |
| রামমঙ্গল               | ৯৫                          | শচীন্দেবী         | ২৪৯           |
| রামেশ্বর               | ২৮৪                         | শচীনন্দন দাস      | ৩৮৩           |
| রাম                    | ৬৭৯                         | শতপথব্রাহ্মণ      | ৯             |
| কান্তারাজ রাজার একাদশী | ১২২                         | শনকা              | ১৫৮           |
| কপগোস্বামী             | ৬২৮                         | শাি               | ১১১           |
| কপনারায়ণ ঘোষ          | ৫১৫                         | শব্দচন্দ্র        | ১৩১, ১৯৯      |
| কপরাম                  | ৯৫, ২১৩, ৪৪৬                | শাসন              | ৩৮১           |
| কপসনাতন                | ৩৪২                         | শিবচন্দ্র         | ৪৭৭, ৫৯৯      |
| ল                      |                             | শিবপ্রসাদ         | ৮৩৬           |
| লক্ষপতি বণিক           | ৪২২, ৪২৯                    | শিবরামেন বুদ্ধ    | ১২২           |
| লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়  | ৪৮০                         | শিবসংকীর্তন       | ৪৩৭           |
| লক্ষ্মীদেবী            | ২৫৫                         | শিবসিংহ           | ১৯৭           |
| লক্ষীন্দর              | ১৫৯, ২২৭                    | শিরোমুণ্ডন        | ৩৮৪           |
| লয়ালী মজনু            | ৫৩৭                         | শিশুবোধক          | ৬৩৬           |
| ললিতবিস্তর             | ৩৯                          | শিশুরাম দাস       | ৫১৬           |
| লহন                    | ৮১, ১৮১ ৩৯২, ৪২২            | শীতলামঙ্গল        | ১৮১           |
| লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস     | ৯৫, ৩৪২, ৩৬১, ৩৬২, ৫১১      | শুক্রেম্বর        | ২১            |
|                        |                             | শুয়াটুটি গোপা    | ৪২৭           |
|                        |                             | শৈবদর্শন          | ৮২            |

|                                 |                    |                 |          |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| শৈবসম্বন্ধসংগ্রহ                | ১২৭                | স্মরণদগণ        | ৩৬৪      |
| শ্রামদাস                        | ৩৩২, ৩৪২           | স্মৃতিকল্পদাম   | ৬৬১      |
| শ্রামলাল মুখোপাধ্যায়           | ৬৭১                | সাতুরায়        | ৬১৭      |
| শ্রামানন্দ                      | ৩৪৪                | সাধনকথ          | ৬৩১      |
| শ্রামাসংগীত                     | ৬৩৪                | সাবুনভক্তিচলিকা | ৩৬৩      |
| শ্রামাসংগীতকাবগণ                | ৫২৬, ৫২৯           | সাবদা অক্ষব     | ১        |
|                                 | ৩৫৭                | সাবদামঙ্গল      | ৪৭৭      |
| শ্রী—                           |                    | সাবিপুত্র       | ৭        |
| শ্রীকবীনন্দা ১৫                 | ১২৬ ১৪৪, ১৪৬ ২১৮,  | সিবাঙ্গদোলা     | ৫৬       |
|                                 | ২৩১                | সীতাচবিত্ত      | ৩৫৭      |
| শ্রীকৃষ্ণবিজয়                  | ১৫৭ ২৩১            | সীতাবামদাস      | ২১৩ ৪৪৩  |
| শ্রীকৃষ্ণবিলাস                  | ৫০৬                | স্ববল সম্বাদ    | ৬১৪      |
| শ্রীকৃষ্ণযাত্রা                 | ৬১১                | স্ববুদ্ধিবায়   | ৩৮৬      |
| শ্রীগয়াকব                      | ১২                 | সুশীল           | ৪৩৪      |
| শীধর                            | ২৫৪                | সেঙ্গপৌষন       | ৩৮       |
| শ্রীনিবাস                       | ২৭৫, ৩৪৪ ৩৮৬       | সৈয়দ জাফর      | ৫২৭      |
| শ্রীমন্ত                        | ৪৪২ ৪৩২            | স্রীকবি         | ২৭৩      |
| শ্রীশচল                         | ৫২৯                | স্রাশিক্ষ       | ৫২২      |
| শ্রীহর অক্ষর                    | ১৭৮                | স্বপ্নপক        | ৫৭৬      |
| য                               |                    | স্বপ্নবিলাস     | ৬১৪      |
| যষ্ঠাব কবি                      | ১৪৯, ৪৭৪ ৪৮৪ ৪৯২   | স্বপ্নবর্ণন     | ৩৩৩      |
| স                               |                    |                 |          |
| সঙ্গীতমাধব                      | ২৭৬                |                 |          |
| সত্যনিরায়ণ                     | ১৭৭ ১৫৬            | হবপেত্র লুপ্ত   | ৭        |
| সত্যপীবেত্র কথ                  | ৪৩৬ ৬২৬            | হবিচবণ দাস      | ৩৫৬      |
| সত্যপীবোপাখ্যান                 | ৩৬৮                | হবিদাস ঠাকুর    | ৩১৬      |
| সনাতন                           | ২৫২ ৩৬৩            | হবিনাম মতি      | ২৬৪      |
| সহজিয়া পুঁথি                   | ৬৩৩                | হবিবল্লভ        | ২৮৬      |
| সংস্কার-বুগ                     | ৩৮৭                | হবিলীলা         | ৫৭৮, ৫৮৬ |
| সংস্কৃত ১২, ৩১, ৩২ ৮, ২২৭, ৩৬৯, |                    | হকঠাকুর         | ৬৮৮      |
|                                 | ৪৫৬                | ইন্দ্রগণকন      | ৫৪৪      |
| সঙ্ঘ                            | ২৪, ১২৮, ১৩২,      | হাটপত্ন         | ৩৬৩      |
| সংস্কার দত্ত                    | ৩৫০                | হাডিপ           | ৬৪       |
| সমাজ                            | ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৭৯, ৫১৭ | হামিদ্দার       | ৫৪       |
| সহস্রোচ্চকবর্তী                 | ৫৯ ২১৩, ৪৪৩, ৪৫২   |                 |          |

|                     |     |                |          |
|---------------------|-----|----------------|----------|
| হালহেড সাহেব        | ৬৪১ | হীরামালিনী     | ৫৫৩      |
| হাস্তার্ণব          | ৫৩৩ | হুসেন চৌধুরী   | ৫৪০      |
| হিন্দীকাব্য         | ৬২৭ | হুসেন সাহ      | ১৩৬, ৩৯৪ |
| হিন্দী পদ্মাবত      | ৫৪২ | হুসেনী সাহিত্য | ২১৮      |
| হিন্দুস্থানী রেবিলে | ৯২২ | হেমলতা         | ২৭৮      |

---